শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। বৈশাখ ১৩২১ ১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়

লেখকগণের নাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীগুরুদাস সান্যাল, শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমতিলাল সিংহ রায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

নিয়মাবলী।

—:০:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখক-গণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। } বৈশাখ ১৩২১ { ১ম সংখ্যা।

বাণী-বোধন।

কল্পে কল্পে যুগে যুগে বরষে বরষে,
এস মা সাহিত্যকুঞ্জে নব নব বেশে,
নব নব ফুল ফুটি ও পদ পরশে,
সৌরভ ছড়ায়ে দিক্ দেশে ও বিদেশে।
কুঞ্জপিক সাড়া দিক্ বীণার ঝঙ্কারে,
নব একতান এক উঠুক ফুটিয়া,
মন্ত্র মুগ্ধ করি সবে বিশ্বচরাচরে,
সে তান দিগন্ত কোলে পড়ুক লুটিয়া।
জাগ মা, বরষপরে একুঞ্জ মাঝারে,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি হ'ক প্রকাশিত।

হেথা হোতা লুকায়িত ছায়া ও আঁধারে।
বিনাশি করুক তাহা কুঞ্জ আলোকিত।
অমল ধবল ছবি বিকাশি আবার
সাহিত্যকুঞ্জের মাঝে জাগ মা আমার।

নববর্ষ।

টপ্-টপ্-টপ্—অজ্ঞের অনন্তের অভ্র বিস্তার হইতে, দেবতার করুণার শীতল সমীর সংস্পর্শে, যেন মুক্তাফলের আকারে আকারিত শীতল বারি-বিন্দুর ন্যায়, এক একটী বর্ষ অপরিজ্ঞাত অনন্তের ক্রোড়ে যাইয়া পতিত হইতেছে। এমন কত আসিল, কত পড়িল। কোটি কোটি কল্প কোটি কোটি বর্ষ—এমনই ভাবে অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইয়াছে। আর আমি চুরাশী লক্ষ যোনি বারে বারে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন কত বর্ষবিদায়ের হিসাব রাখিয়াছি, কত হিসাব বিস্মৃত হইয়াছি। ইহা ত আমারই হিসাব - আমার গতাগতির হিসাব—জনন মরণের হিসাব—ভাব অভাবের হিসাব। আমি আসি যাই; তাই আমার কালের হিসাব রাখিতে হয়। আমার গতা-গতি না থাকিলে, কাল আছে—সময় থাকে না—পরিমাণ থাকে না, কল্প, যুগ শতাব্দী, বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড থাকে না। আমার যাতায়াতের জন্যই এতটা হিসাব।

আমি কেন এত ছুটাছুটি করি? কে জানে কেন! কেহ বলেন ভগবানের এমনই ইচ্ছা, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন কর্ম্মফল। ঘোড়াকে প্রত্যহ যেখানে চক্কর দেওয়া যায়, সেখানে চক্রাকার একটা পদচিহ্ন ফুটিয়া উঠে; যে পথ ধরিয়া প্রত্যহ ঘাটে যাওয়া যায়, সেই পথে একটা দাগ পড়িয়া যায়, আর সেখানে ঘাস জন্মায় না। জন্মমরণের মধ্যে পড়িয়া

কত জীব কত চক্কর খাইতেছে, অনন্তের ঘাটে যাইবার জন্য কত জীব এক পথ দিয়া হাঁটিতেছে। তাহাদের গতাগতির ফলে কালের বক্ষে একটা দাগ পড়িয়া যায়, বিস্মৃতির শষ্প-বিস্তার সে দাগের উপর আসিয়া পড়ে না। অনন্তকোটি জীবের পদচিহ্নের উলঙ্গরেখা ভৃগু-পদচিহ্নের ন্যায় কালের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি কৃপা করিয়া এ চিহ্ন মুছিয়া ফেলেন না। ইহাই কালের পরিমাণ, ইহা হইতেই আমার নূতন ও পুরাতনের হিসাব। কেন এ দাগ থাকে? যিনি সে চিহ্ন সাদরে হৃদয়ে ধরিয়া আছেন, তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার করুণা।

যম ও কাল একই পুরুষ। যাহা বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহাই যম; যিনি সংযত, প্রণালীকৃত, পদ্ধতির দ্বারা শাসিত, তিনিই যম। যিনি যম, তিনিই ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা ধারণ করা যায়, তাহাই ধর্ম্ম। যিনি বিধির বা নিয়মের শাসনে সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্ম! সুতরাং তিনিই যম। যিনি সৃষ্ট ব্যাপারকে জনন-মরণের প্রণালীবদ্ধ রাখিয়াছেন, তিনিই যম। কালের উপর দিয়া এ প্রণালী বহিয়া গিয়াছে, তাই যিনি যম, তিনিই কাল। কাজেই কাল, ধর্ম্ম ও যম একই পুরুষ। এই কালের উপর দিয়া সৃষ্টির যে প্রণালী বহিতেছে, অজ্ঞেয়, অনন্ত কাল জলের যে তরঙ্গভঙ্গ-ব্যাকুল তটিনী ছুটিয়াছে, তাহাই কাল-সহোদরা কালিন্দী, যম-ভগিনী যমুনা। যম কেবল বিন্যাস কেবল অবস্থান; যমুনা বিকাশ ও উন্মেষ। যম সাগরসম কেবল বিস্তার, যমুনা সে বিস্তারবক্ষে কোটী বীচিবল্লরীবিক্ষোভী। যম নীল আকাশ, যমুনা যেন আকাশের কোলে উষার খেলা। যম তমাল তরু, যমুনা মাধবী লতা; যম অবস্থান মাত্র, যমুনা ক্রিয়া। যম স্বয়ং কাল, যমুনার এক একটী উর্ম্মি এক একটী কল্প, এক একটী মন্বন্তর। এই যম ও যমুনা লইয়া কালের খেলা চলিতেছে। যমও অজ্ঞেয়, যমুনাও অজ্ঞেয়; কেবল যমকে ধরিতে পারি না, যমুনাকে ধরিতে পারি,—অনুভবের মধ্যে আনিতে পারি। যমুনার দুই পাড় স্মৃতি দিয়া বাঁধা; যম সাগর, উহার তীর নাই, তট নাই, আছে কেবল সৃষ্টির বিকাশ।

এই কালের খেলার মধ্যে জীব যেন শফরীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে;—কখনও বা ঢেউ খাইয়া বেলাভূমির উপর যাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা অতল

জলে ভাসিয়া যাইতেছে। এই এক একটা আছাড়, এক একবার অতল জলে ডুব স্মৃতির এক একটা পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদ ধরিয়া কালের পরিমাণ। ব্রজ-গোপীসকল বলিয়াছিলেন যে, কত কাল ব্রজ লীলায় আমরা মগ্ন ছিলাম, তাহার হিসাব ত বলিতে পারিব না। তবে যে দিন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভ্রান্ত হইয়া আছাড় খাইয়া নৈরাশ্যের বেলাভূমিতে যাইয়া পড়িয়াছি, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত দিনের-দণ্ডের এবং পলের হিসাব আছে। দুঃখের হিসাব হয়, কেন না, দুঃখ যে বাধা, দুঃখ যে কেবল প্রতিকূল বেদনা! অতএব নির্দ্দিষ্ট কাল,—পরিমিত কাল দুঃখের দ্যোতক।

এস নববর্ষ, আমার দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য তুমি এস। ভোগের বল্মীক-পিণ্ডের উপর আর একটি বালুকা কণা হইয়া, এস নববর্ষ, আমাদের এ বিষম ভোগের ভার বৃদ্ধি কর। আমার অনন্ত গণনার সহায়ক তুমি, আমার কাল-পরিমিতির অবলম্বন তুমি—নৈরাশ্যের ও বিরহের বেলা ভূমিতে যমুনার বীচি-বিস্তারের মত এস নববর্ষ, আমাদের আশার স্নেহ-সেচনে স্নিগ্ধ করিয়া যাও। ঐ শুন সুপক্ক মহাকাল (মাকাল) ফলের মতন একটী বর্ষ টপ্ করিয়া অতীতের গর্ভে পড়িয়া গেল। কত ব্যথা, কত বেদনা, কত দুঃখ, কত জ্বালা, কত ক্ষোভ, কত নৈরাশ্য ক্রোড়ে করিয়া একটী বর্ষ অতীতের অনন্ত গর্ভে পড়িয়া গেল। সে দিন আর ফিরিবে না, সে কাল আর আসিবে না; অথচ যতদিন উহার স্মৃতিটুকু জাগরূক থাকিবে, ততদিন অন্তর্দাহ হইতেই থাকিবে। এস নববর্ষ আমার স্মৃতির চিতাচুল্লীজ্বালামালাকে সজীব রাখিবার জন্য নূতন কাষ্ঠ খণ্ডের মত তুমি রাবণের চিতায় আসিয়া পতিত হও। তুমি দগ্ধ হইতে না হইতে এই ভাবে আর একটি—আর একটি করিয়া কত নববর্ষ যে আসিবে, তাহার হিসাব নাই। রাবণ বধের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন কত আসিয়াছে। কত নববর্ষ কত ভাবে সে ভীম চিতাকে প্রজ্বলিত রাখিয়াছ। তুমিই বা তাহার কোন দিক্ জ্বালাইয়া রাখিবে? তোমার উপর দিয়া কি চিতাচুল্লী হইতে নীল অগ্নিজিহ্বাসকল ফুটিয়া উঠিবে? আশায় তোমায় ডাকিতেছি না, পরিবর্ত্তনের লোভে তোমায় আহ্বান করিতেছি না; তোমার কুক্ষিগত অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের মঞ্জুষা দেখিয়া তোমাকে

আমন্ত্রণ করিতেছি না। তুমি আসিতেছ তোমার আগমন অনিবার্য্য বলিয়া তোমাকে কেবল প্রত্যুদ্‌গমন করিতেছি।

কাল কদম্বদ্রুমের পত্রস্বরূপ এক একটি বৎসর। শ্রীকৃষ্ণ এই কদম্ব মূলে দাঁড়াইয়া, ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠামে বাঁশী বাজাইতেছেন, বংশীরব শুনিয়া ক্রোড়বাহিনী যমুনা উজান বহিতেন—দুই কূল প্লাবিত করিয়া যমুনা উজান বহিতেন। সে কৃষ্ণ নাই, সে ব্রজ-বিলাস নাই। তাই বিরহের তাপে কদম্ববৃক্ষের এক একটি পত্র শুষ্ক হইয়া যমুনার জলে উড়িয়া পড়িতেছে। যতক্ষণ পাতা জলে ভাসিতেছে, ততক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, ততক্ষণ স্মৃতির সাহায্যে অতীতের কথা একটু আধটু মনে থাকিতেছে। যখন সিক্ত গলিত পত্র ডুবিতেছে, তখন বিস্মৃতি আসিয়া ঘেরিতেছে। এখানে সবই নূতন—সবই পুরাতন। আমিই কেবল হিসাব-নিকাসের জন্য একটাকে নূতন একটাকে পুরাতন বলিতেছি। এই হিসাব-নিকাসে যে আমার অহমিকার পুষ্টি হয়, আমার অহঙ্কারের পোষণ হয়। তাই যাহা যায়, তাহাকে পুরাতন বলি; যাহার আগমন প্রতীক্ষা করি। তাহাকে নবীন বলি। অথবা যাহা কদম্ব-কাণ্ডে সংযুক্ত শ্যাম শোভায় আপ্লুত, তাহাই নূতন,—নিতাই নূতন; আর যাহা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা অবহেলার বিষয় ভাবিয়া পুরাতন। এস নববর্ষ, নব কিশলয়ের শোভা বিস্তার করিয়া, মাধবের মাধুরী ফুটাইয়া এস—এস নব বর্ষ। আমরা দেখি—দেখিয়া পরিতৃপ্ত হই। দেখার সাধ মিটিলে তুমিও পুরাতন হইবে, তোমাকেও যাইতে হইবে। যতক্ষণ আছ, তাই ততক্ষণ নয়নময় হইয়া তোমাকে দেখিব। তোমার কুক্ষিগত মঞ্জুষা হইতে তুমি সুখ দুঃখের নানা উপাদান বারোমাসে ছয় ঋতুতে নানা ভাবে বাহির করিতে থাক—আমরা কেবল দেখিতে থাকি। মরিব না ত। সেই দ্বাপরের ব্রজবিলাস হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল দেখিতেইছি। কদম্ববৃক্ষের এমন কত পাতা গজাইল, কত পাতা শুকাইল—আমরা কেবল তামাসাই দেখিতেছি। দেখিব বলিয়াই তোমাকে ডাকিতেছি,—এস নববর্ষ—আমার শ্রান্তি নাই, বিরতি নাই, তোমাকে দেখিব বলিয়াই ডাকিতেছি—এস নববর্ষ!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিকথা।

(ভবভূতি।)

মহাবীর-চরিত।

(৪)

শ্রীরাম ও পরশুরামের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বমণ্ডলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ভার্গব অবশেষে রামচন্দ্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। দেবতারা বিমানচারীদিগকে মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে বলিলেন, এবং তাঁহারাও এইরূপ স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইলেন।—"কৃশাশ্ব-শিষ্য ভগবান্ কৌশিক মুনির জয়, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের জয় এবং ক্ষত্রিয়ারির শিক্ষক, জগতের অভয় দাতা, লোকশরণ্য দিনকরকুলেন্দু রামচন্দ্রের জয়।" সেই সময় রাবণসচিব মাল্যবান শূর্পণখার সহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক বিমানারোহণে আকাশ মণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণের আনন্দোৎসবে মাল্যবানের চিত্তে দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি শূর্পণখাকে দেবতাদিগের একযোগ ও ইন্দ্রাদির স্তুতি-গানের কথা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সূর্পণখা মাল্যবানের নিরুপম সত্য বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন; তিনি এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুইটী বরের প্রার্থনায় রাজার নিকট মন্থরা নামে পরিচারিকাকে অযোধ্যা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, সে এক্ষণে মিথিলার উপকণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে; চারগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি। তুমি এক্ষণে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও অপর বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের দণ্ডকবনে গমন প্রার্থনা কর। সূর্পণখা রাম তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না এবং তাহাতেই বা কি ফল লাভ হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান উত্তর দিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশে বিশেষতঃ বিজয়কামী রামের নিকট পিতৃসত্য অমান্য হইবে না। তাহার পর সাম দান ভেদ দণ্ডাদি

যোগাচার নীতি অনুসারে রামকে দূরে আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের নিকটে আনিতে হইবে, বিন্ধ্যারণ্যের অপরিচিত স্থানে বিচরণ করার সময় তাঁহাকে আক্রমণ করার বেশ সুযোগ উপস্থিত হইবে। দণ্ডকারণ্যে বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি বিচরণ করিয়া থাকে, তাহারা প্রভুশক্তি-হীন রামের উৎসাহ-শক্তিকে মায়াপ্রভাবে পরাভূত করিতে পারিবে। ইহাতে রাবণের সীতা-হরণ সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। সূর্পণখা লক্ষ্মণের রামের সহিত আসার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, লক্ষ্মণও রামের ন্যায় অস্ত্রপারদর্শী বীর, উভয়কেই একসঙ্গে ছদ্মভাবে দমন করা প্রয়োজন। সূর্পণখার কিন্তু এসকল ভাল লাগিতেছিল না। তিনি দূরবর্ত্তী রামকে নিকটে আনিয়া ও সীতাহরণের দ্বারা স্ত্রীঘটিত বিরোধ উপস্থিত করা অমঙ্গলকরই মনে করিতেছিলেন; এবং মাল্যবানকে তাহা জানাইলে, মাল্যবান রামচন্দ্রের স্বমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট মণ্ডলে অবস্থিতির জন্য দূরবর্ত্তিতা অস্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, সুবাহু মারীচের বিজেতা ও তাড়কাহন্তার সহিত রাবণের বৈর অবশ্যম্ভাবী। আবার দেখ, রামচন্দ্র জগতের পালক, আমরা কিন্তু তাহার পীড়াদায়ক; সুতরাং এই নিত্য শত্রুতার জন্য তাহার প্রতি সাম-নীতির ব্যবহার করা যাইতে পারে না। আর যাহাকে দেবতারা পতিরূপে স্বীকার করিতেছেন, তাহার কিসেরই বা প্রয়োজন? কাজেই তাহার প্রতি দান-নীতিরও প্রয়োগ করা যায় না। ভেদ-নীতির প্রয়োগও আমাদের সাধ্য নহে, একমাত্র দণ্ডনীতি অবশিষ্ট থাকে। তাহার মধ্যে এরূপ প্রবল শত্রুতে প্রকাশ দণ্ডের বিধান অসম্ভব; কাজেই গুপ্ত দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই জন্য বনে আকর্ষণ করিয়া সীতাহরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে শত্রু কর্ত্তৃক স্ত্রী হরণে সলজ্জ রাম তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর আশ্রয় লইতেও পারেন অথবা ক্ষীণবল হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। কিম্বা প্রতাপহীন হওয়ায় পরিতপ্ত হইয়া সন্ধির ব্যবস্থাও করিতে পারেন। আর যদি অবমাননা ভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বিনাশের জন্য উদ্যত হন, তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী তাঁহাকে সমুদ্র নিবারণ করিতে না পারিলেও

আমাদের সহিত মিত্রতার আবদ্ধ ইন্দ্রনন্দন বালী নিহত করিয়া ফেলিবে, কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তার অনেক প্রয়োজন।

সূর্পণখার তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়ায় মাল্যবান আবার কহিতে লাগিলেন যে, বৎসে তুমি রাবণের প্রিয় এবং কার্য্যজ্ঞও বটে, সেই জন্য তোমার নিকট নিঃশঙ্কভাবে মনের খেদ জানাইতেছি। ক্ষত্রিয় রাম স্বমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট মণ্ডলবর্ত্তী এবং আমাদের অপকারী এবং আমরাও তাহার অপকারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তিনি আমাদের প্রাকৃত ও কৃত্রিম দ্বিবিধশত্রু হইয়া উঠিয়াছেন, আর আমার তৃতীয় দৌহিত্র ও রাবণের অনুজ বিভীষণ সহজ শত্রু আছে, এই তিন প্রকারশত্রু নিকটবর্ত্তী হইয়া সর্পের ন্যায় ভয় উৎপাদন করিতেছে। কুম্ভকর্ণ থাকিয়াও না থাকার মত, সে স্বেচ্ছাকৃত নিদ্রা ব্যসন ও অবিনয়ে মগ্ন, বিভীষণ সুশীলতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আত্মগুণ-সম্পন্ন হওয়ায় অমাত্যগণ তাহার অনুরক্ত; খর দূষণ প্রভৃতি সজ্জজীবিগণ রাজাকেই ভজনা করিয়া থাকে, তাহারা বৎসের ধেনু দুগ্ধ-দোহনের ন্যায় রাজার অর্থ শোষণ করিতেছে, অমাত্যেরা বিরক্ত হইয়া উঠিলে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ ভেদজর্জ্জর রাজকুল রামচন্দ্রের আক্রমণমাত্রেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। নীতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, বিপদ লঘু হইলেও আক্রান্তের নিকট তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং বিভীষণের বিষয়ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য, তাহার প্রতি প্রকাশ দণ্ড, গুপ্তদণ্ড, কারাবন্ধন বা নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রকাশ দণ্ডে সমসম্পর্কীয় রাক্ষসেরা সহ্য করিবে না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা গুপ্তদণ্ডেরও অনুমান করিতে পারেন, তজ্জন্য অমাত্যেরা কুপিত হইলে রামের আক্রমণে তাহা ভয়ানক হইয়া উঠিবে, তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলে বিভীষণের সহিত একমত খর দূষণ প্রভৃতি বিরোধী হইয়া উঠিবে, নির্ব্বাসন করিলে তাহারা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে খর দূষণের বিষয় প্রথমেই চিন্তা করিতে হয়।

মাল্যবানকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া সূর্পণখা বলিয়া উঠিলেন যে, সেবা-বৃত্তির কি গুরুত্ব! রাবণ ও খর দূষণ, সম্বন্ধে তুল্য হইলেও মাতামহ এক্ষণে তাহাদের বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মাল্যবান উত্তর দিলেন যে, ইহা সদ্বংশীয়গণের আচার বটে। খর দূষণ প্রভৃতি ব্যতীত বিভীষণ নিজে

কি করিতে পারেন; সূর্পণখা সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, যে আমাদের বিরুদ্ধভাব বুঝিতে পারিবে সে নিজেই অপসৃত হইবে, অথবা আমরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেও স্বজন হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই, এরূপ মনে করা উচিত নহে, কারণ আশৈশব যাহার সহিত বিভীষণের সখ্য স্থাপিত আছে, এবং যে এক্ষণে বালী প্রদত্ত ঋষ্যমুখে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সুগ্রীবের সে নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেখানে বালী তাহাকে বধ করিবে, নিজেই অথবা সুগ্রীবের দ্বারা রামের আশ্রয় লইলেও বালী তাহা উপেক্ষা করিবে না। সূর্পণখা তখন বলিয়া উঠিলেন যে, পরশুরামের পরাভবের ন্যায় রাম যদি বালীকে বধ করেন, তবে রাম বিভীষণ সংযোগ অনর্থকর হইয়াই উঠিবে। সে কথায় মাল্যবান কহিলেন যে, বালীকে যিনি বিনাশ করিবেন, তাঁহাকে আমাদেরও নিহন্তা বলিয়া জানিবে, সেরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে একমাত্র কুলতন্তু বিভীষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। ধর্ম্মময় রাম তাহাকেই রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিবেন। সূর্পণখা অগত্যা তাহাই হউক, বলিলে মাল্যবান তাঁহাকে মিথিলায় পাঠাইতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন যে, তুমি এক্ষণে মিথিলায় গমন কর। জনক দশরথের নিকট বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র না থাকিলে আমাদের উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধিত হইবে; আমিও লঙ্কার দিকে চলিলাম। সূর্পণখা হা মাতঃ না জানি তোমার ভাগ্যে কতকষ্ট আছে বলিলে, তখন মাল্যবান বলিয়া উঠিলেন "হা বৎস খর দূষণ! তোমরা আমার ন্যায় পাপীর দ্বারাই নিহত হইবে, হা বৎস বিভীষণ! তুমিও আমার দ্বারা স্বস্থানচ্যুত হইবে! হা বৎস রাবণ! তোমার মহাশঙ্কটই উপস্থিত দেখিতেছি। হা বৎসে কেকসি! তুমি শীঘ্রই আর তিনপুত্র দেখিতে পাইতেছ না।" তাহার পর সূর্পণখা মিথিলায় এবং মাল্যবান লঙ্কাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে ভার্গবের পরাভবে মিথিলায় আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। জনক দশরথ পরস্পর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন, বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জনক দশরথকে বলিলেন "রাজন্। সৌভাগ্যক্রমে তুমি রামভদ্রের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়াছ! সেই মহাবীরের অসামান্য সতত গুণান্বিত, অতিমানুষ মহাফলদ অদ্ভুতচরিত

কেবল আমাদের বলিয়া নহে, সমস্ত জগতেরই মঙ্গলকর বলিয়া জানিবে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—সখে কুশিকনন্দন! রামচন্দ্রের মহিমা আমাদের আশীর্ব্বাদের অতীত। কারণ তাহার দ্বারা আমরা ও ত্রিভুবন কৃতার্থ হইয়াছি। সে কথায় বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, রামচন্দ্রের মহিমা তাহার প্রকৃষ্ট পুণ্যের ফলস্বরূপ, এ আতিশয্যের আমরা কেহই নহি। দশরথ বলিয়া উঠিলেন "ভগবান কুশিকনন্দন ওকথা বলিবেন না। আদিত্যবংশীয় পূর্ব্বনৃপতি দিলীপ প্রভৃতির কুলদেবতার ন্যায় তেজোরাশির অরুন্ধতীপতির ভক্তিভরে আরাধনার এবং প্রচুরতপশালী অমোঘাশিষ দক্ষ ঋষিগণের আশীর্ব্বাদের ফলে মঙ্গলনিধি আপনাকে প্রসন্ন করায় রামভদ্রের এই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।" বশিষ্ঠ কহিলেন, "সত্য সত্যই বিশ্বামিত্র এই রূপই বটেন, বাক্যমনের অগোচর উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, প্রদীপ্ত-অপ্রমেয় মহত্ব এই দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্মর্ষিতে তেজোভরে জ্বলিয়া উঠিতেছে।" বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন, "ভগবান্ মৈত্রাবরুণ সনৎকুমার ও আঙ্গিরসের গুরুবিদ্যা তপোময় আপনি যখন আমার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন সে গুণ আমাতে না থাকিলেও তাহা আছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, আপনার বাক্যই অমোঘ পবিত্র। আর রামভদ্রের পক্ষে এসমস্ত কার্য্য বিস্ময়করও নহে, কারণ রাজা দশরথ তাহার জনক। বৈবস্বত মনুর বংশে সাক্ষাৎ পুণ্যোন্নতির ন্যায় আপনার উপদিষ্ট বিধি অনুসারে প্রজাপালনে রত, পবিত্রচরিত যে রাজগণ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ধুরন্ধর বীর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, গুণনিধি রাজা দশরথের যে শ্লাঘ্য ধরিত্রী-পতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার বৃত্রশত্রু জম্ভদমন, বিশ্ব-পতি দেবরাজ মহেন্দ্র সেনাশিক্ষক অসুরহন্তা এই বীরকে বহুবার যুদ্ধে বরণ করিয়াছেন। ঈদৃশ দশরথ বিসদৃশ পুত্রের কি জনক হইতে পারেন? সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? ভগবান্ ইন্দ্রের বিজেতা দশানন, দশাননের বিজেতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, তাঁহার নিহন্তা ত্রিভুবনে প্রখ্যাতমহিমা মহাবীর পরশুরামকে জয় করিয়া বৎস রামভদ্র সমস্তই ত জয় করিয়াছেন বলিতে হইবে।

এই সময়ে জামদগ্ন্য ও রামচন্দ্র সেইদিকে আগমন করায় তাঁহাদিগকে

দেখিয়া লোকসকলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, রাজা দশরথ তাঁহাদের আগমন লক্ষ্য না করিতে পারায়, লোকসকলের দ্বিধা বিভাগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বিশ্বামিত্র রাম-জামদগ্ন্যের আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বীরশ্রী ও বিনয়ে শোভিত হইয়া মান্য মুনির নিকট অবনত অথবা গুণোন্নত রাম গুরু-সমীপে প্রথমাপরাধী শিষ্যের ন্যায় হতবীরদর্প ভার্গবের কাছে লজ্জা প্রকাশ করিতে করিতে এদিকে আসিতেছেন। আসিতে আসিতে রামচন্দ্র জামদগ্ন্যকে বলিতেছিলেন, "ব্রহ্মবাদীদিগের উপাসিত বন্দ্য পদযুগে শোভিত, বিদ্যাতপব্রতনিধি, তেজস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ আপনার প্রতি যে অবিনয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিয়া, প্রসন্ন হউন। আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি। জামদগ্ন্য বলিলেন যে, সে কি কথা, তুমি কোনই অপরাধ কর নাই; বরঞ্চ আমার উপকারই করিয়াছ। চৈতন্যমাত্রাহরণ করিয়া যে দর্পব্যাধি পুণ্য ব্রাহ্মণ জাতি,—বংশগুণ ও আমার শ্লাঘ্য চরিত্রের ধ্বংস ঘটাইয়াছে, এবং যে এক হইয়াও বহুদোষে গহন, ব্রাহ্মণবৎসল তোমা কর্ত্তৃক মঙ্গলের জন্যই তাহা শমিত হইয়াছে। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, আপনার বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণই আমার অপরাধ। জামদগ্ন্য কহিলেন যে, তাহা অন্যায্য নহে। কারণ, অন্য প্রকারে রোগীর দোষ অসাধ্য বিবেচনা করিয়া যেমন বৈদ্য শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন, দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তির প্রতি রাজাকেও তাহারই অনুকরণ করিতে হয়। রামচন্দ্র জামদগ্ন্যের সহিত উক্তিপ্রত্যুক্তিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। জামদগ্ন্য কোথায় যাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র প্রথমে দশরথ জনকের নিকট বলিয়া লজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকট যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভার্গব লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু রামের নির্দ্দেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া অগত্যা সেই দিকেই চলিলেন।

যেখানে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও জনক দশরথ অবস্থিত ছিলেন, রাম পরশুরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। জামদগ্ন্য তখন সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাঁহার বিজয়ী শাসন জামদগ্ন্যেও প্রতিষ্ঠিত, এই সেই

সৌম্যত্বে অচণ্ড চণ্ডশাসন রাম।” জনক দশরথ ভার্গবের অতি গম্ভীর সৌজন্য প্রকাশে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র সকলকে যথারীতি প্রণাম করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। জামদগ্ন্যও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আপনাদের ন্যায় বৃদ্ধ গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যে মহাপাপের সঞ্চয় করিয়াছি, রাম কর্ত্তৃক দমিত হওয়ায় এক্ষণে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব, তাহার আদেশ প্রদান করুন। মন্বাদি আপনারাই ত প্রথম ধর্ম্মদ্রষ্টা এবং গুরুর নিকট হইতে অনেক প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনারাই ত গ্রন্থসমূহ দ্বারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।” বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন যে, বৎস অদ্যই দেখিতেছি তুমি শ্রোত্রিয়—আমাদের কুলে জন্ম লাভ করিলে। তোমার দুর্বিনয়ে আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার সুখী হইয়াছি। বৃদ্ধদের স্বভাবই এই, এক্ষণে প্রকৃত কল্যাণের অনুষ্ঠান হউক। তুমি এক্ষণে পরিশুদ্ধই হইয়াছ। বিশ্বামিত্রও কহিলেন যে, বৎস রামচন্দ্রের দ্বারা যে তোমার পাপ মোচন হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছি। কারণ, ধর্ম্মাচর্য্যেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজদণ্ডেও পাপের বিশুদ্ধি হয়, সুতরাং প্রজাপালকদিগের নিকটে বশিষ্ঠ আর কি আদেশ করিতে পারেন। রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন যে, এই সকলই ভগবান্ সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্ম-ঋষিগণের প্রসন্ন গম্ভীর পবিত্র বচনাবলী। দশরথও পরশুরামকে কহিলেন “ভগবন্,—জামদগ্ন্য স্বভাবতই পবিত্র; আপনার আবার পবিত্রতার প্রয়োজন কি? তীর্থোদক ও বহ্নির কি শুদ্ধির প্রয়োজন হয়?” জামদগ্ন্য তখন নির্জ্জন বাসের অভিলাষ করিয়া ভগবতী বসুন্ধরাকে রন্ধ্র দানে প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করিলেন। জনক সে সময়ে তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে, জামদগ্ন্য যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন সকলে তথায় উপবেশন করিলেন। ইহার পর রাজা দশরথ জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা জনপদ-বহির্ভাগে অবস্থিতি করেন, আমরাও নিজ নিজ গৃহকার্য্যেই ব্যস্ত থাকি, আমাদের মনোরথ-বাঞ্ছিত আপনাদের আগমন দীর্ঘকাল পরে বহু পুণ্য-ফলে মাত্র লাভ করিলাম। স্তুতিপথের অতীত প্রভাবে প্রদীপ্ত আপনার

কি স্তুতি করিব? সমগ্র মহী যাঁহার অকপট দান, তাঁহাকে দান করিবারই বা কি আছে? বিষয়বিরত শান্ত মুনিজনের পরিজনই বা কি করিবে? তথাপি পুত্ত্রগণ সহ দশরথকে আপনার বশম্বদ বলিয়াই জানিবেন। জামদগ্ন্য উত্তর দিলেন "তোমাদের এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, মুনিগণ যাঁহাকে প্রদীপ্ত ধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতির্নিধি ভগবান্ সবিতাই তোমাদের প্রসবিতা, ইহা অপেক্ষা তোমাদের অন্য সম্পদের প্রশংসা-বাদের প্রয়োজনই বা কি? আর অপ্রমেয়মহিমা বশিষ্ঠ বেদের ন্যায় যাহাদের ধর্ম্মগুরু, সেই যাজ্ঞিক ইক্ষ্বাকুবংশীয় তোমরাই প্রকৃত রাজর্ষি। দেবাসুর যুদ্ধে অভয়প্রদ ধনুঃশাসন, সপ্ত দ্বীপে নিবিষ্ট-যজ্ঞযূপশ্রেণীর দ্বারা অঙ্কিত ভূমি সকল, সনাতন কীর্ত্তি ভগবতী ভাগীরথী ও সাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কার্য্যাবলী তোমাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে।" পরশুরামের কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্রের নিকট হইতেই এ সমস্তের শিক্ষালাভ হইয়াছে দেখিতেছি। তাহার পর ভার্গব রামচন্দ্রকে তাঁহার বনগমনে অনুমোদন করিতে বলিলে, বিশ্বামিত্রও বিদায় চাহিয়া বলিলেন যে, রঘুজনক-গৃহে বিবাহ-মঙ্গল দর্শন করিলাম। এক্ষণে ভার্গববিজয়ী বৎস রামভদ্রকে অভিনন্দন করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই। বিশ্বামিত্রের গমন কথা রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে জানাইলে, বিশ্বামিত্র অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন। "বৎস! তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, কিন্তু অনুষ্ঠানের নিত্যতা আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া থাকে। আহিতাগ্নিগণের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম প্রত্যবায়-সঙ্কট বলিয়াই জানিবে।" বশিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন যে, স্বগৃহ হইতে স্বগৃহে যাতায়াত ত স্বেচ্ছাধীন। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, তাহাই যদি ভগবানের অনুরোধ হয়, তাহা হইলে চলুন দুজনেই সিদ্ধা-শ্রমে যাই, আপনাকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত হইলে, মধুচ্ছন্দ-মাতার সমাদরই লাভ করা যাইবে। বশিষ্ঠ তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন। জনক দশরথ বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "ব্রহ্মর্ষি-সঙ্গম কতই রমণীয়, কতই মধুর। যাঁহারা পরস্পরে পরস্পরেরই মাহাত্ম্য জানেন এবং অন্যে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত নহে, তাঁহাদের বিরোধও পরোপকারের জন্যই

উজ্জ্বল হইয়া উঠে, প্রণয়ের ত কথাই নাই।” সেই সময়ে সীতা দূর হইতে গুরুজনদিগকে অভিবাদনের কথা জানাইলে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন “বৎসে জানকি! বর্ত্তমান বিজয়-মঙ্গলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-গৃহিণীগণ তোমার বহুমান সহকারে যে পূজা করিতেছেন, তোমার বিজয়ী বীরপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের মহাভয় নিবৃত্ত হইলে, শচীও তোমায় সেইরূপ পূজা করিবেন বলিয়া মানস করিতে থাকুন।” ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, রাক্ষসগণ অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হউক। তাহার পর ঋষিরা আসন হইতে উত্থিত হইলে অপর সকলেও প্রণাম করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জামদগ্ন্য গমনোদ্যত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “তোমার শান্তি স্থিরা হউক, প্রত্যগ্ জ্যোতির প্রকাশ হউক, এবং অন্তঃকরণ শুভ সঙ্কল্প হইতে অভিন্ন হউক।” তাহার পর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

জামদগ্ন্যও তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পরশুরাম বলিতে লাগিলেন “ক্ষত্রিয়ধ্বংস হইতে নিবৃত্ত হইয়াও আমি যে ধনুঃ ধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না সমিচ্ছেদনের জন্য পরশুর কিছু ব্যবহার হইতে পারে। আমার অভিলাষ এই যে, দণ্ডকারণ্যের পুণ্য সরিত্তটে যে সমস্ত ঋষি বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বিধ্বংসের জন্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা তথায় সতত বিচরণ করিয়া থাকে, সেই নিশাচরগণের ভ্রমণের জন্য এই ধনুই উপযোগী হইবে, তাই এই ধনুর সহিত তোমাতেই রাক্ষসবধের অধিকার ন্যস্ত করিতেছি,” এই বলিয়া পরশুরাম রামচন্দ্রকে ধনু সমর্পণ করিলেন। রামচন্দ্রও “আপনার আদেশ শিরোধার্য্য” বলিয়া ধনুকটি আগ্রহ সহকারে লইলেন। তাহার পর জামদগ্ন্য বাষ্পাকুললোচনে “আয়ুষ্মন্ তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও” বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রও অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভার্গবের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি কি উপায়ে দণ্ডকারণ্যে যাইবেন, তাহারই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্নেহপ্রবণ গুরুজনেরা

যে তাহাকে যাইতে দিবেন, রামচন্দ্র তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতে ছিলেন না। ভার্গব তাঁহাকে অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন, অথচ তিনিও পরাধীন, ওদিকে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক তপস্বীরা উৎসারিত হইতেছেন, এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মাল্যবানের উপদেশ ক্রমে শূর্পণখা মন্থরার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছিল, প্রথমে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে রামকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। রাম যখন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ দূর হইতে মধ্যমা মাতার প্রিয়সখী মন্থরার আগমন সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। রামচন্দ্র মন্থরাকে লইয়া আসিতে বলিলে, লক্ষ্মণ শূর্পণখাবিষ্টা মন্থরাকে লইয়া উপস্থিত হয়। পরশুরামবিজয়ী রামচন্দ্রকে দেখিয়া শূর্পণখার মন বিচলিত হইয়া উঠিল, সমগ্র সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আবেশে লোচন-রসায়ন রামচন্দ্রের সৌম্য শরীর-নির্ম্মাণ নিরীক্ষণ করিয়া, সংসার-সুখহারী বৈধব্য দুঃখে জর্জ্জরিত শূর্পণখার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র না থাকায়, তিনি সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া স্বকার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মন্থরার মুখ দিয়া কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরদ্বয় রামচন্দ্রের দ্বারাই রাজা দশরথকে জানাইবার জন্য প্রকাশ করিলেন। লক্ষ্মণ মন্থরার হস্ত হইতে কৈকেয়ীর পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, "এক বরে ভরত রাজ্য ভোগ করিবেন, অপর বরে রামচন্দ্র অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে যাইবেন; তথায় বল্কল পরিধান করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিতে হইবে, সীতা ও লক্ষ্মণ ব্যতীত অন্য কোন পরিজন অনুগমন করিতে পারিবে না।" রামচন্দ্র যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাই উপস্থিত দেখিয়া তিনি ইহাকে মহানুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন। কৈকেয়ীর বর তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া দিল, বিশেষতঃ লক্ষ্মণের বিরহ ঘটিবে না বলিয়া তাহার মনে আনন্দ-সঞ্চার হইল। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিতে পারিবেন জানিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বনগমনের ইচ্ছা মন্থরাকে জানাইলে, মন্থরা যে সংসারে রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় কল্পদ্রুম জন্মে, তাহাকে প্রণাম করিতে করিতে অপসৃত হইল।

এই সময়ে ভরত মাতুল যুধাজিতের সহিত আসিতেছিলেন। লক্ষ্মণ সেকথা রামচন্দ্রকে বলিলে, রাম বলিতে লাগিলেন যে, ভরতকে আলিঙ্গন না করিয়া আমি ধীরভাবে বনে যাইতে পারিতেছি না, আবার আমাদের প্রবাসদুঃখে কাতর তাহাকে দেখিতে কষ্টবোধ হইতেছে। ভরত-যুধাজিৎ উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে জানাইলেন যে, প্রজাবর্গ একমত হইয়া নিবেদন করিতেছে;—"আপনার প্রসাদে শ্রয়ীত্রাতা আপনার পুত্র রাজা রামভদ্রের দ্বারা সনাথ হইয়া সকল লোক পূর্ণকাম হউক।" দশরথ জনককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, কল্যাণকামী প্রজাগণের অনুরোধ আনন্দকর বটে, কিন্তু রাম যাহাদের প্রিয়, সেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র এখানে উপস্থিত নাই। জনক উত্তর দিলেন যে, সৎকার্য্য তাঁহাদের পরোক্ষে অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা প্রীতই হইবেন। আর অভিষেক-কার্য্যের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ভগবান্ বামদেবই উপস্থিত আছেন। তখন দশরথ বলিলেন যে, তবে জামদগ্ন্য-বিজয়োৎসব ও অভিষেক-মহোৎসব এক সঙ্গেই সম্পন্ন হউক; এমহোৎসবে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই পূরণ করা যাইবে। তখন রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া আপনাকে একজন প্রার্থী বলিয়া জানাইলেন। দশরথ তাঁহার কি প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, আপনি মধ্যমা মাতায় যে বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি এক্ষণে তাহাই যাচ্ঞা করিতেছেন, তাহারই অনুগ্রহে আমরা এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থী। দশরথ বলিলেন যে, রঘুবংশীয়েরা সত্যসন্ধ, এ বিষয়ে তোমার সংশয় কেন? তুমি যখন তাঁহার দূত হইয়া প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদানেও স্বীকৃত। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বরদ্বয়ের কথা পাঠ করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ পড়িয়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল, রাজা দশরথও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা জনক বলিয়া উঠিলেন, "ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাজা দশরথের পত্নী, বিশুদ্ধ রাজকুলকন্যা এবং নিজে সাধ্বী হইয়াও কৈকেয়ী এই লোকভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইতেছে"। রাজা দশরথ প্রকৃতিস্থ হইলে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তাত, যদি আপনারা সত্যসন্ধ হন এবং রাম আপনাদের প্রিয় হয়, তাহা হইলে

পরশুরামের ধনু সমর্পণ।

Mohila Press, Calcutta

আমাকে এই প্রসাদ ভিক্ষা প্রদান করুন যেন, আমার মধ্যমা মাতা পূর্ণকামা হন"। রাজা দশরথ "তাহাই হউক, আর কি উপায় আছে" বলিয়া নীরব হইলেন। জনক তখন বলিয়া উঠিলেন, "হা বৎস রামচন্দ্র, হা লক্ষ্মণ! বৃদ্ধ ইক্ষাকু-বংশীয়গণ পুত্রে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া যে আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিতেন, দুগ্ধপোষ্য তোমাদিগকে তাহারই আচরণ করিতে হইল? তবে বৎসে সীতে, তুমিই ধন্যা, কারণ গুরুজনের আদেশে তুমি পতির অনুগমন করিতে পারিলে!" সে কথায় দশরথের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি 'হা বৎসে জানকি, বিবাহসূত্র হস্তে থাকিতেই তোমাকে রাক্ষসের উপহার করিতে হইল', বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে জনকও মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, বৎস গুরুজন ত অত্যন্ত বিপন্ন দেখিতেছি, ইহার পরিণাম কি হইবে! লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন যে, স্নেহের আবেগে আমাদের বিয়োগ দুঃখে ইহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু কি করা যাইবে! মধ্যম মাতা বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগকে স্নেহ-কাতর হইলে চলিবে না। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতি মানুষ চিত্তবলের প্রশংসা করিয়া সীতাকে আনিতে তাহাকে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আদেশ পালনে রত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ভরত তখন যুধাজিৎকে বলিতে লাগিলেন যে, মাতুল ইহা কি আমাদের গৃহের উপযুক্ত হইল? যুধাজিৎ কহিলেন "বৎস, আমিও উদ্‌ভ্রান্ত ও সম্মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। পতি মৃত্যু-মুখে পতিত, পুত্র-যুগল বনগামী, অভাগিনী নব বধূটীও রাক্ষসের বলিরূপে প্রক্ষিপ্তা, লোকসকল নিরাশ্রয়, আমাদের কুলও কলঙ্কে পরিবৃত্ত, আমার ভগ্নীর দৌরাত্ম্যে দেখিতেছি সমস্ত জগৎ বিহ্বল হইয়া উঠিল"। সেই সময়ে লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সীতা বলিতেছিলেন যে, ভাগ্যক্রমে আমাকেও গুরুজন বনগমনে অনুমতি দিয়াছেন। তাহার পর রামচন্দ্র সীতা-লক্ষ্মণের সহিত পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুধাজিৎকে বলিলেন যে, মাতুল! তাতদ্বয় ও পুত্রবৎসলা মাতারা রহিলেন, আমরা চলিলাম, আপনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবেন; এই বলিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। যুধাজিৎ, 'আমি তোমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন করিতে পরিব না'

বলিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন; ভরতও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি কি করিবেন, যুধাজিৎকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে জানাইলেন যে, ভরতও তোমার পাদ-পরিচারক রূপে গমন করিতেছে। রামচন্দ্র কহিলেন যে, সে ত গুরুজনের আদেশে বর্ণাশ্রম-রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে। ভরত বলিয়া উঠিলেন যে, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন তাহাই করুক। রাম বলিলেন যে, পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও স্বরুচিতে চালিত হওয়া উচিত নহে। ভরত উত্তর দিলেন যে, আমার কেবল আপনার অনুগমনমাত্রেই স্বরুচি। ইহা শুনিয়া রাম বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, আমি থাকিতে তুমি বা অপর কেহ পিতার নিয়োগ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। তবে 'হতভাগ্য আমি সত্য সত্যই পরিত্যক্ত হইলাম' বলিয়া ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যুধাজিৎ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত যুধাজিৎকে তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, যুধাজিৎ ভরতের সহিত পরামর্শ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, বৎস রামচন্দ্র, ভরত তোমার নিকট হইতে শরভঙ্গ ঋষির প্রদত্ত স্বর্ণ পাদুকাযুগল প্রার্থনা করিতেছে, তাঁহার দ্বারা ভরতকে অনুগৃহীত কর। রামচন্দ্র তাহা ভরতকে প্রদান করিলে ভরত পাদুকা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র দশরথ জনকের মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য ভরতকে উপদেশ দিলেন। ভরত তখন বলিতেছিলেন "আমি নন্দীগ্রামে জটাধারী ও আর্য্য-পাদুকার অভিষেক করিয়া যতদিন তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিব," তাহার পর তিনি রাম সীতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ভরত বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, রামচন্দ্র পুনর্ব্বার দশরথ জনকের শুশ্রূষার জন্য ভরতকে বলিলেন, ভরত দেখিলেন,—তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে জনকের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, হায় হায়, আমার সমস্তই অপহৃত হইল। তাহার পর দশরথ সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন "বৎস রামচন্দ্র। যাইও না, আমার প্রাণ-

বায়ু পলায়ন করিতেছে, চারিদিকে আমায় অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। মর্ম্মভেদী নবব্যাধি প্রসারিত হইতেছে, তোমার মুখচন্দ্রমা একবার চক্ষুঃসমীপে লইয়া আইস, বনে যাইব না এ কথাটী একবার বল, সহসা আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না"। ক্রমে দশরথ উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং হতভাগ্য আমি এক্ষণে কোথায় প্রবেশ করিব বলিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ভরত ও জনক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সেস্থান হইতে লইয়া গেলেন।

রামচন্দ্রের বনবাস সংবাদ সকলেই অবগত হইল, মিথিলাবাসী নর-নারীগণ তাহা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে কহিয়া বলিলেন "দেখ ভিন্নরুচির লোক সকল এক হইয়া কিরূপ ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে। নরনারীগণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অশ্রুবর্ষণে পথসকল কর্দ্দমিত হইয়া মিথিলা নগরে অকালে বর্ষার সূচনা করিতেছে। রামচন্দ্র কহিলেন যে, মাতুল। আপনি ফিরিয়া যান, ভরতকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিলাম। যুধাজিৎ উত্তর দিলেন—আমাকে তোমার অনুগমন করিতে দেও। সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন যে, ছি ছি ও কথা বলিবেন না, আপনারা গুরুজন, আমরাই আপনাদের অনুগমন করিব, আপনাদিগকে আমাদের অনুগমন করা উচিত নহে। আর আমাদের তিনজনেরই বনে যাইবার জন্য আদেশ। যুধাজিৎ বলিতে লাগিলেন, "আমি কি একাকী অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি? ঐ দেখ, আবাল বৃদ্ধ প্রজাবৃন্দ আগমন করিতেছে। আরও দেখ, অযোধ্যাবাসী পূজনীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ মিথিলাবাসীদের সহিত যজ্ঞপাত্রনিচয় স্কন্ধে গ্রহণ, পত্নীহস্তে হোমাগ্নি প্রদান ও হোমধেনুসকল অগ্রে স্থাপন করিয়া বাজপেয় যজ্ঞে ব্যবহৃত স্ব স্ব ছত্রহস্তে তোমার আতপতাপ নিবারণের জন্য ধাবিত হইতেছেন"! এই সমস্ত দেখিয়া রামচন্দ্রও বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তিনি যুধাজিৎকে কহিলেন, "মাতুল, গুরুজনেরাই শিশুদিগকে ধর্ম্মভ্রংস হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন; আপনি মহাজনদিগকে প্রতি নিবৃত্ত করুন"। এই বলিয়া যুধাজিতের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি

প্রজাদিগকে বুঝাইয়াই বা কোথায় যাইব? হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! হে জনক নন্দিনি! তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, এ পাপী কিন্তু নিবৃত্ত হইতেছে, তোমাদের কল্যাণ হউক, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধাজিৎ আবার বলিতে লাগিলেন, "শ্রীরামচন্দ্রের এই লোকপাবনী চারিত্র-পঞ্জিকা প্রতি মন্বন্তরে সর্ব্বভূতদ্বারা গীত হইয়া পরিব্যাপ্ত হউক"। তাহার পর তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রামলক্ষ্মণও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে লক্ষ্মণ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদপতি গুহের সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত বিরাধ রাক্ষসের উপদ্রবের কথা রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র তখন উত্তর করিলেন যে, তাহা হইলে প্রথমে হতভাগ্য বিরাধের প্রমথনের জন্য প্রয়াগ-সন্নিহিত মন্দাকিনী-সংলগ্ন পবিত্রসানু চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসবিনাশের নিমিত্ত ঋষিগণের উপশোধিত পুণ্যসলিলপরিপূর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইবে; অবশেষে গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকটবর্ত্তী জনস্থানে যাওয়া যাইবে। তাহার পর তাঁহারা সেই সেই স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন।

সঙ্কীর্ণতা।

যাঁহারা শাস্ত্রসম্মত সদাচারের অনুরাগী, বহু ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণতা-দোষগ্রস্ত বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক এদোষ তাঁহাদের প্রকৃত পক্ষে আছে কি না, তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে আছে। প্রকৃত পক্ষে সঙ্কীর্ণতা দোষগ্রস্ত কাহারা, সে বিষয়ের আলোচনাও এই প্রবন্ধে আছে।

কেবল আলোচনা নহে, সমাধানও আছে, কিন্তু সমাধান সকলে না মানিতে পারেন,—এইজন্য আলোচনা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রথমে দেখা যাক্ সঙ্কীর্ণতা শব্দের অর্থ কি? (১) স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে সঙ্কীর্ণতা শব্দের অর্থ—সঙ্কর বা বর্ণসঙ্করভাব প্রাপ্তি। বর্ণসঙ্কর ভাব প্রাপ্তির সাধারণ অর্থ বিভিন্ন জাতির পরস্পর শোণিত সংমিশ্রণ। বলা

বাহুল্য,—সদাচারে যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহাদিগকে এইরূপ সঙ্কীর্ণতা দোষ-দুষ্ট বলিতে ইংরাজিশিক্ষিতগণের প্রবৃত্তি নাই।

অতএব—অসঙ্কীর্ণতা লৌকিক—সংক্ষিপ্ততা, ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা, ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা এইরূপ নানা কথায় এই সঙ্কীর্ণতার পরিচয়।

সদাচারে অনুরাগী ব্যক্তি প্রকৃতই সঙ্কীর্ণ কি না, প্রকৃতই অনুদার কি না—তাহাই দেখা যাক্।

কিন্তু বড়ই ব্যাপক, আমার লেখনীও যেন এই আলোচনা-লিপি অঙ্কনে অসমর্থ। লেখনী আমাকে জানাইতেছেন, মহাশয়—একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ, তা না হইলে এক পয়সায় যে সুচারু লেখনীর সহায়তা লাভ করিতে পারেন, একটী পয়সার মায়ায় তাহাতে মহাশয় বঞ্চিত, আর এই অধম বংশ-সম্ভবাকে নিরন্তর পেষণ করিতেছেন—ইহার অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতা কি হইতে পারে?—

আমি লেখনীকে বলিলাম 'শুভে সমাশ্বসিহি'—আমার হস্তে তোমাকে আর অধিক দিন বিড়ম্বিত হইতে হইবে না, সাহিত্যের যে উদ্দাম উন্নতি, যে উন্নতির তাড়নায় শিবরাত্রি ব্রতও সন্ত্রস্ত—সে উন্নতির যুগে আমাদের সাহিত্য-সেবা লাঞ্ছনা মাত্র। অতএব সত্বরই বিশ্রাম লাভ করিবে, এরূপ আশা—তুমি সম্পূর্ণরূপেই করিতে পার।

লেখনী আশ্বস্তা হইলেন। কিন্তু, মন বিদ্রোহী হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর কর, তাহার পর যাহা হয় লিখিও—নচেৎ আমিই বিরোধী। আমি অগত্যা মনকে প্রশ্ন করিতে অনুমতি দিলাম,—

মন প্রশ্ন করিলেন, যে হিন্দু সদাচারে অনুরাগী, তিনি স্বয়ং মানব-চর্ম্মাবৃত হইয়াও জগতের বহু মানবকে ঘৃণা করেন, অনেক জাতিকে স্পর্শ করিতেও পরাঙ্মুখ, যাহা কিছু উন্নতিকর, যাহা কিছু উপাদেয়, তাহা অবলম্বন করিবার পক্ষে তাহারাই অন্তরায়,এইরূপ অনুদার ব্যক্তিকে সঙ্কীর্ণ বলিব না ত কাহাকে বলিব?

আমি। বেশ! এরূপ প্রশ্নেই আমার আবশ্যক; এখন আমার কথা শুন।

সদাচারে অনুরাগী হিন্দু, কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ঘৃণা করিতে পারেন না,—তবে ব্যক্তিবিশেষকে বা জাতিবিশেষকে যে স্পর্শ না করা, তাহার

হেতু শাস্ত্রবাক্য; শাস্ত্রে যাহা বলিবেন--তাহা পালন করা সদাচারে অনুরাগীর কর্ত্তব্য। আদেশ পালন ও ঘৃণা এক নহে। ভাবিয়া দেখ, আমি আমার পুত্রকে কত ভাল বাসি, কিন্তু তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন বা তাহার সহিত এক পাত্রে ভোজন আমি ত কখন করি না; তাই বলিয়া তুমি কি বুঝ, আমি তাহাকে অন্তত কিছু ঘৃণা করি।

মন বলিল—তা বুঝি না বটে, কিন্তু একপাত্রে ভোজন না করিবার কারণ কি, তাহাও ত বুঝি না।

আমি বলিলাম, কুসঙ্গে দূষিত হইয়াছ। তাই শাস্ত্রাদেশ ধারণা করিতে পার না। শাস্ত্রে আছে—উচ্ছিষ্ট-ভোজন বা একত্র একপাত্রে ভোজন করিতে নাই, তাই ঐরূপ কার্য্য করি না।

মন বলিল,—শাস্ত্রই যে সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট,—তাই ঐসব বিধি নিষেধ।

আমি বলিলাম,—ঐরূপ কথা কি বলিতে আছে। আমাদের এখন অনেক দোষ আসিয়াছে, একথা বলিতে পার; শাস্ত্রের দোষ কি কখন সম্ভব! যাহা জগতের হিতকর, শাস্ত্র তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য বলিতেছি শুন, এই যে ইউরোপের দুই একটী শিশুখাদ্যের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে "হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে"—কেন ইহা লেখা থাকে, ভাবিয়াছ কি!

মন। ভাবিয়াছি,—হস্তের ময়লা বা সংক্রামক রোগের সম্পর্ক উহাতে নাই, এইটুকু বুঝাইবার জন্যই ঐরূপ লেখা থাকে।

আমি। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা হয় না কেন? থাকিলই বা হস্তের ময়লা, হইলই বা সংক্রামক রোগ; মানবের হস্ত মানবের রোগ মানব ঘৃণা করিবে!

মন। সে কি মহাশয়! আত্মরক্ষা করিবে না। সকলেই যদি আত্মরক্ষা না করে ত সংসার কয়দিন, জগৎ কয়দিন, ব্যাধি মহামারী—জগৎকে যে শ্মশান করিয়া ফেলিবে। অতএব আত্ম রক্ষার জন্য যে যত্ন, তাহা ঘৃণা নহে, কর্ত্তব্য পালনে উদ্যম মাত্র।

আমি। বেশ তাই বেশ! আমিও তাই বলিতেছি। শাস্ত্র আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই আত্মরক্ষা কেবল শরীর রক্ষা-দ্বারায় হয় না, মনকেও রক্ষা করিতে হয়। তুমি যে আমার আত্মবিদ্রোহী,

তাহার হেতু শাস্ত্রাদেশ পালনে আমরা অসমর্থ। আমি যদি বাধ্য হইয়া প্রতিনিয়ত রেলষ্টীমারে অস্পৃশ্য স্পর্শ না করিতাম, অসম্ভাষ্যের সম্ভাষণ না করিতাম, অপ্রতিগ্রাহ্যের প্রতিগ্রহ না করিতাম, তুমি কখনই বিদ্রোহী হইতে পারিতে না, আমি পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবলে এবং শ্রীশ্রী৺ কৃপায় যতটুকু আত্ম-রক্ষা করিতে এখনও পারিয়াছি, তাহাতেই তুমি বিদ্রোহী হইয়াও আমাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিষয়ে পরিচালিত করিতে পার নাই, শাস্ত্রাদেশে আমার শ্রদ্ধা দূর করিতে পার নাই, তুমি আমার যেমন সহায় শরীর তেমন নয়; শরীর জন্মে জন্মে হইতেছে, যাইতেছে; তুমি অনাদিকাল হইতে আমার সঙ্গে আছ, তোমাকে যদি আমার বশবর্ত্তী সহায় করিতে পারি ত আমার আর ভাবনা কি। আমি তখন পূর্ণ—আমি তখন পরমানন্দে নিমগ্ন। সকল মানবকে এইরূপ পরমানন্দ লাভে অধিকারী করিবার জন্য শাস্ত্র বিধি-নিষেধ প্রচার করিয়াছেন। তাহা সঙ্কীর্ণতামূলক নহে, আত্মরক্ষা-প্রযত্নমূলক।

মন। মহাশয়! বুঝিলাম না, অস্পৃশ্য স্পর্শ কিরূপে আত্মরক্ষায় ব্যাঘাত হয়।

আমি। বল দেখি মন শরীরে স্পর্শ হইলে, আমি তাহা কাহার সাহায্যে উপলব্ধি করি।

মন। আমার সাহায্যে।

আমি। তাহা হইলে, বাহিরের স্পর্শে তোমারও সম্বন্ধ আছে স্বীকার করিতেছ।

মন। তা করিতেছি বৈ কি।

আমি। আমার শরীরের স্পর্শে যেমন তোমার সম্বন্ধ—অন্যের শরী-রের স্পর্শেও অন্যের মনের সেইরূপ সম্বন্ধ আছে; অতএব উভয়ের শরীর স্পর্শে উভয়ের শরীরে যেমন সম্বন্ধ, উভয়ের মনেও একটা সম্বন্ধ হয়, ইহা মানিতে হয়।

মন। তা মানিব কেন?

আমি। সাধারণ স্পর্শে যে সামান্য সম্বন্ধ হয়, তাহাতে সে সম্বন্ধ স্থুল জ্ঞানে ধরা যায় না, তাই মানিতে আপত্তি করিতেছ; কিন্তু স্পর্শের যেখানে প্রগাঢ়তা, সেখানে ভাবিয়া দেখ—এক স্পর্শেরই সাহায্যে তুমি তাহার

মনের ভাব নিজেই গ্রহণ করিয়াছ। দম্পতীর স্পর্শের কথা স্মরণ কর,—বুঝিবে আমার কথা সত্য কি না।

মন। আচ্ছা, অন্যকে ছাড়িয়া আপনার কথা এখন মানিলাম—পরস্পরের মনের সম্বন্ধ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি?

আমি। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে যে ব্যক্তি অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মনে ময়লা থাকিবার সম্ভাবনা অধিক, সেই ময়লা বা মলিনতা যাহাতে না আসে, তাহার জন্যই ব্যবস্থা; সেই ব্যবস্থাতেই স্পর্শ নিষেধ। আর উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি নিষেধের সহিত শরীর রক্ষারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এই প্রকারের রক্ষা-ব্যবস্থাপ্রদাতা শাস্ত্রকে বা শাস্ত্রবিশ্বাসকে সঙ্কীর্ণতায় অপবাদগ্রস্ত করা অজ্ঞতা মাত্র।

মন—চুপ করিয়াছে। আমি বলিলাম,—বরং যদি সংকীর্ণতা দোষ দেখিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্টকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বজাতির অন্ন-ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত, সঙ্কীর্ণতা সেই সমস্ত ব্যক্তিতেই দেখিবে।

ক্ষুধা হইলে সংযম করিবার শক্তি নাই, তাই পশু পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় যথেচ্ছ ভোজন, ইহাতে উদারতা কোথায়? পক্ষান্তরে যাহারা সংযমী, যাহারা শান্ত, যাহারা সমাজতত্ত্বদর্শী বুদ্ধিজীবী, তাহাদিগকে উহারা ঘৃণা করে, আপনার পৈতৃকসমাজকে অবজ্ঞা করে, ইহা কি কম সঙ্কীর্ণতা? এই যে ধনের আধিপত্য হেতু পৃথিবী-ময় বিপ্লব ও বিভীষিকা, ইহার মূলেই সঙ্কীর্ণতা নিহিত—যাহারা উদারতার দাবী করে, তাহারা সেই সঙ্কীর্ণতার পূর্ণ উপাসক। ইহারা ত্যাগের সম্মান জানে না,—ভোগের জন্য আত্মহারা; দারিদ্র্যের মহিমা বুঝে না,—ধনের জন্য উন্মত্ত; সংযমের পূজায় ইহাদিগের শ্রদ্ধা নাই—বিলাসের দাস্যে নিমগ্ন, ইহারা সঙ্কীর্ণ নহে ত সঙ্কীর্ণ কে? স্মৃতি শাস্ত্রের যে সঙ্কীর্ণতা দোষ—তাহাও ইহাদিগের মধ্যেই বর্ত্তমান—মনু বলিয়াছেন,

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণশঙ্করাঃ।

কেবল—বিভিন্ন জাতির শোণিত-মিশ্রণ নহে, অবিবাহে বিবাহ এবং শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

যাহাদের স্বদেশে মমতা নাই—থাকিলে পল্লীভবনকে শ্মশানে পরিণত করিয়া নগরের বিলাস ভোগে উৎকট কামনা জাগিত না, যাহাদের স্বজনের প্রতি স্নেহ নাই—থাকিলে দরিদ্র জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়া নবাব মীরবক্সের প্রসাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইত না, যাহাদের স্বধর্ম্মে বিদ্বেষ—তাহা না হইলে যথেচ্ছাচার হইত না, এক কথায় বলিতে হইলে যাহারা স্বার্থের জন্য স্বদেশ, স্বজন এবং স্বধর্ম্ম সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা উদার—আর যাহারা বিদ্বেষহেতু নহে—শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ সদাচারে অনুরক্ত—স্বদেশ, স্বজন এবং স্বধর্ম্মে অনুরক্ত, তাহারা সঙ্কীর্ণ।—"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

কালিকাতত্ত্ব।

দ্বিতীয়স্তম্ভ।

গত পৌষমাসের শাশ্বতী পত্রিকায়, সাধারণ মানবগণের অপ্রিয় বা ভয়াবহ কালীতারাদিরূপের দৈবততত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিব বলিয়া তাহার আবশ্যকতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এইবার প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাইতেছে। এই প্রস্তাবের প্রথম স্তম্ভে শ্রুতির প্রতি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিব; শ্রুতির গর্ভে কালীতারাদি তত্ত্ব নিহিত আছে কিনা প্রথমে তাহার অন্বেষণ করিব। শ্রুতির আদেশে যদি কালীতারাদিতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্ব অবধারিত হয়, তবে সেইরূপ ভগবত্তত্ত্ব অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা অনুকূলিত কিনা, পরে তাহার আলোচনা করিব, তৎপর অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ থাকিলে তাহার চিন্তা করা যাইবে।

কালীতারাদির শ্রৌততত্ত্বচিন্তা।

ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদেরই মন্ত্রভাগে অদিতিনামক একটী দেবতার কথা বারম্বার উল্লিখিত আছে। আর সেই দেবতার নিকট দীর্ঘায়ুষ্ঠাদি অভ্যুদয়, এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করার প্রার্থনা করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা কেবল এইমাত্র বুঝা যাইতে পারে যে ঐ দেবতাটী জীবগণের প্রাণের অধিপতি, কিন্তু তাহার স্বরূপের কথা সর্ব্বত্র উল্লিখিত নাই। তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, যজুর্ব্বেদের কঠ শাখার মন্ত্রভাগে, আর বৃহদারণ্যক এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। নিম্নে তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

কঠোপনিষদ্ "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি, মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ইত্যন্ত মহাবাক্যের দ্বারা পরমব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের পর, তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নতারূপ সগুণভাব নির্ব্বাচনের নিমিত্ত এই মন্ত্র কয়টীর উপদেশ করিয়াছেন, "য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। (শ্রুতি) য কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কর্ম্মফলভুজং জীবং প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারং আত্মানং বেদ বিজানাতি অন্তিকাৎ অন্তিকে সমীপে ঈশানং ঈশিতারং ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য ততঃ তদ্বিজ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপ্সতে ন গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ যাবৎ হি ভয়মধ্যস্থোঽহনিত্যং আত্মানং মন্যতে তাবৎ গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানং। যদা তু নিত্যং অদ্বৈতং আত্মানং বিজানাতি তদা কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেৎ। (শাঙ্করভাষ্য।) ইহার মর্ম্মার্থ এই যে পূর্ব্বে চিন্মাত্রস্বরূপ নিত্যবুদ্ধশুদ্ধমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। যাঁহা হইতে বিশ্বরাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, সমুদ্রবক্ষে বীচিমালার ন্যায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর সমুদ্রতরঙ্গের মতই যাঁহাতে অনন্ত জগৎ বিলীন হইয়া যাইবে, যিনি অনন্তপ্রকার ক্রিয়া ও তজ্জনিত সুখদুঃখাদি অনন্তরূপ ফলভোগের সাক্ষীস্বরূপ, কিন্তু স্বয়ং তাহা ভোগ করেন না, বা তাহাতে বিলিপ্ত নহেন, সেই পরমেশ্বরকে যিনি আপনার অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, যাবৎপ্রকারকর্ম্মফলভোগী প্রাণশক্ত্যাদিসম্পন্ন নিজ জীবকে পরাবিদ্যাপ্রভাবে সেই পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়রূপে অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, জলময় সমুদ্রের তরঙ্গাবলীর ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য-

ময় মহাসাগরের অভিন্নভাববিশিষ্ট তরঙ্গবিশেষরূপে আপনাকে বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিজের জন্মমৃত্যুভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। কাযেই মৃত্যুভয়ও থাকেনা, আর ভ্রান্ত জীবের মত মৃত্যু হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করার জন্য ব্যগ্র হননা।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে মুমুক্ষু জীব নিজ দেহের কোন্ স্থানে মনোনিবেশ করিয়া কোন্ গুণ, কোন্ ক্রিয়া, কোন্ শক্তির দ্বারা সেই পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে। তাঁহার সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবন্ত মুখ্যরূপটী দেহের কোন্ স্থানে কিরূপে আছে, ইহার উত্তর প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "যঃ পূর্ব্বং তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভি র্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ। (শ্রুতিঃ) যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ সঃ সর্ব্বাত্মা ইত্যেতৎ দর্শয়তি যঃ কশ্চিৎ মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ জাতং উৎপন্নং হিরণ্যগর্ভম্. কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বং ইত্যাহ—অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং অপ্ সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ ন কেবলাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অজায়ত উৎপন্নো যঃ তং প্রথমজং দেবাদিশরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিগুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীন্ উপলভমানং ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্যকারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যে, ব্যপশ্যত যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। য এবং পশ্যতি স এতদেব পশ্যতিঃ—যৎতৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম। (শাঙ্করভাষ্য।)

ইহার ভাবার্থ এই, সেই পরমেশ্বরকে জ্ঞানাদি সর্ব্বশক্তির প্রভু প্রাণশক্তির লীলাক্ষেত্র হৃৎপিণ্ড মধ্যে উপলব্ধি করিবে। শরীরের মধ্যে যত প্রকার জ্ঞান-শক্তির ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, পরিচালনের ব্যাপার উঠিয়া হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, তাহারা সকলেই প্রাণের অধীন, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাণবল অনুপ্রবিষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রাণে অনুস্যূত হইয়াই জ্ঞানশক্তির বিকাশ ও ক্রিয়াশক্তির লীলাখেলা হইতেছে; আবার স্বস্ব ক্রিয়া সম্পাদনের পর আবার প্রাণের মধ্যেই মিশিয়া থাকে। প্রাণই ইহাদের প্রত্যেকের আলম্বন, প্রাণশক্তি বাদ দিয়া ইহাদের অস্তিত্বের নামগন্ধও থাকেনা। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া শক্তিকে প্রাণশক্তির শাখাপ্রশাখাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব যদিচ সেই পরমেশ্বর নয়নাদি ইন্দ্রিয়গর্ভে বিরাজমান সেই জ্ঞানশক্তির অন্তরালে

থাকিয়াও তাঁহার সহায়তা করিতেছেন, করচরণাদির পরিচালক কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ ক্রিয়াশক্তিরও কোলে কোলে থাকিয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিতেছেন সত্য, তথাপি তাহাদের অন্তরালে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সেই সকল শাখাপ্রশাখার মূলস্থান হৃৎপিণ্ডস্থ প্রাণশক্তির অন্তরালে সেই প্রাণের প্রাণ-রূপে, সেই বুদ্‌বুদাকার প্রাণের সমুদ্রাকার আলম্বনরূপে, আত্মসমর্পণ করা বা উপলব্ধি করার চেষ্টাই ভূরিফলপ্রদ বলিয়া ন্যায্য। সেইখানে চিন্তা করিতে পারিলেই তাহার আপেক্ষিক ব্যাপকতা ধরিতে পারা যায়। প্রাণশক্তির প্রস্রবণ দশ ইন্দ্রিয়েরই কোলে কোলে প্রবহমান, কাজেই হৃদয়স্থ প্রাণশক্তির অন্তরালে প্রাণের অধিষ্ঠাতৃরূপে, তাহার উপাদানভাবে তাহাকে বুঝিতে পারিলে সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার সত্তার প্রচার অনুভূত হয়। কিন্তু নয়নাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় কিম্বা করচরণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এক একটীর অধিপতি রূপে যদি তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারা যায়, যদি তাহা ধরিয়া আত্মসমর্পণ করা যায়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শক্তিগুলির অধিষ্ঠাতৃত্ব বা ঈশতৃত্বাদি ধরা পড়েনা, কারণ নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বা করচরণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে পরস্পরের কাহারই ব্যাপ্য ব্যাপকতা সম্বন্ধ নহে। অতএব এক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহাকে দেখা তত আদৃত নহে। নিদ্রাকালে কেবল প্রাণশক্তিই জাগ্রত থাকে, জ্ঞানশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি তাহাতে লুকাইয়া যায়। জাগরণের পূর্ব্বেও তাহা হইতে প্রস্ফুটিত হয়। এজন্য প্রাণই সর্ব্বশক্তির আলম্বন, প্রাণের অন্তরালেই তাহার প্রাণশক্তিকে ধরিয়া আত্মসমর্পণ করা অধিকতর শ্রেয়স্কর বিষয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি আরও হেতু প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই আদেশ করিতেছেন। যিনি জীবগণের জীবত্বের আলম্বন-স্বরূপ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের অন্তরালে তরঙ্গের আশ্রয় সমুদ্রের মত প্রাণ-শক্তির সমুদ্ররূপে প্রাণের প্রাণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনিই চিন্মাত্র ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে আবির্ভাবের প্রথমরূপ চিন্মাত্ররূপ হইতেই সেই ঐশ্বর্য্যবস্তুরূপের পূর্ব্বে আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সমস্ত জড়-জগতের পূর্ব্বে প্রকাশমান, তাঁহা হইতেই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। যিনি মুক্তিকামী তিনি তাঁহাকে হৃৎপিণ্ডমধ্যবর্ত্তী আকাশের আলম্বনে উপলব্ধি করিবেন। যিনি এই প্রাণদেবতা, তিনি পূর্ব্বকথিত পরব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন

নহেন। পরব্রহ্মই পরদেবতা হইয়া হৃদয়গুহায় বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার একদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটী নাম আছে হিরণ্যগর্ভ, এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য প্রকার আর একটী নামও আছে এবং বিশেষণও আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভি র্ব্যজায়ত এতদ্বৈতৎ। (শ্রুতিঃ)

কিঞ্চ যা সর্ব্বদেবতাময়ী সর্ব্ব দেবতাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি। শব্দাদীনাং অদনাৎ অদিতিঃ তাং পূর্ব্ববৎ গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং অদিতিং। তামেব বিশিনষ্টি—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যজায়ত উৎপন্না ইত্যেতৎ। (শাঙ্করভাষ্য)

অপর দিক দিয়া দৃষ্টি করিলে এই প্রাণদেবতারই অপর নাম অদিতি, কাযেই ইনিও উল্লিখিত মতে পরব্রহ্ম হইতে প্রথম আবির্ভূতা, ইনিও প্রাণদেবতারূপা। ইনিও হৃৎপিণ্ডস্থ আকাশ-মধ্যে উল্লিখিত মতে জীবগণের প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রাণদেবতা হইতে নয়নের অধিষ্ঠাত্রী, শ্রবণের অধিষ্ঠাত্রী, রসনাপ্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং যাবৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী যাবং প্রকার দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই জন্য যাবৎ দেবগণকে আদিতেয় বা আদিত্য বলা গিয়া থাকে। আর এই সর্ব্বদেবতার প্রসূতিকে সর্ব্বদেবতাময়ী বলা যায়। ইঁহার প্রাণশক্তির মূর্চ্ছনা যাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে মিশ্রিত আছে, এজন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদিও যেরূপ প্রাণশক্তির দ্বারা গৃহীত হয় এবং প্রাণই তাহার ভোক্তা, শব্দস্পর্শাদি পদার্থ গুলি যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মসাৎ কৃত হইতেছে তাহাও সেইরূপ তদ্গত প্রাণাংশদ্বারাই হইতেছে, প্রাণাংশ দ্বারাই তাহা গৃহীত হইতেছে, প্রাণাংশই তদ্বারা পুষ্ট হইতেছে, সুতরাং প্রাণদেবতাই তাহাদের ভোক্তা। শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি শক্তিমাত্র পদার্থ হইলেও তাহাদিগকে যে শব্দ ও রূপাদি ভাবে উত্থাপিত করা এইটুকু মাত্রই নয়নাদিগত ইন্দ্রিয়াংশের কার্য্য, কিন্তু উহাদের গ্রহণ-

করাটুকু প্রাণেরই কার্য্য। কাজেই প্রাণই উহাদের ভোক্তা বা অত্তা। এ কারণে সেই প্রাণদেবতার নাম অদিতি। ইনি আপনার তনু হইতেই ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি যাবৎ প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যকরণ বিভাগাপন্ন যাবৎ জন্য বস্তুর সঙ্গে মিলিতভাবে থাকিয়া প্রকাশমানা আছেন। অতএব মুমুক্ষুগণ এইরূপেও প্রাণদেবতাকে চিন্তা করিবেন। সেই পরব্রহ্মই এই অদিতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, অতএব এই ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই মুমুক্ষু মানব মুক্তি-লাভ করিতে পারে।

এই শ্রুতির আদেশের দ্বারা সর্ব্ব প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্ব প্রাণের উপাদানরূপা সুতরাং সর্ব্ব প্রাণের প্রাণস্বরূপা পরমদেবতাকে অদিতি নামে জানা গেল। এই হইল কঠশাখার মন্ত্রের উক্তি। অতঃপর বৃহদা-রণ্যকীয় ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা আগামী বারে প্রদর্শিত হইবে, এইবার এই পর্য্যন্তই রহিল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বর্ষচিত্র।

অনন্ত কাল সাগরের একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ তেরশত বিশ সাল তাহাতেই মিশিয়া গেল। সফেন বুদ্বুদ সলিলে মিশিয়া গেলেও যেমন সলিল বক্ষে দুই একটি দাগ রাখিয়া থাকে, বর্ষ বুদ্বুদের চিহ্নও তেমনই কাল সাগরের বক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তন্মধ্যে যেটী সফেন বা ঘটনা রঞ্জিত হয় তাহারই চিহ্ন থাকার সম্ভব। তেরশত বিশ সালের দুই একটী দাগ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করিতেছি। আমাদের আলোচনা ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য লইয়া; সুতরাং আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

ধর্ম্মান্দোলনের বিশেষ কিছু চিহ্ন তেরশত বিশ সাল রাখিতে পারে নাই। একমাত্র নবদ্বীপেই বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বটে। বৈষ্ণব সম্মিলনী বৈষ্ণব ধর্ম্মের রক্ষণ ও প্রচারের জন্য বর্ষে বর্ষে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, ইহা দেশের একটি শুভ লক্ষণ বটে মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্রেরই ঐকান্তিক যত্নই ইহার জীবনস্বরূপ। মহারাজের মুক্তহস্ততার উল্লেখ ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি যাহার মেরুদণ্ড, তাহা যে সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে. কিন্তু একমাত্র তাঁহার যত্নই দেশের সমবেত যত্ন বলিয়া বুঝিব কিনা স্থির করিতে পারিতেছি না! একমাত্র সেই ধনকুবেরের প্রতি সকল কার্য্য নির্ভর করিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের নিজের কি হইল? তাঁহার আন্তরিক যত্নের সহিত যদি আমাদের যত্ন মিশাইয়া দিতে পারি, তবেইত কল্যাণের সূচনা হইবে। তাঁহার ন্যায় আমাদেরও আন্তরিক যত্ন আছে কি? এক্ষণে বৈষ্ণব সম্মিলনী সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব।

বৈষ্ণব সম্মিলনী সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের গোস্বামিগণের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। অবশ্য যাঁহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব সম্মিলনীর চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে যদি তাঁহারা ইহাকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ সূচনার সম্ভব। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা এখনও পর্য্যন্ত অবগত নহি। তবে কোন কোন স্থলে অন্যান্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে দেখায়, আমাদের ঐরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে ইহার প্রচার আরম্ভ হইলে, ইহার যুক্তি তর্ক প্রবল হওয়াই উচিত। বৈদিক ধর্ম্মের নিকষ পাষাণে সেই সমস্ত যুক্তি তর্ক পরীক্ষিত হইয়া টিকিলে তবেই ত তাহা হিন্দু সমাজে আদরণীয় হইবে। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত যে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য না হইবে, তাহা কদাচ হিন্দু সমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ একমত কি না বলা যায় না। পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্ম সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইলেও তাহাতে হিন্দু সমাজের আত্যন্তিক

ক্ষতি হয় না, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ধান ঘটিলে তাহারও অস্তিত্ব নাশ হইবে। বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই পৌরাণিক ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং যে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৈদিক মতের সহিত একমত নহে, তাহা সমাজের পক্ষে প্রকৃত উপকারী কিনা বিবেচনার বিষয়। যদি তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মপ্রসাদকে বেদ হইতে স্বতন্ত্র বলিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম শরীরের চিত্রাঙ্কনে তাহার মস্তকে বেদ, মধ্যদেহে (ধড়ে) স্মৃতি, দুই বাহুতে তন্ত্র ও পুরাণ, দুই পাদে সদাচার ও আত্মপ্রসাদ কল্পনা করিতে হইবে। বাহু বা পাদ ছিন্ন হইলেও শরীরের প্রাণ থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তক বা মধ্যদেহ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার জীবনের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বেদ বা বৈদিক ধর্ম্ম এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি বাদ দিলে হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখা যায় না। পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিবাদ হইতে পারে। ঋষি প্রণীত পুরাণ ও শিবোক্তি তন্ত্রের মধ্যে কাহার প্রাধান্য বিচার করিতে গেলে শিবোক্তি যে নিম্নস্তরে যাইবেন ইহা দুঃসাহসিকেরই কথা, সুতরাং শিবোক্তির প্রাধান্য নাই ইহা বলিতে পারা যায় না; তাহা হইলে পুরাণ ও তন্ত্রের প্রাধান্য লইয়া গোলযোগের সম্ভাবনা। কিন্তু বেদের আদেশকে কেহই অমান্য করিতে পারেন না, যাহা নিত্য ও অপৌরুষেয় তাহার প্রাধান্য চিরদিনই হিন্দু সমাজকে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু বেদ বিরুদ্ধ ঈশ্বর মতকেও আদর করেন না। বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মত বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা হিন্দুর নিকট আদরণীয় নহে। এই বৌদ্ধমতের ছায়া যে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্মে নাই একথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৈদিকমতের বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া যদি কোন তান্ত্রিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। সুতরাং আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে। বৈষ্ণব সম্মিলনী কিরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, আমরা তাহাই অবগত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরমন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য লইয়াও এবার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রের যে নূতন সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণা ছিলনা। এক্ষণে দেখিতেছি বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ তাহারও আরম্ভ করিয়াছেন। বেদ, তন্ত্র বা পুরাণে উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন স্বতন্ত্র মন্ত্রের সৃষ্টি হিন্দুর নিকট নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছে। যদি কেহ তাহাতে প্রীত হন, হউন, কিন্তু ইহা যে নূতন সৃষ্টি তাহা বলিতেই হইবে। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের দেহত্যাগ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়াই বোধ হইতেছে। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়, তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, তাঁহাকে সকলের নিকটেই সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের সহিত একমত কিনা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায়না। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের স্থান পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তেরশত বিশ সাল সামাজিক আন্দোলনে স্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্মিলনী সমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়াছেন। বিলাত প্রত্যাগতগণের সহিত সামাজিক ব্যবহার করা যাইতে পারে কিনা এবার ব্রাহ্মণ সম্মিলনী হইতে তাহার মীমাংসা হইয়াছে। প্রথমেই মুন্সীগঞ্জে ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, কিন্তু তাহাতে কোন বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। কালীঘাটে ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর অধিবেশনে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, পণ্ডিতগণের মধ্যে একপক্ষ তাঁহারা ব্যবহার্য্য হইতে পারেন বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া ইহার বিচারে বিদেশপ্রত্যাগতগণ ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্যে ব্যবহার্য্য ব্যতীত অন্য সকল গুরুতর বিষয়ে ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না বলিয়া মর্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সমাজ মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন সংবাদ পত্রও এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছেন। যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিচারে যাহা স্থির করিয়াছেন

তাহার প্রতিবাদ ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে যদি সমাজবিধি সম্বন্ধে আমরা স্ব স্ব প্রধান হই, তাহা হইলে আমরা চীৎকার করিতে পারি বটে, কিন্তু আমরা যখন যে কোন কার্য্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা খাড়া করিয়া তাহারই দোহাই দিয়া থাকি, তখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতে যদি কোন ব্যবস্থা অব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাদের চীৎকার যে অন্যায্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দোহাই অস্বীকার করিয়া আমরা আপনাদের যুক্তি অনুসারে চীৎকার করিতে পারি বটে, কিন্তু তাঁহাদের দোহাই মানিলে অধিকাংশ যে মত দিয়াছেন তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। সকল দেশেই স্থিতিকামী ও পরিবর্ত্তনকামী সম্প্রদায় আছে। পরিবর্ত্তনকামিগণের যুক্তিই অকাট্য এবং স্থিতিকামিগণের যুক্তি উপেক্ষনীয় ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। স্থিতিকামী ও পরিবর্ত্তনকামী স্ব স্ব যুক্তির বলে সমাজকে যে দিকে চালিত করিবেন সমাজ সেই দিকেই চলিবে। যদি স্থিতিকামীরা কোন বিষয়ের বিরোধী হন, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনকামীরা নিপুণতা সহকারে তাহার খণ্ডন করিতে পারিলে, তবে সমাজ তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবে। বিদেশে না গেলে আমাদের জাতির উন্নতি হইবেনা, এরূপ কথায় সমাজ সাড়া দিয়া উঠিবেনা, যুক্তি দ্বারা তাহা বুঝাইতে হইবে। যদি পরিবর্ত্তনকামী বলেন যে, সাংসারিক উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষাদির জন্য দেশান্তর যাইতে হইবে, স্থিতিকামী উত্তর করিবেন যে, হিন্দু সাংসারিক উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে দেশান্তরগমন প্রভৃতি অন্তরায়। যদি পরিবর্ত্তনকামী প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দেশান্তর প্রত্যাগত ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারেন বলেন, স্থিতিকামী তখন শাস্ত্র ও যুক্তির দোহাই দিয়া তাঁহাকে সমাজে অব্যবহার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন। শাস্ত্রের কথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। যুক্তি এই যে, সকল কার্য্যের একটী দার্শনিক দিক্ আছে। বিদেশগমনে জাতি যায় কেন? তাহারও দার্শনিক মীমাংসা আছে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসী পত্রে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। সংস্কারের অস্তিত্ব বিনাশ সম্বন্ধে তিনি যাহা

আলোচনা করিতেছেন তাহা যে কেহ ফুৎকারে উড়াইয়া দিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা। আর যে সমস্ত বিদেশপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী কিনা তাহাও বিবেচ্য। তাঁহাদের কৃত কার্য্যে যদি পাপ জ্ঞান হয়, তবেই ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবে। সত্য সত্যই কি তাঁহারা বিদেশে শিক্ষাদির জন্য গমন ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারসকলকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন? এরূপ ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী বটেন। প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হইলেও, তাহার যে ব্যবস্থা আছে তাঁহা কি কেহ প্রতিপালনে সম্মত? অসমর্থ বলিয়া এক অনুকল্প খাড়া করিয়া যদি তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি প্রহসন বলিতে হইবেনা? সুতরাং প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তই বা কই? প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া যদি কাহারও প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হয়, শাস্ত্রে তিনি অব্যবহার্য্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার স্থান যে সমাজ হইতে দূরে রহিবেনা, ইহা একভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিদেশে গিয়া যে সংস্কার টুকু আত্মাতে লাগিয়া গিয়াছে, তাহার নাশের জন্য কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, তাহাও বিবেচনার বিষয়। দেশী কাপড় চাদর ব্যবহার বা লোক দেখান দেশীয় আহারে সে সংস্কার নষ্ট হয়না। কারণ বিদেশপ্রত্যাগতগণের মন প্রাণ, আত্মায় বিদেশী ভাব জড়াইয়াই থাকে। সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার কখনও স্বজাতির মধ্যে আসিতে পারেননা। এরূপ ক্ষেত্রে একটা লোকদেখান প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহারা ব্যবহার্য্য হইতে চাহেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্পর্দ্ধার কথা বলিতে হইবে। যদি বিদেশে না গেলে জ্ঞানোপার্জ্জন ও অর্থোপার্জ্জন না হয়, যাঁহারা তাহার অভিলাষী, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সমাজকে আক্রমণের চেষ্টা কেন? তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে ত সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। যদি বল এ সব লোক বাদ দিলে সমাজের কি থাকিল? সমাজের যাহা থাকিবে তাহাই যথেষ্ট। বিদেশপ্রত্যাগতদিগের সমাজ প্রবল হউক; তদিতর সমাজ নয় দুর্ব্বলই থাকিল। তবে তাহা যে একেবারেই দুর্ব্বল, ইহা আমরা স্বীকার করিনা। সাংসারিক উন্নতিতে এক সমাজ শ্রেষ্ঠ হইলে

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যে অপর শ্রেষ্ঠ থাকিবে ইহাই আমরা মনে করি। প্রথম সমাজের সহিত দ্বিতীয় সমাজ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিবেন। এইরূপ দুই সমাজ থাকিলে যে জাতীয় উন্নতি হয়না ইহা আমরা মনে করিনা।

ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে ব্রাহ্মণেতর জাতির উপবীতগ্রহণ সম্বন্ধেও একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা একতরফাই হইয়াছে। আমাদের মতে অন্যপক্ষের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। অনেক দিন হইতে ইহারও একটা গোলযোগ চলিতেছে। এই সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে রীতিমত বিচারে ইহার মীমাংসা হইয়া গেলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। সে যাহা হউক, যখন অন্যপক্ষ আহ্বানসত্ত্বেও উপস্থিত হন নাই, তখন যতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেতর জাতিসকল, ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া ইহার মীমাংসা না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কেবল তাঁহাদের পক্ষীয় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থায় সমাজ সন্তুষ্ট হইবেনা। আর যদি তাঁহারা স্ব স্ব যুক্তি বলে উপবীতধারণের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত সমাজ মানিবে কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যাঁহাদের দোহাই দিয়া আজও সমাজ চলিতেছে, তাঁহাদের কথা মানিয়া লইতেই হইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতিতত্ত্বের মীমাংসা বড়ই কঠিন। জাতিতত্ত্ব সুসিদ্ধ না হইলে অধিকারও স্থির হয়না। এরূপ গুরুতর ব্যাপারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীর বিচারই মানিতে হইবে। ব্যক্তিগত যুক্তি সমাজ মানিয়া লইবে না।

ব্রাহ্মণ সম্মিলনী ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মিলন ও বরপণ সম্বন্ধেও প্রস্তাবাদি করিয়াছেন, তাহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে বলিতে পারিনা। তবে তাহার চেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বরপণ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ভবন সম্বন্ধে পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের লক্ষ টাকা দানের কথাটা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায়না। ব্রজেন্দ্রকিশোরের অকপট দানের পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দুই এক স্থলে পাইয়াছি, কিন্তু সমাজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তাঁহার এ দান যে চিরস্মরণীয় থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ দান আর একজন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। অনেক কার্য্যে ইহা অপেক্ষা বড়

বড় দান হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের প্রকৃত হিতের জন্য এরূপ দানের কথা আমাদের স্মরণ হয় না।

এবার বরপণ লইয়া দেশে অত্যন্ত হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জন হইতেই এই আন্দোলনের সৃষ্টি। সমাজের এই মহাব্যাধি সামাজিকগণ কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছেন না। কত সভা সমিতি, কত বক্তৃতা, বাগ্মিতা হইল, কিন্তু এ ব্যাধি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যাঁহারা জাতীয় উন্নতির জন্য মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা কাগজে কলমে কেবল এই ব্যাধি বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, কার্য্যে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা। কায়স্থসভা যে সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বরপণ প্রথা নিবারণ অন্যতম ছিল। প্রতি বৎসর বাৎসরিক অধিবেশনে তাহার একটা প্রস্তাব হয় মাত্র, কিন্তু সমাজে তাহার কার্য্য কিছুই দেখা যায়না। অন্য দুই একটী প্রস্তাব খুব দাপটে চলিতেছে বটে কিন্তু এ প্রস্তাবের সময় সভার স্থান লোকশূন্য হইয়া যায়। ইহাতে আমরা বুঝিতেছি, যেখানে অর্থসম্বন্ধ সেখানে কায়স্থসভা বা ব্রাহ্মণ সভা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। স্বয়ং স্বার্থত্যাগ না করিলে অপরের নিকট বক্তৃতায় কোন ফল হয়না। এই প্রথায় যে কতলোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। স্নেহলতার ন্যায় কত কুমারী যে পরে আত্ম বিসর্জ্জন না করিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে। আবার ইহার জন্য সমাজে যে পাপ প্রবেশ না করিবে তাহাই বা কে বলিল? কলিকাতার টাউনহলে কৃষ্ণনগরের মহারাজের সভাপতিত্বে এবিষয়ের একটী মহাসভা হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? ফকীরের আলখাল্লার ন্যায় সকল সমাজের দুই একজন লোককে জড়াইয়া যে সভার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বক্তৃতার ঝাঝটাই কাণে লাগিয়া থাকিবে। প্রত্যেক সমাজের লোকে নিজ নিজ সমাজে যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন,তবে তাহাতে ফল হইতে পারে। কেবল সভা সমিতিতে কিছু হইবে বলিয়া, আমরা আশা করিনা। তবে সমাজের প্রধান প্রধান লোকের এরূপ চেষ্টা যে প্রশংসনীয় তাহা বলা যাইতে পারে। সে যাহাহউক এই ব্যাধির মূলোচ্ছেদনের জন্য সামাজিকগণকে আন্তরিক যত্নই করিতে হইবে।

এক্ষণে সাহিত্যান্দোলনের কথা। এবার সাহিত্য জগতের প্রধান বিষয় রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদে পাশ্চাত্য জাতির বিস্ময়োৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পূর্ব্বে আমাদের অবিদিত ছিলনা, এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতি তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কম্ আনন্দের কথা নহে, তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এবার পাবনায় উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় জর্জ্জ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির ও নাটোরাধিপ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির সাহিত্যান্দোলনে যোগদান যে আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তর-বঙ্গ সম্মিলনী আন্তরিকতার সহিতই সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। সেজন্য উদ্যোগিগণকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন এবার কলিকাতা মহানগরীতেই হইয়াছে। আমাদের সদাশয় গবর্ণর বাহাদুর তাহার উদ্বোধন কার্য্য করিয়াছেন। সাহিত্যান্দোলনে রাজপ্রতিনিধির যোগদানে আমরা যে কৃতার্থ হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের এরূপ উৎসাহপ্রদানে আমরা যে নির্ভয়ে সাহিত্য সেবায় রত থাকিতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি। এবার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনের সভাপতি হইয়া তাহার যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহা বলিতেই হইবে। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সাহিত্যিক বিরল এবং বহুকাল হইতে তিনি সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্য সম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। এবার তাহা অনেক পরিমাণে সফল করার চেষ্টা হইয়াছে। এবার সম্মিলনের মূল সমিতিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং সাহিত্য বিভাগে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, দর্শন বিভাগে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায় মহাশয়, বিজ্ঞান বিভাগে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এবং ইতিহাস বিভাগে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনার অবসর প্রদান, ও সম্মিলনের গুরুত্ববৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। তবে আমরা বলি কেবল প্রবন্ধ পাঠ বা তাহার সামান্য

আলোচনায় এই বিরাট সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল বলিয়া মনে করা উচিত নহে। সম্মিলনের কিছু স্থায়ীকার্য্য করিতে হইবে। সাহিত্যের পুষ্টি ও রক্ষা সম্বন্ধে সম্মিলনের লক্ষ্য থাকাও চাই। নতুবা প্রতি বৎসর একস্থানে সমবেত হইয়া একটা সাহিত্যিক বনভোজনের জন্য কতকগুলি অর্থ নষ্ট করা সমীচীন নহে বলিয়া আমরা মনে করি। আশা করি বঙ্গীয়, সাহিত্য সম্মিলন ক্রমে স্থায়ী কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। উপসংহার কালে একটী কথা এই বলিতে চাহি যে, ধর্ম্ম বিষয়ে হউক, সমাজ অথবা সাহিত্য বিষয়েই হউক, সকল কার্য্যে আমাদের আন্তরিকতা থাকার প্রয়োজন। নতুবা সেরূপ আন্দোলন কদাচ স্থায়ী হইতে পারেনা।

নববর্ষ বরণ।

এস হে নবীন আজি এ গৃহ প্রাঙ্গণে,
অজ্ঞাত অতিথি তবু বরের মতন,
বরণীয়, রমণীয়, কত পরিচিত।
একান্ত আত্মীয় যেন হৃদয়ের ধন।
মঙ্গল-শঙ্খের শব্দ দীপালোক মাঝে,
মুকুলমঞ্জরী মধু-বর্ণে গর্ব্ব গানে,
এস তুমি আজি রহি ব্যথার প্রলেপ,
তাপের সান্ত্বনা আর তৃষার অমিয়,
সংস্কারিয়া বিভূষিয়া এ জীর্ণ দেউল,
জাগাও তাহাতে পুনঃ আরতি বন্দনা;
গম্ভীর শঙ্খের নাদে ডাক দলে দলে,
সুপ্ত অবসন্ন জনে, এ প্রাঙ্গণ তলে,
হে নবীন, হে বরেণ্য প্রফুল্ল বয়ান,
আন নব আশা প্রেম জ্ঞান শক্তি প্রাণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

বলিদান।

অনেক সময়ে দেখা যায় বলিদানের সময় উপস্থিত হইলে দেবদত্তের মনে উৎফুল্লতা জন্মায়,—উদ্যম, ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠে; আবার, তত্র উপস্থিত বিষ্ণুদত্তের মনে একটু ভীতি, কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য অথবা করুণা ফুটিয়া উঠে। হয় ত উভয়েই শাক্ত, দেবীর মহাপ্রসাদপ্রার্থী, তথাপি দেখিতে পাই দুইজনে ব্যাপারটী দুইভাবে বুঝিয়া লইয়াছে। আবার, ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে পরিবেষ্টাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাইব, বিষ্ণুদত্তই এক মালসা মহাপ্রসাদ উদরস্থ করিয়াছে, দেবদত্ত এক হাতারও কম। ইহার কারণ কি তাহা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে আরও একটী বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহা এই—

শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন শাস্ত্রের বহুস্থলে বৈদিক যজ্ঞ অথবা তান্ত্রিক শক্তিপূজার অঙ্গস্বরূপ পশুবলির স্পষ্ট বিধি থাকিলেও মধ্যযুগের কোনও কোনও শাস্ত্রে পশুবলির স্পষ্ট নিষেধ আছে। ঋষিপ্রণীত ও ঋষিঠাকুরপ্রণীত শাস্ত্রের বিরোধ-ভঞ্জন একরূপ অসাধ্য ব্যাপার, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এবিষয়ে হিমসিম খাইতে হইয়াছে। প্রায় সকল নবীন শাস্ত্রের প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়া থাকেন, তাঁহার গ্রন্থখানি বেদসম্মত, অথবা নির্ভাঁজ নিখুঁত পঞ্চমবেদ, অথচ বেদবিরুদ্ধ অনেক কথা সেই সেই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সে সকল কথা অতি মনোহর, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রসূত, তর্কসঙ্কুল এবং উন্নত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রস্রবণস্বরূপ। সে সকল কথা পাঠকালীন মনে হয়, যেন ক্ষণকালের জন্য অপৌরুষেয় অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার শ্রুতিকে ঘরের এক কোণে সরাইয়া রাখি।

কেন এরূপ হয়, তাহার কারণ জানিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার পিছনে একটা বৃহৎ ইতিহাস আছে। পশুবলির নিন্দা, দানধর্ম্মের প্রশংসা, অহিংসাধর্ম্মের অতিপ্রশংসা, স্ত্রীজাতির বিশেষতঃ স্ত্রী-পদার্থের নিন্দা, জগতের দুঃখময়ত্ব প্রতিপাদনের সফলচেষ্টা, বৈরাগ্যের প্রশস্তি ইত্যাদি বৌদ্ধবুদ্ধিপ্রসূত তত্ত্ব মধ্যযুগের হিন্দুশাস্ত্রের কুক্ষিতে কেন স্থান পাইয়াছে

ইহার কারণ জানিতে হইলে অন্ততঃ ভারতযুদ্ধের পর হইতে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস জানা আবশ্যক। কিন্তু উপাদানের অভাবে কখনও সেরূপ ইতিহাস প্রস্তুত হইবে না, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত, এবং এ সম্বন্ধে কেবল ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণ খণ্ড চিত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে ইহাও একরূপ সুনিশ্চিত। অতএব এ অবস্থায় একটা মৌলিক তত্ত্ব মনে রাখিয়া কারণের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে বোধ করি সত্যের সান্নিধ্য লাভ ঘটিতে পারে।

সেটী এই। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও বৌদ্ধমত যে স্মরণাতীত প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বৈদিক মতের উপর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উপর ছায়াপাত করিয়া আসিতেছে। একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। Revealed doctrineএর সহিত Rationalism এর আপ্তবাক্যের সহিত যুক্তিবাদের দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে, এবং থাকিবে। কঠোপনিষদে ইহার ইঙ্গিত আছে। নচিকেতার তৃতীয় বরপ্রার্থনা কালে উক্তি এই ;—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ কঠ, ১ম বল্লী।

আত্মা মৃত্যুর পরে শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত লিঙ্গদেহসম্বন্ধী হইয়া থাকেন কি না, এ বিচিকিৎসা অর্থাৎ সংশয় চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলেন—আত্মা দেহান্তরসম্বন্ধী হইয়া অর্থাৎ লিঙ্গদেহাশ্রয়ে থাকেন, আবার কেহ তাহার বিপরীত কথা বলেন, তাঁহাদের মতে মরণের পরে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এ তত্ত্বটী বিজ্ঞানাধীন, অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাপেক্ষ, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবার নহে। এজন্য ইহাকে পরম-পুরুষার্থ বলা হয়। আমি (নচিকেতা) আপনাকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়া এই বিদ্যা অবগত হইতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা।

বুদ্ধদেবের বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে প্রজ্বলিতঅগ্নিকল্প ব্রাহ্মণকুমার নচিকেতা সশরীরে শ্রীযমমন্দিরে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের তথায় গিয়া ভোজন করা দূরের কথা, তিনি এই মর্ত্ত্যধামে

'মারের' সহিত যুদ্ধ করিয়াই হিমসিম খান; শেষ, যাহাকে লইয়া এত গোলযোগ, সেই আত্মার বিনাশ সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। যাহা হউক, নচিকেতার তুলনায় বুদ্ধদেব যে 'কালিকারছেলে' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতএব বলিতে হয়, এই যুক্তিবাদ বা তর্কপথ বেদমার্গের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া চিরকালই ভারতের ব্রাহ্মণকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক প্রতারিত করিয়া আসিতেছে। এই যুক্তিবাদকে বৌদ্ধমত বলিবার কারণ এই যে, ইহা বেদ-নিরপেক্ষ। বৈদিক ঋষির নিকট বেদবিরুদ্ধ বাক্য আপাতমনোহর—আপাতশ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতীত হইলেও তিনি যত্নের সহিত উহা অগ্রাহ্য করিতেন, কিন্তু তার্কিক ঋষিঠাকুর তাহা করিতেন না কেননা তিনি অন্তরে অন্তরে অ-বৈদিক হইয়াপড়িয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বৈদিক ঋষি-পরিচালিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-সমাজের মধ্যে বড় একটা পসার করিয়া উঠিতে পারেন নাই, যে হেতু তখন অসিধারী বৈদিক-ঋষি সংখ্যায় অল্প ছিলেন না। কিন্তু যে সময় হইতে অসিখানি পরের হস্তে অর্পিত হইল,—ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনের প্রধান সহায় বল একমাত্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল, সেই সময় হইতে বৌদ্ধ ঋষিঠাকুর ধর্ম্ম ও সমাজের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পাইলেন। পরে আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া হিন্দু জাতি সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ঋষির প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া পড়ে, এবং তাহার অন্যতম ফল বেদাতিরিক্ত শাস্ত্ররাশি প্রণীত হইয়া মুক্তি-বাদীর চির ঈপ্সিত স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহত করিয়া দেয়। বেদাতি-রিক্ত শাস্ত্র বা শাস্ত্রাংশ বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে, একাধিকব্যক্তিপ্রণীত হইতেও পারে, এবং প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই। অতএব যাহা বলা হইতেছে তাহা বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র বা শাস্ত্রাংশকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; এবং উত্তর কালে আবিষ্কৃত বেদের অনুকূল বা বেদসম্মত তত্ত্বরত্নরাজির প্রতি কিছুমাত্র কটাক্ষ করা হইতেছে না ইহাও বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধিপ্রসূত মত বৌদ্ধমত, তাহাতে আপ্তবাক্যের আদর নাই। কেবল-যুক্তিবাদীর লক্ষণ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

(১) "তার্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কথয়তি।"
কঠশ্রুতির ভাষ্য, ২।৯

(২) "তার্কিকাণাঞ্চাগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাদনিত্যাত্মনোদৃষ্টিরিতি।"
ঐতরেয়োপনিষদের ভাষ্য ৪ র্থ খঃ।

ভাবার্থ ;—

তার্কিকব্যক্তি আগম অর্থাৎ বেদের তত্ত্বার্থদর্শী নহেন, তিনি স্ববুদ্ধিপ্রভাবে যাহা কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ, তাহাই বলিয়া থাকেন; কিন্তু, তাহা বুদ্ধিকল্পিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেন না, তাঁহার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রপ্রভূত-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ১।

তার্কিকেরা আগম সম্প্রদায়ের সেবা করেন নাই, করিয়া থাকেন না; অথচ আগম সম্প্রদায়ের সেবা ব্যতীত শাস্ত্রপ্রভূত তর্কাগম্যা বুদ্ধি জন্মে না;—কাযেই তার্কিকেরা ভ্রান্তিবশতঃ এই উৎপত্তি-বিনাশবর্জ্জিত আত্ম-দৃষ্টি, অর্থাৎ জগতের নিখিল পদার্থ যে আত্মার নিকটে গিয়া এক হইয়া যায় বা তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত বিজ্ঞানের বিনিদ্র সাক্ষী আত্মার স্বরূপভূত নিত্যনির্ব্বিশেষ দৃষ্টিকে ভ্রান্তিবশতঃ বাহ্যদৃষ্টির অনুরূপ গ্রহণ-কারিণী, অতএব উৎপত্তি বিনাশশীল দৃষ্টি বলিয়াই বুঝিয়া থাকেন। ২।

এই বুদ্ধিপ্রসূত বৌদ্ধমতের প্রধান লক্ষণ এই যে, বেদবাক্যজিজ্ঞাসুর স্বীয় সংস্কারের অনভিমত হইলে তাহাতে অনাস্থাপ্রদর্শন,—তা, কি ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ব্যাপারে, কি দেবতাজ্ঞান সাধন বা ঈশ্বরজ্ঞানসাধন ব্যাপারে। অপিচ, বেদকে ছাড়াইয়া বড় বড় তত্ত্বকথা বলিতেছি, ইত্যাকার অভিমানও বৌদ্ধ-মতের একটা প্রধান লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এমন কি উপনিষৎ নামে পরিচিত কোনও কোনও গ্রন্থের যে যে স্থলে এই সকল লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই সেই স্থলে আমাদিগকে সাবধানে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে, তর্কাগম্যা আগমসুধাভ্রক্ষিতা বুদ্ধিকে বৈদিক ঋষির বুদ্ধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ বুদ্ধি তর্কগম্যানহে, তর্কাগম্যা। তর্কগম্যাবুদ্ধি-প্রণোদিত বৌদ্ধ-ঋষি-ঠাকুর সংসারের অসারত্বজ্ঞান, আসক্তির বিনাশে দুঃখের বিনাশ বা অত্যন্তনিবৃত্তি, সুখে বিতৃষ্ণা, পরদুঃখনিবারণ, জীবে দয়া, সর্ব্বোপরি

অহিংসাকে অধিকারিনির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই ‘পরমোধর্ম্মঃ’বলিয়া বুঝিতেন। কিন্তু বৈদিক ঋষি জগৎটাকে অন্যরূপ দেখিতেন। তাঁহার মতে জগৎ দুঃখময় ত নহেই, প্রত্যুত জগৎ জ্যোতির্ম্ময়, মধুময়, কেন না আত্মা যখন জ্যোতির্ম্ময়, মধুময় রসময়, আনন্দময়, তখন আত্মা হইতে অভিন্ন জগৎ জ্যোতির্ম্ময়, মধুময়, রসময়, আনন্দময়না হইবে কেন? যাঁহাতে মুমুক্ষা জন্মে নাই, তিনি এই জ্ঞানের অনধিকারী ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র তাঁহার ন্যায় অধিকারিসাধ্য নহে। তিনিজন্ম জন্মান্তরে এই অদ্বয়জ্ঞান লাভের জন্য বর্ত্তমান জীবনে যজ্ঞ করিবেন,—দেবতার বা পরদেবতার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি সমাপনান্তে তদবশিষ্ট অমৃতাখ্য প্রসাদ ভোজন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন; তিনি যন্ত্রে, অগ্নিতে বা প্রতিমায় মন্ত্রাহুত দেবতার সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতকাম হইবেন; তিনি বৈধ-হিংসাসমন্বিত যজ্ঞদ্বারা প্রমাদকৃত হিংসাদি-জনিত এবং অন্যান্যকারণজাত পাপরাশি ক্ষয় করিয়া অল্পে অল্পে উন্নত স্তরে উঠিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন। ইহাই হইল, বৈদিক ঋষির কথা। এমতে এক তুড়িতে পাপ উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা নাই। তাই ঋষি দুন্দুভি বাজাইয়া বলিলেন,—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজ্জীবিষেচ্ছতং সমা।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ঈশোপনিষৎ। ২।

ভাবার্থ। যাহার জিজ্জীবিষা নাই তাহারই পক্ষে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, তাদৃশ ব্যক্তিই ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের সেবক হইতে পারে। তোমাতে যখন ষোল আনা জিজ্জীবিষা বিদ্যমান, তখন তোমার পক্ষে সন্ন্যাস নহে, তুমি শতবর্ষ জীবন কামনা করিয়া স্বাভাবিক কর্ম্মরূপ বিষকে (কেন না তাহা বন্ধনের কারণ) বৈদিক কর্ম্মরূপ শোধিত বিষের দ্বারা (স্থানান্তরে শ্রুতি ইহাকে ‘অবিদ্যা’ বলিয়াছেন) শোধিত করিয়া লইবে,—শাস্ত্রীয় কর্ম্মদ্বারা স্বাভাবিক কাম্য কর্ম্মকে পরিশ্রুত করিয়া লইবে; নচেৎ তোমার পক্ষে আর কোনও পথ নাই,—যাহার আশ্রয়ে তুমি স্বাভাবিক কর্ম্মফলের হাত ছাড়াইয়া দূরে থাকিতে পার। কর্ম্মফল তোমাতে সংলিপ্ত হইবেই, তোমার সঙ্গ ছাড়িবে না।

বৈদিক-ব্রাহ্মণ শ্রুতির এই অমোঘ সত্যবাণী মাথা পাতিয়া লইলেন।

—না লইয়া পারেন না, কেননা আমরা দেখিতে পাই উত্তরকালে কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিপ্রণীত ভগবদ্‌গীতার সমস্ত কথাই যেন ঈশোপনিষদের এই এক মন্ত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সুবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রাচীন কালের বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ, তথা তাঁহাদের পরিচালক ঋষি-ঠাকুরেরা গোড়া হইতে অন্তরে অন্তরে বেদবাক্যে উদাসীন বা অনাস্থাবান্ হওয়ায়, অপিচ তাঁহাদের তাড়াতাড়ি ভবসাগর পার হইবার বলবতী ইচ্ছা থাকায়,—অন্য পথ ধরিলেন। তাঁহারা কঠোর কর্ম্ম-যোগ সাধন ব্যাপারটী সাধারণের পক্ষে সহজ সাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে অপৌরষেয়-আগম -সম্মত কর্ম্ম-যোগের সৌকর্য্যসাধন নাম দিয়া উহার ব্যভিচার আরম্ভ করিলেন, এবং সুযোগ পাইয়া হৃদয়ে চিরপুষ্ট অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ তত্ত্বটী নবীন শাস্ত্ররাশির মধ্য দিয়া অতি সুকৌশলে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। একথা অস্বীকার করিলে ভারতের দুই হাজার বৎসরের ঐতিহাসিক চিত্র গুলিকে পুঁছিয়া ফেলিতে হয়। যে তর্কগম্যা বুদ্ধি বৈদিক যুগ হইতে শাস্ত্রের (বেদের) উপর ছায়াপাত করিয়া আসিতেছিল,—মহাপরাক্রমশালী শূদ্রবংশোদ্ভব সম্রাট্ অশোকের নেতৃত্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব দেশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইলে, উহা যে হিন্দু-বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষে জন সাধারণের হৃদয়ে অ-বৈদিক ভাবের প্রস্রবণ ফুটাইতে পারে নাই, একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে বরং স্বীকার করিতে হয়, এই সকল ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে নিরামিষ শিব পূজা, নিরামিষ বিষ্ণু পূজা ত বটেই,—নিরামিষ কালী পূজার বিধান পর্য্যন্ত করা হইয়াছে; সামগানের স্থানে নামগান বসান হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বকগার্হস্থ্যাশ্রমের স্থানে চিরকৌমার্য্য বসাইয়া সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সৃষ্টি করা হইয়াছে; যজ্ঞের (অবিদ্যার) সহিত ঈশ্বরপ্রণিধানজনিত জ্ঞানের (বিদ্যার) সমুচ্চয় অর্থাৎ এ-দুয়ের যুগপৎ অনুষ্ঠান বা অন্বয় সাধন ব্যাপারকে হীন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—তাহার স্থানে দান, নামগান, জীবে দয়া প্রভৃতির সহযোগে তর্কগম্যা অতএব বুদ্ধিপ্রসূত দেবার্চ্চনাপদ্ধতি বসাইয়া ভাবপ্রবাহ ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার চরমফল দাঁড়াইয়াছে 'আত্মবৎ'

সেবায়। সম্রাট্ অশোকের সময়ে লোক যজ্ঞ করিলে বা নিমন্ত্রণ করিয়া মাংস খাওয়াইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। অতএব যাঁহারা অহিংসাধর্ম্মের ওকালতনামা লইয়া শাস্ত্র গড়িয়াছেন,—বর্ণাশ্রমী তেজীয়ান্ আর্য্যকে বাবাজী-ডৌলসই করিয়া বর্ত্তমান অপরূপ হিন্দুরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আদৌ কেহ অশোকের পূর্ব্বে ভূভার লাঘব করিতে আসিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে প্রবল সন্দেহ আছে।

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নিষ্কাশিত হইলেও বুদ্ধিপ্রসূত-জ্ঞানজনিত তর্কসঙ্কুল বিচার যায় নাই; বোধিসত্বগণ ও তাঁহাদের শক্তিগণ গিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণই দ্বিজোত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন; 'মচ্ছবে' জাতিবিচার বৌদ্ধযুগেও ছিল না এখনও নাই; উড্ডীশ ও ক্রিয়োড্ডীশের এখনও যথেষ্ট আদর আছে; শূন্যে নির্ব্বাণ চলিয়া গেলেও অহিংসা-ধর্ম্ম মাথা তুলিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব বৌদ্ধপ্রভাব যে প্রত্যেক হিন্দুর অস্থিমজ্জায় অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর, এ কথায় রাগ করিলে কিছুমাত্র আসে যায় না, কারণ কথাটা ঐতিহাসিক সত্যের উপর স্থাপিত, এজন্য চিরকাল থাকিবে। ইহাতে দুঃখিত হইবারও প্রয়োজন নাই। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। অধ্যাত্ম-রাজ্যলক্ষ্মীর শত্রু অনেক। আত্মনিষ্ঠাজনিত বল, অপ্রমাদ, অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনাদিতে মত্ততার অভাব, আর সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ এই তিন বস্তু কর্ত্তৃক আধ্যাত্মরাজশ্রী রক্ষিত থাকেন। রক্ষকের অভাবে রাজলক্ষ্মী বহুদিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে বৌদ্ধ-বুদ্ধি-রূপা অলক্ষ্মীর রাজশক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে। অতএব ইহাতে রাগ করিবার কারণ নাই। বরং ইহাতে আমাদের লাভ এই যে, আমরা পূর্ব্ববর্ণিত দেবদত্ত ও বিষ্ণুদত্তের মধ্যে পরস্পরের সংস্কার বৈষম্যের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি।

অতএব, এই প্রবন্ধে পশুবলির অনুকূল ও প্রতিকূল বচন তুলিয়া তুলা-দণ্ডে ওজন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাতে দ্বন্দ্ব মিটিবে না, কাকসমাকুল বৃক্ষের ন্যায় স্থানে স্থানে একটা ক্ষণিক কলরব উঠিবে

মাত্র। আর এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব যাহাতে লোকে একটু স্থিরচিত্তে, নানা দ্রব্য থাকিতে পশুবলির আবশ্যকতা কেন অধিক, তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন, সেজন্য তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

ধ্যানযোগে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে সাধকের মুখ্য উপহার প্রাণ, গৌণ উপহার রেতঃ বা উজ্জলরস; আর কর্ম্মযোগে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে মুখ্য উপহার রুধির, গৌণ উপহার অপর দ্রব্যাদি। প্রাণ উপহার দিতে একমাত্র সমর্থ সমাধি সাধক যোগী, অন্যে নহে। ইহা জ্ঞানলক্ষণা ভক্তির চরমাবস্থা, ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। উজ্জলরস উৎসারণ পূর্ব্বক সহস্রারস্থিত দেবতায় অর্পণ করিতে একমাত্র সমর্থ অব্যভিচারী কৌল সাধক, বীর সাধকও নহেন, কারণ তিনি এ সাধনায় মগ্ন করিতেছেন, ভবিষ্যতে কৃতকাম হইতে পারেন, না হইতেও পারেন। নাগিনী জাগিলেই যে 'কৃপা' বর্ষিবে, একথা পূর্ব্ব হইতে কোনও বীরসাধক ঠিক করিতে পারেন না। নাগিনী অন্য ভাবে অন্যরূপে কৃপা করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কৃপা ও 'কৃপা' নয়।

কিন্তু, বীরসাধক ব্যতীত এই অধিকারের সাধকদিগের জন্য বাহ্যপূজা নহে। যোগী এবং সিদ্ধকৌল লোকসংগ্রহচিকীর্ষু হইয়া বাহ্যপূজা করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন, নিজের জন্য করেননা বা করিবার আবশ্যকতা নাই। বাহ্যপূজা মধ্যম ও মন্দ সাধকদিগের জন্য সে মন্দ সাধকও একালে অতীব বিরল, অতএব ঈশ্বর প্রীত্যর্থে মন্দ সাধকদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার রুধির; রুধির অপেক্ষা সার পদার্থ যে উজ্জলরস, এবং তাহার অপেক্ষা সার পদার্থ যে প্রাণ সে দুইটার একটাও নহে, হইতে পারে না।

কর্ম্মযোগে (যজ্ঞে বা পূজায়) রুধির কেন ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর প্রধান উপহার হইল, গত আশ্বিন মাসের শাশ্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'জগদম্বার প্রধান আহার' শীর্ষক প্রবন্ধে তত্ত্বদর্শী পূজ্যপাদ লেখক তাহার অকাট্য শ্রৌত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া অনেকের চক্ষুর ছানি তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ছানি রোগটার একটা দোষ এই যে, একবার কাটাইলেও পুনরায় হইতে পারে। সেই জন্যই এই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন, নচেৎ যাঁহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে, বৌদ্ধ সংস্কারের কষে বৈদিক সংস্কারের রসটুকু একবারে

নষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে 'জগদম্বার প্রধান আহার' প্রবন্ধ পাঠই যথেষ্ট।

এখন, শোণিত কেন মুখ্য উপহার হইবে, তাহার গোটাকতক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে হইবে।

শক্তি মাহাত্ম্যবিষয়ক যত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে, ঋগ্‌বেদ ব্যতীত চণ্ডীই তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। তন্ত্র চণ্ডীকে 'পুরাতনী' বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাকে মহাভারতের আসন দিয়া ইতিহাস বলিলে যে দোষ হয়, চণ্ডীকে পুরাণের আসন দিয়া পুরাণ বলিলে সেই দোষই হয়। ভগবদ্‌গীতা যেমন উপনিষৎ বা গীতোপনিষৎ। চণ্ডীও সেইরূপ ঋগ্‌বেদান্তর্গত রাত্রিসূক্ত, শ্রীসূক্ত এবং দেবীসূক্তের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যান মাত্র। এই চণ্ডীতে দেবগণের প্রতি দেবীর শ্রীমুখের বাক্য আর সুরথ ও সমাধির প্রতি বৈদিক ঋষিকৃত পূজার ব্যবস্থা মানব গ্রহণ করিতে বাধ্য। দেবীপূজা সম্বন্ধে দেবীর বাক্যে অশ্রদ্ধা বা অসম্মান প্রকাশ করিয়া দেবীর পূজা করিলে, গোবধপূর্ব্বক পাদুকাদানের মত একটা ফল হইতে পারে, যাহা সকলে গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে না।

দেবীমাহাত্ম্যের যে অধ্যায়ে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার ১০ম ১১শ শ্লোক এই,—

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব তৎ ॥ ১০।
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাস্তথা কৃতম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥ ১১।

'বলিপ্রদানে' অর্থে,—সম্ভবতঃ বিষ্ণুমন্ত্রী, এবং বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না এমন যে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তিনিই বলিতেছেন, "বলিপ্রদানে পশুঘাতাদৌ যদ্বা বলিঃ প্রদীয়তেঽত্র তৎবলিপ্রদানং পশুঘাতাত্মককর্ম্ম তস্মিন্। 'বলিপূজাং' বলিষু যুক্তপূজাং।

শ্লোকের বঙ্গার্থ। বলিদানে, পূজায়, হোমাদিব্যাপারে এবং পুত্রাদির বিবাহোৎসবে আমার এই সমস্ত চরিতকথা পাঠ করিবে ও শ্রবণ করিবে। ১০।

বিধিজ্ঞ অবিধিজ্ঞ যেই হউক, আমার এই মাহাত্ম্য পাঠপূর্ব্বক বলিযুক্ত পূজা, ও হোমকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে, আমি প্রীতিসহকারে উহা গ্রহণ করিয়া থাকি। ১১।

এস্থলে পূজার অঙ্গগুলির মধ্যে পশুবলিকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। অনুকল্পের নামোল্লেখও নাই।

অতঃপর রাজা সুরথ ও বৈশ্যরত্ন সমাধিকৃত পূজায় দেখিতে পাই,—
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ শেষাধ্যায় ১১শ শ্লোক।
বঙ্গার্থ। তাঁহারা কখনও নিরাহারে, কখনও বা ফলমূলাদি আহার করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক দেবতায় মন সমাহিত করিতে লাগিলেন এবং স্বগাত্র-রুধির বলিস্বরূপ অর্পণ করিলেন।

এখন তন্ত্র হইতে কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া যাউক। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তন্ত্রের সার্ব্বজনীনতা প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই অহিংসা ধর্ম্মের পটহনিনাদ বৈদিক যজ্ঞের বিঘ্ন ও হানি সাধন করিয়া আসিতেছিল। তখন বিশ্বামিত্রপ্রমুখ কোদণ্ডধারী রঘুবীর বা চক্রধারী দ্বারকানাথ স্বধামে; তখন অমর ঋষি দ্বৈপায়ন অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া চিরসমাধিতে নিমগ্ন,—কাল-সাগরের বক্ষে বৈদিক ধর্ম্মতরণী কর্ণ-ধারবিহীন। কাযেই তখন মানবের ইহপরকালের কল্যাণার্থে সাধু-অসাধুনির্ব্বিশেষে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় বৌদ্ধভাবাপন্ন ভারতকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারোদ্ধার করিলাম।

বিধিবদ্বলিদানেন চতুর্ব্বর্গফলং ভবেৎ॥ শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত রুদ্র-যামলের বচন॥

পিতৃদৈবতযজ্ঞেষু বৈধ-হিংসা বিধীয়তে। ঐ ঐ যামলবচন।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ নাস্ত্যহিংসাপরং সুখং।
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা॥ ঐ ঐ ঐ

যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষঙ্‌ নাশয়তে বিষং॥ ঐ ঐ ঐ

তস্মাদবিধিনা হিংসা পাপজনিকা, বিধিবোধিতা হিংসা স্বর্গজনিকা ইতি নির্গলিতার্থঃ।

ব্রহ্মানন্দ গিরির ভাষ্য।

স্বনিমিত্তং তৃণং বাপি ছেদয়েন্ন কদাচন।

দেবতার্থং দ্বিজং গাং বা হত্বা পাপৈর্ন লিপ্যতে॥ কুলার্ণব।৫।

মামনাদৃত্য পুণ্যোঽপি পাপং স্যাৎ প্রত্যবায়তঃ।

মন্নিমিত্তং চরেৎ পাপং পুণ্যং ভবতি শাম্ভবি॥ ঐ ঐ

শ্লোকার্থ সরল বলিয়া অনুবাদ দিলাম না। কুলার্ণবের শেষ দুইটী শ্লোকের মধ্যে গীতার কর্ম্মযোগতত্ত্ব নিহিত আছে।

অতঃপর বৈদিক ঋষি মনুর কথা বলা যাইতেছে।—

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

ঔষধ্যঃ পশবো বৃক্ষা স্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।

যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥ ৫।৩৯, ৪০।

বঙ্গার্থ। যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বর স্বয়ংই পশুগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যজ্ঞ সমস্ত জগতের বিবৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ কেবল আত্মোন্নতিই ইহার লক্ষ্য নহে)। এই নিমিত্ত যজ্ঞে যে পশ্বাদি-বধ তাহাকে অ-বধ বলিয়াই জানিবে (কারণ ইহাতে বধ-জন্য দোষের বিদ্যমানতা নাই)।৩৯। ধান্য, যব প্রভৃতি ঔষধি, ছাগাদি পশু, যূপাদি নিমিত্ত বৃক্ষ, তির্য্যক্ জাতি, কপিঞ্জলাদি পক্ষী যজ্ঞার্থে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে জাত্যুৎকর্ষ অর্থাৎ উচ্চ যোনি প্রাপ্ত হয়।৪০।

যজ্ঞার্থে পশুর সৃষ্টি হইয়াছে পশুর পরজন্মে জাত্যুৎকর্ষ লাভের জন্য। এখানে হিংসার কথা আদৌ উঠিতে পারে না, কেন না যেমন ভাবী উন্নতির জন্য সন্তানের উপর শাসন (অর্থাৎ পীড়ন, যাহার নামান্তর হিংসা) পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য, যেমন দেহে স্ফোটক হইলে রোগীর অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ (যাহার সাক্ষাৎ ফল দেহের উপর পীড়ন অর্থাৎ হিংসা) অস্ত্রচিকিৎসকের পক্ষে কর্ত্তব্য, সেইরূপ পশুবধ পশুর হিতার্থে যাজ্ঞিকের পক্ষে কর্ত্তব্য; না করিলে কর্ত্তব্য-অকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। একার্য্যে কোনও প্রকার বিকল্প অনুকল্প করিলে

চলিবে না ; কারণ, যজ্ঞীয় প্রাণীর জাত্যুৎকর্ষ সম্পাদন ব্যাপারে যজমানের চেষ্টাই দেবতার প্রীতির কারণ, নচেৎ আনন্দ-ঘনশ্রী-মূর্ত্তির অপ্রীতি কোথায় ? বেদের উপর ও বেদমূলক শাস্ত্রের উপর কলম চলে না। চালাইলে তৎসঙ্গে আস্তিক্য বুদ্ধিকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রকম্পিত করিতে হয়। তাহার চরম ফল আত্মহত্যা। যাঁহারা সেরূপ ভাবে বেদমূলক শাস্ত্রের উপর কলম চালাইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রমী আর্য্য জাতিকে সম্ভবতঃ জ্ঞান পূর্ব্বক প্রতারিত করিয়াছেন, ধর্ম্মের হানি সাধন করিয়াছেন ; এবং আমরা চারি হাজার বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া আসিতেছি। প্রায় সমস্ত হিন্দুই এখন ন্যূনাধিক বৌদ্ধভাবাপন্ন। এখন বেদ-বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে বিদ্যা লাভের বিজ্ঞাপন পড়িয়াও ব্রাহ্মণকুমার বেদ পড়িতে যায় না। সে বিদ্যা নাকি অর্থকরী নহে !

জীব হিংসা পাপ, যদি আপনার সুখের জন্য করা হয় ; কিন্তু, দেবতার জন্য সে কার্য্য করিলে ফল একবারেই বিপরীত, যেমন বিষ-পানে মরণ, আর শোধিত বিষপানে রোগমুক্তি।

আবার, আপনার জন্য জীবহিংসা সর্ব্বত্রই পাপ-জনক, একথা বলিতে পারা যায় না। ভাল করিয়া ঝাড়িলেও জ্বালানী কাষ্ঠ হইতে তাবৎ কীট দূর করা অসাধ্য। পীড়ার সময় ও দেশে কলেরার প্রকোপ হইলে সিদ্ধ জল পান না করিয়া থাকা যায় না। দেহাশ্রিত কীটগুলার অত্যাচার বাড়িয়া উঠিলে ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের বধসাধন করিতে হয়। শয্যাদিতে মৎকুণের আতিশয্য হইলে সুনিদ্রার উপায়ান্তর উদ্ভা-বন করিতে অদ্যাপি কোনও অহিংসাধর্ম্মী সমর্থ হন নাই। যে মৃদঙ্গ যন্ত্রে নাম গানের সময় সঙ্গত হইয়া থাকে, তাহার বন্ধনীর জন্য যে চর্ম্ম ব্যবহৃত হয় তাহা মৃত গোচর্ম্ম নহে,—জীবিত গো রুইদাস দত্ত বিষ ভক্ষণে বিনষ্ট হইয়া, অথবা কষাইয়ের হস্তে পঞ্চত্ব লাভ করিয়া যে চর্ম্মদান করে, সেই গোচর্ম্ম ;—অর্থাৎ রোগে মরা গোরুর চামড়ায় খোলের ডূরী হয় না। এস্থলে এই গোবধ ব্যাপারের অনুমন্তা অনেকগুলি ! জগৎ হিংসাপূর্ণ।

মৃগ, অজ, হংস, পারাবত প্রভৃতি যজ্ঞীয় প্রাণীর উপর প্রেমটা ঢালিয়া দেওয়া শুভ লক্ষণ নহে। অজ-নন্দনের প্রতি প্রেমের বন্যা ছুটিলে তজ্জননীর ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, কেননা, জননীর শোক সংঘটনের ভয় করিয়া পশু-বলি বন্ধ করিয়া দিলে, ছয় মাস অতীত না হইতেই অজ-নন্দন জাত্যুচিত প্রকৃতির প্রেরণায় প্রলুব্ধ হইয়া গর্ভিণীর প্রতি ধাবিত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। দেশব্যাপী সে দৃষ্টান্তের ফল ভাল হইবে না। অতএব শাস্ত্রের মধ্য দিয়া সেরূপ পৈশাচিক ব্যাপারের কথঞ্চিৎ প্রশমন করাই কর্ত্তব্য।

মনু বৃথামাংসভোজীর পক্ষে নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কারণ ভারতের আর্য্যজাতিকে মধ্যএসিয়াবাসীদিগের ন্যায় মাংসাশী জাতিতে পরিণত করা দূরদর্শী আর্য্য ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাচীন আর্য্য জাতির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পদার্থের সার সংগ্রহ করিতে অদ্বিতীয় পটু ছিলেন। তাঁহারা কালকূট হলাহল হইতে মৃত-সঞ্জীবন ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন; সুরা, নারী ও মাংসের মধ্য হইতে মুক্তিদায়িকা শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিই বৃথামাংসভোজীর অসদ্‌গতিপ্রাপ্তির আদি দ্রষ্টা, ইহুদি পয়গম্বর মুসা তাঁহার তুলনায় অনেক আধুনিক। বেদাশ্রিত আর্য্য নৃপতি সসত্ত্বা পত্নীকে বনবাসে পাঠাইয়াও আদর্শ প্রেমিক; ব্রাহ্মণ মাতৃহত্যা করিয়াও তেজস্বী ঋষি; পিতামাতা স্বহস্তে সহাস্যে করাত দিয়া পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়াও অতিথিসৎকার অচ্ছিদ্র করিতে প্রস্তুত; রাজা একদিকে কপোতের প্রাণ রক্ষার্থে নিজদেহের মাংস কাটিয়া শ্যেন পক্ষীর আহারের ব্যবস্থা করিলেন, অন্যদিকে শত অশ্বমেধ পূর্ণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম পালন করিলেন; ক্ষত্রিয়শিষ্য ব্রাহ্মণগুরু নিপাত করিয়াও 'অশ্বত্থামাধিক' প্রিয় শিষ্য। প্রাচীন আর্য্য জানিতেন 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'। কর্ম্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়, ইহার যাথাত্ম্য তত্ত্ব অবধারণ করা অসাধ্য বলিয়াই ঋষি ভগবানের মুখ দিয়া ইহাকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়াছেন।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

বামাচরণ।

আজন্ম দ্বারকা-কূলে ভীষণ শ্মশানে,
আছিলে সাধকবর সাধনে মগন!
আসব-আবেশে সদা আরক্ত নয়নে,
হেরিতে জননীরূপ—জ্বলন্ত তপন!—
ত্যজিলে শৈশবে চির সাধের সংসার,
ধরিলে ধর্ম্মের পথ সত্য ও সুন্দর!
ছিলে চিরদিন মুগ্ধ ভাবে আপনার,
বাঁধিয়ে শ্মশান-বুকে সাধনার ঘর!
মনে পড়ে তনু তব ভূতলে লুটায়,
হাঁকি 'তারা' 'তারা' সুধু তিতি নেত্রনীরে,
সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক ফুটি রুধির ছুটায়,
ভাদ্রের ভীষণ রৌদ্রে স্তব্ধ নদীতীরে!
তারাকারা তারা তব নয়নেরি তারা,
তারানামে আজীবন ছিলে আত্মহারা!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

দিল্লী

(প্রাচীন ইতিহাস)

পৃথ্বীরাজ

যিনি হিন্দুর শেষ রাজা, যাঁহার গৌরবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার পরাক্রমে রাজপুত-রাজগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যান এবং

যাঁহার প্রদীপ্ত প্রভাবে মুসলমান বীরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠেন, সেই বীর-শিরোমণি পৃথ্বীরাজের সহিতই দিল্লীর শেষ সম্বন্ধ, তাহার পর দিল্লী মুসলমান বিজয়স্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিয়া সমগ্র হিন্দু জাতির প্রতি উপেক্ষার হাসি প্রদর্শন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রসমরের সূচনা হইতে মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী হিন্দুর গৌরব বিস্তার করিয়াছিল, পৃথ্বীরাজের পর তাহাই আবার মুসলমান-সম্রাটগণের বিজয়-ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়। চৌহান-বংশধরও আজমীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মাতামহ অনঙ্গপালের সাধের দিল্লী লাভ করায়, পৃথ্বীরাজের পক্ষে উত্তর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম নরপতি হওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার পিতা সোমেশ্বর রাঠোরের কঠোর হস্ত হইতে দিল্লী রক্ষা করায় অনঙ্গপাল অবশেষে পৃথ্বীরাজের হস্তে দিল্লী সমর্পণ করেন। দিল্লী ও আজমীরের প্রভুত্বই পৃথ্বীরাজকে পরাক্রমশালী করিয়া তুলে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত রাজগণ তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন নাই, পাঠান বীরগণও অনেকবার সে পরাক্রমে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের সহিত পৃথ্বীরাজের শেষ সংঘর্ষও তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বের পরিচায়ক। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দেশে সে সময় ভারতরাজলক্ষ্মী পাঠানের পূজা গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্পা হওয়ায় পৃথ্বীরাজের সকল আশা ভরসা দৃষদ্বতীর সলিলপ্রবাহে অনন্ত কালের জন্য ভাসিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর গৌরবসূর্য্য একেবারেই অস্তমিত হয়, বহুশত বৎসর পরে সে কথা স্মরণ করিতে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। পৃথ্বীরাজ এ জগৎ হইতে বিদায় লইলেও, তাঁহার গৌরব-কাহিনী আজিও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, বিশেষতঃ চাঁদ কবি আমাদিগের নিকট তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। চাঁদের সেই গম্ভীর ঝঙ্কারের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, অন্যান্য ঐতিহাসিকের অনুকূল প্রতিকূল তানলয়ে মিশাইয়া আমরা পৃথ্বীরাজের চরিত্রগানে প্রবৃত্ত হইতেছি। জানি না ইহা সকলের নিকট প্রীতিকর হইবে কিনা।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পৃথ্বীরাজ মাতামহ অনঙ্গপালের নিকট হইতে দিল্লীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অনঙ্গপাল দিল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া চাঁদকবি উল্লেখ করিয়াছেন। * যে সময়ে

* চাঁদ কবির লিখিত পৃথ্বীরাজরাসো গ্রন্থে দুইজন অনঙ্গের সহিত

অনঙ্গপাল দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বর পরাক্রমে উত্তর ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

দিল্লীর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কহ্লন নামে আর একজন নরপতিরও উল্লেখ আছে। কহ্লন আবার তুয়ার অনঙ্গপালের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রথম অনঙ্গকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া জানা যায়।

> "পণ্ডব বংশ অনঙ্গ নৃপ। পতি হতিনাপুর ঠাম॥
> এক সমৈ যমুনা তটহ। বসিয় রাজ তহঁ গাম॥
> অনঙ্গপাল তুঁয়র তহাঁ। দিলী বসাই আনি॥
> রাজপ্রজা নরনারী সব। বসৈ সকল মন মানি॥"

পৃথ্বীরাজের মাতা দিল্লীর পূর্ব্ব পরিচয় প্রদানকালে বলিতেছেন, ঃ—

> "হম পিতু পুরিষা পুব্ব, নৃপতি কহ্লন বন ক্রীলত।
> * * * * * * *
> কহ্লনপুর কহ্লননৃপতিঃবাসী নৃপ নিজ সাজ।
> কিতক পাঠ অন্তর নৃপতি, অনঙ্গপাল ভয় রাজ" ॥

পৃথ্বীরাজের মাতা পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর পূর্ব্ব পরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে, আমার পিতার পূর্ব্ব পুরুষ কহ্লন নামে রাজা দিল্লীর নিকট মৃগয়া করিতে আসিয়া দেখেন যে, তথায় একটী শশক শিকারী কুকুরকে আক্রমণ করিতেছে; তাহা দেখিয়া তিনি ইহাকে বীরভূমি মনে করিয়া তথায় কহ্লনপুর নামে নগর স্থাপন করেন। আমার পিতা অনঙ্গপাল সেইখানেই নূতন দিল্লীর পত্তন দেন এবং সেই প্রসঙ্গে বাসুকীর মস্তকে কীলক স্পর্শের উল্লেখও আছে। অনঙ্গপাল কীলক পরীক্ষা করিয়া পরে দুঃখিত হন।

> "অনঙ্গপাল ছক্কবৈ, বুদ্ধিজো ইসী উকিল্লিয়।
> ভয়ৌ তুঅঁর মতিহীন, করী কিল্লীয় তৈঁ ঢিল্লিয়।"

চাঁদ কবির উক্তি সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পাণ্ডুবংশীয় অনঙ্গ যমুনাতটে যেখানে গ্রাম বসাইয়াছিলেন, তথায় তোমর অনঙ্গপাল দিল্লী স্থাপনা করেন। আবার কহ্লনের কহ্লনপুরেও দিল্লীর

কামধ্বজ নামে কোন নরপতি কনোজরাজ বিজয়পালের সহিত অনঙ্গপালের দিল্লী অধিকারে অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের

স্থাপনা হয়। তাহা হইলে পাণ্ডুবংশীয় অনঙ্গ ও কহ্লন কি এক ব্যক্তি এবং তোমরবংশীয়গণ কি পাণ্ডুবংশোদ্ভব? অথবা পাণ্ডুবংশীয় অনঙ্গ যেখানে গ্রাম বসান সেখানে কহ্লন কহ্লনপুর স্থাপন করেন এবং সেই খানেই অনঙ্গপাল দিল্লীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কহ্লন চন্দ্র শব্দের বাচক হওয়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে সেই জন্য চন্দ্র বলিতে চাহেন; তাহা হইলে এই কহ্লন বা চন্দ্র কি লৌহস্তম্ভের চন্দ্র? এ সমস্তের মীমাংসা করা সুকঠিন। লৌহস্তম্ভে লিখিত আছে যে, ১১০৯ সংবতে অনঙ্গপাল দিল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি কোন্ অনঙ্গপাল? প্রচলিত বিক্রমসংবৎ ধরিলে ১১০৯ সংবৎ ১০৫৩ খৃষ্টাব্দ হয়; তাহা হইলে এ অনঙ্গ পৃথ্বীরাজের মাতামহ অনঙ্গপাল হইতে পারেন না। কিন্তু চাঁদ কবি তাঁহার গ্রন্থে যে অনন্দ বিক্রমসংবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ধরিলে উক্ত ১১০৯ সংবৎ পৃথ্বীরাজের মাতামহেরই সময় হইয়া উঠে এবং চাঁদকবি তাঁহার কর্ত্তৃকই কীলক স্থাপন, দিল্লীগঠন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের মাতামহের পূর্ব্বে ১০০ একশত বৎসরের মধ্যে কোন বিখ্যাত অনঙ্গপালের কথা চাঁদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। শত বৎসরের মধ্যে আর এক প্রসিদ্ধ অনঙ্গ-পাল থাকিলে চাঁদের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকাই সম্ভব ছিল; কিন্তু তিনি কহ্লন ও পাণ্ডুবংশীয় অনঙ্গ ব্যতীত আর কোনও বিখ্যাত রাজার সহিত দিল্লীর সম্বন্ধ থাকার কথা বলেন নাই। তদ্ভিন্ন ঐতিহাসিকগণের দ্বিতীয় অনঙ্গপালের সুবিচারাদির কথা চাঁদ পৃথ্বীরাজের মাতামহেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এমন কি অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকে দিল্লীদানের পর তীর্থবাস করিলেও প্রজাগণের অসন্তোষের জন্য পৃথ্বীরাজের নিকট হইতে দিল্লী কাড়িয়া লওয়ারও অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পৃথ্বীরাজের শত্রু শাহাবুদ্দিনেরও সাহায্য গ্রহণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহা হইলে তৃতীয় অনঙ্গপালই দ্বিতীয় অনঙ্গপাল হইয়া উঠেন। ১১০৯ সংবৎকে অনন্দ অর্থাৎ ৯০—৯১ বিযুক্ত বলিলে সুচারুরূপে ইহার

পৃথ্বীরাজ।

Printed by the Mohila Press Calcutta.

সাহায্য প্রার্থনা করেন। সোমেশ্বর দিল্লী উপস্থিত হইয়া কামধ্বজ ও বিজয়পালকে বাধা প্রদান করিয়া অনঙ্গপালের দিল্লী রক্ষা করেন। তাহার পর বিজয়পালের সহিতও সন্ধি স্থাপিত হয়। অনঙ্গপাল কন্যা সুরসুন্দরীকে বিজয়পালের ও কমলাকে সোমেশ্বরের হস্তে অর্পণ করেন। * এই কমলার গর্ভেই পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। দিল্লী পৃথ্বীরাজের জন্মভূমি। ১১১৫ অনন্দ বিক্রমসংবতের (১১৪৯ –৫০ খৃঃ অব্দ) বৈশাখ মাসে পৃথ্বীরাজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। † রাজপুতবালকেরা যেমন বাল্য কাল হইতে

মীমাংসা হইয়া যায়। অনন্দ ১১০৯ সংবৎ ১১৯৯—১২০০ প্রচলিত বিক্রম সংবৎ (১১৪৩-৪৪ খৃঃ অব্দ) হয়। ১১৪৯—৫০ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরাজের জন্ম, সুতরাং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। মাতামহ কর্ত্তৃক দিল্লী প্রতিষ্ঠার সমকালে পৃথ্বীরাজের মাতার বয়স ৮ বৎসর ছিল বলিয়া চাঁদকবির গ্রন্থে দেখা যায়। তাহা হইলে তাঁহার চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পৃথ্বীরাজের জন্ম হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং দিল্লীর সহিত যে অনঙ্গপালের বিশেষরূপ সম্বন্ধ শুনা যায় তিনিই পৃথ্বীরাজের মাতামহ। দ্বিতীয় আর এক অনঙ্গপালের কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। চাঁদের গ্রন্থে অনঙ্গপালের কোন পুত্রাদির উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় অনঙ্গপালের যে সমস্ত পুত্রাদির উল্লেখ শুনা যায়, তাহা প্রবাদ ব্যতীত কোন বিশ্বস্ত সূত্র হইতে জানা যায় না। সুতরাং পাণ্ডুবংশীয় অনঙ্গ ও তুমার অনঙ্গপাল এই দুই জনেরই সহিত দিল্লীর সম্বন্ধ অনুমান করিতে হয়। কল্লান হয় প্রথম অনঙ্গ অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইতে পারেন।

* "অনঙ্গপাল পুত্রী উভয়। ইক দীনী বিজপাল ॥
ইক দীনী সোমেস কৌঁ। বীজ ববন কলি কাল ॥
এক নাম সুরসুন্দরী। অনিবর কমলা নাম ॥
দরসন সুরনর ছুল্লহী। মনোঁ সু কলিকা কাম ॥"

টড পৃথ্বীরাজের মাতাকে রুস্মা বাই বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

† "একাদশ সৈ পঞ্চদহ। বিক্রম শাক অনন্দ ॥
তিহি রিপু জয় পুর হরণ কৌঁ। ভয় প্রিথিরাজ নরিন্দ ॥"

মৃগয়া অভ্যাস করে, পৃথ্বীরাজও সেইরূপ দলবল লইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়স সময়ে সোমেশ্বর মণ্ডোবর রাজ্যের রাজা পরিহারবংশীয় নাহর রায়ের কন্যার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। নাহর প্রথমে নিজেই এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের পত্র পাইয়া তিনি আবার অসম্মত হন। ইহাতে সোমেশ্বর অবমানিত বোধ করায়, বালক পৃথ্বী স্বয়ংই সসৈন্যে মণ্ডোবরে উপস্থিত হইয়া নাহর রায়কে পরাজিত ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আজমীরে প্রত্যাগত হন। ইহার পর মেবাতের মুগলরাজা মুদ্গল রায়ের সহিত সোমেশ্বরের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। ক্রমে শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর * সহিত

এই অনন্দ অর্থে সনন্দ অর্থাৎ প্রচলিত বিক্রম সংবৎ হইতে ৯০—৯১ বিয়োগ করিতে হইবে, তাহা হইলে অনন্দ ১১১৫ সনন্দ ১২০৫—৬ বা ১১৪৯—৫০ খৃঃ অব্দ হয়। নিম্নে পৃথ্বীরাজের জন্মকুণ্ডলী প্রদত্ত হইল।
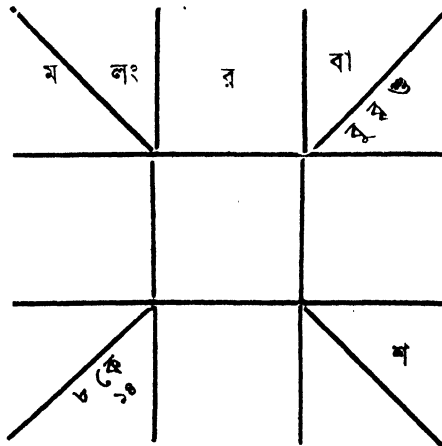
* চাঁদকবি মহম্মদঘোরীকে শাহাবুদ্দিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি সাধারণতঃ মহম্মদ সাম বা মহম্মদ বিন সাম নামে কথিত হইতেন, তথাপি তাঁহার শাহাবুদ্দিন নামের পরিচয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে Elliot's History of India গ্রন্থে

পৃথ্বীরাজের বিবাদের সূচনা হয়, শাহাবুদ্দিনের সহিত বিরোধেই পৃথ্বীরাজ অবশেষে যে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের দুই একটী সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু চাঁদকবির বর্ণনা হইতে ইহাঁদের অবিরাম সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণামে শাহাবুদ্দিন বিজয়ী হইলে ও পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বহুবার পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন বলিয়া চাঁদকবি উল্লেখ করিয়াছেন। * আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদানে চেষ্টা করিতেছি।

এইরূপ লিখিত আছে,—"Mahammad ghori—This conqueror is called by many historians Shahabu-ddin, a name which the Ranzatu-Safa tells us was changed to Mu'izzu-ddin when his brother Ghiyasu-ddin became king. He is also commonly known as Mahammad Sam or Mahammad Bin S'am, a name which the coins show him to have borne in common with his brother. The superscription on his coins is "As Sultanu-l'azam Muizzu-ddunya' wau-ddi'n Abu'-l Muzaffar Muhammad bin s'am." On some coins this is contracted into "Sultanu-l'azam Abu'-l Mirzaffar Mahammad bin sa'm", and on others to "Sultanu-l'azam Mahammad bin sa'm. The most interesting coins, however, of this monarch are those described by Mr. Thomas (I. R. A. S., XVII, P. 194.) as struck in honor of his "Martyred Lord" by Ta'ju-ddin Yalduz, at Ghazni, after the death of Muhammad bin sa'm." (Vol. II P. P. 483-84)

* আবুল ফজল আইন আক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি লিখিতেছেন,—"In the reign of Raja Pirthowra, Sultan Moozeddeen Sam made several incursions from Ghuzneen into Hindoostan, but never gained any victory. In the Hindoo history it is said, that Raja Pithowra gained, rom the Sultan, seven pitched battles; after which, in

পৃথ্বীরাজের সহিত শাহাবুদ্দিনের কি কারণে বিরোধ উপস্থিত হয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে সাধারণ হিন্দুমুসলমানসংঘর্ষ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন; চাঁদকবি কিন্তু ইহার একটী বিশেষ কারণই নির্দ্দেশ করিতেছেন। মীর হোসেন নামে শাহাবুদ্দিনের এক পিতৃব্যপুত্রের সহিত চিত্ররেখা নামে এক নর্ত্তকী লইয়া তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। মীর হোসেন সপরিবারে উক্ত নর্ত্তকীকে লইয়া গজনী পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নাগরের নিকট উপস্থিত হন। সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ তথায় মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। হোসেন তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে পৃথ্বীরাজ আশ্রয়দানে সম্মত হন। শাহাবুদ্দিন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া হোসেনকে পরিত্যাগ করার জন্য পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে হোসেনকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে শাহাবুদ্দিন তাতার খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির সহিত গজনী হইতে বহির্গত হইয়া সিন্ধুনদী অতিক্রমের পর সারুণ্ডপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। পৃথ্বীরাজও কৈমাস, চামণ্ড রায়, কণ্হ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতির সহিত দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া দুই এক স্থানে শিবির সন্নিবেশের পর শাহাবুদ্দিনের নিকট উপস্থিত হন। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠে, অবশেষে শাহাবুদ্দিন পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে ৫ দিন পর্য্যন্ত সসম্মানে রাখিয়া মীর হোসেনের পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাহাতে তিনি আর হিন্দুদের উপর অত্যাচার না করেন তাহারই জন্য অনুরোধ করেন। তাহার পর শাহাবুদ্দিন গজনী উপস্থিত হন *। শাহাবুদ্দিন এ পরাজয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি

A. H. 588, the eighth battle was fought near Thanesir (Thánesvar) when the Raja was taken prisoner." (Gladwin's Ayeen Akbory)

" রষ্‌ষি পঞ্চ দিন সাহি। অদব আদর বহু কিন্নৌ॥
সুঅ হুসেন গাজী। সুপুত্ত হথ্‌থৈঁ গ্রহী দিন্নৌ॥
কিঅ সলাঁম তিয়বার। জাহু অপ্যনে সুথানহ॥
মতি হিন্দুপর সাহি। সজ্যি আঔ সথানহ॥

গজনীতে আসিয়া হোসেনের পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখেন। সে কোনরূপে পলায়ন করিয়া আবার পৃথ্বীরাজের শরণাপন্ন হয়। পৃথ্বীরাজ নাগরের নিকট মৃগয়া করিতে আসিবেন গুপ্তচরমুখে এ সংবাদ পাইয়া শাহাবুদ্দিন অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করার জন্য আবার তথায় উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ তাহা জানিতে না পারিয়া সামান্য সৈন্য সামন্ত সহ মৃগয়া করিতে তথায় গমন করিলে শাহাবুদ্দিনের সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে কিন্তু অবশেষে তাহারা পরাজিত হইতে বাধ্য হয়। শাহাবুদ্দিনও গজনীতে পলায়ন করেন।

গুজরাটের রাজা ভোলা ভীম রায়ের সহিত সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজের অনেক দিন হইতে বিবাদ চলিতেছিল। ভীমরায় আবুর রাজা সলখের কন্যা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সলখের ইচ্ছিনী নামে আর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। ভীমরায় তাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করায় সলখ তাহাতে অসম্মত হন। ইচ্ছিনীকে তাঁহার পৃথ্বীরাজের হস্তেই সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল। ভীমরায় বলপূর্ব্বক ইচ্ছিনীকে হরণ করার অভিপ্রায়ে আবুতে উপস্থিত হন। এদিকে সলখও পৃথ্বীরাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। পৃথ্বীরাজের আগমনের পূর্ব্বেই ভীমরায় আবু আক্রমণ করিয়া সলখকে নিহত করেন, কিন্তু ইচ্ছিনীকে হরণ করিতে পারেন নাই। ভীমরায় আবু হইতে প্রত্যাগত হইয়া পৃথ্বীরাজকে দমন করার ইচ্ছায় শাহাবুদ্দিনের নিকট দূত প্রেরণ করেন। শাহাবুদ্দিন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ভীমরায় ও পৃথ্বীরাজ উভয়কেই দমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অসংখ্য সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ সে সংবাদ পাইয়া ভীমরায় ও শাহাবুদ্দিন দুইজনকেই একসঙ্গে পরাস্ত করিতে অভিলাষ করেন। ভীমরায়ও শাহাবুদ্দিন ও পৃথ্বীরাজ উভয়কেই আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এইরূপে তিন শত্রু পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হইলে এক মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ভীমরায়ের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের সহিত মিলিত হইয়া শাহাবুদ্দিনকেই আক্রমণের পরামর্শ

বৈঠায়ি সাহ সুধাসনহ। লায় অপ্য গাজী সুসথ॥
সম্পত্ত জাই গজ্জন পুরহ। করীষের উদ্ধার অথ”

দিয়াছিলেন ; কিন্তু অপরে তাহাতে আপত্তি করায় ভীমরায় অবশেষে উভয় শত্রুর সহিতই যুদ্ধার্থে সচেষ্ট হন। পৃথ্বীরাজ প্রধান সেনাপতি কৈমাসকে ভীমরায়ের সহিত যুদ্ধের জন্য নাগরে পাঠাইয়া দেন এবং নিজে শাহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধার্থে উদ্‌যোগী হন। কৈমাস প্রথমে বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তাহার পর পৃথ্বীরাজের অন্যান্য সেনাপতি উপস্থিত হইলে তিনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ভীমরায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে সারুণ্ডপুর উপস্থিত হইয়া ভীমবেগে শাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করেন। চাঁদ কবি বলেন যে, শাহাবুদ্দিনের সহিত ৩০০০০০ তিন লক্ষ ও পৃথ্বীরাজের সহিত ২০০০০ বিশ হাজার মাত্র সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাজপুতপাঠানের রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত হইয়া উঠে। অবশেষে শাহাবুদ্দিন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বন্দী ও পরে কিছু দণ্ড বিধান করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার পর ইচ্ছিনী কুমারীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। * ইচ্ছিনীর ভ্রাতা জৈত সিংহ

সসির সুমগ্‌গহ অস্ত। তীস ষট বীর সমন্ধর ॥
গ্যরহ সেঁ পরবীঁন। সাহি বন্ধ্যৌ গোরিয় বর ॥
মাহ প্রথম বরতীজ। বীজ রবি সপ্তম থানং ॥
বর পাঁণিগ্রহ মণ্ডী। সুবর ইঁচ্ছিনি চোহু আঁনং ॥
মুক্কয়ৌ সাহি ঘনডণ্ড লৈ। বর বাজেঁ নিসাঁন ঘন ॥
আষেট ফেরি মণ্ডিয় নৃপতি। বন সটু কবি চন্দমন" ॥

কবিচন্দ্র ১১৩৬ অনন্দ সংবতের মাঘ মাসে এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন ; আবার কৈমাসের সহিত ভীমরায়ের যুদ্ধের সময় "গ্যরহ সেঁ চালীস চব" অর্থাৎ ১১৪৪ বলিতেছেন। চাঁদ কবি অন্যত্র পৃথ্বীরাজের বার বৎসর বয়সে ইচ্ছিনীর সহিত বিবাহের কথা লিখিয়াছেন।—"বার মৈ বরস রা সগখ সোয়। দিল্লী সুয়ায় ইঁচ্ছনী লোয়" ॥ ১১১৫ অনন্দ সংবতে পৃথ্বীরাজের জন্ম। তাহা হইলে এ ঘটনা ১১৩৬ সংবতেই সম্ভব হয় ; কিন্তু ১১৪৪ সংবৎ কোথা হইতে আসিল বলা যায় না। সকল পুঁথিতে ১১৪৪র দোঁহাটী নাই; সুতরাং ইহা সন্দেহজনক। আবার ফেরিস্তার সহিত ঐক্য করিলে এই ১১৪৪ সংবৎ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ফেরিস্তা এই ঘটনাকে অন্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভীম

শাহাবুদ্দিনের পরাজয়ে, পৃথ্বীরাজের সহায়তা করায় তিনি তাহাকে আবুর রাজত্ব প্রদান করেন। ইচ্ছিনীকে লইয়া আসার সময়ে পৃথ্বীরাজের পূর্ব্ব শত্রু মুদগল রায় তাঁহার পথাবরোধ করায় পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে দুরীভূত করিয়া দেন।

ক্রমে পৃথ্বীরাজের বল বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অনেক রাজা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক হইতে লাগিলেন। ইচ্ছিনীর সহিত বিবাহের পর বৎসরেই তাঁহার প্রিয় সেনাপতি ও চিরসহচর চামুণ্ডরায়ের ভগ্নীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ সম্পন্ন হয়, এই বিবাহের ফলেই রাজকুমার রেনসীর জন্ম। এদিকে অনঙ্গপাল নিঃসন্তান হওয়ায় ক্রমে তাঁহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হয়। অনঙ্গপাল একজন নীতিজ্ঞ, সুবিচারক ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহার শাসনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি এক্ষণে পৃথ্বীরাজকে তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করায় পৃথ্বীরাজের নিকট দিল্লী দানের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, এই সময়ে পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথা কুমারীর সহিত চিতোরাধিপতি সমরসিংহের বিবাহপ্রস্তাব চলিতেছিল। বিবাহের পর কি এক্ষণে পৃথ্বীরাজের দিল্লীগমন উচিত এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হয়। পরে শীঘ্রই তাঁহার দিল্লী গমন কর্ত্তব্য ইহা স্থির হইলে পৃথ্বীরাজ পিতার নিকট অনুমতি লইয়া আজমীর হইতে দিল্লীতে উপস্থিত

রায়ের সহিতই শাহাবুদ্দিনের সংঘর্ষের কথা লিখিয়াছেন এবং মহম্মদ ঘোরীর পরাজয়ের কথাও স্বীকার করিয়াছেনঃ—

In the year 574, he again marched to Oocha and Moultan, and from thence continued his route through the sandy desert to Guzerat. The Prince Bhim-dew (a lineal descendant from Bramha Dew of Guzerat, who opposed Mahmood Ghiznevy) advanced with an army to resist the Mahomedans, and defeated them with great slaughter. They suffered many hardships in their retreat, before they reached Ghizny. (Briggs' Ferishta) (৫৭৪ হিজরী বা ১১৭৮ খৃষ্টাব্দই ১১৪৪ অনন্দ সংবৎ। ফেরিস্তা কিরূপে এই ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করিলেন বলা যায় না; কিন্তু চাঁদের গ্রন্থ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ১১৩৬ ই উক্ত ঘটনার সময় স্থির হয়)।

হন। যদিও তিনি সময়ে সময়ে মাতামহের রাজ্যে গমন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। যে দিবস তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন, সে দিন দিল্লী নগরী আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পুষ্পপতাকায় শোভিত হইয়া দিল্লী মনমোহিনী শ্রী ধারণ করে। অনঙ্গপালের কর্ম্মচারিগণ পৃথ্বীরাজকে রাজা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যথাবিহিত নজর প্রদান করেন। প্রজাবৃন্দও যার পরনাই সন্তুষ্ট হয়। ১১৩৮ অনন্দ সংবতের অগ্রহায়ণ মাসে পুত্রিকাপুত্র পৃথ্বীরাজের হস্তে দিল্লী সমর্পণ করিয়া অনঙ্গপাল ধর্ম্মাচরণের জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন *। দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ ও আজমীরে সোমেশ্বর রাজত্ব করিতে থাকায় উত্তর ভারতবর্ষে চৌহানদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে থাকে। অন্যান্য রাজপুত রাজা তাহাতে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ পৃথ্বীরাজের দিল্লীর অধিকার লাভ করায় কনোজরাজ জয়চন্দ্রের তাহা চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে। শাহাবুদ্দিনও পৃথ্বীরাজের এরূপ আধিপত্যে তাঁহার পরাক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনায় পৃথ্বীরাজকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে অভিলাষী হন। রাজপুত রাজগণের সহিত অবিরত বিরোধে পৃথ্বীরাজের বলক্ষয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় শাহাবুদ্দিনের পক্ষে ভারতবর্ষ বিজয় সুকর হইয়া উঠে। সে সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্ব্বে অনেক প্রধান প্রধান রাজপুত বীর ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ বীরগণের ক্ষয়ে সমস্ত হিন্দু জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। যদি হিন্দুরাজগণ আপনাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিয়া ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে সে সময়ে ভারতবর্ষ পাঠানের

---

* "একাদশ সংবত্তহ। অষ্ট অগ্‌গ হতি তীস ভনি॥
প্রথি সুরতি তঁহাঁ হেম। সুদ্ধ মগসির সুমাস গণি॥
সেত পষ্‌ষ পঞ্চমীয়। সকল বাসর গুর পূরণ॥
সুদ্দি মৃগসির সময়িন্দ। জোগ সদ্ধহি সিধ চূরণ॥
পোহু অনঙ্গপাল অপ্পিয় পহুমি। পুত্তিয় পুত্ত পবিত্ত মন॥
ছন্দ্যো সুমহ সুষতন তরুণি। পতি বদ্রী সজ্জে সরণ॥"

করায়ত্ত হইত না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। কারণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদ ঘোরী ফুৎকারে ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন নাই।

রক্তের টান।

রামলাল শ্যামলাল দুই সহোদর—দুই ভাইয়ে অত্যন্ত প্রণয়; বাল্যকালেই তাহারা পিতৃমাতৃহীন; দুই ভাই—দুই ভাইয়ের অবলম্বন; বাল্যকাল হইতেই তাহাদের উপজীবিকা তাহারা কায়িক পরিশ্রমে একরূপ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। দুইজনেই এখন যুবক, একবৎসরের ছোট বড়, দুই জনেই অবিবাহিত। এ পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে হয় নাই। এখানেও তাহারা একই কয়লার খনিতে কুলির কাজ করে। দুই জনে এক বৎসরের ছোট বড়।

কুলিদের লম্বা ব্যারাক—সকলেই এক একখানা ঘর লইয়া আছে। অনেকে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়াও কুলির কাজ করে। রামলাল শ্যামলালও ব্যারাকে একখানি থাকিবার ঘর পাইয়াছিল। দুই ভাই এক কক্ষেই বাস করে।

পাশের ঘরে বৈজু তাহার একমাত্র অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা ভগবন্তীয়া ও তাহার পত্নীকে লইয়া বাস করে, এবং রামলাল শ্যামলাল যে খনিতে কাজ করে, তাহারাও সেই খনিতে কাজ করে। ভগবন্তীয়া সুন্দরী। তেমন সুন্দরী কুলি মজুরের ঘরে দেখা যায় না। টানা টানা চোক, ক্ষীণ কটি, সুকোমল গঠন, নাতিদীর্ঘ যুবতী স্থলপদ্মের মত ফুটিয়া আছে।

ভগবন্তীয়াকে দেখিয়া অবধি রামলালের ভাবান্তর ঘটিল। যুবতী তাহাদের স্বজাতীয়, রামলালের অন্তরে একটা ভবিষ্যতের সুখ-আশা জাগিয়া উঠিল। সুযোগ মতে একদিন ভ্রাতাকে গোপন করিয়া সে ভগবন্তীয়ার পিতার নিকট তাহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিল।

ভগবন্তীয়ার পিতা, কন্যার বিবাহের পণ ১০০৲ এক শত টাকা চায়—অত টাকা রামলালের নাই; রামলাল ক্ষুব্ধ চিত্তে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। ভগবন্তীয়াও একথা জানে। পূর্ব্বে সে রামলালের সহিত অসঙ্কোচে কথা বার্ত্তা বলিত; ইদানীং রামলালকে দেখিলেই, তাহার কেমন একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইত; সে আর পূর্ব্বের মত অসঙ্কোচে কথা বার্ত্তা বলিতে পারে না।

রামলাল অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। সে রাত্রেও কাজ করে। শ্যামলাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া উভয়ের রন্ধন করে—পরে

ভ্রাতার আহার্য্য রাত্রে খনিতে গিয়া দিয়া আসে। রামলাল রাত্রি ১২ টার সময় বাড়ী ফেরে—প্রাতঃকালেই আবার কার্য্যে বাহির হয়। শ্যামলাল ভ্রাতাকে এত পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু রামলাল শুনিল না—সে ভ্রাতার কথায় মৃদু হাসিল মাত্র। রাত্রে যেরূপ অতিরিক্ত কার্য্য করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। ইদানীং রামলালের সহিত ভগবন্তীয়ার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না—সে বিবাহের টাকা সংগ্রহের জন্যই ব্যস্ত—অবসর কম।

সন্ধ্যার সময় শ্যামলাল দাওয়ায় রাঁধে—ভগবন্তীয়া আসিয়া বসিয়া নানারূপ গল্প গুজব করে—কেমন একটা অজানিত আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। রামলাল শ্যামলালের নিকট ভগবন্তীয়ার বিবাহসংক্রান্ত কোন কথা প্রকাশ করে নাই। ইহাই সে প্রথম ভ্রাতার নিকট গোপন করিয়াছিল।

এইরূপে ৫।৬ মাস কাটিয়া গেল। ভগবন্তীয়ার উপর শ্যামলালের প্রণয় দৃঢ় হইতে লাগিল। রামলাল ইহা কিছুই লক্ষ্য করিল না।

কয়লার খনিতে একজন নেটিভ্ ডাক্তার কর্ম্ম করেন। ডাক্তারটি বয়সে নবীন; চরিত্র ভাল নয়। একদিন হঠাৎ ভগবন্তীয়ার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। অনেক বয়স্থা রমণী খনিতে কাজ করে—তাহাদিগকে সর্দ্দারণী বলে। ইহারা পয়সা পাইলে সব করে। ডাক্তার তাহাদেরই এক জনকে ভগবন্তীয়াকে সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিল।

সন্ধ্যায় কাজ করিয়া যখন ভগবন্তীয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন সর্দ্দারণী নানা প্রলোভনে ডাক্তার বাবুর কথা উত্থাপন করিল। ভগবন্তীয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। সর্দ্দারণী বুঝিয়াছিল সহজে কিছুই হইবে না। কিন্তু ডাক্তার ভগবন্তীয়ার জন্য উন্মাদ—সর্দ্দারণী কৌশলে একদিন ভগবন্তীয়াকে রেলের পুলের নিকট লইয়া গেল। স্থানটী নির্জ্জন, সন্ধ্যার পরে কেহই সে পথে চলা ফেরা করে না। হঠাৎ ডাক্তার বাহির হইয়া ভগবন্তীয়ার হাত চাপিয়া ধরিল। ভীতা বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল।

শ্যামলাল ভাইয়ের আহার্য্য দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, রমণীর আর্ত্ত চীৎকারে সে পুলের নীচে গিয়া দেখিল, ডাক্তার ভগবন্তীয়ার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—ভীতা বালিকা তাহার হাত ছাড়াইবার আকুল চেষ্টা করিতেছে। শ্যামলাল আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ডাক্তারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, ডাক্তারকে উন্মত্তের মত প্রহার করিতে লাগিল—তাহার পর ভগবন্তীয়াকে লইয়া বাসায় ফিরিয়া গেল।

বাসায় কেহই এবিষয়ে কোন উচ্চ বাচ্য করিল না; কিন্তু এই

ঘটনায় ভগবন্তীয়া শ্যামলালের উপর আরও অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু শ্যামলালের ব্যবহার সহজে ভুলিলেন না; প্রায়ই নানা ভাবে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। শ্যামলাল নীরবে তাহা সহ্য করিতে লাগিল। এ খনির কাজ ছাড়িয়া গেলে ভগবন্তীয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তাই সে ভগবন্তীয়ার জন্য এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল। অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। এক ভগবন্তীয়া তাহা জানিত, করুণ সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু রামলালও যে ভগবন্তীয়ার জন্য আজ ছয় মাস অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছে, ভগবন্তীয়া তাহা বুঝিয়াও বুঝিল না।

ছয় মাস হইয়া গিয়াছে—রামলালের একশত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আজ তাহার কত আনন্দ; যাহার নিকট সে টাকাগুলি জমা রাখিয়াছিল, সেখান হইতে টাকাগুলি লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিল। আজ তাহার হৃদয় আনন্দোৎসাহে পরিপূর্ণ।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সেদিন আবার পূর্ণিমা,—নদীর জল চিক্ চিক্ করিয়া হাসিতেছে। রামলাল দেখিতে পাইল, পুলের উপর একটী যুবক ও যুবতী বসিয়া আছে। দুই জনে সাগ্রহে দুই জনের প্রতি চাহিয়া আছে—কথাশেষ হয় না—কত আগ্রহ—কত উল্লাস; রামলালেরও ভবিষ্যত সুখকল্পনায় অন্তর অধীর হইয়া উঠিল। ভগবন্তীয়ার মুখ খানি চোখের উপর দেখিতে পাইল, সেও অমনি তাহাকে লইয়া, এমনি জোছনায়, এমনি আনন্দ উপভোগ করিবে—কি শান্তি! কি সুখ! একটা উন্মাদনাপূর্ণ সুখলালসায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে পুলের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ দেখিল, সে যুবতী ভগবন্তীয়া। তাহার সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে, যুবক অন্য কেহ নহে, তাহার ভাই শ্যামলাল! তাহার মাথার ভিতরে ঘুরিতেছিল—সে জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যুবক যুবতী তেমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিভোর চিত্তে গল্প করিতেছিল। এই ভাবে কতক্ষণ গেল—রামলাল দুর্দ্দমনীয় নিরাশার কষাঘাত সহ্য করিয়াও স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল, সে কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিল না। হঠাৎ তাহার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সংসারে কেহই আপনার নয়, নিজের ভাই নিজের শত্রু, জগতে তবে সুহৃদ কে আছে? সে জগৎসংসার সুহৃদশূন্য, আত্মীয়শূন্য, সম্পূর্ণ নিজেকে একাকী বিবেচনা করিতে লাগিল। মায়া মমতা স্নেহ হৃদয় হইতে দূর হইয়া গেল। সে একটা বিজাতীয় ঘৃণায়, এ অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার

জন্য কৃতসংকল্প হইল। পর মুহূর্তেই সে তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তাহার বক্র দৃষ্টির যদি দাহিকা শক্তি থাকিত, যুবক যুবতী নিঃসন্দেহ তাহাতে ভস্ম হইয়া যাইত।

রামলাল চলিয়া গেল। ভগবন্তীয়া ও শ্যামলালের সে দিকে কোন দৃষ্টি ছিল না, তাহারা নিজের ভাবে বিভোর। রামলাল কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একবার দাঁড়াইল; তখনও যুবক যুবতী তেমনি বিভোর হইয়া গল্প করিতেছিল। রামলালের দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইল. চক্ষু অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল, তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ ও শিরাসকল স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার পর সে দ্রুত চলিয়া গেল।

রামলাল ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিল— প্রান্তরের জ্যোৎস্না ঘাসের শিশিরের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল; তাহার ললাট কুঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিবর্ণ।

শ্যামলাল কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। ভগবন্তীয়াও অন্য দিক দিয়া তাহার কুটীরে চলিয়া গিয়াছিল। অসময়ে ভ্রাতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একবার চমকিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই মনে হইল, বুঝি তাহার ভ্রাতা অসুস্থ, নতুবা অসময়ে ফিরিবে কেন? সে নিকটে গিয়া ভ্রাতাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিবে—হঠাৎ ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কি ভয়াবহ মুখভাব! সে মুখ দেখিয়া শ্যামলালের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুমি যে অমন ক'রে ব'সে আছ?"—রামলাল একবার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি অতি তীব্র—শ্যামলালের চক্ষু তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে মুখ নত করিল। রামলাল বলিল, "আমি আজই এখান থেকে চ'লে যাব।" শ্যামলাল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আর আমি?" রামলাল বলিল, "কেন তুমি এই খানেই থাক্‌বে।" স্বর শ্লেষপূর্ণ। শ্যামলাল ভ্রাতার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, সে ভ্রাতার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। রামলাল বলিল, "তুমি এখন বড় হোয়েছ—আপনার পথ আপনি দেখ। আমার সঙ্গে আর তোমার সম্বন্ধ কি?" তারপর রামলাল ভ্রাতার উত্তরের কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়াই ভিতর হইতে নিজের জিনিষ পত্র বাহির করিয়া লইয়া দ্রুত চলিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শ্যামলাল—নির্ব্বাক্ হইয়া ভ্রাতার কার্য্য দেখিতেছিল। তাহার ভাই কখনও যে এরূপ করিবে বা করিতে পারে, সে তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছিল না। রামলাল দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেলেই, শ্যামলাল ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল; সে দিন আর আহারাদি কিছুই হইল না। সমস্ত রাত্রি শ্যামলাল ভ্রাতার সেই বীভৎস মুখখানি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, সে ভ্রাতার অনেক অনুসন্ধান করিল—কিন্তু রামলালের কোন তত্ত্ব করিতে পারিল না। ক্ষুণ্ণমনে শ্যামলাল সন্ধ্যার সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। ভ্রাতার হঠাৎ বিরাগের কারণ সে কিছুই বুঝিল না। ভ্রাতার বিচ্ছেদে সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আজ ২০ বৎসর তাহারা একই শয্যায় শয়ন করিয়াছে, একই পাত্রে আহার করিয়াছে, এক লোটায় জলপান করিয়াছে, সেই ভাই হইতে আজ তাহাকে জীবিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইতে হইল!—শ্যামলালের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তাহার আর মুখে হাসি নাই—কার্য্যে উৎসাহ নাই, দেহে শক্তি নাই, মস্তিষ্কে বল নাই, যে ভগবন্তীয়াকে সে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, যাহার জন্য অবহেলে সে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিত, যাহার দর্শনে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, সেই ভগবন্তীয়াকেও তাহার আর তেমন ভাল লাগে না; সে জগৎ বন্ধনশূন্য দেখিতে লাগিল। শীঘ্রই ভ্রাতৃবৎসল শ্যামলাল কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িল।

কে কাহাকে দেখে, সকলেই কাজ করিতে বাহির হইয়া যায়—শ্যামলাল একলা শয্যার উপর পড়িয়া থাকে। সেই সন্ধ্যায় ভগবন্তীয়া ফিরিয়া আসে—ভগবন্তীয়া কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শ্যামলালের নিকট যায়। দারুণ নির্জ্জনতায়, রোগশয্যায়, ভগবন্তীয়ার দর্শনে সে কতকটা পরিতৃপ্তি লাভ করে। ভগবন্তীয়াও কায়মনে তাহার সেবা করে। একদিন ভগবন্তীয়া বলিল, "আমি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে ঔষধ এনে দি—রোগ শীগ্‌গির সারবে।" যে ভগবন্তীয়া ডাক্তারের সেই ব্যবহারের পর হইতে সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্তে দূরে দূরে সরিয়া থাকিত, সেই ডাক্তার বাবুর নিকট সে আজ স্বেচ্ছায় শ্যামলালের ঔষধের জন্য যাইতে চাহিতেছে। শ্যামলালের করুণায় চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। সে সাগ্রহে ভগবন্তীয়ার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "না ঔষধ আন্‌তে হবে না, আমি অম্‌নিই ভাল হব।"

শ্যামলালের অসুখের জন্য দুই একদিন ভগবন্তীয়ার কার্য্যে যাওয়া হইত না। তাহাতে তাহার পিতা মাতা কত ভৎর্সনা করিত, ভগবন্তীয়া তাহা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল। শ্যামলাল ও তাহা জানিত, সে আরও ভগবন্তীয়ার গুণে মোহিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

কাজ কর্ম্ম বন্ধ; পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া যাহা ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল—অবশেষে ঘটী থালাটী পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল। আর পথ্যাদি চলে না—শ্যামলালের অপেক্ষা ভগবন্তীয়া আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহারও হাতে নগদ টাকা নাই—সে যাহা রোজগার করে, তাহার পিতাই তাহা লইয়া থাকে—চাহিলেও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে লুকাইয়া তাহার একখানি

অলঙ্কার বন্ধক দিয়া শ্যামলালের পথ্যাদি চালাইতে লাগিল। ভগবন্তীয়া যদিও তাহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু শ্যামলালের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সে ভগবন্তীয়ার আর্থিক অবস্থা সকলই জানিত; সে দিন দিন আরও কৃতজ্ঞতায় ভগবন্তীয়ার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল।

দুই মাস ভুগিয়া শ্যামলাল ভাল হইল। কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল—তথাপি সে ভগবন্তীয়ার অলঙ্কারখানি মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিল। সে ইহা বিশেষভাবে জানিত যে, অলঙ্কারবন্ধকের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, ভগবন্তীয়ার তাহার পিতামাতার নিকট লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না—ভগবন্তীয়া তাহাকে দুর্ব্বল শরীরে পরিশ্রম করিতে অনেক বার নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিল না।

এদিকে রামলাল, ভ্রাতার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সেই খানেই রহিল। প্রত্যহ সে গোপনে ভ্রাতার সন্ধান লয়—শ্যামলালের ব্যাধির সময় ভগবন্তীয়ার শুশ্রূষা যত্ন সমস্তই সে লক্ষ্য করিয়াছিল—ক্রোধ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আর ভ্রাতৃস্নেহ রহিল না। হায়! ঈর্ষা-বহ্নি! মানুষের সমস্ত সৎবৃত্তি তুমি এমনি করিয়াই দগ্ধ কর!

ভগবন্তীয়ার গহনাবন্ধকের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এ বিষয়ে শ্যামলালই অপরাধী; সে আরও আগ্রহে প্রাণপণে অলঙ্কার উন্মোচনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল। ভগবন্তীয়া পিতামাতার নিকট নানারূপে বড়ই লাঞ্ছিত হইতেছিল; বিশেষ তাহার মাতার অত্যাচার ভয়াবহ—কোন দিন ঝগড়া করিয়া তাহাকে খাইতে দেয় না। শ্যামলাল আপনার রুটি ভগবন্তীয়াকে ধরিয়া দেয়;—প্রকাশ করে, সে নিজে আহার করিয়াছে; নতুবা সে জানে, ভগবন্তীয়া আহার করিবে না। নানারূপে দিন দিন উভয়ের প্রেম আরও দৃঢ় হইতে লাগিল।

অনেক কষ্টে শ্যামলাল, ভগবন্তীয়ার অলঙ্কার ছাড়াইয়া দিল। ভগবন্তীয়ার পিতামাতা অনেকটা শান্ত হইল। এক দিন সে সুযোগ বুঝিয়া ভগবন্তীয়ার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। সেই একশত টাকা পণ। তাহার মত সাধারণ কয়লার কুলির খাইয়া পরিয়া একশত টাকা সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। কিন্তু শ্যামলাল নিরাশ হইল না। প্রকৃত প্রণয় মানুষের হৃদয়ে, দেব-আশীর্ব্বাদের মত শক্তি প্রদান করে; মানুষ সেই শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব করিয়া তোলে। শ্যামলাল এখন ফুরানে কাজ করে। যত কাজ করিবে তত পয়সা; সে ভগবন্তীয়ালাভের আশায় অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; শ্যামলাল তখনও খনিতে কাজ করিতেছিল। একবার ভগবন্তীয়া ডাকিতে আসিল;

ললাট-ঘর্ম্ম মোক্ষণ করিয়া শ্যামলাল মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টিতে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম পূর্ণিমার জোয়ারের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। সে বিহ্বলভাবে ভগবন্তীয়াকে চুম্বন করিল। লজ্জা সঙ্কোচ মিশ্রিত আনন্দে ভগবন্তীয়ার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। খাদের উপর হইতে দুইটী তীব্র চক্ষু অন্ধকারে মার্জ্জারের মত জ্বলিতেছিল। সে চক্ষু রামলালের। রামলাল হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

শ্যামলালের আর ক্লান্তি রহিল না। একটি চুম্বনে এই সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। সে ভগবন্তীয়াকে অগ্রসর হইতে বলিয়া পূর্ণবেগে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল।

রামলাল লাফাইয়া উঠিল। এ মিলনদর্শন তাহার পক্ষে অসম্ভব—সে বরবার খাদের অপর পার্শ্বে গেল, সেখানে খাদ কাটাইবার জন্য ডিনামাইট পোতা ছিল। দু'একদিনের মধ্যেই খাদ কাটাইবার প্রয়োজন হইবে। যেখানে শ্যামলাল কাজ করিতেছিল, ঠিক তাহারই উপরাংশ ডিনামাইটপূর্ণ; শ্যামলাল নীচে পূর্ণ উৎসাহে কাজ করিতেছিল। রামলাল উপরের দিকে চাহিয়া একবার কি ভাবিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি একটা পৈশাচিক আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ডিনামাইটের পলিতায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল। তাহার পর সে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া, খাদ কাটিবার শব্দের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পলিতার আগুণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল; আর ডিনামাইটে সংযোগ হইবার বিলম্ব নাই। এখনি শ্যামলাল খাদ পতনের সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হইয়া যাইবে। হঠাৎ রামলালের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে একটা পৈশাচিক উত্তেজনায়, আপনাকে যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, শ্যামলাল সেই শ্যামলাল—তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়—শ্যামলাল তাহার সহোদর, শ্যামলাল বাল্যের সঙ্গী—যৌবনের সঙ্গী—একটী রমণীর তুচ্ছ মোহে আজ তাহাকে হত্যা করিবে? মুহূর্ত্তে সে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিল। পলিতার আগুণ ক্রমশই ডিনামাইটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আর মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে রামলাল খাদের ভিতর লাফাইয়া পড়িল—শ্যামলাল একমনে কাজ করিতেছিল। রামলাল ধাক্কা দিয়া শ্যামলালকে খাদের নীচে অংশে ফেলিয়া দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সশব্দে প্রকাণ্ড কয়লা স্তূপে রামলালের জীবন্ত সমাধি হইল।

ডিনামাইটের ভীষণ শব্দে আশপাশ হইতে সকলেই ছুটিয়া আসিল—

শ্যামলাল তাহার ভ্রাতা রামলালকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে উন্মাদের মত তাহাকে রক্ষা করিতে ছুটিল। কয়লা সরাইয়া রামলালের দেহ বাহির করা হইল। তখন তাহার সংজ্ঞা নাই, কিন্তু প্রাণ তখনও আছে। ধরা-ধরি করিয়া শ্যামলাল তখনি ভ্রাতাকে নিজের কুটীরে লইয়া গেল, ডাক্তার আসিলেন, বলিলেন আশা নাই।

ভগবন্তীয়া ও শ্যামলাল প্রাণপণে ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ভোর রাত্রে রামলালের একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে ভ্রাতার হাত ধরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভাই, আমার কোমরে একশত টাকার নোট বাঁধা আছে—তুমি এই টাকা পণ দিয়া ভগবন্তীয়াকে বিবাহ করিও।" তাহার পর ভগবন্তীয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, সে দৃষ্টি, স্নিগ্ধ শান্ত। সেই রাত্রেই রামলালের মৃত্যু হইল।

রামলাল কি ত্যাগ স্বীকার করিল—শ্যামলাল তাহা বুঝিল না। কিন্তু ভগবন্তীয়া আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। তাহার পর শ্যামলালের সহিত ভগবন্তীয়ার বিবাহ হইয়া গেল। কালে শ্যামলাল, রামলালের শোক বিস্মৃত হইয়া গেল কিন্তু ভগবন্তীয়ার হৃদয়ের ক্ষত আজীবন দূর হইল না।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সাধনার পথ।

সাধনার পথ যদিও সরল
সংশয়ে বাঁকিয়া যায়।
গগনের ভানু (র) প্রচণ্ড কিরণ
অন্ধ কি দেখিতে পায়?
রয়েছে পড়িয়া সম্মুখে বিস্তারি
চির সত্য মহা পথ।
চ'লে চল ভাই নির্ভয় অন্তরে
হবে পূর্ণ মনোরথ॥

শ্রীমতিলাল সিংহ রায়।

শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩২১ ৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র, শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীনিরঞ্জন সান্ন্যাল, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, ভাদ্র সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি, পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য নামে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে ভাদ্র মাসেই ভি, পি করিব। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখক গণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ, ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora.) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

রামকৃষ্ণের সাধনা

Engraved and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ২য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩২১। ৪র্থ সংখ্যা।

আলোচনা।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচার।

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নাম কে না অবগত আছে? যিনি বঙ্গদেশে সনাতনধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ও উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুসমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বিরাট্-আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, অনেকের মনে হইতে পারে যে, তিনি বোধ হয় এতকাল নীরবেই অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, তিনি শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত গভীর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সত্যতা স্থির করিয়াছেন, এতদিন তাহা প্রবন্ধাকারে ও শিষ্যগণের নিকট শিক্ষাচ্ছলে প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সাধারণকে তৎসমস্ত উপহার প্রদানের জন্য তিনি আবার এক বিরাট্ আন্দোলনের অবতারণা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা কোনরূপ কল্পনামূলক ধারণা বিশেষ নহে। প্রকৃত পদার্থ বা শরীরতত্ত্বের পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমান-গঠিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান নহে, উহা দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্য অধ্যাত্মবিদ্যার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাজ্জ্বল্যমান সত্যতা প্রকাশ করে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা আছে, এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উহার প্রত্যেক স্তরের বিনিয়োগ আছে। সেই সকল স্তরের উহার [illegible] উপলব্ধি করিলে আর তাহার

সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ থাকে না। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা তাঁহার আবিষ্কৃত দার্শনিক তত্ত্বের দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সাধারণে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই এই অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা শুনিতে পারেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই। যাঁহারা এই অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইবেন।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

ভারতবর্ষে এক্ষণে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক বাস করিতেছেন। এক এক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ও আছে, ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়। সেই অনৈক্য লইয়া সময়ে সময়ে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি সেই অগ্নিটি চালিত করার জন্য চেষ্টা কিছু বেশী মাত্রায় দৃষ্ট হয়। কারণ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ 'লা ওয়ারিশ,'। খৃষ্টান মিস্‌নরি অবিরত বহ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন; ব্রাহ্ম নরনারী অগ্নিবৃষ্টি করিতে ক্ষান্ত নহেন। অবকাশ পাইলে মুসল্‌মানগণও একটু আধটু স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দেন। হিন্দুসমাজ কিন্তু নীরবেই সহ্য করে। অন্য কোন সমাজের প্রতি এরূপ আক্রমণ করিলে আক্রমণকারীর মস্তকে যে যষ্টি নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা নীরবে সহ্য করিতেছে, তাহাদের প্রতি আক্রমণের চেষ্টা কিছু বেশী মাত্রায় চলিতেছে। বিশেষতঃ আজ কাল ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের সংবাদপত্রিকায়, মাসিকপত্রে, প্রচারকের বক্তৃতায়, এমন কি উপাসকের মুখ হইতে হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজের একটু নিন্দা বাহির হওয়াই চাই। কখনও কখনও তাহা তীব্র বিষের ন্যায় আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে তাঁহারা দোষ ব্যতীত গুণ প্রায়ই দেখিতে পান না। যদি একথা মানিয়া লওয়া যায় যে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে বা সমাজে দোষের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণের তাহার সংস্কার চেষ্টা কি অনধিকার চর্চ্চা নহে? আর তাঁহারা কি মনে করেন

যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম বা সমাজ জগতে আদর্শ বলিয়াই গৃহীত হইবে। যাঁহারা মনে করেন আর্য্য ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহাদের সম্প্রদায়স্রষ্টৃগণের ধর্ম্ম ভারতে আদর্শ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে, তাঁহাদের উক্তিকে বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আর সেই ধর্ম্ম ও সমাজ যে কিরূপ আদর্শস্বরূপ তাহাও চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। আমাদের কথা, আগে আপনারা আদর্শ হইয়া উঠ, তবে অপর সকলকে আহ্বান করিও; নতুবা বিদ্বেষবিষ উদ্গিরণ করিয়া আপনাদিগকে লোকের নিকট ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিও না। বাস্তবিক যদি তোমরা আদর্শ পুরুষ হইতে পার তবে লোকে তোমাদের কথা শুনিবে। তাই বলিতেছি আগে আপনাদের সমাজ-টাকে আদর্শ করিয়া তুল দেখি। অন্য ধর্ম্ম বা সমাজের নিন্দা না করিয়া তাহাতেই মনোযোগ দেও, তাহা হইলে আপনাদের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে। পরনিন্দা মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

প্রত্ন-তত্ত্বের জয়ঢক্কা।

"ট্যাং ট্যাং শো ট্যাং, ট্যাং ট্যাং শো ট্যাং" করিয়া আজকাল চারিদিকে প্রত্নতত্ত্বের জয়ঢক্কা বাজিতেছে। কিন্তু কেহ কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সে বাদ্যকে টেম টেমের আওয়াজ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যেন, প্রত্নতত্ত্বের ঢক্কানিনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা যে হওয়ার উপায় নাই, ইহা তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ আপনাদের ঢক্কায় কলেবর যতই কেন বাড়াইয়া তুলুন না, তাহার চর্ম্ম দুইখানি যে বহুল ছিদ্রসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ছিদ্রে তালি দিতে দিতে অনেক চর্ম্মও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, কাজেই ঢক্কার বাদ্য জোরে বাহির হইতে পারিতেছে না। তাহার আওয়াজ টেম টেমের ন্যায় চিরদিনই বোধ হইবে। রূপক পরিত্যাগ করিয়া আমরা এক্ষণে প্রকৃত কথারই অনুসরণ করি-তেছি। প্রত্নতত্ত্বকে পরীক্ষিত বিজ্ঞানের ন্যায় স্থাপন করিবার জন্য আজকাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর স্থাপিত, আর প্রত্নতত্ত্ব অনুমানের ভিত্তিতে বিলুণ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আরোহ

প্রণালীতে (inductive method) স্থিরীকৃত হয়। আর প্রাত্নতত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অবরোহ প্রণালীতে (deductive method) স্থির হইয়া থাকে। একটি বিশেষ হইতে সামান্তের, আর একটী সামান্ত হইতে বিশেষের নির্ণয় করিয়া থাকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, :কাজেই প্রত্নতত্ত্ব যে কোনকালে বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিবে সে আশা দুরাশা মাত্র। যদিও প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে তাঁহারা অবরোহ প্রথাকেই স্থির রাখিয়াছেন। অশোক যুগের বা গুপ্ত যুগের লিপিকে বর্ত্তমান অক্ষরে পাঠ করিবার জন্য পূর্ব্বে একটি সঙ্কেত স্থির করাই আছে। যদিও বিশেষ বিশেষ প্রস্তর ফলক্ হইতে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই অগ্রে স্থিরীকৃত সামান্ত সিদ্ধান্তটিই পরীক্ষা ক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িতেছে ; সুতরাং ইহা কদাচ বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে পারে না। ঋগ্বেদ দেবতার নিকট প্রার্থনাত্মক মন্ত্র বিশেষ। ইহা হই-তেই তৎকালীন আর্য্যসমাজের ইতিহাস বাহির করিতেই হইবে, অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। জাতিভেদ ঋগ্বেদের সময় ছিল না, অতএব পুরুষসূক্ত প্রক্ষিপ্ত। এ সমস্ত কি উদার বৈজ্ঞানিকের মত কথা, না মস্তিষ্ক মধ্যে যাহা স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বত্র দেখিতে চেষ্টা করা ? বাঙ্গালীর রক্তে আর্য্যগন্ধ নাই, সবই দ্রাবিড়গন্ধে পরিপূর্ণ। যদি বল শাস্ত্র ও প্রমাণে স্থির হয় যে, দ্রাবি-ড়েরাও আর্য্য হইতে শেষে অনার্য্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য ; আমরা যাহা স্থির করিয়াছি তাহাই অভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিকের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু এখনই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়ি-য়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনেক স্থানেই যে গোঁজামিল তাহা আলো-চনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সত্য গোঁজামিল দিয়া স্থির করিতে হয়, তাহাকে জাহির করিতে হইলে যে বাদ্যভাণ্ডের প্রয়োজন তাহাতে যে তালি দিতে হইবে ইহাতে কি সন্দেহ আছে ? কাজেই তাঁহাদের ঢক্কানিনাদ টেম টেমের ন্যায়ই চিরদিন বোধ হইবে ; সে আওয়াজ জোরে বাহির হওয়ার উপায় নাই। বিজ্ঞানবাদ্যের ন্যায় আওয়াজ বাহির করিতে হইলে তাহা নিশ্চয়ই ফাঁসিয়া যাইবে।

পল্লীসমাজ।

পল্লীসমাজই আমাদের প্রকৃত সমাজ। নগর সমাজে কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকায় তাহাকে সমাজ বলিয়া মনে না করাই উচিত। পূর্ব্বে নগরে কোনই সমাজ ছিল না। সমাজ বলিতেই পল্লীসমাজ বুঝাইত। এক্ষণে কিন্তু পল্লী সমাজ ভাঙ্গিয়া নগরসমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, কাজেই শৃঙ্খলা অপেক্ষা বিশৃঙ্খলারই রাজ্য বাড়িতেছে। সেকালে পল্লীসমাজের নেতৃগণ সমাজকে চালিত করিতেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইত; কাজেই সমাজে শৃঙ্খলা দেখা যাইত। এক্ষণে নেতার অভাব ও শৃঙ্খলারও অভাব। দলাদলি রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষিতে পল্লীসমাজ সর্ব্বদাই টলমল। একান্নবর্ত্তী পরিবার নামে যে একটি আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন পল্লীসমাজে দেখা যাইত, এক্ষণে তাহার অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক্ষণে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় শাশুড়ী বধূতে এক একটি ভিন্ন পরিবার। নগরসমাজের ন্যায় পল্লীসমাজেও এক্ষণে কেহ কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করে না, আবার যাহারা নেতা বলিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহারাও স্বার্থের দাস। তখনকার নেতৃগণ স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থকেই প্রিয় মনে করিতেন। আবার অনেকে একেবারে পল্লীগ্রামের সংস্রব ত্যাগ করিয়া নগরে বাস করায়, পল্লীসমাজে সন্নেতারও অভাব ঘটিয়াছে, ফলতঃ এক্ষণে পল্লী সমাজে শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অভাব। ইহার নিজ দোষের সহিত নগরের বিলাসিতা প্রভৃতি দোষও ইহাতে সংক্রামিত হইতেছে। ক্রমে ইহাকে এরূপ জীর্ণ করিয়া তুলিতেছে যে, অচিরে ইহা ধ্বংসের পথে উপনীত হইবে। আমাদের যদি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগ্রেই পল্লীসমাজের সংস্কার করিতে হইবে। কারণ, তাহাই প্রকৃত সমাজ. যাঁহারা দেশের হিতসাধনে ইচ্ছুক, তাঁহারা কি একবার পল্লীসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না?

কালিকাতত্ত্ব।

৩য় স্তম্ভ।

গত বৈশাখ মাসে কালিকা তত্ত্বের আলোচনায় তাহার মূলভিত্তিস্বরূপ অদিতি দেবতার কথা উত্থাপিত হইয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে কঠশাখার উপদেশটী মাত্র দেখাইয়াছিলাম। এবার সে বিষয়ে বৃহদারণ্যকের আদেশ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত আছি। অতএব তজ্জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাইতেছে,—

বৃহদারণ্যক, কঠোপনিষদ হইতে একটু অন্য সাচে ঢালিয়া অদিতি দেবতাতত্ত্বপ্রকাশ করিয়াছেন এবং একটী বৃহদায়োজন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। শেষেও অনেক দূর পর্য্যন্ত নানাবিধ অলঙ্কার প্রতিকার দ্বারা সেই অদিতি দেবতার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু তাত্ত্বিকতায় কঠোপনিষদ বা কঠশাখার অদিতি দেবতা হইতে বৃহদারণ্যকের অদিতি দেবতা রেখামাত্র অতিক্রম করেন নাই।

বৃহদারণ্যক জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীকে মৃত্যু সংজ্ঞা দান করিয়া সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা কেন করিলেন তদ্বিষয় যথাসময়ে আলোচিত হইবে। এই মৃত্যু প্রকরণের শেষাংশেই অদিতি নাম করণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুত্বের উপসংহার করিয়াছেন। প্রথমে সেই বাক্য কয়েকটী শ্রবণ করুন।

"নৈবেহ কিঞ্চিনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদ মাবৃতমাসীৎ, অশনায়য়া, অশনায়াহি মৃত্যুঃ, তন্মনোঽ কুরুত আত্মন্বীস্যামিতি। সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্যার্চ্চত আলোঽ জায়স্তার্চ্চতে বৈ মেকমভূদিতি, তদেবার্কস্যার্কত্বং কংহবা অস্মৈ ভবতি যএব মেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ॥ ১

আপো বা অর্কস্তস্তদ্‌যপাং শর আসীৎ তৎসমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যাম্ শ্রাম্য ওস্যে শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরাসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ॥ ২

স এব ত্রেধাত্মানং ব্যাকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং সএব প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্যপ্রাচীদিক্ শয়োঽসৌচাসৌবের্ম্মৌ। অচাস্য প্রতীচীদিক্ পুচ্ছম

সৌচাসৌ চ সক্থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচীব পার্শ্বে স্তৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদর মিয়মুরঃ সএষোহপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্রক্বচৈতিতদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্॥ ২

সোহকাময়ত দ্বিতীয়োম আত্মজায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুঃ তস্য যদ্রেত আসীত্তৎ সম্বৎসরোহভবৎ। নহ পুরাততঃ সম্বৎসর আস। তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সম্বৎসরস্তদেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদস্বজত। তংজাতমভিব্যাদদাৎ সভান মকরোৎ সৈববাগভবৎ॥ ৪

সঐক্ষত যদিবাই মমভিমংস্তে কনীয়োহন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চর্ব্বো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজা পশূন্। স যদ্যদেবাসৃজত্তদত্তুমধ্রিয়ত। সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতে রদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তাভবতিসর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এব মেত দদিতে রদিতিত্বং বেদ॥ ৫॥"
বৃহদারণ্যক॥

এই শ্রুতি কয়েকটীর জগদ্‌গুরু কৃত ভাষ্য অতি বৃহৎ। এই জন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ধৃত করা হইল না। নিতান্ত আবশ্যক ২।১টী অংশই উচিত উচিত স্থানে প্রদর্শিত হইবে। তবে সাকল্যে আমরা ভাষ্যেরই ভাবার্থ প্রকাশ করিব। তাহা এই,—

পূর্ব্ব সৃষ্টির অবসানে যখন মহাপ্রলয় হইয়াছিল তখন এই জগতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভব গোচর হইতেছে ইহার কিছুই ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া জগতের একবারে শূন্যাবস্থা হইয়াছিল ইহা বুঝিতে হইবে না। ইহা ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণাবস্থায় লীন হইয়াছিল। সেই কারণাবস্থাটীর একটু আভাস ধরিবার জন্য কেবল একটী সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে অশনায়া যাহার অপর নাম বাসনা। আমরা প্রত্যহ প্রগাঢ় সুষুপ্তি কালে যে অবস্থায় উপনীত হই তাহাই বিশুদ্ধ বাসনার অবস্থা। উহা, জাগ্রৎ স্বপ্ন কালীন আমাদের ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ও শরীরে যত প্রকার ক্রিয়ার তরঙ্গমালা উঠাপড়া করে, তৎসমস্তের অতি সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহের সামান্যাবস্থা। দর্শন, স্পর্শনাদি কালীন আমাদের আন্তর রাজ্যে যে পৃথক পৃথক তরঙ্গ উদ্ভূত হয় তাহারা প্রত্যেকেই সংস্কারাবস্থায় লুকাইয়া থাকে। অপর একটী তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া ফেলে। এই অবস্থাই আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়ার সংস্কারাবস্থা ইহা বেশী আড়ম্বর করিয়া

বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সংস্কারাবস্থায় দুইটী দশা অনুমিত হয়; একটী বিশেষ দশা, অপরটী অবিশেষ দশা বা সামান্যাবস্থা। যে সংস্কার একটীমাত্র তরঙ্গের সূক্ষ্মাবস্থাকালে করিয়া নিদ্রিতভাবে থাকে আবার অবকাশ ও সুযোগ-মতে সেই একটী তরঙ্গকেই নিজ কুক্ষি হইতে প্রসারিত করে সেই সংস্কার সেই তরঙ্গ দ্বারায় বিশেষিত হইয়া থাকে। যেমন রামদাসকে দেখিলে তাহার একটী সংস্কার, শ্যামদাসকে দেখিলে তাহার একটী সংস্কার, মৃদঙ্গের বাদ্য শুনিলে তাহার একটী সংস্কার, ভেরীর বাদ্য শুনিলে তাহার একটী সংস্কার ইত্যাদি। এই সকল সংস্কার প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন এবং অপরিসংখ্যেয় ভাবে প্রত্যেক জীবের অন্তরে নিহিত আছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শ্রবণাদি কালে আমাদের অন্তরে যে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ ফুটে তাহাদের যে তরঙ্গটীর মৃতাবস্থা কোলে করিয়া যে সংস্কার সুপ্তভাবে থাকে, সুযোগকালে সেই সংস্কার হইতে আবার সেই মৃত তরঙ্গটীই উজ্জীবিত হইয়া উঠে। এইটুকুই এই সংস্কারের বিশেষত্ব। এইরূপ অবস্থাপন্ন সংস্কারকে ব্যষ্টি সংস্কারও বলা যাইতে পারে; আর ইহাকে ব্যষ্টি বা বিশিষ্ট বাসনাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ বাসনা বা বিশেষ সংস্কারের অস্তিত্ব একটা সুবৃহৎ অবি-শেষ ভাবের অস্তিত্বসাপেক্ষ। সংস্কারেরর যে অবস্থাতে—উল্লিখিত কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে না, এমত একটী নির্ব্বিশেষ অবস্থার অপেক্ষা করে। অবিশেষ অবস্থাই বিশেষ অবস্থার উপাদান স্বরূপ। অবিশেষ অবস্থা না থাকিলে কোন কিছুরই বিশেষ অবস্থা ফুটিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ অবিশেষ অবস্থাকে সামান্যাবস্থা বলে। বর্ণিত সংস্কারেরও তাদৃশ অবিশেষ অবস্থাই তাহাদের সামান্যাবস্থা। সামান্য ধর্ম্ম তাড়িৎসমুদ্র হইতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বিশিষ্ট সংস্কার হইতে বিশিষ্ট তাড়িৎ শক্তির আবির্ভাব হয় এহ স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। যাবৎ সংস্কারের সামান্যরূপ সমুদ্র হইতে সুযোগ মতে বিশিষ্ট সংস্কার গুলি ফুটিয়া উঠে। আবার ক্রিয়ার পরে সেই সামান্যাবস্থায় উহারা লুকাইয়া থাকে। ঈদৃশ সংস্কা-রের নামও বাসনা এবং ইহাকে বিশেষ বাসনা বা এক ভাবে সমষ্টি বাসনাও বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বাসনা বা সংস্কার গুলি সামান্যাবস্থার মধ্যে লুকাইয়া থাকে অথবা—বাক্যান্তরে সামান্যাবস্থায়

উপনীত হয় ইহাও বলা চলে। এই উভয় প্রকার বাসনাই কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা দ্বারা ধরিতে পারা যায় না, কোনরূপ বিশেষণেও রক্ষিত করার ক্ষমতা নাই, কেবল পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পরিস্ফূর্ত্তি এবং নিজের প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারায় ইহার অনুমান করা হয়। প্রগাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা কি ভাবে থাকি, জাগ্রৎকালে তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না; কিন্তু তখনও আমি ছিলাম এইরূপ পরিস্ফুট সাক্ষ্য অন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রত্যভিজ্ঞাই আমাদের তাদৃশ সুষুপ্তিকালে সংস্কারাবস্থায় বিদ্যমানতার একতর প্রমাণ; আর দ্বিতীয় প্রমাণ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার স্ফূর্ত্তি। আমাদের দৈহিক মানসিক যাবৎপ্রকার ক্রিয়া সংস্কারাবস্থায় ছিল বলিয়াই আবার যথাকালে সেই সকল সংস্কার হইতে সেই সকল ক্রিয়ার তরঙ্গাবলী ফুটিয়া উঠিয়া জাগরণকালের যাবৎ ঘটনা সম্পন্ন করে। কিন্তু ইহার একবারে শূন্যাকার হইলে সুষুপ্তির পর আর কাহারও জাগরণের আশা ছিল না। শূন্য হইতে কখন কোন শক্তি বা বল বা কোন কিছুর প্রকাশ হইতে পারে না; কিন্তু সামান্যাবস্থা হইতে বিশেষ অবস্থার প্রাদুর্ভাব হয়। কাজেই সুষুপ্তিকালে আমাদের সর্ব্বশক্তি সেইরূপ একটা সংস্কারাবস্থায় ছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যে বর্ণিত ব্যষ্টি-সংস্কার বা ব্যষ্টিবাসনাই জীবের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ জীববাসনা বা জীব-সংস্কার নামে কথিত হয়। আর সামান্যাবস্থার নাম ঈশ্বরসংস্কার বা ঈশ্বর-বাসনা। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীববাসনাগুলি ঈশ্বরবাসনায় লুক্কায়িত ছিল। ইহাই তাৎকালিক অবস্থা।

জগৎ নামে যে পদার্থটা এই দশদিকে দেখিতেছ, ইহা কেবল কতকগুলি শক্তির তরঙ্গের লীলা-খেলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্থাবরজঙ্গমবিশিষ্ট এই জগৎ-নামধারী যাবৎপ্রকার শক্তি যেখানে মহাসুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহাই যাবৎ শক্তির সামান্যাবস্থা বা সূক্ষ্ম সংস্কার বা বিরাট্ বাসনাবস্থা নামে কথিত হইয়া থাকে। আমরা প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সেই বাসনাময় হইয়া যাই বলিয়া তখন আমাদিগকে বাসনা দ্বারায় আবৃত বলা যাইতে পারে। নদনদী সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেলে যে ভাবে তাহাদিগকে সমুদ্রে আবৃত বলা যায়, এই আবরণেরও সেই রূপই অর্থ। এ ভাবেই এই স্থাবরজঙ্গমাদিবিশিষ্ট অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎ সেই মহাপ্রলয়কালে মহাসুষুপ্তি অবস্থার আদর্শ-

বিশিষ্ট-বাসনা সমুদ্রে সমাবৃত হইয়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছিল কিন্তু, একবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল না। পরে সেই অবস্থা হইতে ব্যষ্টি সংস্কারগুলি, ফুটিয়া যথাক্রমে এই বিশ্বরাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। পরমেশ্বর তখন যাবৎ জগতের বাসনা কোলে করিয়া বাসনার সঙ্গে মিশিয়া অভিন্নভাবে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। এইজন্য সেই বাসনারূপ বিশেষণের কোন কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে সংজ্ঞিত করা গিয়া থাকে। এই বাসনার একটী নাম দেওয়া যায় মৃত্যু। তাহার কারণ জীবগণ যখন মৃত হয় তখন তাহাদিগের মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যাহা কিছু আছে সকলেরই নিষ্ক্রিয় ভাব হইলে তাহারা অতি সূক্ষ্ম শক্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া বাসনাসামান্যের গর্ভে অদৃশ্য হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে বাসনাই সমস্ত জীবগণকে যেন কবলিত করিয়া সংহার করিয়া ফেলেন এরূপ বলা যাইতে পারে। সে কারণে বাসনাকে মৃত্যুসংজ্ঞায় অভিহিত করা উচিত। সেই বাসনাসামান্য ঐশিক শক্তিরই নামান্তর মাত্র। জগতের সৃষ্টিশক্তি, পালনশক্তি, সংহারশক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই বাসনাসামান্যের এক এক তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই বাসনাসামান্যই ঈশ্বরের শক্তি এবং তাহাই তাঁহার শরীর। অতএব সেই চিন্মূর্ত্তি পরমেশ্বরকেও মৃত্যুসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। প্রতি পলে পলে অসংখ্য জীবগণ হা হতোহস্মি করিতে করিতে সেই সর্ব্বতোমুখ মৃত্যুরূপ পরমেশ্বরের মহাগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার কুক্ষিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আবার সেই কুক্ষি হইতেই বমনের ন্যায় উদ্গীর্ণ হইয়া জীবভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নানা যোনিতে নানাকারে আবির্ভূত হইতেছে। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। তিনি মহাগ্রাস, মহামুখ এবং ভয়ের ভয় এবং ভীষণের ভীষণ। এ কারণে তিনি মৃত্যুনামে খ্যাত হইয়াছেন। মহাপ্রলয়-কালে অনন্ত কোটী স্থাবর জঙ্গমপ্রাণিবিশিষ্ট অনন্তব্রহ্মাণ্ডময় জগৎ আবি-র্ভাবের ব্যুৎক্রমে অতি সূক্ষ্ম সংস্কারাবস্থায় পরিণত হওয়ার পর সেই বাসনা-সামান্যময় সমুদ্রের দ্বারা কবলিত হইয়া তাঁহাতেই আবৃতভাবে ছিল। তখন জগতের আর কিছুই ছিল না, একমাত্র বাসনাসামান্যশরীরবিশিষ্ট পরমে-শ্বরমাত্রই ছিলেন। বাক্যান্তরে ইহাও বলা যায় যে কেবল সেই মৃত্যুমাত্রই ছিলেন। এই মৃত্যুদেব আপনার বাসনাসামান্যময়শরীর হইতে যখন জগৎ-

প্রকাশের উন্মুখ অবস্থায় উপনীত হন তখনও ইঁহার মৃত্যুনামের অপলাপ হয় না। জগতের সৃষ্টি হইয়া গেলেও তিনি সেই নামেই বিরাজমান। কারণ তাঁহার মৃত্যুর ক্রিয়ার কোন সময়েই ত্রুটী বা অন্যথা হয় না। তথাপি ক্রিয়ান্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবস্থাভেদে তিনি অন্যান্য নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন। এই ভাবে সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থা হইলে তাঁহাকে প্রাণদেবতা, বুদ্ধ্যাত্মা, প্রজ্ঞানঘন, প্রাজ্ঞ এবং আনন্দময় ইত্যাদি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হয়। আবার এই অবস্থা হিরণ্যগর্ভেরই পূর্ব্বরূপ বলিয়া জগদ্‌গুরু ইহাঁকে হিরণ্যগর্ভ নামেও সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

"বুদ্ধ্যাত্মনোঽশনায়া ধর্ম্মইতি স এষ বুদ্ধ্যবস্থো হিরণ্যগর্ভো মৃত্যুরিত্যুচ্যতে। তেন মৃত্যুনেদং কার্য্যমাবৃতমাসীৎ। যথা পিণ্ডাবস্থয়া মৃদা ঘটাদয় আবৃতাঃ স্যুরিতি তদ্বৎ।"

ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে অশনায়া কথাটীর ভোজনবাসনা এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমাদের প্রকাশিত অর্থের অনৈক্য মনে করিলে পাঠকের ভ্রম হইবে। কারণ ভোজনবাসনার অর্থ ভাঙ্গিয়া বুঝিতে গেলে আমাদের অর্থই প্রকাশিত হয়। ইহা লইয়া আর বিস্তার করিব না। "নৈবেহ" ইত্যাদি হইতে "অশনায়া হি মৃত্যুঃ" ইত্যন্ত বাক্যটীর ভাবার্থ এই পর্য্যন্তই রহিল। অতঃপর "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদি বাক্যের ভাবার্থে মনোযোগ করুন,—

বার্ণত মৃত্যু বা প্রাণদেবতা সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে সেই বাসনা-সামান্য হইতে পূর্ব্বসৃষ্টির সংস্কার ফুটিয়া উঠিল। তখন পূর্ব্বসৃষ্টিতে যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই তাঁহার অনন্ত স্মৃতিজ্ঞানের বক্ষে যথাবৎ ফুটিয়া উঠিল। তখন প্রভুর সুষুপ্তি বা মহানিদ্রা ভাঙ্গিয়া যেন স্বপ্নবৎ অবস্থার উদয় হইল। এখন তাঁহার মনের অবস্থার পরিস্ফূর্ত্তি হইল ইহা বলা যায়। তৎপরে তাঁহার সেই-রূপ শরীর হইতে অহং ভাবাদির আবির্ভাবের পর যথাক্রমে আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের প্রকাশ হইল। এই সময়ে সেই ভূতগণ অসংহত ভাবে অর্থাৎ তরলাকার বা বাষ্পাকার অনন্ত সমুদ্ররূপে অবস্থিতি করি-তেছিল। তখন সেই মৃত্যু হইতেই আবির্ভূত বিরাট্-নামক পুরুষ তাঁহার গর্ভ মধ্যে থাকিয়া তাঁহার এক বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মানুষদিগের বহু কোটি বৎসর

পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে সেই তরলাকার সমুদ্র হইতে বহু প্রকারের পদার্থরাশি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কতকগুলি সংহত এবং কতকগুলি অসংহত ভাবে পৃথক পৃথক হইয়া গেল। যেগুলি সংহত ভাবাপন্ন হইল সেগুলি ভূগোল খগোল নামে খ্যাত। আর অসংহত গুলি জল, বায়ু এবং তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ। এই বিরাট্‌ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্রই সেই মৃত্যুদেব ইহাঁকে পুনর্ব্বার উদরসাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন এখন এই জগদ্রূপী বিরাটের নবাভিজাত অবস্থা। এখন তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে পর্য্যাপ্ত আহার হইবে না। ইহা হইতে অসংখ্য প্রজার সৃষ্টি হইয়া পড়িবে ; তখন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যথোচিত আহার হইবে। এই ভাবিয়া দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গাদি অসংখ্যপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রুধির পান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আবার প্রসব, আবার সৃষ্টি। এইরূপ জন্মমরণপ্রবাহময় সংসার চলিতে লাগিল। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, প্রাণিগণকে সৃষ্ট করিয়া তৎক্ষণাৎ একবারে পূর্ণমাত্রায় আত্মসাৎ না করিয়া তিনি যে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত রাখেন, ইহা তাঁহার অদনেরই—আহারেরই পর্য্যাপ্তির নিমিত্ত। উৎপত্তিমাত্রে অদন করিলে তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। এই মৃত্যুদেবতা সর্ব্বদা এই অনন্ত জগৎকে এই ভাবে অদন করিতেছেন বলিয়াই ইহাঁর নাম অদিতি। এইরূপ অদন করাই আদিতির অদিতিত্ব। এই ভাবে সেই মৃত্যুদেবতারূপ পরমেশ্বরই অদিতি নামে অভিহিত হন। ইহাই বৃহদারণ্যকের অদিতি কথার অর্থ। ইহার অন্যান্য বিষয় পরে বলা যাইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

রামকৃষ্ণ।

(আজি) বিশ্ব তোমার চরণে লুটিছে
ধন্য তুমি হে দেবতা।
(তোমার) প্রেমের প্লাবনে, সকল ভুবনে
ছড়ায়ে পড়েছে মমতা ॥
তোমার নামের বিজয়-কেতন
উড়িছে ঊর্দ্ধে পরশি গগন
তার তলে আজ, বিশ্ব-সমাজ
করিছে পুণ্য-জনতা ॥
সকল বিশ্বে সাড়া পড়ে গেছে
হৃদয় বিকাতে তাইতো এসেছে
তোমার চরণে,—দয়াময় জ্ঞানে—
শুনিয়া অমিয়-বারতা ॥
কোটী কণ্ঠে মহিমা তোমার
দেশে দেশে আজ করিছে প্রচার
তব উপদেশ, শিখায় জগতে—
সাম্য, প্রেম, একতা ॥

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কবিকথা।

(ভবভূতি)

মহাবীর-চরিত।

(৭)

অলকা ও লঙ্কা দুই ভগিনী, একজন কুবেরকে আর একজন রাবণকে আশ্রয় করেন। রাক্ষসকুলনিধনের পর লঙ্কা রাবণকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাবণের ত্রৈলোক্যবীরলক্ষ্মীর আকর্ষণ, রাক্ষসলোক-প্রতিপালন, পশুপতিচরণে ছিন্নমুখপুণ্ডরীকসমর্পণ, বন্ধুজনে বাৎসল্যপ্রদর্শন প্রভৃতি যতই মনে হইতে লাগিল, ততই লঙ্কার হৃদয় মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতির স্মরণেও তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। এদিকে চিত্ররথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিভীষণের রাজ্যাভিষেক দর্শনের ও রামচন্দ্রের সেবার জন্য বিমানরাজ পুষ্পককে উপদেশ-প্রদানে অলকাপতি-অলকাকে লঙ্কায় পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ ও রাক্ষসগণের ধ্বংসের এবং একমাত্র বিভীষণের জীবিত থাকার কথা চিন্তা করিতে করিতে অলকা লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, পতিবিরহশোকবিধুরা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী লঙ্কা একাকিনী ক্রন্দন করিতেছেন। অলকা তখন তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লঙ্কা বলিয়া উঠিলেন যে, কিরূপেই বা আশ্বস্ত হই, আমার এক্ষণে যুবতীজনমাত্রই অবশেষ। একমাত্র কুলতন্তু বিভীষণ জীবিত আছে শুনিতেছি, কিন্তু সেও শত্রু সেবায় রত। শুনিয়া অলকা কহিলেন যে, ভগিনী ওকথা বলিও না, রামচন্দ্র আমাদের শত্রু নহেন, তিনি যাঁহার শত্রু ছিলেন তিনি ত আর ইহ জগতে নাই। তখন লঙ্কা অলকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের স্বামীর এরূপ পরিণাম ঘটিল কেন? অলকা বলিতে লাগিলেন যে, অনুজসহায় রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনে দণ্ডকারণ্যে আগমন করিলে, রক্ষোনাথ সীতাহরণ করায় তাহারই পরিণামফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। তাহার পর তিনি কুবেরের আদেশে আপনার উপস্থিতির কথা বলিলে, লঙ্কা

পশুপতিমিত্র ধনেশকেও রামভদ্রের সেবায় ব্যগ্র জানিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। অলকা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্রই পরমার্থদর্শিগণের তত্ত্ব, ইনিই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তিনি সাধুদিগের ত্রাণের জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ এ সব কথা জানিতেন কিনা লঙ্কা জিজ্ঞাসা করিলে, অলকা উত্তর দিলেন যে, শাপপ্রভাবে তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

রাবণগৃহে বাস করায় সীতার বিশুদ্ধির সন্দেহে তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। যিনি পতিব্রতাজ্যোতিঃস্বরূপিণী লোকাচারের অনুরোধে তাঁহাকেও আবার অন্য জ্যোতির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইল! অনল হইতে তাঁহার অক্ষত শরীরে বহির্গমনের পর বসু, আদিত্য ও রুদ্রগণ সহ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, সেই সাধ্বীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন, এবং রামচন্দ্রকে তাঁহার স্থিতিস্বরূপিণী সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ত্রিভুবনবাসিগণকেও সে কথা জানাইয়া দিলেন। চারিদিকে সুমঙ্গল তূর্য্যরব ও গীতধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। অপ্সরা ও দিব্যর্ষিগণ সীতাদেবীর বিশুদ্ধি অনুমোদনের জন্য তথায় অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পর রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণের রাজ্যাভি-ষেক সম্পন্ন হইল। নবলঙ্কেশ্বর প্রভুর আজ্ঞায় বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের সমস্ত আদেশ পালন করিয়া বিভীষণ পুষ্পকরথ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অলকা ও লঙ্কা তখন সেই স্বাভাবিক মহিমায় মণ্ডিত মহাচরিত মহানুভব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।

পুষ্পকরথকে অগ্রে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিতে আসিতে বিভীষণ বলিতেছিলেন, রামচন্দ্রের সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত হইয়াছে। মাতলির সৎকারের পর সুরনারীগণকেও মুক্ত করিয়া দিয়াছি। এতদিন অবিরত অশ্রু-ধারায় যাহাদের গণ্ডস্থল রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যাহারা কনককঙ্কণ-ত্যাগ ও একবেণী ধারণ করিয়া মলিন বসনে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিতা হইতেছিল, সেই বন্দী অমর রমণীগণ মুক্তিলাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে গমন করিতেছে। তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন যে, দেব, আপনার সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত

হইয়াছে। যে কারাগার বন্দিগণে পরিপূর্ণ ছিল, একণে তাহা স্বর্ণশৃঙ্খল ও সুদর্শন পতাকায় অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সেই বিমানরাজ পুষ্পক, ইহার গতি অবাধ, প্রবৃত্তি অভিলাষানুযায়ী, বশ্যতা অতুলনীয়, তাই মনোরথানুসারে সর্ব্বদাই ইহার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিয়োগমত বিভীষণ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন জানিয়া রামচন্দ্র আনন্দসহকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আর কি অবশিষ্ট আছে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বলিতে লাগিলেন যে, বলদৃপ্ত ভুজদণ্ডে পূজিতমহিমা ত্রিভুবনকণ্টক উন্মূলিত, দেবীর অবমাননা প্রশমিত বিভীষণের অভিষেক সুসম্পন্ন ও আপনার প্রতিজ্ঞাও প্রতিপালিত হইয়াছে। দ্রোণপর্ব্বত আহরণকালে হনুমানের নিকট সবিশেষ সংবাদ অবগত হইয়া কুমার ভরত বিষণ্ণ অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন, এক্ষণ তাঁহার নিকট হনুমানকেই দুতস্বরূপে পাঠাইয়া দিন, এবং নিজে পুষ্পক বিমান অলঙ্কৃত করুন, "প্রিয় বয়স্যের যাহা অভিরুচি তাহাই হউক" বলিয়া রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিলেন। সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এদিকে হনুমান তাঁহাদের গমনবার্ত্তা লইয়া ভরতের নিকট অগ্রসর হইলেন।

বিমানরাজ পুষ্পক অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই দিনই চতুর্দ্দশ বৎসরের অবসান ঘটিল, সীতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া চুপে চুপে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা এক্ষণে কোথায় যাইতেছি? লক্ষ্মণ তাঁহাকে অযোধ্যাগমনের কথা বলিলেন, সীতা পুনর্ব্বার বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ সেই দিবসকেই শেষ দিন বলিয়া জানাইলেন। উপরে উঠিয়া পুষ্পকরথ ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, সকলে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ ও নিম্নে অসীম নীলসাগর মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সকলে বিস্ময় সহকারে তাহাই দেখিতেছিলেন। দক্ষিণে নীলসমুদ্রের সীমা দেখিতে না পাইয়া ও দূর হইতে তাহাকে বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ড মনে করিয়া সীতা রামচন্দ্রকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, দেবি উহা ভূমিখণ্ড নহে, অষ্টমূর্ত্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জলরূপা প্রথমা মূর্ত্তি, লোকে ইহাকে সাগর বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকে, উহার মহিমাও অখণ্ডনীয়। শুনিয়া সীতা বলিলেন যে, বৃদ্ধ-

গণের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের জ্যেষ্ঠশ্বশুরগণই নাকি ইহাঁর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সমুদ্রবক্ষস্থিত রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ সীতার নয়নগোচর হওয়ায়, তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অভিনব তৃণসমাচ্ছন্ন ভূমিতে ধবলাংশুকের ন্যায় ও কি দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মণ তখন বলিতে লাগিলেন, "আর্য্যের শাসন মস্তকে ধারণ করিয়া কুতূহলী বানরনায়কগণ উৎসাহসহকারে দিগন্তস্থিত পর্ব্বতসমূহের শিখর সকল আনয়ন করিয়া যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল, প্রলয়পর্য্যন্তপ্রথ্যাতমহিমা লোকের অবস্থিতিস্বরূপ আর্য্যচরিতের কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহাই সমুদ্রবক্ষে লক্ষিত হইতেছে।

ক্রমে পরিচিত স্থানসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন যে, মিলিত তমাল বৃক্ষের ছায়ায় অন্ধকারিত শীতল নিকুঞ্জপুঞ্জে পূর্ণ, মলয়াচলের তুঙ্গশৃঙ্গাগ্র হইতে নিপতিত নির্ঝরিণীনিচয়ের প্রসারিত জলধারায় সিক্ত ভূমিসকল চিনিতে পারিতেছ কি? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন যে, আর্য্য তাহাই বটে, ইহাদের নিকটে সেই জীর্ণ কন্দরটিও দেখা যাইতেছে। দিক্‌সকল গর্জ্জনে জর্জ্জরিত, বজ্রনির্ঘোষে ব্যোমতল বধির, প্রচণ্ডবায়ুবেগে মুহুর্মুহু মেঘরাশি সঞ্চালিত, বৃক্ষসকলের ঘোরান্ধকারে চক্ষু অন্ধীকৃত হইতে থাকায়, মেঘবর্ষণে দারুচিনিগন্ধে লক্ষ্যীকৃত এই কন্দরেই আমরা রজনী যাপন করিয়াছিলাম। শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, হায় কি প্রমাদ! এই মন্দভাগিনীর দুরদৃষ্টক্রমে এই মহানুভবদিগের এরূপ অবস্থাও ঘটিয়াছিল।

তাহার পর আবার কাবেরীতীরভূমি দৃষ্টিপথে পড়িলে, বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তথায় প্রান্তস্থিত গিরিনিতম্বে তাম্বূলীলতার মাধ্বীকধারা উদ্গিরণে প্রফুল্লপুগবনে ঘনীকৃততল পুরাতন বনস্পতিসমূহে সমাচ্ছন্ন বিবিধ আশ্রমপদ লক্ষিত হইতেছিল। সেই সমস্ত আশ্রমে স্থিরতপঃস্বাধ্যায়ে সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম কল্পান্তসাক্ষী মুনিগণ বাস করিতেছিলেন বলিয়া বিভীষণ জানাইলেন। তাহারই নিকটে দক্ষিণ দিকে লোপামুদ্রার পরিষ্কৃত অগস্ত্যাশ্রমও দেখা যাইতেছিল। বিভীষণ রামচন্দ্রকে তাহার কথা বলিলে, রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন যে, আমরা কি অগস্ত্যাশ্রম অতিক্রম করিয়াছি? যাঁহার প্রভাবে সমুদ্র মরুস্থলে পরিণত হইয়াছিল, বিন্ধ্য আপনার বৃদ্ধিগর্ব্ব খর্ব্ব

করিয়াছিল, যাঁহার কুক্ষিস্থিত অনলে বাতাপির দেহ জীর্ণ হইয়া যায়, সেই অচিন্ত্যপ্রভাব মুনি কাহারও বাক্যের বিষয় নহেন। সুতরাং অমিতবিভব বিশ্বান্তরাত্মসাক্ষী এই সকল মহাত্মাদিগকে কিরূপে বন্দনা করা যায়? সেই সময়ে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল, "তুমি অনুজের সহিত প্রজাগণকে পালন করিতে থাক, তোমার যশ কল্পান্তস্থায়ী হউক, আর যাহারা রামনাম উচ্চারণ করিবে, তাহারা মোক্ষ লাভ করুক"। মহামুনির স্তুতি-পাঠক আমি এই অশরীরী বাণীতে অনুগৃহীত হইলাম বলিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন। অন্য সকলেও সেই মহামুনিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

বিভীষণ আবার পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, দেব রামভদ্র! এই সেই পম্পাপ্রান্তবর্ত্তী ভূমিসকল। বহুকাল পরিচয়ের জন্য বলপূর্ব্বক ইহারা যেন চক্ষু দুইটিকে আকর্ষণ করিতেছে। সম্মুখে একবাণে বিদ্ধ জীর্ণ তালখণ্ড দেখা যাইতেছে। এইখানে বীর্য্যবান্ বালী বাণনিকরে অল্পক্ষণ মধ্যে নিহত হওয়ায় ক্রীড়াকপিতুল্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্থি-পর্ব্বতও এইখানেই পদাঘাতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইখানেই হনুমানের নিকট দেবীর উত্তরীয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিয়া উঠিলেন যে, আর্য্যপুত্র কি হনুমানের হস্তে আমার উত্তরীয় দেখিয়াছিলেন। আবেগভরে তখন রামচন্দ্রও সীতাকে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, আমরা ব্যাকুল ভাবে বিচরণ করিতে করিতে, তোমার অঙ্গচ্যুত অনসূয়ানামাঙ্কিত উত্তরীয়খানি প্রথম অভিজ্ঞানস্বরূপে হনুমানের নিকট প্রাপ্ত হই। তাহা দেখিবামাত্র নয়নযুগলে যেন শরদিন্দুকিরণ স্পর্শ করিল, সর্ব্বাঙ্গ কর্পূরপরাগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অন্তঃকরণ যেন অমৃত-ক্ষরণে সিক্ত হইয়া উঠিল।" এ কথায় সীতার মুখে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। তখন আবার লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন যে, এই সেই পিতৃসখ গৃধ্ররাজ এইখানে সেই পাপাত্মার অনুসরণ করিয়া জরাজর্জ্জরিত দেহত্যাগের পর নবযশঃশরীর অবলম্বন করিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার কারণেই এইরূপ মহানুভবের এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইবার সুগ্রীব বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেব, দণ্ডকারণ্যের সীমা অতিক্রম করা হইয়াছে। যেখানে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের প্রতিশোধে আগত

খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত। রাক্ষসের কথা শুনিয়া সীতা আবার কম্পিতা হইয়া উঠিলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, দেবি, ভয় করিও না, এক্ষণে তাহাদের নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে। সিংহগর্জ্জনে হস্তিগণের বিনাশের ন্যায় লক্ষ্মণের ধনুষ্টঙ্কারে রাক্ষসগণের প্রলয় ঘটিয়াছে।

সেই সময়ে পুষ্পক কিছু ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিভীষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেব, সম্মুখে অত্যুচ্চ সহ্যাদ্রি দেখা যাইতেছে, ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিলে আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হওয়া যাইবে। সেই জন্য বিমানরাজ পুষ্পক পৃথিবীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন করিতেছে। লক্ষ্মণ তখন বলিয়া উঠিলেন যে, তাহা হইলে পুরুষোত্তমের পদলাঞ্ছিত প্রদেশগুলি এইবার দেখিতে হইবে। রথ ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিলে, সকলে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক সূর্য্যমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইলে, রামচন্দ্র তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "যিনি আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণের প্রসবিতা, তেজের আধার এবং ত্রিবেদের সারস্বরূপ, পুষ্পকারোহণে তাঁহাকে আমাদের সন্নিহিত দেখিতেছি", তাঁহার পর সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলের চারিদিকে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, দিবসে তারকাচক্রের মত ও কি দেখা যাইতেছে। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, উহা তারকাচক্রই বটে, অতিদূরত্বনিবন্ধন রবিকিরণে প্রতিহত চক্ষু তাহাদিগকে দিনে দেখিতে পায় না। এক্ষণে বিমানারোহণে তাহা গত হইয়াছে। সীতা কৌতুকসহকারে আবার বলিতে লাগিলেন যে, গগনোদ্যানে যেন প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি দেখা যাইতেছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্র তখন কহিলেন যে, জগতের দিগ্‌ভাগ এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, দূরত্বের জন্য পৃথিবীর ভেদাভেদ কিছুই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে না, আবার এই অন্তরীক্ষদেশও সকল দিকেই একরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগ্রীব পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেব ভ্রাতার সৌহার্দ্দিবশে দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করিয়া এ সকল

স্থান আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। এই দেখুন, ঐ দুইটি উদয়াস্ত-গিরি, ইহাদের ক্রোড়ে চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তকাল নির্ভয়ে অতিবাহিত হইয়া থাকে। আর এ দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ঐ যে চন্দন ও কস্তুরী লেপিত পৃথিবীর স্তনযুগলের ন্যায় শ্বেত ও নীল সমুন্নত ও সমবিস্তৃত পর্ব্বত দুইটি দেখা যাইতেছে, উহাদের নাম কৈলাস ও অঞ্জন। আর এটি কাঞ্চনাচল, এবং এই দেখুন গগনস্পর্শি শিরে গন্ধমাদনও শোভা পাইতেছে। তাহার পর ও সকল ভূমি আমাদের অগম্য। বিস্ময়সহকারে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন যে, একেবারে সমস্তই যেন পরিলক্ষিত হইতেছে, স্বর্গস্থিতিও বিভাগ করা যাইতেছে।

এই সময়ে একটি কিন্নরমিথুন তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সীতা তাহাদের বিস্ময়করী আকৃতি দেখিয়া বলিতেছেন যে, এই অদ্ভুত জীবত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ইহারা না মানুষ না পশু। শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন যে, দেবি, ইহারা অশ্বমুখ কিন্নর মিথুন। এই সকল স্থানে প্রায়ই ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিভীষণ বলিলেন যে, ইহারা এই দিকেই আসিতেছে, বোধ হয় অলকেশ্বরের দূত হইবে। কিছু দূর হইতে সেই কিন্নরমিথুন বলিতে লাগিল, "দেব, দিনকরকুলমণি রামভদ্র, অলকেশ্বর কুবেরের আদেশে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য অযোধ্যায় যাইতে যাইতে, এইখানেই আপনার দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহার আদেশপালনে আমাদের বিশেষ-রূপ উপকারই ঘটিল। কারণ সেই পুরাণপুরুষের অভিব্যক্তি ও পর্য্যায়-স্বরূপ মহাতেজের সাক্ষাৎকার ঘটিল।" এই বলিয়া তাহারা রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পরে, কিন্নরটী গাহিয়া উঠিল, "আপন্নবৎসল জগজ্জনের একমাত্র বন্ধুস্থল, জ্ঞানীহংসসমূহের সরো-বরস্বরূপ, রামচন্দ্র, জন্মকর্ম্মবিধুর সুমনা চকোরগণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তোমার যশগান করুক।" কিন্নরীও গাহিতে লাগিল, "যতকাল বাসুকীর শিরে ভূমণ্ডল অবস্থিতি করিবে, যতকাল নভোমণ্ডল, গ্রহগণে বিচিত্রিত হইয়া রহিবে, হে সীতে! ততকাল তোমার পুণ্য-যশোরাশি মহাত্মগণ গান করিতে থাকুন। "ইহাতে রামসীতার চক্ষে

লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। অন্য সকলে তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

তাহার পর রামচন্দ্র পৃথিবীর নিকটস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নবলঙ্কেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "দেব এইত সুরনদীধৌতোপল কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল জীর্ণ ভূর্জবল্কলাচ্ছন্ন হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশসকল দেখা যাইতেছে। এইখানে তত্ত্বালোকে ধ্বস্তমোহান্ধকার, অধ্যাত্মবিদ্যাসেবী ব্রহ্মর্ষিদিগণের নিসর্গমধুর সৌম্য তেজ জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে সিদ্ধাশ্রম তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হইলে, লক্ষ্মণ যেন সেই সকল ভূমি হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তিনি তাহাকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতেও পারেন নাই। রামচন্দ্র তাহা অবগত হইয়া সেস্থানগুলি স্মরণ করিতে করিতে আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন যে, বৎস, এ সকল সেই গুরু কৌশিকপাদের সঞ্চরণে পবিত্রিত তপোবনভূমি। এই খানেই যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য রাজা কুশধ্বজের সহিত আলাপনে আনন্দ অনুভব করিতে করিতে গুরুদেব আমাদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিতেন, এবং আমরাও বাল্যোচিত তারল্য প্রকাশ করিতাম। কুশধ্বজের নাম শুনিয়া সীতাও সস্পৃহনয়নে চারিদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন যে, লঙ্কেশ্বর! গুরুচরণপঙ্কজে পবিত্রিত ভূমিভাগে বিমানারোহণ উচিত নহে বলিয়া আমি মনে করিতেছি। সেই সময় এই শব্দ হইল, "ওহে রামলক্ষ্মণ, ভগবান বিশ্বামিত্র তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে, অযোধ্যাপুরী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বিলম্ব করিও না। অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্টদেব তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমিও মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়া মুহূর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি। "এই কথা শুনিতে শুনিতে রামচন্দ্র বিমানাধিদেবতাকে ইঙ্গিত করিলে, বিমান-রাজ স্থির হইল। তাঁহারা অবহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য বলিয়া, আবার বিমানে অধিষ্ঠিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের স্নেহ প্রকাশে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আহা, মহাত্মারাও বাৎসল্যপরতন্ত্র, তপঃস্বাধ্যায়ের জন্য তাঁহাদের সময় বিভক্ত হইলেও, বাৎসল্যপ্রভাবে তাঁহাদিগকে আগমন করিতে হইতেছে। অথবা এইরূপ

উচিতই বটে, কারণ করুণাবশে তপোবনমৃগ আশ্রমতরু কিংবা মনুষ্যের প্রতি তাঁহারা মৃদুভাবই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজগণের গৃহে জন্মমাত্র, শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞানের মুখ্য সংস্কার এই মহাত্মাদিগের নিকট হইতেই আমরা লাভ করিয়াছি।

সহসা নীহারজালের ন্যায় পার্থিব ধূলিরাশিতে দিক্‌সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বিভীষণ তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সকলে বিস্ময়সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তখন চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, আমার মনে হইতেছে, হনুমানের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ভরত আমাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য সসৈন্যে আসিতেছে। সেই সময়ে হনুমান উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "অন্তরে দেবের অপূর্ব্ব চরিত ধ্যান করিতে করিতে, ভরত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুকাল পরে আপনার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই ঐ দেখুন, সেই জটাবল্কলধারী মহাত্মা অমৃতময় রাম-নাম আস্বাদন করিতে করিতে, হর্ষোদ্‌ভ্রান্ত প্রজাগণের সহিত আগমন করিতে-ছেন। "উল্লাসসহকারে রামচন্দ্র কহিলেন যে, চিরায়ুষ্মানের সৌহার্দ্দ্য লাভ ঘটিল। ইহা আমাদের সকল আনন্দের উপরই বলিতে হইবে। লক্ষ্মণ তখন হনুমানকে ভরত কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, হনুমান তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। সীতা ভরতের নূতন বেশে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। বন্ধুসমাগম দেখিয়া বিভীষণ বিমানরাজকে স্থির হইতে বলিলেন, তখন সকলে পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময়ে কতিপয় প্রধান পুরুষে পরিবৃত হইয়া ভরত-শত্রুঘ্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে তুলিয়া সাদরসম্ভাষণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "প্রফুল্ল পঙ্কজের নালস্পর্শের ন্যায় তোমার রোমহর্ষ স্পর্শ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকারের ন্যায় সুখ অনুভব করিতেছি"। এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। লক্ষ্মণ ভরতের পদতলে নিপতিত হইয়া পরে তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। শত্রুঘ্নও রামলক্ষ্মণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কুলস্থিতির অনুবর্ত্তন কর বলিয়া উপদেশ দিলেন। তাহার পর ভরতশত্রুঘ্ন সীতাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলে,

সীতাও তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অভিমত হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামচন্দ্র ভরতশত্রুঘ্নের নিকট বিভীষণের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, ইহাঁরা আমাদের বিপদসাগরে পোতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে আলিঙ্গন কর। ভরতশত্রুঘ্ন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত অভিনন্দন করিলেন। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, আর্য্য, আমাদের কুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সিংহাসনারোহণের সমস্ত অভিষেক-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। রামচন্দ্র তখন মনে মনে বিশ্বামিত্রের আগমনপ্রতীক্ষা ও বশিষ্ঠদেবের আদেশপ্রতিপালন উভয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বশিষ্ঠের আদেশ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাই জানাইলেন। তখন সকলে মিলিয়া অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অযোধ্যায় রঘুকুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব পত্নী অরুন্ধতী ও রাণীদিগের সহিত রামচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকেরও সমস্ত সামগ্রী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র নিকটবর্ত্তী হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে বলিতেছিলেন, "ক্ষমার সুক্ষেত্র, গুণমণিগণের খনিস্বরূপ, আর্ত্তপ্রাণি-গণের মূর্ত্তিমৎ পুণ্যফল, কৃপারাম রামচন্দ্র বাহ্যতঃ নয়নের দ্বারাই উপাস্য, সেইজন্য আমরা তাঁহার দর্শনলাভে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে লোকযাত্রার অনুবর্ত্তন করা যাক্।" তাহার পর তিনি কৌশল্যা সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া রামলক্ষ্মণের অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমনের কথা বলিলেন। তঁহারাও তাহার কুলগুরুর আশীর্ব্বাদপ্রভাবের ফল বলিয়াই জানাইলেন। কৈকেয়ী বিমর্ষভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারই কারণে রামলক্ষ্মণের বনবাস ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক বিঘোষিত হয়, তজ্জন্য তিনি মনস্তাপ ভোগ করেন। অরুন্ধতী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া শূর্পণখার মন্থরাশরীরে প্রবেশে এই সমস্ত ঘটিয়াছিল বলিয়া জানাইলেন। তখন সকলে রাক্ষসগণ অবলাজনকেও কষ্টপ্রদানে বিরত হয় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে মঙ্গল-সময়ে কোন প্রকার দুঃখ করা উচিত নহে বলিয়া শান্ত হইতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, এখনও রা॰॰সগণের অত্যাচারের কথা কেন?

সেই সময়ে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া উল্লাসসহকারে বলিতে লাগিলেন, "এই সেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইঁহাকে দেখিয়া, চন্দ্রকান্ত মণির পূর্ণ সুধাকরদর্শনের ন্যায় আমার মন যেন গলিয়া পড়িতেছে।" তাহার পর তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া কুলগুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা নীতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিশুদ্ধ দৃষ্টি লাভ কর। রামলক্ষ্মণ অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলে, তিনি অভীষ্ট সিদ্ধ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মাতৃগণকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সীতা বশিষ্ঠচরণে প্রণতা হইলে, তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বীর প্রসবিনী হও, বলিলেন। তাহার পর জানকী অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোপামুদ্রা, অনসূয়া, ও অরুন্ধতী সীতার সহিত মিলিতা হইয়া চারি পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হউন।" সীতা শ্বশ্রূদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা বংশধর পুত্র প্রসব কর বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় শব্দ হইল, "কৃশাশ্বশিষ্য ভগবান্ বিশ্বামিত্র আদেশ করিতেছেন, অদ্য পুরবাসিসকলে গৃহে গৃহে রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হইতে থাকুক, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অভিষেকের সামগ্রীসকল সজ্জিত করুন"। তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন যে, বৎস রামচন্দ্রের ভাগ্যমহিমায় স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বামিত্র সিংহাসনে অভিষেক করিবার জন্য সমাগত হইতেছেন। আর আর সকলেও অত্যন্ত আনন্দিত হইলে, বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণ মধ্যেই শিষ্যের সহিত তথায় আগমন করিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "যজ্ঞবিঘ্নশান্তির জন্য দশরথের হস্ত হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া মনে যাহা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সে সকল সম্পন্ন হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল। অনুকূল দৈববশে তাহা সফল হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি। তাই সমাহৃত দ্রব্যসম্ভারে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি।" বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন যে, এই সেই কৌশিক। যাঁহার ক্ষত্রতেজ স্বাভাবিক ও ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ঠতার পরিচায়ক, সেই লোকোত্তর চমৎকারের নিধিস্বরূপের কোন্ কার্য্যই বা অদ্ভুত নহে? তাহার পর বশিষ্ঠবিশ্বামিত্র উভয়ে পরস্পরে

অভিবাদন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে এখনও প্রতীক্ষার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও বিশ্বামিত্রকে যথোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। তখন বিশ্বামিত্র দিব্যর্ষিগণকে উদ্দেশ করিয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিলে, অভিষেককার্য্য আরম্ভ হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও তথা হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, লোকপালদিগের সহিত দেবরাজ এই অভিষেক-কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন। অভিষেকমঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গেলে, রামচন্দ্র বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন, তাহারা উভয়ে বলিতে লাগিলেন, "গুণারাম, রামভদ্র, ইক্ষাকুবংশীয় মুখ্য ভূপালগণ যে রাজ্যভার ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণে শোভিত হইয়া তাহাই বহন করিতে থাক"। তাহাই হউক বলিয়া সকলে ইহার অনুমোদন করিলেন।

তাহার পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সুগ্রীব, বিভীষণ ও পুষ্পককে বিদায় দিতে বলিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তখন আবার বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন, "বৎস রামভদ্র, গুরুতর গুরুশাসন প্রতিপালিত এবং ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছে, রক্ষোবিনাশে ত্রিলোকের মনোব্যাথা দূরে গমন করিয়াছে, দেবগণ সিদ্ধার্থ হইয়াছেন। অনুজ, সুহৃদ্ ও পত্নীসহ রাজ্যপ্রাপ্তিও ঘটিল। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেয়স্কর কার্য্য আছে, তাহা ব্যক্ত কর।" রামচন্দ্র বলিলেন, "জগতের মঙ্গলকর এখন যাহা অবশিষ্ট আছে, ভগবানের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হউক। অতন্দ্রিত ক্ষিতিপালগণ ভূমণ্ডল পালন করিতে থাকুন। মেঘসকল যথাসময়ে বারিবর্ষণ করুক। রাজ্যসমূহ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ইতিশূন্য হইয়া শস্যশালী হইয়া উঠুক। কবিগণ শ্লোকরচনায় লোকসকলের নিত্যানন্দ বিধান করুন। আর পণ্ডিতগণ পরকৃত প্রবন্ধে সাতিশয় হর্ষলাভ করিতে থাকুন।" বিশ্বামিত্র তাহাই হউক বলিয়া উত্তর দিলেন। তাহার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

অনেক দিন হইতে প্রাণে একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, বদিরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিব। সে ইচ্ছা আমার এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ভগবান এ অধমকে এতদিনে দয়া করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় জলধর বাবুর "হিমালয়" পাঠ করিয়া এবং অন্যান্য লেখক মহোদয়গণের ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া হিমালয় ভ্রমণ করিতে প্রাণে যে একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, ভগবান্ তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। আমার আশা ছিল না যে, আমাদ্বারা এ কার্য্য হইবে। সেই পথকষ্ট, সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে ডবল মাঘ মাসের শীত অনুভব, সেই "চড়াই উৎরাই, অনাহার" অনিদ্রা, অত্যাচার এ দুর্ব্বল শরীরে সহ্য করিতে পারিব বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু সর্ব্বাপদহারী মধুসূদন আমার সকল আপদ্ দূর করিয়া প্রাণে এক অভাবনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই শক্তিতে এমন একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আজ গৌরব অনুভব করিতেছি, জীবন সার্থক জ্ঞান হইতেছে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বকে স্মরণ করিয়া ১৩২০ সালের ২৫এ বৈশাখ রাত্রির গাড়ীতে বহুদিন বাঞ্ছিত ৺ কেদারবদরীদর্শনে যাত্রা করি। পরদিন বেলা ১০ টায় কাটিহার পৌঁছিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কাটিহার খুব বড় ষ্টেশন, অনেক যাত্রীর ভিড়। এখান হইতে কানপুর অবধি একটী লাইন গিয়াছে। যাহারা ছাপরা, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, বালিয়া, গোরখপুর অঞ্চলে যাইবে, তাহারা প্রায়শঃ এই লাইনে যায় এবং সেই জন্য গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় হয়। যাহা হউক, বেলা ৪ টায় অতিকষ্টে একখানা কাশীর তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে যৎসামান্য স্থান সংগ্রহ করা গেল। গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া পরদিন বেলা ২॥ টায় ভাট্নী জংসনে কাশী যাইবার গাড়ী বদল করিতে হইল ও সেই গাড়ীতে চাপিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। একা ভাড়া করিয়া লাক্ষা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখনও অন্ধকার হয় নাই।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাক্তারখানার বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গৈরিকবসনপরিহিত দীর্ঘদেহ একজন সন্ন্যাসী তথায় আসিলেন এবং আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের মত বলিলেন, "বাবা তোমার দুই দিন খাওয়া হয় নাই, যাও, শীঘ্র হাতমুখ ধুইয়া এস, আমি তোমার খাবার যোগাড় করিয়া দিতেছি। তাঁহার কথায় আমি আশ্বাস পাইলাম এবং সেই সন্ধ্যাবেলা কলে বেশ করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়াই দেখি একটী লোক জলখাবার লইয়া দণ্ডায়মান। আমি জলযোগ করিয়া সেই লোকটীর সঙ্গে রান্নাঘরে যাইয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া আসিলাম। পূর্ব্বকথিত সন্ন্যাসীর সহিত রাত্রি প্রায় ১১টা অবধি নানাবিষয়ক গল্প করিয়া সেই ঔষধালয়ের বারান্দাতেই রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন ২৮এ বৈশাখ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আশ্রমে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। যখন প্রথমে এই বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল তখন "প্রবাসী" পত্রিকায় সমস্ত বৃত্তান্ত ও চিত্র দেখিয়াছিলাম। খুবই সুন্দর লাগিয়াছিল, এখন চক্ষে দেখিয়া ধন্য হইলাম। সত্য সত্যই বাড়ীটি দেখিবার জিনষ। দুইটী অংশ, একটী অদ্বৈত আশ্রম। অন্যটী সেবাশ্রম। অদ্বৈত আশ্রমটি অতি সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মন্দিরে উঠিলে প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। সব গম্ভীর, যেন ভক্তির রাজত্ব। মন্দিরের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্ত্তি আছে। পার্শ্বে ভোগশালা এবং অন্য দুই একখানি ঘর। মন্দিরের বারান্দায় সতরঞ্চ বিস্তৃত। বোধ হইল যেন অপবিত্রের লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বরাত্রে আরতি দর্শন করিয়াছি। একটী যুবক ব্রহ্মচারী ধুনা গুগ্‌গুল দ্বারা আরতি করিলেন, পরে সমবয়স্ক ৩টী ব্রহ্মচারী সমস্বরে ভজন আরতি গান করিলেন। যতক্ষণ মন্দিরে ছিলাম প্রাণে এক অপূর্ব্ব শান্তি আনিয়াছিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া একটু এদিক ওদিক ভ্রমণের পর বেনারস সিটি ষ্টেশনে হরিদ্বারের টিকিট ক্রয় করিতে চলিলাম। টিকিট লইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিলাম এবং স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিলাম। অসংখ্য

নর নারী মন্দিরে যাইতেছে, "জয় বিশ্বেশ্বর, জয় মা অন্নপূর্ণা" রবে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে, আমি প্রাণ ভরিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আশ্রমে ডাক্তারখানায় ঔষধ বিতরণের কাজ লাগিয়া গিয়াছে। বাহির হইতে রোগী আসিতেছে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন, একটা যেন বেশ হৈ চৈ কাজ চলিতেছে। ওদিকে পাকশালায় রোগীদিগের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, কাহারও বার্লি, কাহারও সুজি, কাহারও দুগ্ধ ইত্যাদি। আফিস ঘরটী বেশ সাজান। মঠের সন্ন্যাসীদের নানা রকমের ফটো চতুর্দ্দিকে সজ্জিত। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের দুইখানা বড় প্রতিমূর্ত্তি ফুলদ্বারা সজ্জিত দেখিলাম। সমস্ত দেখিয়া বেলা ১০টায় আহারাদি করিয়া আশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় আসিতে এক্কা হইতে কোথায় আমার একটী জামা পড়িয়া গেল আর খোঁজ হইল না। ষ্টেশনে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর পঞ্জাব মেল আসিল। বাবা বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মাঠের মধ্যদিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। ডাক গাড়ী অনেক ক্ষুদ্র ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া, বড় বড় ষ্টেশনে দু এক মিনিটের জন্য থামিতে থামিতে রাত্রি ৩টায় লাকসার জংশনে পৌঁছিল। লাকসারে হরিদ্বারের গাড়ীতে উঠিলাম, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে হরিদ্বার ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। একটু রাত্রি ছিল, ষ্টেশনের মুশাফির খানায় কাটাইয়া প্রত্যুষে হরিদ্বারে প্রবেশ করা গেল। রাস্তায় দু একটা পাণ্ডা বদরিনারায়ণ যাইব কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং আমি কোন পাণ্ডা করিব না বলায়, হতাশভাবে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। আমি কনখলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গেলাম। স্বামী শিবানন্দ স্বামী, তুরীয়ানন্দ এবং আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট স্বামী কল্যাণানন্দ ও কয়েকজন সেবককে দেখিলাম। স্বামীজীদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। আমি স্নান করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীদিগের সহিত এক সঙ্গে আহারাদি করিলাম। অনেক রকম কথাবার্ত্তা হইল এবং বদরিকাশ্রম

যাইব শুনিয়া তাঁহারা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে স্বামীজীগণের অনুমতি অনুসারে কনখলে সমস্ত দেবালয় দর্শন করিতে বাহির হইলাম। কনখলে দক্ষেশ্বর মহাদেবই প্রধান দেবতা এবং অন্যান্য ছোট বড় দেবতাও আছেন। দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিলাম। সন্যাসীদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। যখন সেই বৃদ্ধসন্ন্যাসিগণ বালকের ন্যায় আমার সহিত হাস্য কৌতুক আরম্ভ করিলেন তখন আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইতে লাগিল এই শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া আমি কোথায় শান্তি অন্বেষণ করিতে যাইতেছি। পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই শুষ্ক হৃদয় লইয়া ভ্রমণ করিলে কি ইহা অপেক্ষা বেশী শান্তি পাইব? জানি না ভাগ্য-লিপি কি আছে। আমার কেদারবদরীযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক উপদেশ দিলেন। আমার হাত ধরিয়া বদরীনারায়ণের রাস্তাবিষয়ক কত কথা বলি-লেন। কোথায় ভাল চটী আছে, চটীতে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া স্নান করিও না, রাস্তায় পিপাসা হইলে ভাল ঝরণা দেখিয়া জলপান করিও, খাদ্যাখাদ্য খুব সাবধানে ইত্যাদি খুঁটীনাটী কত উপদেশ দিলেন। আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। দুইদিন সাধুসঙ্গে মহানন্দে কাটাইলাম। শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামীজীর নির্দ্দেশমত হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে ঘুরিতে ঘুরিতে দুইজন ভদ্রলোক সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁহাদের নিবাস কলিকাতায়। তাঁহারাও কেদারবদরী যাইবেন। আমি যাইব শুনিয়া তাঁহারা খুব খুসী হইলেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে সঙ্গী পাইয়া ততোধিক আনন্দিত হইলাম। আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া সন্যাসীদিগকে আমার সঙ্গী পাওয়ার কথা বলিলাম এবং অনেক কথাবার্ত্তার পরে রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি সন্যাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হরিদ্বারে সেই ভদ্রলোকদ্বয়ের সহিত মিলিত হইলাম। রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন ৩১শে বৈশাখ প্রাতঃকালে বাজারে গিয়া দুই জোড়া দড়ির জুতা ও পর্ব্বত ভ্রমণোপযোগী লম্বা লাঠি ক্রয় করিলাম। জুতা প্রত্যেক জোড়া ৷৵৹ আনা ও লাঠি ৴৹ এক আনা করিয়া হইল। কিছু জলযোগ করিয়া আমি একাই হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশের রাস্তায় চলিলাম। সঙ্গী ভদ্রলোকদ্বয় এই ১৪

মাইল সমতল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবেন। কিছুদূর গিয়াই সত্যনারায়ণ মন্দির পাইলাম। অনেক সন্ন্যাসী এবং যাত্রী এখানে আশ্রয় লইয়াছে। আমি ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটী পাঞ্জাবী সাধু আমার হাত ধরিয়া তাঁহার কাছে বসাইলেন এবং কতকগুলি চানা খাইতে দিলেন। মিশনের সন্ন্যাসীরা আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, যার তার হাতে কিছু খাইও না, কেননা এবার একজন সাধুবেশধারী জুয়াচোর ধরা পড়িয়াছে, সে প্রসাদ বলিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য পথিককে খাওয়াইয়া দিত এবং সে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিত। সেই কথাটী মনে হইয়া আমি সেই সন্ন্যাসী প্রদত্ত চানা খাইব কি না ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসী আমাকে খাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি দুই একটী চানা মুখে দিয়া অবশিষ্টগুলি সন্নাসীর অজ্ঞাতসারে ফেলিয়া দিলাম। এখানে সত্যনারায়ণ জীর মন্দির আছে। বাবা কালী কমলীবালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা, সদাব্রত ও ঔষধালয় আছে। সাধু সন্ন্যাসীরা এই স্থানে প্রথম সদাব্রত গ্রহণ করেন। পর্ব্বতভ্রমণে উদরাময় হইবার আশঙ্কা, তাহার এক এক পুরিয়া ঔষধও ধর্ম্মশালায় পাওয়া যায়। বাবা কালী কম্‌লীবালা নামক একজন সন্ন্যাসী কয়েকবৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ধনী মহাজন দিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, বদরিকাশ্রমের রাস্তার মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক বড় বড় স্থানে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত দুইই আছে। মন্দিরের দেবতা দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ চলিতে লাগিলাম। সত্যনারায়ণমন্দির হইতে সমতল রাস্তায় আরও কয়েক মাইল চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হৃষীকেশ পৌঁছিলাম। বাবা কালী কম্‌লী-বালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় স্থান সংগ্রহ করা গেল। কত দেশের অসংখ্য যাত্রী সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কত যাত্রী, কত রকম পরিচ্ছদ, কত রকম ভাষা, কিন্তু বাঙ্গালী অতি কম; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গার ধারে অনেক সন্ন্যাসীর কুটীর দেখিলাম। স্থানটী বেশ জমকাল। কিছুক্ষণ পরেই আমার সেই সঙ্গী ভদ্রলোকদ্বয় আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা হরিদ্বার হইতে আহারাদি করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ধর্ম্মশালায় গেলাম এবং স্থান সংগ্রহ করিয়া তিনজনে

গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে একটা নিচু রাস্তা দিয়া আমরা গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। কিছুদূর বালির চর ভাঙ্গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলাম। চরের মধ্যে কয়েকখানি তপস্বীর সাধনকুটীর দেখিলাম। সামান্য কিছু খড় ও বাঁশ দিয়া কোনরূপে কুটীর খানি খাড়া করা হইয়াছে। একটু জোরে বাতাস বহিলেই কোথায় উড়িয়া যাইবে। গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া ঋষিকুণ্ড দর্শন করিলাম, এ স্থানকে ত্রিবেণী ও বলে। প্রাচীনকালে জনৈক ঋষি এখানে তপস্যা করিতেন। একদিন তাঁহার যমুনা স্নান করিতে ইচ্ছা হয়। কোথায় গঙ্গাতীরে বসিয়া তিনি তপস্যা করেন, যমুনা তথায় কি করিয়া আসিবেন আর ঋষিবরও আসন ছাড়িয়া যমুনার তল্লাসে যাইতে পারেন না, কাজেই যোগবলে যমুনাকে নিজ কুটীরদ্বারে আনিয়া স্নান করিলেন। যেখানে যমুনার আবির্ভাব হইয়াছিল তথায় একটী কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরে একটী মন্দির দেখা গেল। কিন্তু মন্দির অর্গল বদ্ধ থাকায় আমরা ভিতরে দেবতা দর্শন করিতে পারিলাম না। কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া বটবৃক্ষতলে একটী নেপালী সাধুর আড্ডায় বসিলাম। একটী বাঙ্গালী সাধু ছিলেন, তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সাধু বাবাজীকে প্রণামান্তর আমরা আসন গ্রহণ করিলে, বাঙ্গালী সাধুটী সেই নেপালী নাগা সন্ন্যাসীর সিদ্ধত্ব ও মহাপুরুষত্বলাভের কথা অনেক বলিলেন এবং আমাদিগকে সে কথা বিশ্বাস করিতে যথেষ্টরূপে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী কিন্তু আমাদিগের সহিত কোন বাক্যালাপই করিলেন না। সেই বাঙ্গালী সাধুটী আমাদের বদরী-কেদার যাইবার কথা শুনিয়া আমাদের সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং কেদারনাথ কিম্বা তুঙ্গনাথ যাইতে ঝম্প প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিবেন বলিলেন, পরিচয় দিলেন তিনি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাগিনেয়। বালককাল হইতেই সন্ন্যাসী এবং ভারতবর্ষের" তীর্থসমূহ একাধিক বার ভ্রমণ করিয়াছেন। "চার ধাম চুরাশী আড্ডা ঘুরিয়া কোথাও মনের মত গুরু না পাইয়া, অবশেষ হৃষীকেশে এই মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন। অনেক দিন ইহাঁর নিকটে আছেন এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া দিলেন না। তাই পর্ব্বতশিখর হইতে দেহটাকে ছাড়িয়া দিয়া তুচ্ছ গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম এক দেহত্যাগ ছাড়াও

অনেক রকম কথাবার্ত্তা হইল। সাধুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। অনতিদূরে গঙ্গা কল কল তানে বেগে বহিয়া যাইতেছেন। গঙ্গার পরপারেই বিরাট্‌পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। কি সুন্দর দৃশ্য! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আহারান্তে কম্বলে শুইয়া সেই বাঙ্গালী সাধুর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঝম্প দিয়া দেহত্যাগ করিবার কথা তিন জনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিলেন। রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সঙ্গীদ্বয়ের মোট বহিবার কুলী (কাণ্ডীওয়ালা) ঠিক হইলে, প্রায় ৭টার সময় হৃষীকেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। অল্প দূর গিয়াই তপোবন বা "মুনিকা রেতি" পাওয়া গেল। এখানেও অনেক কুটীর দেখিতে পাইলাম। কত মহাত্মা ঘরসংসার বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া, জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে জীবনযাপন করিতেছেন। ভগবানকে ডাকিতে একাগ্রতা ও একপ্রাণতা আনিতে, এমন নির্জ্জন স্থান বুঝি আর নাই। কত ঝঞ্ঝাবাত, কত বৃষ্টি, কত প্রলয়কাণ্ড, সেই সামান্য কুটীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! জনমানবের সাড়াশব্দ নাই, কেবল দূরে দূরে কয়েকখানি কুটীর। বড়ই সুন্দর স্থান, দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাইল চলিয়া শত্রুঘ্নের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানে মোটের ওজন হয়। টিহরী রাজার কর্ম্মচারী এবং ইংরেজ রাজের শান্তিরক্ষক পুলীশ একজন দেখিলাম। মালের ওজন এবং তাহার মাশুল দিয়া চিঠি ইত্যাদি লইতে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সেখান হইতে রওনা হইয়া ২ মাইল চলিয়া লছমনঝোলা নামক সুবিখ্যাত পুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম এই পুল পূর্ব্বে দড়িদ্বারা নির্ম্মিত ছিল। এ পারে একটা বড় খোঁটা ও পারে একটা খোঁটা মাঝে দড়ির সিঁড়ি এবং দুই পার্শ্বে ধরিবার দড়ি ছিল। সে যে কি ভয়ানক ছিল তাহা অনুমান হয় না। আমরা কিন্তু দড়ির পুলের কোন চিহ্নই দেখিলাম না।

একটী বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বাড়ী কলি-কাতার সন্নিকটে। ৬ দিন হইল এখানে আছেন, আজ হরিদ্বারে ফিরিয়া যাই-

বেন। তিনি বলিলেন আমি তিনবার বদরিকাশ্রম গিয়াছি এবং প্রথমে যখন যাই তখন দড়ির পুল ছিল। দুই পার্শ্বের দড়ি দুই কুক্ষির মধ্যে রাখিয়া ধীরে ধীরে পার হইতে হইত। দড়ির ঘর্ষণে কুক্ষিতে ঘা হইয়া যাইত। বড়ই কষ্টের ছিল"। আমরা তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলাম তিনি অস্বীকার করিলেন। এখানে ৩।৪ খানি দোকান আছে। বাবা কালী কম্‌লী বালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ তলায় ধর্ম্মশালা স্থাপিত। আমরা গঙ্গাতে স্নান করিয়া, কিছু জলযোগ পূর্ব্বক পুল পার হইয়া চলিতে লাগিলাম। এখন লোহার পুল হইয়াছে। ওপারেও দুই একখানি দোকান আছে। পুলের মাঝখানে আমরা তিনজন উঠিলে পুল দুলিতে আরম্ভ করিল। আমরা অনুমান করিলাম দড়ির পুলে পারাপার করা কি ভয়ানক ছিল। আমরা পুল পার হইয়া গঙ্গাকে বামে রাখিয়া, পার্ব্বত্য পথে চলিতে লাগিলাম। বাম দিকে নীচে গঙ্গা কুলুকুলু রবে বহিয়া যাইতেছেন। দক্ষিণে মস্তকোপরি অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। নানাবিধ পার্ব্বতীয় পক্ষীর কলরব এই নির্জ্জন পর্ব্বতকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম এমন সুন্দর দৃশ্য এ জীবনে দেখিতে পাইলাম কি সৌভাগ্য আমার! না জানি এ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা আরও কত সুন্দর! আমরা পার্ব্বতীয় শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কয়েক মাইল সামান্য উচু নীচু রাস্তায় চলিয়া, ফুলবাড়ী নামক চটী পাওয়া গেল। এ রাস্তায় ছাপ্পর ঘর এই প্রথম দেখিলাম। গাছের ডাল শুদ্ধ পাতা দিয়া ছাওয়া আর পাথরের থাম। দুই তিন খানি দোকান আছে। দোকানদারের নিকট খাদ্য দ্রব্য লইলে সে "থালি বর্ত্তন করছি" প্রভৃতি পাকের বাসন দেয় এবং ঘরের ভাড়া লয় না। বদরিকাশ্রমযাত্রীর নিকটে ঘরের ভাড়া লওয়া পাপ কিন্তু জিনিষ না লইলে দোকানে থাকিতে দিবে না। আমরা এখানে আহারাদি করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যষ্টিহস্তে চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোহন চটীতে উপস্থিত হওয়া গেল। এ চটীতে আমাদের পূর্ব্বেই অনেক যাত্রী আসিয়া সমস্ত ঘর দখল করিয়া লইয়াছে। একটী ধর্ম্মশালা আছে, অতি কষ্টে তাহাতে নাম মাত্র স্থান সংগ্রহ করিয়া লোটা কম্বল সেখানে রাখিয়া বাহিরে বসিলাম।

বহু যাত্রীতে চটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই জন কনেষ্টবল একখানা হিন্দি ছাপান রাস্তা চলিবার নিয়মাবলী পড়িয়া যাত্রীদিগকে শুনাইতেছে। একখানা খাটিয়াতে দুইজন বসিয়াছে, আর যাত্রীর দল নীচে বসিয়া সে হুকুম শুনিতেছে। এমন ভাব দেখাইতেছে যে, তাহারাই পাহাড়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আমরাও তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইলাম, লেখা আছে যে অমুক অমুক স্থানে ঔষধালয় আছে, রাস্তায় পাইপ ছাড়া অন্য ঝরণার জলপান করা নিষেধ, দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয় ইত্যাদি। দূরে পাহাড়ের পশ্চাতে চন্দ্রদেব উঠিতেছেন। ক্রমে ক্রমে চারিদিকে সে বিমল কিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক দিকে জোৎস্না, অন্য দিকে পাহাড়ের ছায়া, বড় সুন্দর দৃশ্য। অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, ক্রমে চন্দ্রদেব পাহাড়ের উপরে উঠিলেন। সমস্ত পাহাড় আলোকিত হইয়া গেল। চটীর নীচেই একটা বেশ বড় রকমের ঝরণা বেগে বহিয়া যাইতেছে। যাত্রীদিগের অনাবশ্যক কোলাহল থামিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে বিরাট্ পর্ব্বতশ্রেণী। আকাশে চন্দ্রদেব, সম্মুখে ঝরণার কুলুকুলু শব্দ। সেই পর্ব্বতাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র চটীতে ধর্ম্মশালার বারান্দায় বসিয়া এই মনোমোহন শোভা দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম জানি না, সঙ্গী ভ... বাবুর আহ্বানে চমকিয়া উঠিলাম। রাত্রি হইয়াছে আহারাদির যোগাড় করিতে হইবে বলিয়া তিনি অনুযোগ করিলেন। দোকানে আটা আলু ও গুড় পাওয়া গেল। তাহাই লইয়া আসিয়া হস্তদ্বারা কোনরূপে রুটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করা গেল। সে যে কি রুটী, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে ধারণা করিতে পারে না। অর্দ্ধ ইঞ্চ পুরু, দুপিঠ পোড়া, চেহারা দেখিলে ভয় হয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্ষুধারও অভাব ছিল না। আহারাদি করিয়া কম্বলে শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সেই দীর্ঘ যষ্টি হস্তে রওনা হইলাম। কিছু দূর চলিয়া চড়াই রাস্তা পাওয়া গেল। আমার ধারণা ছিল কামাখ্যা পর্ব্বতে যেরূপ চড়াই করা গিয়াছে ইহাও বুঝি সেইরূপই হইবে। ক্রমাগত দুই মাইল চলিয়া দেখি চড়াই আর শেষ হয় না। খানিক

দূর উঠি আর বিশ্রাম করি, ঝরণা পাইলেই আকণ্ঠ জলপান করি। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়লাম, পা দুখানি অবশ হইতে লাগিল। হাতের লাঠি, স্কন্ধের কম্বল, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র খানি পর্য্যন্ত ভার বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গীয় ভদ্রলোকদ্বয় বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্রাম করিতে করিতে ছয় মাইল চলিয়া বিজানী নামক একটী চটীতে পৌঁছিলাম। এবং সেই খানেই আহারাদির বন্দোবস্ত করা গেল। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে রওনা হইলাম। কিয়দ্দূর চড়াই করিবার পর উৎরাই পাওয়া গেল। প্রথমে মনে হইয়াছিল উৎরাই বুঝি সোজা। কিন্তু এই ৪ মাইল উৎরাই করিয়া দেখিলাম সেটাও কম কষ্টকর নহে। কে যেন গলাধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিতেছে। ইহাতেও পা অবশ হইয়া পড়ে। চারি মাইল নামিয়া মহাদেব চটীতে পৌঁছিলাম। যাত্রীর দলে চটী পরিপূর্ণ। একটী ধর্ম্মশালা আছা তাহাতে কোনরূপে স্থান সংগ্রহ করিয়া রাত্রি কাটান গেল। একটু দুগ্ধ ছাড়া আর কিছুই আহার হইল না। পরদিন ৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে মহাদেব চটী হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম। এই চটীতে গত কল্য শেষ রাত্রিতে হঠাৎ আমার প্রবল জ্বর হয়। তৎপর দিন সকালেও জ্বর ছিল। সেই জ্বর লইয়াই যষ্টি হস্তে রওনা হইলাম। শরীর নিতান্ত খারাপ বোধ হইতে লাগিল। খুব মাথাধরা ও সমস্ত শরীরে ব্যথা লইয়াই চলিতে লাগিলাম। বড় কষ্ট বোধ হইল। উপায় কি, এই অবস্থাতেই চলিতে হইবে। সঙ্গীদ্বয়কে বলায় তাঁহারা প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারিলেন না। নিজের কাছে আমাশয় ও উদরাময়ের কিছু কবিরাজী ঔষধ ছিল, কিন্তু জ্বরের কোন ঔষধ ছিল না। কিন্তু জ্বরঘ্ন ঔষধ না লইয়া আসা বড়ই ভুল হইয়াছিল এবং দেশে থাকিতে শুনিয়াছিলাম যে পাহাড়ে পেটের অসুখ ও আমাশয় এই দুইটী ব্যারামই প্রায়শঃ হয়, তাই অন্য ঔষধ আনিবার আবশ্যকতা মনে করি নাই। সঙ্গীদ্বয় খুঁটী নাটী কত জিনিষ আনিয়াছেন, কিন্তু ঔষধ মাত্রেও নাই। কাজেই নিরুপায় অবস্থায় অতি কষ্টে ছয় মাইল চলিয়া প্রায় ১০ টার সময়ে কাণ্ডী চটীতে উপস্থিত হইলাম। আমার শরীর ভাল নয় বলিয়া এই চটীতেই আশ্রয় লওয়া গেল। এ চটীটা মন্দ নয়, জলেরও বেশ সুবিধা আছে। নিকটেই পাহাড়ীদের বস্তি। একটা কাঠের দোতলা

ঘরে বাসা লইয়া আহারাদি শেষ করিলাম কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে তিন জনে বহির্গত হইলাম। কিছুদূর চলিয়া একটা উৎরাই পাওয়া গেল। প্রায় মাইল খানেক কি তারও বেশী নামিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া একটী পুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। পুলটী ব্যাসগঙ্গার উপরে। পুল পার হইয়া কিছুদূর গেলে ব্যাস চটী পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গার সহিত ব্যাস মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার অন্য একটী নাম ব্যাসপ্রয়াগ। ব্যাসগঙ্গার জল যেন গিরি মাটী গোলা। চটীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌছিলাম। এখানে বাবা কালী কমলীবালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে একটী ঘর ঠিক করিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সূর্য্যদেব সবে মাত্র অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। পাহাড়ের গায়ে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছেন, কি সুন্দর দৃশ্য! ও পারে সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী। বাতাসে দোদুল্যমান সেই বৃক্ষশ্রেণীর চঞ্চল ছায়া গঙ্গার নির্ম্মল জলে পড়িয়া কাঁপিতেছে। সম্মুখে পশ্চাতে, নিকটে দূরে যে দিকে চাই অগণ্য পর্ব্বতশ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। গভর্ণমেণ্টের জঙ্গলবিভাগ হইতে কাষ্ঠের তক্তা করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে, হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে সরকার পক্ষের লোক ঐ সকল তক্তা তুলিয়া লইয়া রেলে যথেচ্ছা চালান দিবে। তক্তাগুলি স্রোতের বেগে ভাসিয়া আসিতেছে দেখিতে ভারী সুন্দর। দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। যে খানে জল কিছু কম ও পাথর জাগিয়া আছে তক্তাগুলি সেই পাথরে লাগিয়া খুব ধাক্কা খাইতেছে এবং চক্রের ন্যায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া পুনরায় স্রোতের মুখে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। আমরা গঙ্গাতীরে একটী বড় পাথরের উপর বসিয়া এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। নিকটে বহু প্রাচীন একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম। ভিতরে কোন্ দেবতা বিরাজ করিতেছেন বুঝিতে পারা গেল না। কেন না তেল সিন্দুরের আধিক্যে দেবতার স্বরূপ অন্তর্ধান হইয়াছে। একজন মলিন-বসনপরিহিত পাণ্ডা ইঁহাকে ব্যাসদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিল এবং প্রণামী বা ভেট কিছু চড়াইতে অনুরোধ করিল। ব্যাসদেব এই স্থানে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এমন পুণ্য স্থানে আপনারা আসিয়া মন্দিরে কিছু প্রণামী

না দিলে প্রত্যবায় হইবে ইত্যাদি মুখস্থ বুলি আরম্ভ করিয়াছিল। সঙ্গীদ্বয় বোধ হয় দুইটী পাই কিম্বা দুইটী অৰ্দ্ধ পয়সা ভেট দিলেন। পাণ্ডাজী ভারী খুসী। ফিরিয়া আসিতে ধর্ম্মশালার নিম্নতল হইতে একজন বাঙ্গালী সাধু আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া প্রণামান্তর উপবেশন করিলে, তিনি দুইখানি পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি কার্ড দুই খানি লিখিয়া দিলাম। এমন একটি মহোপকার করিয়াছি বলিয়া সাধুজী আমাকে শত ধন্যবাদে আপ্যায়িত করিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সাধু আলাপে অতিবাহিত করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের নিকটে ফিরিয়া আসিলাম এবং হাতগড়া রুটী ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। পর দিন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। শরীর ভাল হইয়াছে, একদিন বই আর জ্বর হয় নাই। আমরা তিনজন এবং সেই বাঙ্গালী সাধুটী অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বামে গঙ্গা, দক্ষিণে অত্যুচ্চ পর্ব্বত আর সম্মুখে অপ্রশস্ত রাস্তা। আগে পাছে কত যাত্রীদল "বদরী বিশাল লালাকি জয়" রবে জয়গান করিতেছে, সে রবে প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে বল আসে। সাধুজীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে কয়েক মাইল চলিয়া বেলা প্রায় ১১ টার সময়ে উমরাসু চটীতে উপস্থিত হইলাম এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অপরাহ্নে কয়েক মাইল চলিয়া দেবপ্রয়াগের নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রায় ১ মাইল ১॥ মাইল থাকিতে পাণ্ডা প্রভুদের দর্শন পাওয়া গেল। আমার সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গীদ্বয়কে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিল, সঙ্গীদ্বয় হরিদ্বার হইতেই পাণ্ডা ঠিক করিয়াছেন, অন্য পাণ্ডার আবশ্যক নাই ইত্যাদি বলাতেও তাহারা ছাড়িল না। সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হইল এবং বাসা করা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কোনরূপে পাণ্ডার জ্বালাতন হইতে উদ্ধার পাইয়া সঙ্গীদ্বয়ের পূর্ব্ব স্থিরীকৃত পাণ্ডার আবাস খুঁজিয়া লওয়া গেল। আশ্রয় ঠিক করিতে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পাণ্ডার গোমস্তা আমাদিগকে সযত্নে দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। আমরা খুব পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আহারাদির যোগাড় করিলাম এবং খিচুড়ী ভক্ষণ করিয়া গোমস্তার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন ৫ই জ্যৈষ্ঠ সকালে

উঠিয়া প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনান্তে সঙ্গমস্থলে স্নান করিতে গেলাম। এখানে মস্তকমুণ্ডন পিণ্ডদান প্রভৃতি প্রয়াগের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হয়। বাসা হইতে কিছুদূরে নামিয়া অলকানন্দার পুল পার হইয়া, অনেক সিড়ি ভাঙ্গিয়া, সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। কত যাত্রী যে স্নান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গার সহিত অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। অলকানন্দা ভীষণ শব্দে কূল ছাপাইয়া, তাণ্ডব নৃত্যে তরঙ্গ তুলিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। গঙ্গার জল বেশ নির্ম্মল, অলকানন্দার জল ঘোলা। দুই নদীর জল যেখানে মিশিয়াছে, সেখানে একটী লাইন পড়িয়া গিয়াছে। কি ভীষণ শব্দ, কিছু শুনিবার উপায় নাই। একজন সাধু ঘাটে একটী গুহার ভিতরে অবস্থান করিতেছেন। সারা দিনের জনকোলাহল মিটিয়া যখন সন্ধ্যা হয়, এক নদীর শব্দ ছাড়া যখন আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না, তখন এই সর্ব্বত্যাগী সাধু ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কি স্বর্গ সুখই অনুভব করেন, এ কলুষিত চিত্তে সে চিন্তার অবসর কোথায়? হায় মূর্খ! এই দুর্ব্বল অসংযত পাষাণ হৃদয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কি শান্তি পাইবে? শান্তি যে তোমার হৃদয়ে। শান্তিময়কে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে তবে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। সে শক্তি তোমার কই? নানা চিন্তায় মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়া বাসায় আসিলাম এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধানান্তে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার হাত এড়াইবার নিমিত্ত বাজারের দিকে চলিলাম। বাজারটী বেশ বড়। সব গরম জিনিষই পাওয়া যায়। দোকানীদিগের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রীসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাস্য কৌতুক, মেয়েদের অবাধ গতি দেখিয়া মনে হইল দেশে বুঝি ফিরিয়া আসা গেল। এ রাস্তায় যত গুলি জায়গা দেখিয়াছি, দেবপ্রয়াগই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান বোধ হইয়াছে। দূর হইতে দেখিতে একখানা ছবির মত। কে যেন পাহাড়ের গায়ে সযত্নে একখানা ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। সবই দ্বিতল বাটী, ছাদে শ্লেট পাথর দেওয়া। দুই ধারে পাণ্ডাদের বাড়ী, মাঝে অলকানন্দা খরস্রোতে প্রবাহিতা। শুনিলাম এই দেবপ্রয়াগের বাজারটী ইংরেজের, আর সহরের সমস্ত অংশ টিহরী রাজার অধিকার। এখানে বদরীনারায়ণের পাণ্ডাদিগের বাস। এই ক্ষুদ্র সমতল জমি টুকুর মধ্যে অন্যূন আড়াই শত পাণ্ডার বাড়ী।

প্রত্যেক বাড়ীতে ১০।১২ জন গৃহস্থ ছেলে মেয়ে লইয়া সঙ্কীর্ণভাবে বাস করিতেছে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বত, মধ্যস্থলে এই স্থানটুকু সমতল দেখিয়া মনে হয় পর্ব্বতের গা খুঁদিয়া এই ছোট সহরটী বসান হইয়াছে॥ বাবা কালী কম্‌লীবালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। আমাদের সঙ্গীয় সাধুটী এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়াছেন। বদরীনারায়ণের মন্দির ছয় মাস খোলা থাকে, এই ছয় মাস যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে প্রণামী পাওয়া যায় তাহাতেই পাণ্ডাদের সংবৎসরের খরচ সংকুলন হইয়া থাকে। অনেক ক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসায় আসিলাম এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। আজ আমরা এখানে অবস্থান করিব। হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ ৫৬ মাইল। অপরাহ্নে অলকানন্দার পুল পার হইয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম।

অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, উপরে উঠিয়া মন্দিরে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী দর্শন করিলাম। সম্মুখে আর একটী ছোট মন্দিরে পিতলের গরুড় ভগবান্ যুক্তকরে বিরাজ করিতেছেন। পার্শ্বের অন্য একটী ঘরে দুই জন গাড়োয়ালী সতরঞ্চ খেলিতেছে। দেবমন্দিরের নিকটে উপযুক্ত দৃশ্য বটে! অনেক গুলি সিঁড়ি নামিয়া সঙ্গমস্থলে আসিয়া একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া নদীর জলতানের সহিত প্রাণ ভাসিয়া চলিল। ওপারে অনেকটা উচ্চ পাহাড়ে কয়েক ঘর পাহাড়ীর বাস। তাহারা গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত দড়ির একটী ঝোলা প্রস্তুত করিয়াছে। ঠিক পুলেরই অনুরূপ। একটী লোক পার হইতেছে দেখিলাম। যখন লোকটী মাঝখানে আসিল, তখন ঝোলা এমন দুলিতে আরম্ভ করিল যে, আমার দেখিয়াই ভয় হইল। লোকটী দুই পাশের দড়ি দুই হাতে ধরিয়া, স্বচ্ছন্দে পার হইয়া আসিল। ধন্য সাহস তাহাদের! সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন ৬ই জৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া দেবপ্রয়াগ হইতে রওনা হইলাম। পূর্ব্ব রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, সকালেও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হইলাম। প্রায় ২ মাইল চলিয়া যাওয়ার পর বেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ভিজিয়া ভিজিয়াই চলিতে লাগিলাম। কাপড় কম্বল সব ভিজিয়া গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়ও একটু আশ্রয়

নাই যে, দাঁড়াইয়া মাথাটাকে রক্ষা করি। সেই বৃষ্টিতে প্রায় ৯ মাইল চলিয়া, রাণীবাড়ী চটীতে উপস্থিত হইলাম। স্থির হইল, এখানে কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে হইবে। এ ছাপ্পর ঘরেও ভিজিতে হইবে, রাস্তা চলিতে গেলেও ভিজিতে হইবে। এখানে বসিয়া ভেজা অপেক্ষা চলিতে চলিতে ভেজা ভাল। সামান্য কিছু উদরস্থ করিয়া সেই অজস্র ধারার মধ্যে পুনরায় রওনা হইলাম। ৭ মাইল চলিয়া একটা বড় ঝরণার ধারে উপস্থিত হইলাম। নাম খাণ্ডবগঙ্গা। দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। খাণ্ডব গঙ্গার উপরে পুল ছিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নূতন পুল তৈয়ারী হইবে তাহার সরঞ্জাম পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানটী বর্ত্তমান ভগ্নদশাতেও মনোরম। হাঁটিয়া নদী পার হইয়া ভিল্ল কেদার মহাদেবের মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর বেদী বাঁধান একটী অশ্বত্থ গাছ এবং বেদীর উপরে নবনির্ম্মিত একটী বৃষ বর্ত্তমান। অঞ্জলি ভরিয়া বিল্বপত্র দিয়া মহাদেবের পূজা করিলাম।

কুরুক্ষেত্র সমরে জয়লাভকামনায় মহাবীর অর্জ্জুন মহাদেবের কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। দেবাদিদেব অর্জ্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কিরাত-বেশ ধারণপূর্ব্বক একটী বরাহ উপলক্ষ করিয়া ভক্তের সহিত ছলনা আরম্ভ করেন। পরে সেই বরাহবধব্যাপারে অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরত্বপ্রকাশ হইলে আশুতোষ তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। এই স্থানেই সেই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উপবেশন করিয়া তিন জনে এই মহাপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে অপারআনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ৩ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পুরাতন শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। এখানে কমলেশ্বর মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির আছে। ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যেন একটী ছোট খাট রাজবাড়ী। চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত সিংহদ্বার। সিংহদ্বার পার হইয়া একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল চকের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তর

নির্ম্মিত অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি। বাহিরে প্রকাণ্ডকায় একটি বৃক্ষ। গোলাকারভাবে দ্বিতলের ঘরগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। এক জন পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে লইয়া গেল এবং ছোট বড় অনেক অস্পষ্টাকৃতি দেবতা দর্শন করাইল। একটা ঘরে মন্দিরের মোহান্ত মহারাজকে দেখিলাম। গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যের প্রতিমূর্ত্তি। দেবমন্দিরের মোহান্ত বাবাজীরা কি সর্ব্বত্রই একরূপ? পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, মোহান্তরা সন্ন্যাসী। বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, সীতানাথের মহারাজেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং ঘোর বিলাসিতাপরায়ণ জানা থাকিলেও মনে হইয়াছিল হিমালয় পর্ব্বতস্থ দেবমন্দিরের মোহান্তদিগকে প্রকৃতই মোহান্ত দেখিব। আজ কমলেশ্বরের মোহান্তকে দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল। ভাবিলাম বুঝিবা মোহান্ত নামেরই দোষ! মোহান্তজী বেশ একটু উঁচু গদীতে বসিয়া আল-বোলা টানিতেছেন, আশে পাশে অনেকগুলি বড় বড় মোটা খাতা। একটী কর্ম্মচারী হিসাব লিখিতেছে। দেখিয়া ঘৃণা ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া নূতন শ্রীনগরের দিকে চলিলাম। ১ মাইল গিয়াই শ্রীনগর সহর পাওয়া গেল। সহসা চক্ষুর সম্মুখে একটী বেশ সাজন সহর উদ্‌ঘাটিত হইল।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

ব্যবধান।

(শ্রাবণী পূর্ণিমায়).

কি আনন্দ কোলাহল গগন গহন
মেতে গেছে মহোৎসবে। কলকলতান
ঢলঢল চারিদিকে জ্যোছনা-প্লাবন
কোকিল পাপীয়াকুল গাহিতেছে গান
পুলকে বিভোর প্রাণ। উৎসব-বাঁশরী
বাজিতেছে ঘন ঘন। ফুলসুধাপানে
মদালস সমীরণ। জাহ্নবীলহরী
জ্যোছনা মাখিয়া নাচে করতালিদানে।
কি আনন্দ প্রকৃতির প্রমোদ-আবাসে
আজি যে ঝুলন-খেলা প্রেমঢলঢল।
মানবত্বব্যবধানে শুধু দ্বারপাশে
দাঁড়ায়ে কাঙ্গাল আমি আঁখি ছলছল।
কে মুছিবে কাঙ্গালের অশ্রুগ্লানি ধূলি
ও উৎসব মাঝে কেহ লবে মোরে তুলি।

শ্রীকালিদাস রায়।

দিল্লী।

(প্রাচীন ইতিহাস)

পৃথ্বীরাজ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজের হস্তে দিল্লী সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যায় রত হন। পৃথ্বীরাজ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া দিল্লীর পুরাতন অধিবাসিগণ অপেক্ষা আপনার সহিত আগত লোকজনের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করায়, দিল্লীবাসীরা ক্রমে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে চৌহানের শত্রুপক্ষ যাদব-বংশীয় মালবপতি মহীপাল সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে আজমীরে উপস্থিত হওয়ার আয়োজন করেন। তিনি চম্বল পার হইয়া আজমীর আক্রমণ করিলে, সোমেশ্বরের সৈন্য কর্ত্তৃক আহত হন। সোমেশ্বর তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া পরে সসম্মানে বিদায় দেন। এদিকে অনঙ্গপাল তাঁহার প্রজাবর্গ ও আমাত্যগণের প্রতি পৃথ্বীরাজের অবিচারের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং পৃথ্বীরাজকে দিল্লী পরিত্যাগ করার জন্য আদেশ করিয়া এক দূত প্রেরণ করেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতে অসম্মত হইলে অনঙ্গপাল দিল্লী পুনর্গ্রহণের জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নিকট তিনি পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার বদরিকাশ্রমের অভিমুখে গমন করেন। অনঙ্গপাল হরিদ্বার হইতে সাহাবুদ্দীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। সাহাবুদ্দীনও পৃথ্বী-রাজকে দমন করার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন তিনি অনঙ্গপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইয়া প্রথমে উজীর তাতার খাঁকে হরিদ্বারে পাঠাইয়া দেন। অনঙ্গপাল তাতার খাঁর সহিত অগ্রসর হইলে, সাহাবুদ্দীন তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন, এদিকে পৃথ্বীরাজও সৈন্যসামন্তসহ ধাবিত হন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

হইলে, পৃথ্বীরাজের মন্ত্রী কৈমাস সতর্কতার সহিত রণকৌশল দেখাইয়া অনঙ্গপালকে ধৃত করিয়া ফেলেন। তাহা দেখিয়া সাহাবুদ্দীন উৎসাহ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনিও কিন্তু চামণ্ড রায়ের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। সেবারও ঘোরী বিংশতিটী হস্তী একশত অশ্ব ও দুই লক্ষ মুদ্রা দণ্ড প্রদান করেন। * পৃথ্বীরাজও তাঁহাকে একটী অশ্ব ও খেলাত প্রদান করিয়া সম্মানসহকারে বিদায় দেন। † অনঙ্গপাল লজ্জিত হইয়া পৃথ্বীরাজের সহিত দিল্লী উপস্থিত হন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরে তিনি বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

পৃথ্বীরাজ মৃগয়া করার অভিপ্রায়ে অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া দিল্লী হইতে বহির্গত হইলে এ সংবাদ সাহাবুদ্দীনের কর্ণগোচর হয়। কৈমাস দিল্লী-রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। সাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পাঁচ লক্ষ সৈন্যের সহিত গজনী হইতে যাত্রা করেন, পৃথ্বীরাজও ঘঘর নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হন। সাহাবুদ্দিনের সৈন্য নদী পার হইয়া পৃথ্বীরাজের সৈন্য আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান সেনাপতি এই যুদ্ধে আহত হইয়া পড়েন, অবশেষে পৃথ্বীরাজই জয়লাভ করেন। কণ্ব চৌহান সাহাবুদ্দীনকে বন্দী করিয়া আজমীর লইয়া যান। তাহার পর পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে পঁহুছিলে, সাহাবুদ্দীনকে তথায় আনয়ন করা হয়। পৃথ্বীরাজের সামন্তগণের অভিপ্রায় হইয়াছিল যে, এবার সাহাবুদ্দীনের প্রাণদণ্ড বিধান করিতে হইবে। কিন্তু কণ্ব চৌহান সেবারও তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিয়া ঘোরীর নিকট হইতে পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া লইতে বলেন। পৃথ্বীরাজ

---

* ছাঁড়ি দিয়ৌ সুরতান। ডণ্ড কব্বুল কিয়ৌ সির॥
বীস হস্তি সত বাজ। উঁচ জাতিগাতহ গির॥
উভৈ লষ বর দ্রব্য। দিয়ৌ সাহাব সু দণ্ড॥
সো প্রথিরাজ নরিন্দ। অদ্ধ দীনৌ চামণ্ড॥
অধ দণ্ড সব্ব সামন্ত কঁহু। বঁটি দিয়ৌ-চহুয়ান বর॥
দৈ দণ্ড ষত্ত নর বর সুভর। প্রথীরাজ ছাঁবৈ নকর॥

† ভাব ভগতি প্রথিরাজনে। কীনি অতি মহিমান॥
ইক বাজ সিরপাবদৈ। ছঁড়ি দিয়ৌ সুরতান॥

তাহাতেই সম্মত হন। সাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজের সহিত আর বিবাদ করিবেন না বলিয়া শপথও করেন, ঘোরী কণ্হকে এক মণি ও দিল্লীশ্বরকে আপনার তরবারি নজর দিয়া বিদায় লন। * সেনাপতি লোহানা সাহার সহিত গজনী পর্য্যন্ত যাইতে আদিষ্ট হন। পথিমধ্যে ঘোরীর শত্রু রায়মল্ল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, লোহানা তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলেন। এই সময়ে ঘোরীর উজীর তাতার খাঁ প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া গজনীতে উপস্থিত হন। সাহাবুদ্দীন লোহানাকে যথোচিত সম্মান করিয়া পৃথ্বীরাজকে হস্তী, অশ্ব ও নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করেন। † সেই সমস্ত দ্রব্যের কতকাংশ সামন্তদিগকে প্রদান ও কতকাংশ চিতোরে প্রেরণ করা হয়। কবিচন্দ্র স্বয়ং সে সমস্ত চিতোরে লইয়া যান।

১১৪১ অনন্দ বিক্রম সম্বতে পৃথ্বীরাজ দক্ষিণদেশবিজয়ে বহির্গত হন কর্ণাটাধিপতি পৃথ্বীরাজকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক সুন্দরী নর্ত্তকী উপ-ঢৌকন প্রদান করেন, পৃথ্বীরাজ তাহাকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া গীত বাদ্যে সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন। ইহার পর উজ্জয়িনী, দেবাস, ধার প্রভৃতি ও জয়চন্দ্রের রাজ্যাক্রমণের পরামর্শ স্থির হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের রাজ্যো-ন্নতি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সাহাবুদ্দীনও তাঁহাকে দমন করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন। এক্ষণে উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ উজ্জয়িনীবিজয়ে যাত্রা করিলে,

---

* করি জুহার তর কন্হ। গয়ৌ অজমের দুর গ্গহ ॥
তজ্জ্যো কন্হ পতি সাহ। বত্ত সব জঁপি অপ্পহ ॥
হৈয় খুসাল গজনেস। দঈ ইক লাল সহিত মণি ॥
কন্হ লেই পতি সাহ। গয়ৌ দিল্লী সু ততচ্ছন ॥
মনুহার করিয়া সামন্ত সব। তেগ দঈ দিল্লেস বর ॥
দোশ্অশ্ব করী দোই দেয় করি। সাহি চলা রৌ অপ্প ঘর ॥
† ডেরা দিয় লোহান। করিয় মনুহারি রোজ দস ॥
করিয় যত্ত আজান। তুরিয় পঁচাস অপ্প বস ॥
ইহ দিয়ৌ লোহান। কিয়ৌ ভেজ্জ্যো নৃপ রাজং ॥
লাদে দাই হজার। সত্তমৈ তোলা সাজং ॥
ইক্ক ইক্ক তুরী হথীসু ইক্ক। সামন্তন দীনৌ সবৈ ॥
মুহ করিয় কিত্তি অনেক বিধি। সুবর সুর ফেরিয় জবৈ ॥

সাহাবুদ্দীন তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, পৃথ্বীরাজও তাঁহাকে পুনর্ব্বার বন্দী করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। রাজপুত-মুসলমানে আবার যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষের বীরগণ রণোন্মত্ত হইয়া উঠেন। পৃথ্বীরাজের সেনাপতি পীপ পরিহার সাহাবুদ্দীনকে ধৃত করিতে অভিলাষী হইয়া অদ্ভুত সমরাভিনয় প্রদর্শন করেন। অবশেষে সাহাবুদ্দীন তাঁহারই হস্তে বন্দী হন, পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দীনকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বর পীপ পরিহারকে বহুমূল্য পারিতোষিক দিয়া সেবার বিনা দণ্ডে সাহাবুদ্দীনকে মুক্তি প্রদান করেন। *

ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবে মৃগয়ার উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া উজ্জয়িনীরাজ ভীমদেবকে পরাজিত করেন। ভীমদেব স্বীয় কন্যা ইন্দ্রাবতীকে পৃথ্বীরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হন। কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আইসে যে, গুর্জ্জররাজ ভোলাভীম রায় সহসা চিতোর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, পৃথ্বীরাজ পজ্জুন রায়ের হস্তে আপনার তরবারি সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সমরসিংহের সাহায্যের জন্য চিতোরাভিমুখে ধাবিত হন। এক পার্শ্বে সমরসিংহ ও অপর পার্শ্বে পৃথ্বীরাজ ভীমরায়কে আক্রমণ করিলে, ভীমরায়ের সৈন্য পরাস্ত হইতে বাধ্য হয়, এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতে থাকে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি হোসেন খাঁ এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে আবার ভীমরায় সহসা পৃথ্বীরাজের শিবির আক্রমণ করিলে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, অবশেষে পৃথ্বীরাজই জয় লাভ করেন এবং ভোলা ভীম পলায়ন করিতে বাধ্য হন। † গুর্জ্জরপতির বহুসংখ্যক সৈন্য রণক্ষেত্রে

---

* ছঁড়ি দিয়ৌ সুরতান। সুজস পহু পীপ মণ্ডী সির॥
জিতি জঙ্গ রাজান। ইচ্ছি পুজা ইচ্ছী থির॥

† তব রা নিঁগর রাব। ঝু ঝ ঝ ঘর রাবর মণ্ডিয়॥
রুকিক সেন চহুআন। ষগ্গ মগ্গহ তন ষণ্ডির॥
পরি গহিয় সব সথ। গয়ৌ চালুক বজাইয়॥
বজর বেহ ষগ মিলিয়। নিরতি প্রথিরাজন পাইয়॥
বীরঙ্গ বীর বজ্জর বিহর। ভিরত বজ্জি গিয় বিপ পহর॥
বজ্জরত বীর বঙন পরত। গয়ৌ ভীম তনবর কুসর॥

জীবন বিসর্জ্জন দেয়। যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। ও দিকে উজ্জয়িনীরাজ ভীমদেব পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-প্রদানে অসম্মত হন। সেনাপতি জৈত রায় প্রভৃতি উজ্জয়িনী আক্রমণ করিয়া ভীমদেবকে বিবাহ প্রদানে সম্মত করান। তাহার পর পৃথ্বীরাজ উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রাবতীর সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হন।

পৃথ্বীরাজ এইরূপে চতুর্দ্দিক বিজয় করিয়া সপ্রভাবে রাজ্যশাসনে রত হন। সার্দ্ধ দ্বিবৎসর পর্য্যন্ত তিনি শান্তিতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিরশত্রু সাহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁহাকে আক্রমণ করার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পৃথ্বীরাজ মৃগয়া করিতে বড়ই ভাল বসিতেন। এই সময়ে তাঁহার খট্টুবনে মৃগয়া করার অভিলাষ জন্মিল। তাহার আয়োজন আরম্ভ হইলে, সাহাবুদ্দীনের গুপ্তচর গজনীতে সে সংবাদ প্রেরণ করে। পৃথ্বীরাজ মৃগয়াস্থলে, উপস্থিত হইলে, সাহাবুদ্দীন দূতহস্তে এক পত্র দিয়া বলিয়া পাঠন যে, হোসেন খাঁকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে ও পঞ্জাব প্রদেশ ফিরাইয়া দিতে হইবে। পৃথ্বীরাজ এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তাহাতে অসম্মতই হন। দূত মুখে পৃথ্বীরাজের মনোভাব অবগত হইয়া সাহাবুদ্দীন সৈন্য সজ্জিত করিয়া সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত আগমন করেন। পৃথ্বীরাজ সে সংবাদ অবগত হইয়া নিজে সাহাবুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য অগ্রসর হন। এবার যাহাতে পৃথ্বীরাজকে বন্দী করা হয় সাহাবুদ্দীন স্বীয় সৈন্যদিগকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছিলেন। এ দিকে রাজপুত বীরগণও প্রচণ্ডবেগে মুসল্মান সৈন্য মথিত করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছিলেন, জমশোচ খাঁ ও নওরোজ খাঁ সাহাবুদ্দীনের পক্ষে এবং জৈত রায় প্রমার পৃথ্বীরাজের পক্ষে সৈন্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ক্রমে যুদ্ধ আরব্ধ হইল ও তাহা তুমুলভাবেই চলিতে লাগিল। সাহাবুদ্দীন বেগভরে নিজেই পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, পৃথ্বীরাজ স্বীয় রণকৌশলে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন। সায়ংকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। রাত্রি শেষ হইতে না হইতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরব্ধ হয়। পরস্পর

পরস্পরকে মথিত করার চেষ্টায় উৎসাহসহকারে ধাবিত হইতে থাকে। অবশেষে কিন্তু মুসল্‌মান সৈন্যেরাই পরাজিত হইতে বাধ্য হয়। জৈতরায় সাহাবুদ্দীনকে বেষ্টন করার পর তাঁহার হস্তীকে আক্রমণ করিয়া ঘোরীকে ভূতলে নিপাতিত করেন। পরে তাঁহাকে ধৃত করিয়া পৃথ্বীরাজের নিকট লইয়া আসেন। অবশ্য এ বারও সাহাবুদ্দীন মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। *

এক সময়ে জলন্ধরের রাণী পৃথ্বীরাজের নিকট কাঙ্গড়ারাজের হস্ত হইতে কাঙ্গড়া দুর্গ উদ্ধার করার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতে সম্মত হন। এক্ষণে রাণী সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, পৃথ্বীরাজ কাঙ্গড়ারাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া রাণীকে কাঙ্গড়া দুর্গ ফিরাইয়া দিতে বলেন। কাঙ্গড়ারাজ ভানুরায় তাহাতে অসম্মত হইলে, পৃথ্বীরাজ তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন, ভানুরায়ও তাঁহাকে বাধা প্রদানে আয়োজন করেন। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভানুরায় পরাজিত হইতে বাধ্য হন। পৃথ্বীরাজ রঘুবংশরায় ও হাহুলী রায় হস্তীরকে কাঙ্গড়া দুর্গ অধিকারের জন্য আদেশ দিলে, তাঁহারা অন্যান্য সামন্ত সহ সেই জঙ্গলবেষ্টিত দুর্গম দুর্গ আক্রমণে গমন করেন। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রঘুবংশ রায় একাকী দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। রাজা ভানু পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি পৃথ্বীরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। পৃথ্বীরাজ নববিবাহিতা বধূর সহিত দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া সানন্দে কালযাপন করিতে থাকেন।

---

* গহি গোরী সুবিহান। হথ আপে‌্পৌ চহুআনং ॥
চামর ছত্র রষত্ত। তষত লুট্টে সুরতানং ॥
গোরি বৈ হুস্‌সেন। বীর তুট্টে আছ্‌ছট্টির ॥
মান তুঙ্গ চহুআন। সাহি মুষকে বল ঘুট্টিয় ॥
মধ্যান ভান প্রথিরাজ তপ। বর সমুহ দিন দিন চঢ়ে ॥
জগ জ্যোতি মস্ত সম্ভব ধনিয়। চন্দ বীজ জিম বর বঢ়ে ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

Engraved and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

দুলালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

নিদ্রাগত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসময়ে বৈষ্ণবীকে "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি হুঁকা টানিতে টানিতে "দূর দূর" করিয়া, ঘরে বসিয়া বৈষ্ণবীকে তাড়াইতে লাগিলেন। গ্রামে এরূপ একটা জনপ্রবাদ ছিল যে, রামযাদু চট্টোপাধ্যায় ভিখারীকে তাঁহার বয়সে কখনও ভিক্ষা দেন নাই, পরন্তু, অনেক 'নাছোড়' ভিখারী ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিশাল হস্তের চপেটাঘাতের সুখানুভব করিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাড়নায় বৈষ্ণবী কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, এক পা এক পা করিয়া বরাবর পাকশালার নিকটে, গিয়া দাঁড়াইল এবং "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া, সজোরে মন্দিরায় আঘাত করিতে লাগিল।

বৈষ্ণবী যখন পাকশালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন রামযাদু চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণী এবং অপরাপর মহিলারা পাকশালার দাওয়ায় বসিয়া আহারে ব্যাপৃতা ছিল। সহসা একজন যুবতী ও সুন্দরী বৈষ্ণবীকে বাটীর ভিতর আসিয়া মন্দিরা বাজাইতে দেখিয়া, তাহারা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল, এবং কেহবা গ্রাস হাতে করিয়া, কেহবা গ্রাস মুখে পুরিয়া একদৃষ্টে সেই নবাগতা বৈষ্ণবীর প্রতি তাকাইয়া রহিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী সর্ব্বমঙ্গলা কেবলমাত্র অম্ল দিয়া ভাত মাখিয়াছিলেন। তাহার পর বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হওয়াতে তিনি আর গ্রাস মুখে তুলিবার অবসর পান নাই। অল্পক্ষণ পরে সর্ব্বমঙ্গলা এক গ্রাস ভাত মুখে পুরিয়া বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা তোর নাম কি ?"

বৈষ্ণবী সেইরূপ মন্দিরায় আঘাত করিতে করিতে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার নাম দুলালী।"

চট্টোপাধ্যায়মহাশয় যখন দেখিলেন যে, বৈষ্ণবী তাঁহার তাড়নায় ভিক্ষা না লইয়া বাটী পরিত্যাগ করিল না, তখন তিনি রোষে ফুলিতে ফুলিতে বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার মানসে দক্ষিণ হস্তে এক বিশাল লগুড় লইয়া, এবং বাম হস্তে পবিত্র তাম্রকূট টানিতে টানিতে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু, তাঁহার যত বীরত্ব এখানেই চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলার দেবীর নিকট বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া আছে এবং তদীয় পত্নী তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তখন বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার বিয়াশী দশ আনা ওজনের কোপটা বৈষ্ণবীর উপরে ফেলিতে সাহস না করিয়া, প্রাঙ্গণশায়িত নিরীহ এবং ক্ষুধার্ত্ত যে 'বাঘা" কুকুর অনিমেষ নয়নে পাক-শালার দাওয়ায় মহিলাদিগের আহার দেখিতেছিল এবং মনে মনে পরিত্যজ্য ভোজ্যবস্তু প্রাপ্তির আশা করিতেছিল, সেই হতভাগা সারমেয়ের উপর তিনি যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। "বাঘা" বিকট চীৎকার করিতে করিতে সভয়ে পলাইয়া গেল। রামযাদু চট্টোপাধ্যায় আপন মনে গজর গজর করিতে করিতে স্বস্থানে আসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবীর নাম দুলালী শুনিয়া সর্ব্বমঙ্গলা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি বাপমার খুব আদুরে মেয়ে, তাই বুঝি তোর নাম দুলালী?"

দুলালী উত্তর করিল,—"হ্যাঁ মা আমি বাপ মার খুব আদুরে মেয়ে ছিলাম।"

সর্ব্বমঙ্গলা। তুই এই বয়সে বৈষ্ণবী সাজিয়াছিস্ কেন?

দুলালী। কি কোর্ব্ব মা, আমাদের জাতের এই নিয়ম।

সর্ব্বমঙ্গলা। তোর বাড়ী কোথায়?

দুলালী। আমার বাড়ী পাঁচ গাঁ।

সর্ব্বমঙ্গলা। হ্যাঁ দুলালী, তুই গান গাইতে পারিস্?

দুলালী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "আমাদের—বৈষ্ণবীদের মধ্যে অল্প বিস্তর সকলেই গান গাইতে পারে।"

তখন সকল মহিলারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে এক খানা গান গা।"—

দুলালী মন্দিরায় জোরে আঘাত করিতে করিতে বলিল, "কি গান গাবো?"—

এই প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই এক বাক্যে এক একটা গীতের ফরমাস্ করিয়া বসিল। কেহ বলিল, "একখানা নিধু বাবুর গা; কেহ বলিল, একখানা বিদ্যাসুন্দর গা, কেহ বলিল, একখানা অন্নদামঙ্গল গা।"

চারিদিক্ হইতে প্রশ্ন করাতে দুলালী কোন্ গান গাহিবে তাহাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সর্ব্বমঙ্গলা ফরমাস্ করিলেন, "ওসব গান গাস্‌নে, তুই একখানা মান-ভঞ্জন গা।"

তখন মানভঞ্জন গাওয়াই স্থিরীকৃত হইল এবং দুলালী গাহিল;—

গীত।

"দাঁড়াও দাঁড়াও কালা আমি রাধা গোপবালা,
বড় তব বিরহে কাতর।
সৃজিয়া বিষম ফাঁদ, একি কর শ্যামচাঁদ,
কেন হও ভীষণ নিঠুর॥
আমি রাধা কাঙ্গালিনী, তব প্রেমে পাগলিনী,
চাহি তব চরণ কেবল।
যেওনা যেওনা সেথা, তব তরে হব মৃতা,
দিবা নিশি ঝরিবে সলিল॥"

দুলালী বড় সুন্দর গাহিতে পারিত। তাহার কমনীয় কণ্ঠের মধুর গীত শুনিয়া সকলেই চমৎকৃতা হইল।

সর্ব্বমঙ্গলা বলিলেন, দুলালী, "তুই বেশ গান গাইতে পারিস্। আর একখানা গান গা না।"

দুলালী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর একদিন গাইব মা। আজ অনেক বেলা হয়েছে, বাড়ী গিয়ে রান্না করে খেতে হবে।"

ইতিমধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা অম্লমাখা ভাত কয়েকটী বদনে দিয়া শেষ করিয়াছিলেন। তিনি হাত মুখ ধুইয়া দুলালীকে বলিলেন, "দুলালী দাঁড়া, চাড্ডি চাল নিয়ে যা।"

দুলালীকে বসিতে বলিয়া, সর্ব্বমঙ্গলা গৃহে ঢুকিয়া এক সরা চাউল এবং দুইটা আলু ও একটা বেগুন লইয়া দুলালীর নিকট আসিলেন এবং তাহার ঝোলায় ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "তুই আর একদিন এসে গাস্, আর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী এসে ভিক্ষা নিয়ে যাস্; পাঁচগাঁ ত এখান থেকে বেশী দূর নয়।"

দুলালী হাসিয়া বলিল, "আস্‌ব বৈকি মা। আমরা আপনাদের বাড়ী না এলে কোথায় যাব, ভিক্ষা আমাদের কে দেবে"।

গৃহিণীর নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া দুলালী বাটীর বাহির হইল এবং অবিলম্বে শঙ্করপুর পরিত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

দুলালীকে বিদায় দিয়া সর্ব্বমঙ্গলা তাম্বূল খাইবার মানসে যখন গৃহে ঢুকিয়াছিলেন, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভয়ে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "কেন অযথা কতকগুলা চাউল নষ্ট করিলে" ?

(৩)

সন্ধ্যা হইতে অল্প বিলম্ব ছিল। দিননাথ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম-মানসে সুবর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ থালের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া পশ্চিম গগনে বিলীন হইয়াছিলেন। বিহঙ্গমকুল তরুশাখে বসিয়া কিচির মিচির শব্দ করিতেছিল। দুই চারিটা যূথভ্রষ্ট পক্ষী কুলায়াভিমুখে ত্বরায় উড়িয়া যাইতেছিল। নিশা-বিহারী পক্ষীসকল নীড় ছাড়িয়া ধীরে বাহির হইতেছিল। শিবাগণ গহ্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিতেছিল। রাখালেরা মাঠ পরিত্যাগ করিয়া, গরুর পাল লইয়া পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। বিটপী-শিরে অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্বগগন হইতে শশধরও ধীরে ধীরে উদিত হইতেছিলেন। আকাশপটে দুদশটা তারকা ম্লান জ্যোতিঃ লইয়া বিরাজ করিতেছিল।

শঙ্করপুরের ন্যায় পাঁচগাঁও একটী পল্লী, প্রভেদের মধ্যে শঙ্করপুর অপেক্ষা পাঁচগাঁয়ে মুসলমান জাতির বাস অধিক। পাঁচগাঁয়ে অন্যান্য জাতিরও বাস ছিল।

সন্ধ্যার অত্যল্পকাল পরে দুলালী পাঁচগাঁয়ে আসিয়া উপনীত হইল। দুলালীর সম্পত্তির মধ্যে একখানি কুটীর। সেখানি লোকালয় হইতে একটু দূরে

এবং গ্রামের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। দুলালী ধীরে ধীরে সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার কুটীরের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। কুটীর আলোকবিহীন ছিল।

কুটীরে একটী চিন্তিতমনা যুবক বসিয়াছিল, যুবক সুপুরুষ, মুসল্‌মান, যুবক বলিষ্ঠ। তাহার আয়ত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল। যুবকের পরিধানে সেনানীর পরিচ্ছদ। তাহার মস্তকে উষ্ণীষ, বামকোষে তরবারি বক্ষে কবচ শোভা পাইতেছিল। যুবকের দক্ষিণদিকে ভূতলে ভীষণ শূল পতিত রহিয়াছিল।

কুটীরের দুয়ার উন্মুক্ত ছিল। দুলালী কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহ আঁধার। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ আলো জ্বাল নাই?"

যুবক উত্তর করিল, "না তোমার অপেক্ষায় আছি।"—

তারপর দুলালী চক্‌মকি ঘসিয়া আগুন জ্বালিল, পরে প্রদীপ ধরাইল। প্রদীপের ক্ষীণালোক শূল এবং অসির উপর পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

দুলালী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সৈয়দ হোসেন আজ তোমার একি বেশ?" যুবকের নাম সৈয়দ হোসেন।

দুলালীর আশ্চর্য্যজনক প্রশ্নে সৈয়দ হোসেন উত্তর করিল, "আজ আমি গৌড়ে যাব, আমার বেশ দেখে আশ্চর্য্যান্বিতা হোলে কেন মেহেরা?"

দুলালীর আসল নাম মেহেরা, "দুলালী" তাহার কল্পিত নাম।

মেহেরা। আজ হঠাৎ গৌড়ে যাবে কেন?

হোসেন। মেহেরা! প্রাণের মেহেরা! আমি কেবল তোমাকে রক্ষা করার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা না হ'লে, আমার হস্তে মজঃফর শার পাপরসনাযুক্ত মুণ্ড এতদিনে ধূলায় লুণ্ঠিত হইত। মেহেরা, মজঃফর শাহও পাঠান, আমিও পাঠান। কালচক্রে সে আজ বাদসাহ, আর আমি তোমাকে নিয়ে চোরের মতন গোপনে গোপনে বেড়াইতেছি।

মেহেরা। হোসেন, স্বামী! আমার জন্য তুমি যে অশেষ কষ্ট নীরবে সহ্য করিতেছ, আমি তাহা জানি। কিন্তু আল্লা আমাদের ওপর বড় বিরূপ!

হোসেন। আমাদের ওপর কি আল্লার করুণা হবে না?

মেহেরা। আল্লার তো করুণা তোমার উপর ছিল। তাঁরই দয়ায় তুমি

বাদসাহের সেনাপতি ছিলে। কেবল আমার এ পোড়া রূপের জন্য, তুমি বাদসাহের কোপানলে পড়িয়াছ।

হোসেন। আমি তোমার স্বামী, স্বামী বর্ত্তমানে এক পিশাচ বলপূর্ব্বক তোমাকে কাড়িয়া লয়। তার চেয়ে এপ্রকার অজ্ঞাতবাস, আর ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয়ঃ।

মেহেরা। তুমি সহায়হীন—একা। কেন অনর্থক গৌড়ে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আন্‌বে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরঞ্জন সান্ন্যাল।

দেব-বংশঃ।

[৬]

রামবল্লভোঽথ রাজাভূৎ তস্যকুলে জাতো নূনম্।
তস্যান্তে কৃষ্ণবল্লভো হরিবল্লভোঽতঃপরম্॥ ৬৮
হরেরাত্মজঃ সম্ভূতো জয়দেবো মহামতিঃ।
পুত্রহীনোঽভবদ্রাজা চন্দ্রদ্বীপে প্রথমতঃ॥ ৬৯
বসুবংশে সঞ্জাতোঽসৌ দৌহিত্রো জয়দেবস্য।
চন্দ্রদ্বীপস্য রাজাভূৎ মাতামহে গতে সতি॥ ৭০
কুলাচারবিরুদ্ধত্বাৎ কুপিতা দেববংশজাঃ।
তৈঃ সমাক্রান্তোঽসৌ রাজা মহাভীতো ভবেত্তদা॥ ৭১
অথৈকদা স দৌহিত্রো নক্তঞ্চ পাপসঙ্গমে।
জঘান তৎ দেবকুলং নিষ্ঠুরৈর্গুপ্তঘাতকৈঃ॥ ৭২

অনুবাদ—রাজা দনুজমর্দ্দনের কুলে জাত রমাবল্লভ পরে রাজা হন

রমাবল্লভের পরে কৃষ্ণবল্লভ তাহার পরে হরিবল্লভ রাজা হইয়াছিলেন। মহামতি জয়দেব হরিবল্লভের পুত্র। তিনি প্রথমতঃ চন্দ্রদ্বীপে পুত্রহীন হন। বসু-বংশে জাত তাঁহার দৌহিত্র মাতামহের মৃত্যুর পর চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। ইহা কুলাচারবিরুদ্ধ হওয়ায়, দেববংশীয়েরা কুপিত হন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজা ভীত হইয়া পড়েন। তাহার পর সেই দৌহিত্র এক পাপ-সঙ্গম রাত্রিতে নিষ্ঠুর গুপ্তঘাতকদের দ্বারা দেববংশীয়দিগকে নিহত করিয়া ফেলেন।

টিপ্পনী—চন্দ্রদ্বীপস্থাপন ও তথায় রাজত্ব করিয়া দনুজমর্দ্দন যথাসময়ে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র রমাবল্লভ রাজা হন। কচুয়া প্রথমে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের রাজধানী হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রণেতা ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, রাজা দনুজমর্দ্দনদের বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল কচুয়া তাঁহার রাজধানী ছিল ইহাই প্রকাশ আছে। তাঁহার পুত্র রাজা রমাবল্লভ রায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং বহুদূরে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং তাঁহাদের বিবাহ ও কুলসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করেন। কিন্তু দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের উক্তি যে প্রকৃত নহে, তাহা তাঁহার মুদ্রা ও দেববংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। দেববংশের মতে তিনি বঙ্গজকায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি ও হইয়াছিলেন, তাহা হইলে কুলবিধান প্রথমে তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। পরে রমাবল্লভ তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। দেববংশের শেষ রাজা জয়দেব অপুত্রক হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র দেহুড়গাতিনিবাসী বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। পরমানন্দ দেববংশীয়গণকে হত্যা করিয়া ছিলেন বলিয়া দেববংশে উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্গজকায়স্থকারিকাতে পরমানন্দের রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"বলভদ্রাত্মজো ধীমান্ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ॥
তস্য মাতামহকৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশসমুদ্ভবঃ॥

মৃত্যুকালং প্রাপ্য স হি ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ।
পরমানন্দকস্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥”

পরমানন্দও অনেক কুলবিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এই বসুবংশীয় ভূপালগণই বাঙ্গালার বার ভূঁইয়ার অন্যতম ছিলেন। পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ অথবা তাঁহার পুত্র কন্দর্পনারায়ণের সময়ে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে চন্দ্রদ্বীপ মহাজলপ্লাবনে বিধৌত হইয়া যায়। সে সময়ে ইহা বাকলা নামে অভিহিত হইত। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজ পর্য্যাটক রাল্‌ফ ফিচ্ বাকলায় গমন করেন, তখন কন্দর্পনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। জগদানন্দ অথবা কন্দর্পনারায়ণের সময়েই মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। মোগল-সেনাপতি মুনিম খাঁর আদেশে মোরাদ খাঁ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। কন্দর্পনারায়ণের পর তাঁহার শিশুপুত্র রামচন্দ্র বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জেসুইট প্রচারক ফনসেকা তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হন, সেই সময় তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া প্রচারকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, রামচন্দ্র প্রচারকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ সম্পাদিত হয়। প্রতাপাদিত্য সেই বিবাহসময়ে রামচন্দ্রকে হত্যা করার চেষ্টা করায় তিনি যশোহর হইতে পলায়ন করেন। প্রতাপাদিত্যের কুচেষ্টার জন্য রামচন্দ্র বিন্দুমতীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্র বিন্দুমতীকে একবারেই পরিত্যাগ করেন কিন্তু আবার কাহারও কাহারও মতে রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই গর্ভে তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণের জন্ম হয়। রামচন্দ্র ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া আনেন। গঞ্জালেস্ ফিরিঙ্গী (পর্টুগীজ) তাহার, সাহায্যে প্রবল হইয়া উঠে, পরে সে রামচন্দ্রের সহিত বিবাদ উপস্থিত করে। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। বসুবংশের শেষ রাজা প্রেমনারায়ণ অপুত্রক হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় উলাইল গ্রামনিবাসী

উদয়নারায়ণ মিত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারে প্রেম নারায়ণ বাসুদেব নারায়ণের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশে বাসুদেবনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণের মধ্যে প্রতাপনারায়ণ নামে আর একজন রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, মিত্রমহাশয় আবার অন্যত্র প্রেমনারায়ণকেই বসুবংশের সপ্তম নৃপতি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদয়নারায়ণের রাজনারায়ণ নামে আর এক ভ্রাতা ছিলেন, বঙ্গজকায়স্থকারিকার মতে উভয়েই চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন।

"অথোদয়নারায়ণো রাজনারায়ণঃ সুধীঃ।
গৌরীচরণস্য সুতৌ মহাশূরৌ মহাবলৌ ॥
তয়োশ্চ মাতুলঃ প্রাজ্ঞশ্চন্দ্রদ্বীপেশ্বরো বলী।
প্রেমনারায়ণো রাজা বসুবংশে সমুদ্ভবঃ ॥
সন্তানসন্ততিহীনো লোকান্তরমসৌ গতঃ।
ততো বভূবতুশ্চন্দ্রদ্বীপেশৌ তৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥"

কিন্তু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের মতে উদয়নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, রাজনারায়ণ কতক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বসুবংশীয়গণের পরে মিত্রবংশীয়গণই চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও বঙ্গজকায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হন। বাকলা সম্বন্ধে আইন আকবরীতে এইরূপ লিখিত আছে,—

SIRCAR BOKLA.

Containing 4 Mahls, 7,130, 645 Dams.

	Dams.		Dams.
Ismailpoor.		Sirryrampoor,	252,000
Commonly		Shahzadehpoor,	977,245
Galled Bokla,	43,47,960	Adelpoor,	1,553,440

This Sircar furnishes 320 cavalry aud 15,000 infantry.

(Gladwin's Ayeen Akbery).

সরকার বাকলার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে কোন পরগণার উল্লেখ নাই। পরে

কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি স্বতন্ত্র পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

"Pargana Chandradwip.—This Fiscal Division was assessed at £660 at the time of the Muhammadan settlement of 1721. The rental in 1867 was returned at £20;138. The Collection of the revenue of this Fiscal Division was a source of constant trouble to Government. It was under attachment for years; and, after fruitless endeavours to realise outstanding balances, it was put up for sale in 1799 A. D. At the time of the Decennial settlement it was offered at the assessment of 1789, viz., £ 8972, 10s. one source of arrears lay in the very many independent taluks into which the Fiscal Division was subdivided. Among these were some very intricate rent-free tenures, particularty the Nankar and Hissazat. The lattar were lands originally exempted from the payment of revenue during the time of the native Government in consideration of the personal service of the Zamindar, and his supplying troops for repelling the incursions of the Maghs. Under instructions from Government, the Board eventually directed that Nankar and Hissazat lands should be included in malguzari or rent-paying lands."

(Hunter's Statistical account of Bakarganj P. 224).

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার মধ্যে গোমেদপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, ইদিলপুর ও কোটালিপাড়া নামে পাঁচটি পরগনা আছে।

কুরুক্ষেত্রে উত্তরা।

প্রফুল্ল কানন কোথা ভরা ফুলজালে,
কহ গো নলিনী কোথা শুভ্র মুখখানি ?
বসন্তপ্রভাতে নীল শৈল অন্তরালে,
রক্ত পট্টবাসে কোথা হাস উষারাণি।
কোথা সে নক্ষত্র-দাম-শোভিতা শর্ব্বরী ?
চারিদিকে ধূমরাশি তীব্র শিখানল,
আঁধারে প্রলয়রূপা কাল-বিভাবরী,
ভয়ঙ্কর শবারণ্যে ভ্রমে শিবাদল।
নিশি বিভীষিকাময়ী ;—কে তুমি সুন্দরি !
কি হেতু পশিছ একা কুরুরণভূমে ?
অতসী-কুসুম-তনু-সুবর্ণ-বল্লরী,
এখনি শুখাবে বালা লক্ষ-চিতা-ধূমে !
চিনেছি উত্তরা তোমা ;—হে রাজনন্দিনি !
পতি-শোকে উন্মাদিনী বিহ্বলা মোহিনী !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

জ্ঞান ও সভ্যতা।

জ্ঞানের উন্মেষেই সভ্যতার উন্মেষ, জ্ঞানের উন্নতি বিস্তৃতি ও পরিণতিতেই সভ্যতার উন্নতি বিস্তৃতি ও পরিণতি। সাম্রাজ্যসংগঠন তাহার পালন ও সংরক্ষণ, পরস্পরের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনুকূল সামাজিক ও নানা প্রকার সম্বন্ধের সংস্থাপন, কৃষির প্রচার বাণিজ্যের বিস্তার শিল্পের প্রতিষ্ঠা, ধনবৃদ্ধি বলবৃদ্ধি ও মানবৃদ্ধি প্রভৃতি বাহ্যসম্পদ; শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বাৎসল্য সরলতা হইতে অণিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ত্রিকালদর্শিতা সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি অধ্যাত্মসম্পদ, মানুষের জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের চেষ্টায় পৃথিবীর স্থানে স্থানে আজ পর্য্যন্ত যত গুলি সভ্যতার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীরই মূলে মানুষের জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠায় দণ্ডায়মান। এই যে সভ্যতা যাহা আজ ষোড়শ কলায় পূর্ণতা লাভ করিয়া পৃথিবীর প্রবীণ আদর্শের উপর নূতন করিয়া একটা ছায়াপাত করিতে চলিয়াছে, ভুজবল অর্থবল ও নানারূপ অদ্ভুত কলাকৌশলের মধ্য দিয়া যে সভ্যতা আজ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকে সবলে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে এ সভ্যতাও মানুষের বিজ্ঞানবৃক্ষেরই একটা ফল। মানুষেরই জ্ঞান নিত্য নবোদ্ভাবিত উপায়ের বলে সমগ্র বিশ্বের উপর আজ এই প্রভুশক্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে, মানুষেরই জ্ঞান আজ শত শত যন্ত্রতন্ত্র গোলাগুলি কামান-বন্দুকের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, শাসনসংরক্ষণ ও শৃঙ্খলাবিধানের আবরণে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া মানুষেরই জ্ঞান আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন দেখিতে পাই দুই বা ততোধিক সভ্য জাতি শিল্প ও বাণিজ্যাদি লইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন মনে হয় ইহা ত শিল্পের সহিত শিল্পের, বাণিজ্যের সহিত বাণিজ্যেরই প্রতিযোগিতা নহে, এ প্রতিযোগিতা যে মানুষের জ্ঞানের সহিত মানুষের জ্ঞানের। শিল্প ও বাণিজ্যের আবরণে মানুষেরই জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, যখন দেখিতে পাই কোনও দুই সভ্য

জাতির মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, কামান বন্দুক গোলা গুলি লইয়া পরস্পর পরস্পরের বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন মনে হয় সে যুদ্ধ ত মানুষে মানুষে নহে, কামান বন্দুক গোলা গুলিতে নহে, সে যুদ্ধ মানুষের জ্ঞানে জ্ঞানে, সে পরীক্ষা মানুষের বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে। আপনার ঘরে মুখ ফিরাইয়া যখন দেখি, সেখানে এক নবীন অতিথি সার্ব্বভৌম আধিপত্য বিস্তার করিয়া, আমার প্রভু হইয়া বসিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী এক বিপুল সাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়া আজ তাহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তখন মনে হয় ইহা ত মানুষের আধিপত্য নহে, ইহা যে জ্ঞানের আধিপত্য ইহা ত মানুষের রাজত্ব নহে, ইহা যে জ্ঞানের রাজত্ব, হৃদয়ের কোনও গুপ্তক্ষেত্রে যদি কোনও রূপ হিংসা দ্বেষ বা ঈর্ষার অঙ্কুর লুক্কায়িত থাকে, তবে তখনই তাহা সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়, অধীনতার দুঃখ পরমুখাপেক্ষিতার বেদনা ভুলিয়া গিয়া সে আধিপত্য সে প্রভুত্বের চরণে মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। এইরূপে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র, সভ্যতাভিমানী আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির সার্ব্বভৌম বিজয়বার্ত্তার মধ্য দিয়া তাহার জ্ঞান তাহার বিজ্ঞানেরই বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া থাকে।

কেবল আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি সম্বন্ধেই এ কথা নহে যে কোনও কালে পৃথিবীর যে কোনও জাতি অদৃষ্টলক্ষ্মীর সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া কালবক্ষে আপনার একটা স্থায়ী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অভ্যুদয়ের মূলতত্ত্বের অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, সে অভ্যুদয়ের মূলে আর যাহাই থাকুক, তাহার মূলে তাহার জ্ঞানের যে কোনও রূপ একটা সমুচ্চ বিকাশ সন্নিহিত আছেই আছে। তাহার জ্ঞানই বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করিয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টির দ্বারা তাহাকে সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই জাতি আপনার জ্ঞানের সেই বিকাশ বা বিশিষ্টতাটুকু আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ঐশ্বর্য্য সে সমৃদ্ধির গৌরব ভোগ ততদিন পর্য্যন্তই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিধাতার রোষদীপ্ত নিষ্ঠুর দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গবিস্ফুরণে যখন সে ঐশ্বর্য্য সেই সমৃদ্ধি ভস্মীভূত হইয়া তাহাকে দৈন্যের পথে উপনীত করিয়াছে, তখন তাহার সেই জ্ঞানের প্রদীপ যতদিন পর্য্যন্ত একেবারে তৈলবিহীন হইয়া

যায় নাই ততদিন পর্য্যন্ত তাহা সৌদামিনীর ললিত বিলাসে না হউক কোনও রূপে তাহার মুখমণ্ডলকে আলোকিত রাখিয়াছে। জ্ঞানরূপে যে কোনও জাতি আজ পর্য্যন্ত যে কোনওরূপ একটা বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর বরমাল্যে একমাত্র তাহাদেরই কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে। আর যাঁহারা তাহা পারেন নাই স্বয়ম্বরসভায় ক্লীবের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহারা সে ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হইয়াছেন। অতএব দেখা যায় মনুষ্যজাতি যখনই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে তখনই তাহার জ্ঞানের যে কোনও একটা ধারা সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করিয়া তাহার সহায়তা করিয়াছে। অথবা তাহার জ্ঞান যখন বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই তাহা সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন স্থানে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সভ্যতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা যাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র, তদ্ব্যতীত সভ্যতার আর একটা অঙ্গ আছে তাহা মানুষের জ্ঞান, তাহাই সভ্যতার অন্তরঙ্গ, অথবা তাহাই সভ্যতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। এই সভ্যতা তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তাহারই আশ্রয়ে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। কাজেই সভ্যতার এই বাহ্য পার্থক্যের মধ্য দিয়া তাহার জ্ঞানগত পার্থক্যও সুপরিস্ফুট অথবা জ্ঞানগত পার্থক্যই বাহিরে এরূপ নানা আকারে অভিব্যক্ত। দেশভেদে কাল ভেদে এই যে জ্ঞানের এক একটা ধারা একটু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সভ্যতার এক একটা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সংগঠিত করিয়াছে এ ভিন্নতা বা এ বিশিষ্টতার মূল কোথায়, কি কারণে কোন্ নিয়মে কোথায় কোন্ মূর্ত্তিতে ইহা উদ্ভূত হইয়া এরূপ পার্থক্যের সঞ্চার করিয়াছে এখন তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য।

আহ্বান।

১

অন্ধের নয়ন মণি আলোক আমার।
হৃদি মম উজলিত এস একবার॥
আঁধার হৃদয় মাঝে, সাজায়ে কুসুম সাজে,
পাতিয়াছি হেম-ময় রত্ন সিংহাসন।
এস তুমি বস তাহে হৃদয়-রঞ্জন॥

২

একবার এস মম আরাধ্য দেবতা।
দরশনে দূর হবে হৃদয়ের ব্যথা॥
করুণা-কটাক্ষ দানে চাবে কি আমার পানে,
শুনিবে বারেক কিগো আকুল আহ্বান।
লবে কি চরণে তব এই ক্ষুদ্র প্রাণ॥

৩

আকাশ কুসুম সম আকাঙ্ক্ষা আমার।
ক্ষুদ্রমতি শোভাহীনা আমি যে তোমার॥
আমার এ প্রেম গিয়া পরশিবে তব হিয়া
মিলিবে কি দুটি প্রাণ একই প্রেম ভরে।
বাজিবে কি দুটি হৃদি একই সুস্বরে॥

৪

হে চির-বাঞ্ছিত মম এস একবার।
যতনে পরাব গলে ভকতির হার॥
আঁধার হৃদের আলো, তোমারে বাসিয়া ভালো,
বাঁচিয়া রয়েছি, মোর তুমি মাত্র সার।
ভিখারীর লুকায়িত রতন-ভাণ্ডার॥

৫

এস গো আনন্দময় দেবতা আমার।
সংসার মাঝারে মোর পুণ্য পারাবার॥
অশ্রুধৌত পুষ্পদামে মালা গাঁথি তব নামে
সাজায়ে রেখেছি তারে হৃদয়-মন্দিরে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিব দেব পূজা উপহারে॥

৬

হৃদি মাঝে নীলোৎপল করিয়া রচন।
রাখিয়াছি ও চরণে করিতে অর্পণ॥
পরে সাঙ্গ হলে পূজা, আমার হৃদয়-রাজা
খুলিয়া লুকান বক্ষ দেখাব তোমারে।
উৎকীর্ণ তোমারি মুর্ত্তি হৃদি স্তরে স্তরে॥

৭

দেখাইব ইষ্টদেব তোমারি ও নাম।
দিবানিশি ধ্যানে জ্ঞানে জপি অবিরাম॥
আমার হৃদয়স্বামী অবশিষ্ট শুধু আমি,
আমার আমত্বটুকু দক্ষিণার তরে।
উৎসর্গ করিব দেব ও চরণোপরে॥

৮

আকাঙ্ক্ষা বাসনা আর দান প্রতিদান।
চাহিনা, দিয়াছি দেব স্বার্থে বলিদান॥
মোর এই ক্ষুদ্র প্রাণ দেব পদে করি দান
হৃদয়ের সব সাধ করিব পূরণ।
জীবনে মরণে শুধু চিনি ও চরণ॥

শিবদুর্গা দেবী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, কার্ত্তিক সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি, পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য নামে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে আশ্বিন মাসেই ভি, পি করিব। আশা করি, সকল গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য ; এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ, ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora.) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগমনী।

শ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ২য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩২১। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অবতরণ।

শারদ ষষ্ঠীর নীল আকাশ প্লাবিয়া,
হিমাদ্রির শুভ্রচূড়া করিয়া চুম্বন,
নির্ঝরিণী স্বচ্ছ-বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া,
বিমল কৌমূদী রাশি খেলিছে কেমন!
কন্দর কুঞ্জের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারি,
ছায়া সনে মিশামিশি করিয়া আবার,
শ্যামল বিটপীশিরে আলোক বিথারি,
ছড়ায়ে পড়িল তাহা বসুধা মাঝার।
দেখ দেখ, কোটিগুণ করিয়া বর্দ্ধন,
কৌমুদীর উজ্জ্বলতা সহসা ভাতিল।
কি এক জ্যোতির রাশি বিশ্ববিমোহন,
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবাসী বিস্ময়ে চাহিল।
অবতীর্ণা জগন্মাতা গণেশ-জননী,
বরষের পরে পূত করিতে ধরণী।

আলোচনা।

মা আসিতেছেন।

নিরানন্দ বঙ্গে আবার সম্বৎসর পরে আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, তাই যেন চারিদিকে আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু এ আনন্দের ভাব বৎসরে বৎসরে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সন্তানগণেরও আন্তরিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তাই বাঙ্গলার আনন্দ যেন প্রাণহীন বলিয়াই বোধ হয়। দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়ায় বঙ্গভূমি যেরূপ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে, বঙ্গবাসীর হৃদয়ও সেইরূপ দিন দিন ঘোর অন্ধকারময়ও হইয়া উঠিতেছে। নিরুদ্যম, নিরাশার সহিত অজ্ঞান ও মোহ তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। দিন দিন তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, কাজেই তাহাদের হৃদয়ে কিরূপে আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে? বঙ্গের পল্লী সকল এক্ষণে অরণ্য-সম, সেই মহারণ্যের মধ্যে কোন কোন গৃহে মার আগমন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেরূপ আনন্দত দেখিতে পাই না। হয়ত কেহ পুত্রশোকে কেহ বা পতিশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, শোকাশ্রু তাহাদিগের বক্ষ প্লাবিত করিয়া দিতেছে, এবং তাহাই যেন মার পাদ্যস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। তথাপি এই করুণদৃশ্যের মধ্যেও কিছু কিছু আনন্দের লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই? মার আগমনে সকল গৃহেই কিছু না কিছু আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৎসর বৎসর তাহার হ্রাস হইলেও এমন আনন্দ আমরা আর কখনও পাই না। তাই মা আসিতেছেন বলিয়া আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।

মার পূজা।

মা আসিতেছেন, যথাশক্তি সকলে পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন সত্য, কিন্তু মার প্রকৃত পূজা কি আমরা দেখিতে পাই? আমাদের হৃদয় হইতে সাত্ত্বিকতা দিন দিন অপসৃত হইতেছে। রাজস ও তামস ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাই আমরা সাত্ত্বিক পূজা পরিত্যাগ করিয়া রাজস ও তামস পূজারই আয়োজন করিয়া থাকি। মার পূজায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করিয়া

পশুহত্যা ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে আমাদের দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা পশুবলির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু পশুহত্যা কদাচ সমর্থন করিতে পারি না। সাত্ত্বিক পূজার সহিত যেখানে বলি হয়, তাহাই প্রকৃত পশুবলি। আর মাংস ভোজনের জন্য পশু নাশ পশুহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অধিকাংশ স্থানে পশুবলির পরিবর্ত্তে এই পশুহত্যাই হইয়া থাকে। আবার ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি সৎকার্য্যের পরিবর্ত্তে বেশ্যার নৃত্য-গীত পূজার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে, তথাপি ব্রাহ্মণ সেবা বা দরিদ্র সেবার দৃষ্টান্ত আমরা আর দেখিতে পাইতেছি না। পল্লীগ্রামে যাঁহারা ব্রাহ্মণ সেবা ও দরিদ্র সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সেরূপ সামর্থ্যও নাই— দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি সকলকে ক্রমেই উৎসাহ হীন করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের আবার অর্থবল আছে, তাহারা পশুহত্যা ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত। এরূপ তামস পূজায় অধঃপতন ব্যতীত কদাচ অভ্যুদয় আসিতে পারে না। পূজায় সেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধাও দেখা যায় না। সেই ভোলা দাস, দুর্গাশরণ, কালীশরণের ন্যায় * ভক্তিপূর্ণ মাতৃপূজা আমরা কি আর দেখিতে পাই? মার আগমনে আত্মহারা হইয়া আমরা তাঁহার পূজার জন্য কি ব্যস্ত হইয়া থাকি, না কেবল কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ ও উদর-তুষ্টি লইয়াই পূজার কয়দিন ব্যস্ত হইয়া উঠি। সাত্ত্বিক পূজার দিন দিন হ্রাস হইতেছে বলিয়া আমাদেরও এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। যতদিন আমরা এই তামস পূজা পরিত্যাগ না করিয়া ভোলাদাস প্রভৃতির ন্যায় পূজা করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের কল্যাণের কোনই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে না। আমরা দিন দিন অণুতমেই প্রবেশ করিব। মার জ্যোতি আমাদের সম্মুখ হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। অতএব আমাদের সাবধান হওয়া কি উচিত নহে?

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার।

পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতাদির পর চূড়ামণি মহাশয় পরমেশ্বরের স্বরূপ, দশমহা-বিদ্যা প্রভৃতি গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার অগাধ

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত "দুর্গোৎসব-পঞ্চক" বা "ভক্তি সুধালহরী" দ্রষ্টব্য।

চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় শাস্ত্র ভক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার এই অমৃতময়ী কথা শুনিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। তাঁহার এই অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রচার পরেও চলিবে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছেন। রেবতীরমণ চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট দর্শন ও উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার উপদিষ্ট পথেই আপনাকে চালিত করিতেছেন। তিনি যে সমস্ত উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাহাই নিজ সুচিন্তায় পরিপূর্ণ করিয়া সাধারণকে উপহার দিতেছেন। সাধারণের এরূপ সুযোগ কদাচ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিসভা।

বঙ্গবাসীর প্রবর্ত্তক যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বৎসর বৎসর সভা হইয়া থাকে। এবার তাহার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় এবার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর জন্য বঙ্গবাসী যোগেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষরূপ ঋণী। তিনিই এই বর্ত্তমান যুগের সুলভ সংবাদ পত্রের প্রবর্ত্তক। বিশেষতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুসমাজের মুখপত্র হওয়ায় বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই যোগেন্দ্র চন্দ্রকে যে চিরদিনই স্মরণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশও বঙ্গে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছিল। বঙ্গবাসী ও শাস্ত্র-প্রকাশ যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আমাদের নিকট চির অমর করিয়া রাখিবে। তথাপি তাঁহার স্মৃতির জন্য আমরা যে বৎসর বৎসর সমবেত হই তাহা অবশ্য আমাদের কর্ত্তব্যের পরিচায়ক বটে। আমরা তজ্জন্য সভার প্রবর্ত্তকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মার আগমন।

সারা বৎসরের জড়তার মধ্যে আবার চেতনার স্পন্দন, দুঃখ শোকের আঁধার গৃহে আবার পুণ্যোজ্জ্বল আলোকের উদয়, নিরাশার কাদম্বিনী বক্ষে আবার বিদ্যুচ্ছটার স্ফুরণ! সারা বৎসর পরে দীন, অনাদৃত, দুঃখী সন্তানের গৃহে আবার মহামায়ার আগমন। মৃণ্ময়ী প্রতিমায় আবার চিন্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা! জড়প্রকৃতি, বঙ্গভূমি জগজ্জননীর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। জগতের অধীশ্বরী আজ ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিতেছেন—তাই সকলেই যথাসাধ্য মাতার পূজার আয়োজনে ব্যগ্র রহিয়াছে। শরতের রৌদ্রে মায়ের কমল মুখ পাছে ঝলসিয়া যায়, অমন গৌর তনু পাছে ম্লান হইয়া যায়, তাই নীলাকাশ মাথায় ছত্র ধরিয়াছে। পৃথিবীর পূতিগন্ধ পাছে মায়ের পবিত্র নাসায় আঘ্রাত হয়, তাই কুমুদ কহ্লারাদি কুসুমচয় প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। বহু পথ অতিক্রম ফলে মায়ের ক্লেশ দূর করার জন্য স্বচ্ছ, প্রসন্ন সলিলরাশি পাদ্য হইয়া আছে। জগতের জননীর কাছে বঙ্গভূমি কেন দীনা হীনা মলিনা থাকিবে, তাই নানা সাজে আজি সাজিয়াছে। আপনার দীন দরিদ্র সন্তানগণ পাছে আপনাদের তুচ্ছ পার্থিব হীন অবস্থা দেখাইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেন, তাই বঙ্গভূমি বঙ্গবাসিকে সুন্দর বেশভূষায় সাজাইয়া রাখিয়াছে। এ অভ্যর্থনা কি সুন্দর! জড় প্রকৃতির এই অভ্যর্থনা কি মধুর! অচেতনের উপাসক সাজা কি মনোজ্ঞ!

"তস্মিন্নেবাকালে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং" 'উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং" বলিয়া উপনিষৎ যে দেবীর কথা বলিয়াছেন, "অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং অহমেব সতইব প্রবাসি," আমি জগদীশ্বরী, জগতকে ধন বিতরণ আমিই করি, আমিই বায়ুরূপা হইয়া বহিয়া থাকি—এই প্রকারে শ্রুতি স্বয়ং দেবীর মুখ দিয়াই মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন। "যা শক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা" বলিয়া পুরাণ যাঁহার স্তব করিয়াছেন, মহাশক্তির অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেই জগতের ঈশ্বরী বিশ্বের জননী মহামায়া দুর্গা আমাদের মা আজি

আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে সমাগতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর কাছে লীলানিশ্বাস, সমস্ত সৌন্দর্য্য যাঁতে একীভূত, সমস্ত শক্তির যাঁহা মূল—সেই সৃষ্টিকর্ত্রী রক্ষাকারিণী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যশালিনী মহাশক্তি আজ আকার ধরিয়া সম্মুখে আসীনা। কি আনন্দের, কি গৌরবের এ দিন। আজ সেই মহামায়ার আবাহন, সংস্কৃত মন্ত্রে দশভূজা দুর্গার আজ আবাহন!

কার আবাহন? সদা জাগ্রত সদা অবস্থিত তার আবার আবাহন কি? তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত বটে, কিন্তু আমরা যে নিদ্রিত! তিনি সর্ব্বদা আমাদের সমীপে অবস্থিতা বটে, কিন্তু আমরা যে বাসনারদ্বারা উৎক্ষিপ্ত, বহুদূরস্থ! তিনি অলোকসুন্দরী সাকারা, কিন্তু আমরা যে মোহান্ধ! কৈ আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহাকে আপনার মা ভাবিতে পাই না, তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রাণের আকুলতা পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দিতে পারি না। তাই ত দশভুজা প্রতিমাকে ঘরে আনিয়াছি তাই ত মাকে দেখিয়া স্বস্তি পাইয়াছি।

আমাদেরই আজ জাগরণ। সারা বৎসর নিদ্রা গিয়া আজ জাগিয়াছি। এতদিন আমরা নিদ্রিত ছিলাম, তাই জননীও আমাদের জাগ্রতা থাকিলেও নিদ্রিতা মতই ছিলেন, হৃদয়স্থা থাকিয়াও বহুদূরস্থা ছিলেন। একি কম দুঃখ। তাই আজ আমরা জাগিয়াছি, মাকে জাগাইয়াছি। মা আসিতেছেন। আমরা আবাহন করিব না?

অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিতেছ "জগন্মাতা কৈ? ও প্রতিমা যে খড়মৃত্তিকার সমষ্টি! তোমার প্রতিমা পূজা যে পুতুল পূজা!" কে বলে আমাদের জগন্মাতা নহে? কে বলে আমরা পুতুল পূজা করি? খড় মৃত্তিকা দিয়া আমরা ত আশ্রয় মাত্র তৈয়ারি করি, জড় দেহ মাত্র প্রস্তুত করি, তার পর ঐ আশ্রয়ে, ঐ দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আজ মৃণ্ময়ীর অভ্যন্তরে চিন্ময়ীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—আমাদের প্রাণ দিয়া প্রাণসমন্বিতা করিতে হইবে। আমরা ত প্রতিমার পূজা করি না আমরা ঐ প্রতিমাতে মহামায়ার পূজা করি, এই সাদা কথাটা বোঝ না যে, প্রতিমার পূজা করি। এই প্রতিমাকে আশ্রয় করিয়া মহাশক্তির অর্চ্চনা করি! চৈতন্য সকল বস্তুতেই আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কে পারে,তাহা জানি না। ঐ সর্ব্ব বস্তুতে বিদ্যমান চৈতন্যকে আশ্রয়ের ভিতর আনিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি মাত্র; সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে আকার দিয়াছি

মাত্র। মাতার সন্তান হইয়া মাতাকে চেননা, শক্তির দাসানুদাস হইয়া শক্তির সেবা কর না!

অজ্ঞ অবিশ্বাসী, তোমার জন্ত করুণা হয়; তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি কি জান না? সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ করিতে হইলে অগ্রে স্থূলে আরম্ভ করিতে হয়। তুমি কি জান না, নৌকাযোগে মহাসমুদ্রে যাইতে হইলে নদীমুখ দিয়াই যাইতে হয়। আরও তুমি কি শুন নাই, যে, ঊর্দ্ধস্থ কোন সূক্ষ্ম বস্তুকে লক্ষ্য করিতে হইলে তাহার প্রতিবিম্বের কত উপযোগিতা। অর্জ্জুনের সেই মৎস্যভেদ সলিল বিম্বিত মৎস্যলক্ষ্যই সম্পন্ন হইয়াছিল। সাদৃশ্যমূলক উপাসনার নামই প্রতিমা পূজা। প্রতিমা—সাদৃশ্য। মন্দ মধ্যম ব্যক্তিগণের জন্য প্রতিমা পূজা, উত্তমের জন্য নহে। ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন, আমরাও জানি, তবু কেন করি! আমরা উত্তম নহি বলিয়া। তুমি দু পাতা বই পড়িয়াছ, তুমি বহুধন উপার্জ্জন করিয়াছ, তুমি উচ্চপদে আরূঢ় আছ, তাই কি ভাবিতেছ, তুমি উত্তম! সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যার, সর্ব্বজীবে সম জ্ঞান যার, সর্ব্ববস্তুতে ঐশ্বরিক সত্ত্বানুভব যার, সেই উত্তম! যিনি উত্তমাভিমানী তাঁর একুল ওকুল দুই কুলই নষ্ট।

বৈদিক মন্ত্রের বলে, আন্তরিক ভক্তির জোরে জগজ্জননীর আহ্বান, সে কি ব্যর্থ হয়? প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তাকি বিফল হয়? আমরা মূর্খ, অজ্ঞান, ভক্তিহীন, ক্রিয়াশূন্য; আমাদের সে আন্তরিক ভক্তির জোর নাই, সঞ্জীবমন্ত্র পড়িবার শক্তি নাই। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিমায় ঐশ্বরিক চৈতন্য বিকাশ হইতে পারে। হইতে পারে কেন হয়ই। সেই বিশ্বাসে, সেই জোরে আমরা বিশ্বাসী, বলী। তাই আমরা প্রতিমায় মহামায়ার পূজা করি, ঐ চরণে অঞ্জলি দিই, প্রাণের আকুলতা নিবেদন করিয়া স্বস্তি লাভ করি। এ কি কম সুখ, এ কি কম স্বস্তি! তুমি অভাগ্য সে সুখে বঞ্চিত। তবে আমাদের বিশ্বাসের হন্তা হও কেন? এ সুখের ব্যাঘাত দাও কেন?

সর্ব্বব্যাপিনী, ভূতে ভূতে অবস্থিতা মহাশক্তি আজ দশভুজা রূপে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া আছেন। অবিশ্বাসী, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া

প্রাণ সৌন্দর্য্যরসাপ্লুত হয় কি না? ঐ চরণে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় কি না? বাস্তবিক এই মূর্ত্তি চণ্ডীমণ্ডপ ও দর্শকগণের হৃদয় আলো করে কি না? কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সমাবেশ! বামে বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, দক্ষিণে ধনধান্যরূপা লক্ষ্মী। একপার্শ্বে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, অপর পার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গজানন। ঐ মহিষাসুরের মত মাতার সম্মুখে আমাদের মোহ, আমাদের পাপ বিমর্দ্দিত হইবে না কি?

মা সর্ব্বব্যাপিনী, আমরা ত সর্ব্বব্যাপিনী ধারণা করিতে পারি না। আমাদের দৃষ্টি ক্ষীণ, পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, কাজেই এই দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া স্বশক্তিকে সাকারা সাবচ্ছিন্না করিয়াছি। আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মাতা আজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ভক্তানুকম্পার্থ ধৃতবিগ্রহা দেবীকে এস আমরা নমস্কার করি, বলি—"যাবত্বং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব"। আমরা সুস্থির হইলেই মা সুস্থিরা হইবেন। আমরা অস্থির, মাও অস্থিরা। অন্তশ্চক্ষু কোথায় পাইব, কাজেই বাহ্যচক্ষুতে দেখিবার মত মূর্ত্তি পাইয়াছি। দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইলে অন্তশ্চক্ষু আপনি প্রফুল্ল হইবে। মহামায়ার করুণা-বাতাসে ধীরে ধীরে আমাদের নিমীলিত মনশ্চক্ষু প্রফুল্ল সাকার ধারণ করিবে।

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ

তুমি মা প্রসন্না থাকিলে আমাদের ভাবনা কি? দুঃখ কি? সংসার বন্ধন ক্লেশই বা কি? মা, শুষ্ক দার্শনিকে বলে—তুমি ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁর সিসৃক্ষাও নিরাকারা। এই সৃজনেচ্ছা—মায়ার সহ মিলিত হইয়া ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সাকার। ঐ ব্রহ্মশক্তি ঐ সিসৃক্ষা, ঐ মায়াও পরমেশ্বরে স্থিতা, তখন সাকারা। পরমেশ্বর সাকার, পরমেশ্বরী সাকারা না হইবেন কেন! আমরা ও সিসৃক্ষা বুঝিনা, আমরা বুঝি অগ্নিও যে, অগ্নির দাহিকাশক্তিও সেই। অগ্নির যে কার্য্য দাহিকাশক্তিরও সেই কার্য্য।

মা, আর কি প্রার্থনা করিব? "দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং॥ "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" প্রার্থনা অনেক করিয়াছি "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং' অনেক চাহিয়াছি। মায়ের কাছে সন্তানের লজ্জা

নাই, তাহা জানি। ওসবে আর ভুলিনা। দাও মা, শুদ্ধা ভক্তি দাও তোমার সন্তান হইবার মত আধ্যাত্মিক শক্তি দাও।

শ্রীরামসহায় ভট্টাচার্য্য।

বেদ।

[৭]

বেদ ব্যাখ্যাধিকারী, মন্ত্রার্থের উপযোগিতা ও বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় (বেদার্থ)

বেদের মন্ত্রভাগ বড়ই দুরূহ এই অংশের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে দেখিতে পাই আচার্য্য কৌৎস মন্ত্রভাগের অর্থ সম্বন্ধে সন্দিহান। তিনি নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন যদি মন্ত্রার্থ জ্ঞানের জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন বল তাহা হইলে আমি বলি নিরুক্ত শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই কারণ মন্ত্রের কোন অর্থ নাই। "যদি মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ায়, অনর্থকং ভবতি ইতি কৌৎসঃ। অনর্থকা হি মন্ত্রাঃ"॥ মন্ত্রগুলিকে তিনি কেন অর্থ শূন্য বলেন তাহার কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—তাঁহার প্রধান কয়েকটী যুক্তি এইরূপ—মন্ত্রের পদগুলি পরিবৃত্তিসহ নহে ও তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, মন্ত্র ঐরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার আর মন্ত্রত্ব থাকে না।" নিয়ত বাচোযুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্ব্যা ভবন্তি।"

মন্ত্র পাঠ করিয়া যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেমন হে ওষধি তুমি ইহাকে (যজমানকে) ত্রাণ কর। ওষধির নিজেকেই ত্রাণ করিবার সামর্থ্য নাই সে অপরকে কিরূপে ত্রাণ করিবে। "অথাপ্যনুপপন্নার্থা ভবন্তি—ওষধে ত্রায়স্বৈনম্।"

মন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একজন রুদ্র বর্ত্তমান আছেন দ্বিতীয় নাই, আবার পৃথিবীতে যে অসংখ্য সহস্র সহস্র রুদ্রগণ অবস্থিতি করিতেছেন। "অথাপি বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তি।" ইত্যাদি

যাস্কাচার্য্য"অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাৎ" লৌকিক বাক্যের ন্যায় মন্ত্রও অর্থযুক্ত, কারণ লৌকিক বাক্যে ও মন্ত্রে সমান (একরূপ) শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কৌৎসের যুক্তি গুলি নিম্নলিখিত প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন। লৌকিক বাক্যেও কখন কখন পদগুলি পরিবৃত্তি সহ নহে, তাহাদেরও পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ত, (যেমন পিতাপুত্রৌ) কিন্তু সেরূপ স্থলে যেরূপ লৌকিক বাক্যের অর্থবোধ হইয়া থাকে সেইরূপ মন্ত্রের ও অর্থ বোধ হইবে।

ওষধি ইহাকে পরিত্রাণ কর ইত্যাদি স্থলে অর্থের অসঙ্গতি হয় বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহার উত্তর এই যে এস্থলে ঔষধি শব্দের দ্বারা ওষধির অধিদেবতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রার্থনা করা হইয়াছে তিনি যজমানকে রক্ষা করিতে পারেন সুতরাং এস্থলে অর্থের অসঙ্গতি হয় নাই।

একরুদ্র ও অসংখ্য রুদ্র ইত্যাদি স্থলে বিরুদ্ধার্থ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহার উত্তর এই যে এস্থলে আপাততঃ বিরুদ্ধার্থের প্রতীতি হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই কারণ দেবগণের মহৎ ঐশ্বর্য্য হেতু তাঁহারা কখন এক কখন বা বহু হইতে পারেন। কৌৎসের আর একটী আপত্তি মন্ত্রগুলি বিস্পষ্ট নহে। "অপ্যবিস্পষ্টার্থা ভবন্তি।" যাস্ক তাহার উত্তরে বলেন "নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ স ভবতি।" অন্ধ পুরুষ যে স্থাণুকে (বৃক্ষকাণ্ডকে) দেখিতে পায় না ইহাতে স্থাণুর কোন অপরাধ নাই—পুরুষই অর্থাৎ পুরুষের অন্ধত্বই এস্থলে অপরাধী। মন্ত্রগুলি অস্পষ্ট তাহাতে মন্ত্রের কোন অপরাধ নাই। যিনি মন্ত্রকে অস্পষ্ট মনে করেন তাঁহার প্রজ্ঞাহীনতাই এস্থলে অপরাধী।

এইরূপে বেদমন্ত্র সদর্থযুক্ত প্রতিপাদন পূর্ব্বক কিরূপ পুরুষ মন্ত্রার্থ নির্ণয়ে সমর্থ যাস্ক তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। "যথা জানপদীষু বিদ্যাতঃ পুরুষবিশেষো ভবতি, পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি।" দেশ প্রসিদ্ধ লৌকিক ইতি কর্ত্তব্যতাদি (অনুষ্ঠানাদি) বিষয়ে যেরূপ বিদ্যা হেতু পুরুষের বিশিষ্টত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে সেইরূপ যাঁহারা আচার্য্য পরম্পরাক্রমে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি অধিক বিদ্যাবিশিষ্ট (ভূয়োবিদ্য—বহুশ্রুত) তিনিই প্রশংসনীয়। সেই মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানকুশল পুরুষই মন্ত্রার্থ

ব্যাখ্যার অধিকারী। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের ১৩ অধ্যায়ের উপসংহার স্থলে মন্ত্র ব্যাখ্যাধিকারিসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন।

'নহ্যেতেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা পারাবর্য্যবিৎস্থ তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ।"

ঋষি ও তপস্বী ব্যতীত অপর কেহই বিনা উপদেশে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণে সমর্থ হন না। যাঁহারা উপদেশ দ্বারা আচার্য্য পরম্পরায় বেদ মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি বহু শ্রুত তিনিই প্রশংসনীয়, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। বেদার্থ বোধাধিকারী সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

যাঁহার ঈশ্বরে পরা ভক্তি ও সেইরূপ গুরুর প্রতি ভক্তি আছে তাঁহার নিকটই গুরূপদিষ্ট বেদাদির অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বহুপূর্ব্বে আর একটী মত প্রচলিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ কল্পাদি ও শিক্ষা-শাস্ত্রানুসারে—বেদমন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিহিত ভাবে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি ফললাভ হইতে পারে। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যাদি বিধি অনুসারে যথাবিহিত রূপে অর্থজ্ঞান বিহীন বেদ পাঠ দ্বারাই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রার্থ জানিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্যগণ যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়। মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত যথাবিহিত ভাবে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে—অল্প ফল লাভ হইয়া থাকে। তাহা হইলে মন্ত্রার্থ-জ্ঞান যে বিশেষ উপযোগী তাহা প্রতিপন্ন হইল। মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের উপযোগিতা শাস্ত্রেই বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃকিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞইৎসকলভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা ॥
যদ্গৃহীমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈবশব্দ্যতে।
অনগ্নাবিবশুষ্কেধোন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥

স্থাণু (বৃক্ষকাণ্ড বা গর্দ্দভ) যেরূপ ভার মাত্র বহন করে কিন্তু সেই ভার

পদার্থের গুণের উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি বেদ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ অবগত নহেন তিনি বেদ পাঠের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যিনি অর্থজ্ঞ তিনিই সকল মঙ্গল লাভ করেন। জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিদূরিত হওয়ায় তিনি স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

যাহা গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া থাকে কিন্তু যাহার অর্থ পরিজ্ঞাত নহে ও যাহা কেবল পাঠমাত্র দ্বারাই উচ্চারিত হয় তাহা অগ্নিবিহীন স্থানে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কখন প্রজ্বলিত (ফলোৎপাদনে সমর্থ) হয় না।*

মন্ত্রার্থজ্ঞান প্রশংসা ও মন্ত্রার্থাজ্ঞাননিন্দা সমর্থক বলিয়া যাস্ক নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উতত্বঃ পশ্যন্নদদর্শবাচমুতত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।

উতত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব-পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ঋ বেঃ ৮।২।২৩।৪

যিনি বেদবাক্য পাঠ করিয়া তাহার অর্থ অবগত নহেন, তিনি বেদবাক্যকে দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না—শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না। কিন্তু যিনি বেদবাক্য পাঠ করিয়া তাহার অর্থ অবগত হন, বেদবাক্ কামনাবতী সুবাসা (নীরজস্কা) পত্নীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ বিবৃত করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অপর একটি মন্ত্রও এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যাস্কাচার্য্য বেদার্থ (বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়) কি তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উতত্বং সখ্যেস্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।

অধেন্বাচরতিমায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবানফলামপুষ্পাম্॥ ঋ, বে, ৮।২।২৬।৫

যিনি বেদ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন তিনি দেব সাযুজ্যলাভ বা দেবলোকে অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। অতি দুর্জ্ঞেয় দেবতাপরিজ্ঞানাদি বেদার্থ বিষয়ে কেহই তাঁহার অনুগমন করিতে পারে না।

যিনি বেদ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ অবগত নহেন তিনি কেবলমাত্র অপুষ্প ও অফল বেদবাক্যের সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। মায়া (ঐন্দ্রজালিক)

---

* উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়কে নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্য স্মৃতির শ্লোক বলিয়াছেন। সায়নাচার্য্য এই শ্লোকদ্বয়কে বেদমন্ত্র বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ধেনুর ন্যায় বেদবাক্ তাঁহাকে স্বীয় দুগ্ধ (ফল বা জ্ঞেয় বিষয়) প্রদান করেন না। *

যাস্ক এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন "যো বাচং শ্রুতবান্ ভবত্যফলাম পুষ্পামিত্যফলাস্মা অপুষ্পা বাগ্ ভবতীতি বা কিঞ্চিৎ পুষ্প ফলেতি বা। অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহ। যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা।"

যিনি বেদবাক্ কেবল শ্রবণ করেন কিন্তু তাহার অর্থ অবগত নহেন—ঐ বেদবাক্ তাঁহার নিকট অপুষ্পা ও অফলা হইয়া থাকে। অর্থই বেদবাক্যের পুষ্প ও ফলস্বরূপ। যাজ্ঞ (যজ্ঞপরিজ্ঞান) ও দৈবত (দেবতাপরিজ্ঞান) যথাক্রমে পুষ্প ও ফল, অথবা দৈবত ও অধ্যাত্ম (আত্মজ্ঞান) যথাক্রমে পুষ্প ও ফল।

দুর্গাচার্য্য পুষ্পফলরূপ বেদার্থরূপকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ-বাক্যের সংক্ষেপতঃ অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয়—যজ্ঞজ্ঞান, দেবতাজ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান (যজ্ঞ, দেবতা ও আত্মা বা ব্রহ্ম) তাহাই এস্থলে রূপক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা যাজ্ঞ ও দৈবত, পুষ্প ও ফল অথবা দৈবত ও অধ্যাত্ম পুষ্প ও ফল। ইহার অর্থ এই যে সমস্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রাশি যাজ্ঞ, দৈবত ও অধ্যাত্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। যখন অভ্যুদয়লক্ষণ ধর্ম্ম অভিপ্রেত হয় তখন যজ্ঞজ্ঞান পুষ্প ও দেবতাজ্ঞান ফল; কারণ বৃক্ষের পুষ্প ফলের জন্যই অপেক্ষিত হইয়া থাকে। যজ্ঞ ও দৈবতের জন্য সম্পাদিত হয় বলিয়া যজ্ঞ পুষ্প, ও দৈবত ফল। অপর পক্ষে যখন নিঃশ্রেয়স লক্ষণ ধর্ম্ম অভিপ্রেত হয়, তখন যজ্ঞ ও দৈবত উভয়েই পুষ্প ফল ধারণ করে (যজ্ঞ দৈবতে অন্তর্ভূত হয় বলিয়া এখানে দৈবতই পুষ্প) কারণ নিষ্কাম ভাবে দেবতোদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করিলে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় সুতরাং তখন যজ্ঞ ও দৈবত উভয়ে একত্র ভাবে আত্মজ্ঞানরূপ ফল প্রসব করে। সায়ণাচার্য্য মন্ত্রস্থ পুষ্প ও ফল শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকাণ্ডোক্তস্য ধর্ম্মস্যজ্ঞানং পুষ্পং উত্তর-কাণ্ডোক্তস্য ব্রহ্মণঃ জ্ঞানং ফলং। যথা লোকে পুষ্পং ফলস্যোৎপাদকং তথা বেদানুবচনাদিধর্ম্মজ্ঞানমনুষ্ঠান দ্বারা

---

* আমরা যাস্ক ও দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রটীর ভাবার্থ দিলাম। সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ফলাত্মকব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাং জনয়তি। যথাচ ফলং তৃপ্তিহেতুস্তথা ব্রহ্মজ্ঞানং কৃত-কৃত্যহেতুঃ।

বেদের পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মের জ্ঞান পুষ্পস্বরূপ, উত্তর কাণ্ডোক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান ফলস্বরূপ। জগতে পুষ্প যেরূপ ফলের উৎপাদক, সেইরূপ বেদ পাঠাদির দ্বারা উৎপন্ন ধর্ম্মজ্ঞান অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা উৎপাদন করে। ফল যেরূপ তৃপ্তি হেতু সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান কৃতকৃত্যতা হেতু। সায়ণাচার্য্যোক্ত এই ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে যাস্কোক্ত যজ্ঞ ও দৈব অন্তর্ভুর্ত রহিয়াছে সেই জন্য সায়ণাচার্য্য তাঁহার বেদ ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বেদার্থ বা বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা বেদ মন্ত্র হইতেই বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইলাম—বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় বা বেদার্থ যজ্ঞ দেবতা ও আত্মা অথবা যজ্ঞ দেবতা একত্রভাবে দেখিলে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী

আগমনী।

(সঙ্গীত)

নন্দন-মন্দিরে ফিরে এস জননি!
সুন্দর শিবময় কর সারা ধরণী।
তৃষিত তনয়ে হেরি ছুটে যাক স্তন্য,
বিতর' মা ক্ষুধাতুরে সুধাসম অন্ন।
পুণ্যপুলকে করি এ ভূলোকে ধন্য
দ্যুলোকের আলো আনো ঘনতমোহরণী।
নন্দন-মন্দিরে ফিরে এস জননি!
কর্ম্মে আন গো মাতঃ অনাবিল সিদ্ধি
ধর্ম্ম তোমার তেজে পা'ক নিতি বৃদ্ধি

শর্ম্ম সৌখসহ আনো শুভ ঋদ্ধি
মনুসুতে রাখ মাতঃ! দনুসুত-দলনী।
বর্ষে বর্ষে এস অসহায় বঙ্গে
হর্ষে হর্ষে তার শিহরিয়ে অঙ্গে
স্পর্শে স্পর্শে তার সব মোহ ভঙ্গে
দেখাও তাহারে পুরা গৌরব সরণী ॥
নন্দন-মন্দিরে ফিরে এস জননী।

শ্রীকালিদাস রায়।

কালিকাতত্ত্ব।

গত শ্রাবণ মাসের শাশ্বতী পত্রিকায় কালিকাতত্ত্বের তৃতীয় খণ্ডে. বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া যে অদিতিতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে অদিতির মধ্যে শব্দ ঘটিত ব্যতীত অর্থের মধ্যে স্ত্রীত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। অদিতি শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের স্ত্রীত্ব স্থির করা যায় না। শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গাদির দ্বারা অর্থের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বাদি অবধারিত হয় না। কলত্র শব্দের অর্থ স্ত্রী, কিন্তু শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। দার শব্দের অর্থ স্ত্রীই বটে, কিন্তু শব্দটির পুংলিঙ্গে রূপ হইয়া থাকে। আবার হরীতকী প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহার, কিন্তু অর্থে স্ত্রীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না; অতএব অদিতি কথাটি স্ত্রীলিঙ্গের হইলেও তাহার অর্থে স্ত্রীত্ব না থাকিতে পারে, বরং পূর্ব্বে পুংলিঙ্গে নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুসংজ্ঞায় যাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে,পরে তাঁহাকেই অদিতি নাম দেওয়ায় অর্থের পুরুষত্ব হওয়াও সম্ভবপর। অতএব ইহার অর্থের নির্দ্ধারণের নিমিত্ত এই বৃহদারণ্যকেরই প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের অবতরণ করা যাইতেছে, এতদ্দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

বৃহদারণ্যক পূর্ব্বকার প্রসঙ্গে যাঁহাকে মৃত্যু ও অদিতিরূপে বর্ণিত করিয়া-

ছেন, চতুর্থ ব্রাহ্মণের অপর প্রসঙ্গে তাঁহারই স্বরূপটি প্রদর্শন করাইতেছেন। যথা—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহং নামাভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাঽথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ঔষতিহবৈ সতং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ। ১।

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি সহায় মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নো বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ২ ॥

সবৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ :স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতিহ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩ ॥

ইহার ভাষ্য অতিবিস্তীর্ণ বিধায় লিখিত হইল না, তাহার ভাবার্থ বলা যাইতেছে :—

জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই পূর্ব্ববর্ণিত মৃত্যু বা অদিতি নামক একমাত্র দেবতাই ছিলেন; তখন তাঁহার সর্ব্বশক্তিময় যেরূপটি ছিল, তাহার মধ্যেই মুখ, বাহু, উদর, উরু, পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব অভিব্যক্ত ছিল; কিন্তু স্ত্রীত্ব পুরুষত্বের লক্ষণ সুপ্রকাশিত ছিল না। তখন তিনি কেবল একাকী এক অস্তিত্বে দণ্ডায়মান হইয়া একটা অসীম অনন্ত "আমিত্বের" অনুভব করিতেছিলেন। * * * * সেইরূপ একাকীভাবে থাকিতে যেন তাঁহার আনন্দের ত্রুটি হইতেছিল, এজন্য তিনি দ্বিতীয়ের অভিলাষ করিতেছিলেন। তখন তাঁহাতে স্ত্রী আর পুরুষ এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি হইল; তাঁহার বামভাগে স্ত্রীত্ব আর দক্ষিণভাগে পুরুষত্বের প্রকাশ হইয়াছিল। (ইহারই অপর নাম 'অর্দ্ধনারীশ্বর' বা 'হরগৌরী'। তৎপর সেই অর্দ্ধার্দ্ধই বিভক্ত হইয়া তাঁহার পূর্ণাঙ্গ দুটি শরীর হইল, বামাঙ্গ সম্পূর্ণ একটি স্ত্রীশরীরে এবং দক্ষিণাঙ্গ সম্পূর্ণ পুংশরীরে পৃথগ্‌ভূত হইল। পূর্ব্বে এক শরীরে জগতের পিতামাতারূপে বিরাজ করিতেছিলেন, এক্ষণে জগৎ পিতা ও জগন্মাতার পৃথক্ রূপ হইল। * * * * ইহাই এই বৃহদারণ্যকীয় মহাবাক্যের ভাবার্থ। এখন দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরের অর্দ্ধ

নারীশ্বর ভাব বা তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহাতে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব এই উভয় ভাবই সমভাবে বিদ্যমান থাকে। এ অবস্থায় তাঁহার প্রতি যে সকল সংজ্ঞার প্রয়োগ হয়, তাহাতে স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ উভয়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। আর তাহার বিকাশ ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিলে ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ করিলেও কোন দোষ হয় না। আর ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাকে যে মৃত্যু প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা তাঁহার পুং ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আর, অদিতি প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের নির্দ্দেশ তাঁহার মাতৃত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া। অতএব 'অদিতি' শব্দটির মধ্যে শব্দ এবং অর্থ উভয়ত্রই স্ত্রী-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং 'অদিতি' শব্দে এস্থলে সেই কঠোপনিষদের কথিত পরমেশ্বরীকেই বুঝিতে হইবে; কিন্তু পরমেশ্বরকে নহে।

এই পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরীর বিস্তৃতি অবস্থায় বা বাহ্যক্ষেত্রে পৃথক্‌রূপে দ্বিধাভাব থাকিলেও মূলক্ষেত্রে আবার একতাই হয়। এ বিষয় পুনর্ব্বারও এই বৃহদারণ্যকেই বর্ণিত হইয়াছে; যথা চতুর্থ অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ "ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধংসন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২ ॥ অথৈতদ্ বামে অক্ষিণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি এতাভির্ব্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবতি অস্মাৎ শরীরাদাত্মনঃ" ॥৩॥

ইহার ভাবার্থ—যাঁহার চৈতন্য এবং দর্শনশক্তিদ্বারা তোমার দক্ষিণ নয়ন সচেতন এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া জগতের দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে তিনি পুংরূপী তাঁহার নাম ইন্ধ, তাঁহাকে ইন্দ্রও বলা গিয়া থাকে; আর যিনি তোমার বামচক্ষুর অন্তরালে ঐরূপে বিদ্যমান, তিনি স্ত্রীরূপা, তিনি ইঁহার পত্নী, তাঁহার এক নাম বিরাট্। আবার তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রাণস্থানে এই পতি আর পত্নীর মিলিত ভাব (অর্দ্ধনারীশ্বরভাব) হয়। সেখানে তাঁহারা উভয়েই হৃৎপিণ্ডীয় রুধির দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকেন; রুধির তাঁহাদের অন্নস্বরূপ।

জগতের প্রতিসংহার কালেও এই পতিপত্নীর পৃথগ্‌ভাব তিরোহিত হইয়া আবার বামদক্ষিণাঙ্গভেদে একরূপ (অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ) হইয়া পরে আবার তাঁহারাও অনভিব্যক্তি অবস্থায় উপনীত হয়েন; তখন আবার তাঁহাকে কেবল 'অদিতি' বা কেবল 'মৃত্যু' বলিলেও হয়।

এইত বৃহদারণ্যকের সিদ্ধান্ত। এখন কালিকাতত্ত্বের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক এই অদিতি দেবতার আরও কয়েকটা নাম করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার ঠিক কালী নামটি না থাকিলেও কালরাত্রি এই নামটি উল্লিখিত আছে। কালরাত্রি, কালী, বা কালিকা এই তিনটী নামেরই অর্থের কোন প্রভেদ নাই, "কালী" কাল কথাটীর স্ত্রীলিঙ্গের রূপ, কালশব্দে সর্ব্বভূতের ক্ষয়কারী, প্রতিসংহারকারী বা গ্রাসকারী, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়। "কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" সুতরাং কালীশব্দেরও সেই অর্থই বুঝিতে হইবে। যিনি জগতের ক্ষয়কারিণী, সর্ব্বভূতের প্রতিসংহারকারিণী, তিনিই কালিকা। প্রতিসংহৃতাবস্থায় জগতের রূপগুণাদি কিছুই থাকে না, কোন কিছুরই উপলব্ধি করা যায় না, এই নিমিত্ত অন্ধকারের সাদৃশ্য লইয়া তাঁহাকে রাত্রিও বলা যায়। একারণে কালরাত্রিও তিনিই। এই ভাবে কালী, কালিকা আর কালরাত্রি এই তিনটি একপর্য্যায়ের শব্দ। "অদিতি" কথাটিও ইহারই সমানপর্য্যায়; কারণ ইহার অর্থের কোনই প্রভেদ নাই। ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব বৃহদারণ্যকের অদিতি আর তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কালিরাত্রি বা কালী একই পদার্থ। তৈত্তিরীয় শ্রুতি যথা—কালরাত্রিং ব্রহ্ম স্তবন্ বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরং। সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাম্॥" ইহার অর্থ এই—যিনি কালরাত্রি স্বরূপা, যিনি ব্রহ্মার আরাধিতা দেবতা, যিনি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপা, যিনি দক্ষের দুহিতৃরূপে অবিভূ´তা হইয়াছিলেন, সেই পরম পাবনা মঙ্গলস্বরূপা জগন্মাতাকে প্রণাম। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে ইহাঁকে আবার দুর্গাও বলা হইয়াছে, হৈমবতী বলিয়াও প্রার্থনা করা হইয়াছে। যথা, "উত্তরে শিখরে যাতে ভূম্যাং পর্ব্বত বাসিনী ব্রাহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া"। মা, তুমি এই পৃথিবীতে হিমালয়ের শিখরপ্রদেশে আবিভূ´তা হইয়া সেই পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত আছ, তুমি গায়ত্রী সাবিত্রী এবং সরস্বতীরূপা বেদের অনুরোধমত, তুমি আমার এই

গায়ত্রী জপ গ্রহণ করিয়া এখন ইচ্ছানুসারে অন্তর্হিত হও। "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।" সেই কালরাত্রি দেবীকে আমি সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণাপন্ন হইতেছি, এবং প্রণাম করিতেছি। যাঁহার তনুর বর্ণ অগ্নিসদৃশ এবং অনুপম প্রভাযুক্ত, যিনি সতত জ্ঞানপ্রদীপ্তা অর্থাৎ প্রজ্ঞানঘনরূপা, যাবৎ কর্ম্মফল লাভের নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদেব মনুষ্য কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। আবার এই কালিকা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া অথর্ব্ব বেদের সৌভাগ্যকাণ্ড কি বলিয়াছেন,, শুনুন "অথহৈনাং পরমব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি অব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ভবতি অশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি স সর্ব্বস্মাৎ পাপ্মনঃ বিমুক্তো ভবতি বিমুচ্যতে এতদ্বৈতৎ।" ইহার অর্থ এই পরমব্রহ্মরূপিণী কালিকাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্তা করিতে করিতে যোগী ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। তিনি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ থাকিলেও তখন তাহার পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যের উদয় হয়। তিনি বেদতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার সর্ব্বতত্ত্ব বিদিত হইয়া যায়। তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন, কেবল পাপ হইতে নহে তিনি সংসার বন্ধন হইতেই মুক্ত হইয়া থাকেন। কারণ তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ শব্দে যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই দক্ষিণকালিকাই সেই তত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

এখন দেখা গেল সেই সর্ব্ব বেদপ্রসিদ্ধ অদিতি কথাটী, দক্ষিণ কালিকারই নামান্তর মাত্র, এবং দক্ষিণকালিকারূপ, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীরই প্রকৃতরূপ, ইহা শ্রুতির স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। পুরাণ এবং তন্ত্রাদি যে এবিষয়ের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের বলা বাহুল্য। কারণ তাহা সকলেরই বিদিত আছে। তথাপি পর বারে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিয়া পরে ইহার উপপত্তি বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে, এইবার এই পর্য্যন্ত রহিল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

কবিকথা।

(ভবভূতি)

উত্তর রামচরিত।

(২)

পবিত্র সলিলা ভাগীরথী বক্ষে স্বচ্ছতোয়া তমসা কুলুকুলু স্বরে মধুর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আত্মসমর্পণ করিতেছিল। তাহারই নিকটে মহর্ষি বাল্মীকির চিরশান্ত আশ্রমপদ তরুলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া শ্যামলতা ও পবিত্রতার স্রোত ছুটাইতেছিল। পক্ষীর কাকলী ও বেদধ্বনি মিশিয়া এক অপূর্ব্ব স্বরতরঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। লক্ষ্মণ এই আশ্রমের নিকটেই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। অভাগিনী জানকী প্রসব বেদনায় কাতরা হইয়া ভাগীরথী-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। তথায় সমজ পুত্রদ্বয় প্রসূত হইলে ভগবতী ভাগীরথী ও পৃথিবী সীতাকে রসাতলে লইয়া যান। তাহার পর কুমারদ্বয় স্তন্যত্যাগ করিলে দেবী জাহ্নবী তাহাদিগকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। ঋষি তপস্বী হইতে চরাচর প্রাণি সকলের হৃদয় তাহাদের জন্য স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠে। মহর্ষি বাল্মীকি ধাত্রীকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বালক দুইটির লালন পালন ও রক্ষণাদি সমস্তই করিয়াছিলেন। চূড়া-করণ সম্পন্ন হইলে ঋষি বেদ ব্যতিরেকে সমস্ত বিদ্যাতেই তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন। তাহার পর একাদশ বর্ষে ক্ষত্রোচিত বিধানানুসারে উপনয়ন সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন করান। তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও মেধার জন্য কোন ছাত্রই তাহাদের সহাধ্যায়ী হইতে পারে নাই। আবার জন্ম হইতেই সরহস্যজৃম্ভকাস্ত্রে তাহাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। কুমারদ্বয় কুশ ও লব নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠে।

এই সময় একদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি স্নানের জন্য তমসা নদীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চটিকে শরবিদ্ধ করিয়াছে, তাহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হওয়ায় রসনায় অকস্মাৎ বাগ্‌দেবীর আবির্ভাব হইল। ঋষিও অমনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ব্যাধকে বলিলেন

"হে নিষাদ, তুমি ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে কামমোহিত একটিকে নিহত করায় শাশ্বতী প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না"। এই শ্লোকটি বৈদিক ছন্দ হইতে বিভিন্ন অনুষ্টুব্‌ ছন্দে রচিত হইয়া এক নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছিল। শব্দ ব্রহ্মের আবির্ভাবে প্রদীপ্ত শ্রীভগবান্‌ বাল্মীকির নিকট সেই সময়ে ভগবান্‌ ভূতভাবন পদ্মযোনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, ঋষি! শব্দব্রহ্মের প্রকাশে তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি রামচরিত বর্ণনা কর। তুমি অব্যাহত জ্যোতি প্রতিভাময় আর্ষ চক্ষু লাভ করিয়া আদিকবি হইলে, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হন। তাহার পর ভগবান্‌ বাল্মীকি মনুষ্যলোকে শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত রামায়ণ নামে ইতিহাস প্রণয়ন আরম্ভ করেন। তাহা হইতে সমস্ত সংসার পণ্ডিত হইয়া উঠে।

এদিকে রামচন্দ্র এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর পয়োজন থাকায় তিনি হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করান। ঋষি বামদেব মেধ্য অশ্বকে মন্ত্র সংস্কৃত করিয়া বিমুক্ত করিয়া দেন। শাস্ত্রানুসারে তাহার রক্ষিবর্গও নিযুক্ত হয়। দিব্যাস্ত্র সমূহের প্রয়োগ সংহারের উপদেশ লাভ করিয়া লক্ষ্মণ পুত্র চন্দ্রকেতু রক্ষিবর্গের অধিনায়ক রূপে চতুরঙ্গ সেনা সহিত অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে কোন একজন ব্রাহ্মণ আপনার মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রাজদ্বারে আসিয়া অভয় প্রার্থনা করিতে থাকেন। রাজার অপরাধ ভিন্ন প্রজার অকাল মৃত্যু হয় না। সুতরাং তাঁহার নিজের দোষে এই সকল ঘটিতেছে বলিয়া করুণাময় রামচন্দ্র স্থির করিলে, সহসা দৈববাণী হইল, "সম্বুকনামে শূদ্র পৃথিবীতে তপস্যা করিতেছে, অহে রাম; সে তোমার নিকট শিরচ্ছেদ দণ্ডের যোগ্য, তাহাকে বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে সঞ্জীবিত কর," ইহা শুনিয়া জগৎপতি রামচন্দ্র পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সেই শূদ্রতপস্বীর অন্বেষণে চারিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

বাল্মীকির আশ্রমে অনেক তাপস তাপসী অধ্যয়ন করিতেন, কুশ লবের সহিত অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া এবং বাল্মীকির রামায়ণ রচনার জন্য অবকাশাভাবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অন্যান্য স্থানে গমন করেন। আত্রেয়ী নামে জনৈকা তাপসী অগস্ত্যাশ্রমে অধ্যয়নের জন্য দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হন।

জনস্থান দেবতা বাসন্তী তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া ফল পুষ্প পল্লবে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই বন আপনি যথেচ্ছ ভোগ করুন। আজ আমার সু-দিবস, পুণ্যফলেই সাধুদিগের সহিত সজ্জনের সমাগম ঘটিয়া থাকে, এ অরণ্যে তরুচ্ছায়া, জল তপস্যার যোগ্য অশন ফল কিম্বা মূল সমস্তই আপনি স্বাধীনভাবে ভোগ করিতে পারেন।" আত্রেয়ী উত্তর করিলেন, "এ বিষয়ে কি আর বলিব। সাধুদিগের আচরণ প্রায়ই লোক প্রিয়, আলাপন সংযত ও বিনয়মধুরমতি স্বভাবতঃ কল্যাণকরী এবং পরিচয় অনিন্দিত হইয়া থাকে, তাই অগ্রে পশ্চাতে অপরিবর্ত্তিত স্বভাব অকপট, নির্ম্মল তাহাদের গূঢ় চরিত্র সর্ব্বত্রই উৎকর্ষ লাভ করে।" তাহার পর উভয়ে উপবেশন করিয়া পরস্পর আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসন্তী আত্রেয়ীর পরিচয় ও তাহার দণ্ডকারণ্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়ী নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, এই প্রদেশে অগস্ত্য প্রমুখ অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট বেদান্ত বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাল্মীকির আশ্রম হইতে আসিতেছি। মুনিগণ সমগ্র বেদাধ্যয়নের জন্য যে পুরাণ ব্রহ্মবাদী বাল্মীকির উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আত্রেয়ীর দীর্ঘ প্রবাস স্বীকারে বাসন্তীর অত্যন্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল। আত্রেয়ী কুশ লবের বৃত্তান্ত ও তাহাদের তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও মেধার জন্য তাহাদের সহিত অধ্যয়ন অত্যন্ত দুরূহ জানাইয়া কহিলেন, "দেখুন, গুরু বুদ্ধিমান্ ও জড়মতি উভয়বিধ শিষ্যকেই সমভাবে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত যে, তিনি তাহাদিগের জ্ঞানশক্তির উন্মেষ বা ক্ষয় সাধন করেন না। কিন্তু, ফলে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য ঘটে,, তাহার কারণ এই যে, নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয়, মৃত্তিকারাশির পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে, আত্রেয়ী বাসন্তীকে কুশ লবের বৃত্তান্ত জানাইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সীতার পুত্র বলিয়া বা ভাগীরথী কর্ত্তৃক তাহাদের আনয়নের কথা জানিতেন না। তাহার পর আত্রেয়ী আবার বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়নেও অধ্যয়ন বিঘ্ন ঘটিতেছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

পথশ্রম দূর করার পর আত্রেয়ী বাসন্তীকে অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইয়া দিতে বলিলে, তিনি তাঁহাকে পঞ্চবটী প্রবেশ করিয়া গোদাবরীর তীরে তীরে

যাইতে বলিলেন। আত্রেয়ী ইতিপূর্ব্বে জনস্থানকে ভাল করিয়া জানিতে পারেন নাই, এক্ষণে পঞ্চবটী গোদাবরী গিরিপ্রস্রবণ এবং বনদেবতা বাসন্তীকে বুঝিতে পারিয়া সীতার স্মরণে তাঁহার নয়ন যুগল অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, হা বৎসে জানকি কথা প্রসঙ্গে তোমার প্রিয়সুহৃদ্বর্গ আমার নেত্রপথে নিপতিত হওয়ায় তুমি নামমাত্রাবশিষ্টা হইলেও তোমাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি ; পঞ্চবটী বাস কালে বাসন্তীর সহিত সীতার সৌহার্দ্দ্য ঘটিয়াছিল। আত্রেয়ীর কথা শুনিয়া বাসন্তী ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন, এবং সীতার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন। আত্রেয়ী কোন অমঙ্গল নহে অপবাদও বটে বলিয়া বাসন্তীর কর্ণে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আত্রেয়ী তাঁহাকে আস্বস্ত করিলে, বাসন্তী সীতাকে স্মরণ করিয়া হা প্রিয়সখী, হা মহাভাগে, তোমার নির্ম্মাণের কি এই পরিণাম, বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা কহিতে বাসন্তীর প্রবৃত্তি হইল না। লক্ষ্মণের পরিত্যাগের পর সীতার কি হইয়াছে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলে আত্রেয়ী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাসন্তী আবার বলিলেন যে, আর্য্যা অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেব রঘুবংশীয়দিগের অধিনায়ক ও বৃদ্ধা মহিষীরা জীবিত থাকিতে এরূপ ঘটিল কেন ? আত্রেয়ী তাহাতে উত্তর দিলেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করায় তাঁহারা তখন তাঁহার আশ্রমে ছিলেন, যজ্ঞ সমাপনের পর অরুন্ধতী বধূশূন্য অযোধ্যায় গমন করিব না বলায়, বশিষ্টের প্রস্তাবে তাঁহারা বাল্মীকির তপোবনে বাস করার ইচ্ছা করিয়াছেন। রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিতেছেন বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিলেন, যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর প্রয়োজন থাকায় বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন যে, তবে কি রাজা আবার বিবাহ পর্য্যন্তও করিয়াছেন? আত্রেয়ী তখন হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতির কথা বলিলেন। শুনিয়া বাসন্তী বলিতে লাগিলেন, "লোকোত্তর পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর আবার কুসুম অপেক্ষাও মৃদু হইয়া থাকে, কেহই তাঁহাদের মনোভাব বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না।" আত্রেয়ী পরে যজ্ঞীয় অশ্ব, তাহার রক্ষিগণ

তাহাদের অধিনায়ক লক্ষ্মণ পুত্র চন্দ্রকেতুর কথাও বলিলেন। শুনিয়া স্নেহভরে ও কৌতুক সহকারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন, কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র আঃ মা বাঁচিলাম। তাহার পর শূদ্রমুনির তপস্যা ব্রাহ্মণ শিশুর মৃত্যু, রামচন্দ্রের শম্বুক বধের জন্য যাত্রা সমস্তই জানাইলে বাসন্তী বলিলেন যে, ধূমপায়ী শূদ্র শম্বুক এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে, তাহা হইলে রামচন্দ্র এদিকই অলঙ্কৃত করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আত্রেয়ী তখন বাসন্তীর নিকট বিদায় চাহিলেন, বাসন্তীও তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কারণ সে সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা তখন দেখিতে লাগিলেন যে তটস্থিত পক্ষী নীড় নিচিত তরুসকলের বল্কল হইতে বায়সাদি পক্ষী কীটগুলিকে আকর্ষণ করিয়া ছায়ায় বসিয়া আনন্দ সহকারে ভক্ষণ করিতেছে, আর শাখা শ্রমী ক্লান্ত কপোত কুক্কুটকুলের কূজনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষগুলিও আবার কপোল কণ্ডূয়ন নিবারণের জন্য হস্তিগণের গণ্ড ঘর্ষণ কম্পে নিপতিত রবিতাপে শিথিল বৃন্তকুসুমনিচয়ে গোদাবরীর অর্চ্চনা করিতেছে। তাহার পর উভয়ে সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

পুষ্পকারোহণে চারিদিক অন্বেষণ করিয়া রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং তপস্যারত শূদ্রমুনিকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সদয় ভাবে খড়্গ উদ্যত করিয়া শম্বুকের বধে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণ শিশুর পুনর্জীবনের জন্য এই শূদ্রমুনির প্রতি কৃপাণের আঘাত কর। দুর্ব্বহ গর্ভভারে খিন্না সীতার নির্ব্বাসনে পটু রামের বাহু তুমি তোমার আবার করুণা কোথা হইতে সম্ভব হইবে?' তাহার পর তিনি অতিকষ্টে শম্বুকের শিরচ্ছেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে রামের উপযুক্ত কার্য্যই হইল, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ শিশু জীবন লাভ করিবে কি? সেই সময়ে এক দিব্য পুরুষ উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, যমভয় নিবারণ করিয়া অভয়দাতা আপনি দণ্ড বিধান করায় সেই ব্রাহ্মণশিশু সঞ্জীবিত হইয়াছে, আমারও এই সম্পদ্ লাভ ঘটিয়াছে আমি শম্বুক আপনার চরণ যুগলে প্রণাম করিতেছি। সৎ সঙ্গে নিধন ঘটিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মণ শিশুর পুনর্জীবন লাভ ও তোমার দিব্যশরীর প্রাপ্তি এই উভয় ঘটনায় আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। অতএব

উগ্র তপস্যার ফললাভ করিয়া আনন্দ প্রমোদ ও পুণ্য সম্পদে পরিপূর্ণ বৈরাজ নামক অবিনশ্বর লোক প্রাপ্ত হও, দিব্য শরীরী শম্বুক উত্তর দিলেন যে আপনার অনুগ্রহেই এই মহিমা লাভ হইয়াছে, এবিষয়ে তপস্যায় কি করিয়াছে? অথবা তপস্যার দ্বারাই মহোপকার ঘটিয়াছে বটে, কারণ জগতে অন্বেষণীয় ভূতনাথ শরণাগতবৎসল আপনি এই অধম শূদ্রের অন্বেষণে শত শত যোজন অতিক্রম করিয়া যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই তপস্যার ফল বলিতে হইবে, নতুবা অযোধ্যা হইতে আপনার দণ্ডকারণ্যে পুনরাগমন ঘটিবে কেন? শম্বুকের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র তখন বলিয়া উঠিলেন যে, এইকি সেই দণ্ডকারণ্য? তখন তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই পরিচিত ভূমিকে চিনিতে পারিলেন। তাহার কোনস্থান স্নিগ্ধ শ্যাম আবার কোনস্থান ভীষণ বিস্তৃতির জন্য রুক্ষ দেখাইতেছিল, স্থানে স্থানে নির্ঝর নিচয়ের ঝঙ্কারে দিক্ সকল মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। তীর্থ, আশ্রম গিরি, সরিৎ, গর্ত্ত ও কান্তারে মিশ্রিত সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অপূর্ব্বশোভাই বিস্তার করিতেছিল।

শম্বুক আবার বলিতে লাগিলেন যে এই দণ্ডকারণ্যেই আপনি পূর্ব্বে বাস করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই সিদ্ধক্ষেত্র জনস্থানে আমাদের ন্যায় ভীরু জনপদবাসীরাও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা কেবল দণ্ডকারণ্য নহে, জনস্থানও বটে। শম্বুক উত্তর করিলেন যে, তাহা যথার্থ, এ সকল জনস্থানের প্রান্তস্থিত দক্ষিণাভিমুখে দীর্ঘারণ্য, এখানে ভয়ে সকল প্রাণীর রোম হর্ষ উপস্থিত হয়, আর ইহার বিকট গিরিগহ্বর গুলি উন্মত্ত ও প্রচণ্ড শ্বাপদকুল দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জনস্থানের এই প্রান্ত সীমা কোনস্থল পক্ষিগণের কূজন বর্জ্জিত ও নিস্তব্ধ, আবার কোনস্থল শ্বাপদগণের প্রচণ্ড নিনাদে পরিপূর্ণ, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গম্ভীর ফণ ভুজঙ্গ দিগের নিঃশ্বাস পবনে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহার অভ্যন্তরস্থিত বিবর মধ্যে স্বল্পজল বিদ্যমান থাকায়, তৃষ্ণাতুর কৃকলাসগুলি অজগরদিগের স্বেদ ধারা পান করিতেছে। ভূতপূর্ব্ব আলয় জনস্থান দেখিয়া রামচন্দ্র পূর্ব্ব বৃত্তান্তগুলি যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বৈদেহী কানন বড়ই ভালবাসিতেন,

সম্মুখে সেই কান্তারগুলি দেখা যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কি ভয়ানক হইতে পারে?' তাহার পর তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আবার বলিতে লাগিলেন 'তোমার সহিত মধুগন্ধিবনে বাস করিব বলিয়া সীতা কতই না আনন্দিত হইতেন। তাঁহার স্নেহ এইরূপই ছিল, প্রিয়জন কিছু না করিলেও নিকটে থাকিয়া যে সুখ প্রদান করে, তাহাতেই দুঃখরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। সেইজন্য যে যাহার প্রিয়জন সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ।"

শম্বুক সে সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এই ভীষণ অরণ্য দর্শনে আর কাজ নাই, এক্ষণে মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্য্যন্ত প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত, ঘনসন্নিবিষ্ট গাঢ় নীলচ্ছায় তরুণ তরুরাজিতে মণ্ডিত, নির্ভয়ে বিচরণ শীল-বিবিধ মৃগযূথপূর্ণ, প্রশান্ত গম্ভীর এই মধ্যমারণ্যভাগ অবলোকন করুন। এখানে মত্ত পক্ষিগণের আরোহণে বেতসলতা হইতে চ্যুত পুষ্পরাশিতে সুবাসিত শীত স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ নির্ঝরিণীনিচয় শ্যাম জম্বুনিকুঞ্জে নিপতিত পক্ক ফলের শব্দে মুখরিত হইয়া শত স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্লুকগণের প্রতিশব্দ গম্ভীর নিষ্ঠীবনযুক্ত আরাব সকল একটি মিলিত ধ্বনি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছে। গজ বিদলিতশল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি সকলের রসোত্থিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও অনুভূত হইতেছে।" রামচন্দ্র তখন শম্বুককে বলিলেন যে, ভদ্র তোমার পথে কল্যাণ বর্ষিত হউক। তুমি দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া পুণ্যলোকে গমন কর। শম্বুক উত্তর করিলেন যে, পুরাণ ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া শাশ্বত লোকে প্রবেশ করিব। এই বলিয়া তিনি অগস্ত্যাশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন।

শম্বুকের প্রস্থানের পর রামচন্দ্র হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আবার সেই বন সম্মুখে দেখিতেছি। এইখানে সুদীর্ঘ কাল বাস করিয়া আমরা সধর্ম্ম নিরত বাণপ্রস্থের ও সংসার সুখের রসজ্ঞ গৃহস্থের বৃত্তি আচরণ করিয়াছিলাম। এই সেই ময়ূরধ্বনি নিনাদিত গিরিনিবহ, মত্ত মৃগের লীলাভূমি বনস্থলী। মনোহর বেতসলতায় পরিশোভিত ও ঘন সন্নিবিষ্ট নীল নিচুলে বিভূষিত সরিত্তট। আর দূর হইতে যাহাকে

মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতেছে, ঐ সেই প্রস্রবণ গিরি, উহারই নিকটে গোদাবরী প্রবাহিতা হইতেছেন। এই পর্ব্বতের বিশাল শিখরে গৃধ্রাজ জটায়ু বাস করিতেন। নিম্নে পর্ণকুটীরে আমরা অবস্থিতি করিতাম। নিকটে গোদাবরীর স্বচ্ছ সলিলে তরুনিচয়ের শ্যামশোভা প্রতিবিম্বিত করিয়া বিহগকুলের কূজনে মুখরিত বনান্তপ্রদেশ বিরাজ করিতেছে। এইখানেই সেই পঞ্চবটী বনে আমাদের বাসের জন্য তাহার বিভাগ সকল স্বচ্ছন্দে বিহারের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রিয়ার প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে রামচন্দ্র অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "হত-ভাগ্য রামের এ কি ঘটিল? দীর্ঘকাল পরে বেগশীল তীব্রবিষরস সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, সুতীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে সঞ্চিত ব্রণ ফুটিয়া গেলে, দারুণ যন্ত্রণায় যেরূপ বিহ্বল ও হতচেতনা করে, সেইরূপ প্রিয়াবিরহ শোক আবার ঘনীভূত হইয়া আমাকে বিকল ও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিতেছে। সে যাহা হউক পূর্ব্ব পরিচিত স্থানগুলি একবার দেখিয়া লইতেই হইবে। এই বলিয়া রামচন্দ্র সেই অরণ্যপ্রদেশ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালবশে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে যেস্থানে নদীস্রোত বহিয়া যাইত এখন তথায় তট হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষসমূহের ঘন ও বিরলতার ব্যতি-ক্রম ঘটিয়াছিল। বহুকাল পরে দর্শনের জন্য বনটিকে অন্য বন বলিয়া রামচন্দ্রের মনে হইতেছিল, কিন্তু শৈলগণের অপরিবর্ত্তিত অবস্থান তাঁহার সে ভ্রম দূর করিয়া দিল। রামচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেও পঞ্চবটী-স্নেহ তাঁহাকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি একাকী পঞ্চবটী দর্শনে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে পঞ্চবটীতে প্রিয়ার সহিত সেই সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, স্বগৃহে আসিয়া যাহার সুদীর্ঘ কথা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতাম, প্রিয়তমাকে বিসর্জ্জন দিয়া পাপাত্মা রাম এক্ষণে একাকী তাহাকে কিরূপে অবলোকন করিবে; আবার তাহাকে বিনাসম্ভাষণে কেমন করিয়াই বা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?"

সেই সময়ে শম্বুক আবার উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন যে, দেব ভগবান অগস্ত্য আমার নিকট হইতে আপনার আগমন সংবাদ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্নেহময়ী লোপামুদ্রা পুষ্পকাবতরণের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য মহর্ষিরাও উপস্থিত আছেন। অতএব আপনি আশ্রমে আগমন করিয়া সকলকে সম্মানিত করুন। তাহার পর বেগশালী পুষ্পকে আরোহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য সজ্জিত হইবেন। ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অগস্ত্যাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। গুরুজনের আদেশে পঞ্চবটীকে ক্ষণকাল অতিক্রম করার জন্য রামচন্দ্র তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে কুঞ্জকুটীরস্থিত পেচকগণের ঘুৎকারে মুখরিত বেণুগুচ্ছে বায়সগণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আর বিচরণশীল ময়ূরগণের কেকারব শুনিয়া উদ্বিগ্ন সর্পসমূহ, পুরাতন চন্দনতরুর স্কন্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আবার দক্ষিণাদ্রি সমূহের কন্দরগুলি গোদাবরীর গদ্‌গদ্‌নাদে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। শিখরদেশকে মেঘালিঙ্গনে নীলবর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এবং পরস্পর প্রতিঘাতে নিবিড় চলোর্ম্মির কোলাহলে উত্তাল গভীরপয় পবিত্র সরিৎসঙ্গমগুলিও বিরাজ করিতেছে।

---

(৩)

আজ সমগ্র পঞ্চবটী ব্যাপিয়া এক অপূর্ব্ব শোভার তরঙ্গ ফুটিয়াছে, তরুলতা ফলপুষ্পে সাজিয়া যেন নন্দন কাননকেও লজ্জা দিতেছে। পর্ব্বতের নীল শিখর গুলি যেন আরও নীল হইয়া উঠিয়াছে। নির্ঝরিণী নিচয়ের কলধ্বনি যেন মধুর সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। বিহগকুল নিজ নিজ কূজন পঞ্চমে তুলিয়াছে, ময়ূর ময়ূরী নাচিয়া বেড়াইতেছে। মৃগকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। করভ করভী মদোন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সমস্ত বনভূমিতে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে বনদেবতা বাসন্তী

এইরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার গোদাবরী হ্রদেও আজ মহা-সমারোহ। তথায় ভগবতী ভাগীরথীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহার সহিত সীতাদেবীও আসিয়াছেন। তজ্জন্য গোদাবরী হৃদয়ে আনন্দ কল্লোল ফুটিয়া উঠিতেছে। তমসাও ভাগীরথীর সহিত আসিয়া জনস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। পঞ্চবটীর প্রান্তবাহিনী মুরলাও গোদাবরী বক্ষে নিপতিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

সহসা তমসা ও মুরলার সাক্ষাৎকার ঘটিলে তমসা মুরলাকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রধাবিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুরলা বলিতে লাগিলেন যে ভগবতী লোপামুদ্রা সরিদ্বরা গোদাবরীর নিকট আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "বধূ সীতাকে পরিত্যাগ করা অবধি রামচন্দ্রের শোক তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভী-র্য্যের জন্য বাহিরে প্রকাশিত হইয়া না পড়িলেও অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে দারুণ বেদনা জন্মাইয়া নিরুদ্ধপাক পাত্রস্থিত সন্তপ্ত দ্রব্যের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়জনের বিরহজাত দীর্ঘকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন শোকপ্রবাহে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমাদের আশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় রামভদ্র বধূসহবাসে স্বচ্ছন্দ বিহারের সাক্ষীস্থল প্রদেশগুলি অবশ্যই অবলোকন করিবেন। সেই সেই স্থানে উদ্বেলিত শোকাবেগে নিসর্গ ধীর রামচন্দ্রেরও অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়া,জানাইতেছি যে,রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে,সলিল-নিকর-স্নিগ্ধ পদ্ম কিঞ্জল্ক সুরভি তরঙ্গ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবা-হিত করিয়া তাঁহার জীবাত্মাকে যেন তৃপ্ত করা হয়।" তমসা লোপমুদ্রার স্নেহ দাক্ষিণ্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে,রামচন্দ্রকে সঞ্জীবিত করার মৌলিক উপায় কিন্তু নিকটেই উপস্থিত আছে, মুরলার তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিলে, তমসা তখন সীতার বনবাসের পর তাঁহার ভাগীরথী জলে আত্মবিসর্জ্জন, কুশ লবের প্রসব,ভাগীরথী ও পৃথিবীর সহিত তাঁহার রসাতলে গমন, ভাগীরথী কর্ত্তৃক কুমার দ্বয়ের বাল্মীকির আশ্রমে আনয়ন এই সমস্তের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, সরযূ-মুখে যে শম্বুক বধের জন্য রামচন্দ্রের জনস্থানে উপস্থিতি শুনিয়া ভাগীরথীও ভগবতী লোপামুদ্রার ন্যায় আনন্দিত হইয়া উঠেন, পরে তিনি সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া কোন গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখানে

আগমন করিয়াছেন। গঙ্গা পৃথিবীর সীতার জন্য এরূপ ব্যগ্রতা শুনিয়া মুরলা বলিয়া উঠিলেন যে, এরূপ ব্যক্তিদিগের দশা বিপর্য্যয়ও বিস্ময়াবহ। কারণ গঙ্গা প্রমুখ দেবতারাও ইহাঁদের সাহায্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন, ভাগীরথীর সীতাকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায় মুরলা প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী উত্তম বিবেচনাই করিয়াছেন। রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া জগতের মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রামভদ্রের চিত্ত বিক্ষেপ না ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু অনাসক্তভাবে ও শোকমাত্রই অবলম্বন করিয়া পঞ্চবটী প্রবেশ যে তাঁহার পক্ষে অনর্থকর তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সীতা দেবী কিরূপে রামভদ্রকে আশ্বস্ত করিবেন তাহা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে। তমসা উত্তর দিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী সীতা দেবীকে আদেশ করিয়াছেন যে, অদ্য কুশ লবের দ্বাদশ বার্ষিকী জন্মতিথি, এই দিনে বর্ষানুযায়ী মঙ্গলগ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে, তজ্জন্য মনু সম্ভূত রাজর্ষিবংশের প্রসবিতা পাপনাশন তোমার পুরাণ শ্বশুর সূর্য্যদেবকে স্বহস্তে অবচিত পুষ্পরাশির দ্বারা অর্চ্চনা কর। তুমি যখন তজ্জন্য অবনিপৃষ্ঠে বিচরণ করিবে, তখন আমার প্রভাবে বনদেবতারাও তোমাকে দেখিতে পাইবে না। মনুষ্যের ত কথাই নাই। ভগবতী আমাকেও আমার প্রতি স্নেহশালিনী জানকীর সহচরী হওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

মুরলা এই সমস্ত বৃত্তান্ত লোপামুদ্রাকে জানাইবার জন্য তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, কারণ রামচন্দ্রের আগমনের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, সীতাও গোদাবরী হ্রদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার কপোল দুইটি পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গেলেও তাহাতেই মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল এবং বিলোল কবরীতে আরও শোভা বিস্তার করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া করুণরসের মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায়ই তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। শরৎকালের দুঃসহ তাপে কেতকী পুষ্পের গর্ভপত্র যেমন ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ দারুণ দীর্ঘশোক তাঁহার হৃদয় কুসুমকে বিশুষ্ক করিয়া বৃন্তছিন্ন মনোহর কিসলয় তুল্য আপাণ্ডুর ক্ষীণ শরীরটিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর মুরলা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তমসা ও সীতার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কুসুমরাশিতে ভূষিত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া সীতা পুষ্প চয়নে ব্যাপৃতা হইলেন, তাঁহার হৃদয় শোকে ও উদ্বেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা কি, সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ বলিয়া বনমধ্য হইতে এক শব্দ উত্থিত হইল, সীতা তাহাকে বাসন্তীর স্বর মনে করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ উঠিল, চঞ্চলভাবে সম্মুখে আগত যে করিশাবকটিকে সীতাদেবী স্বহস্ত দত্ত শল্লকী পল্লবাগ্রে পরিপোষণ করিয়াছিলেন, বধূর সহিত জল বিহারে রত তাহাকে অন্য এক উদ্দাম যূথপতি বেগে আক্রমণ করিল।" একথা শুনিয়া সীতা কয়েকপদ গমন করিয়া আর্য্যপুত্র,আমার এই পুত্রটিকে রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া উঠিলেন, ক্ষণপরেই সমস্ত কথা স্মরণ হওয়ায় সীতা কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন যে, পঞ্চবটীর দর্শনে এই হতভাগিনীর মুখ হইতে সেই চিরাভ্যস্ত অক্ষরগুলিই নিঃসৃত হইতেছে। তাহার পর তিনি হা আর্য্যপুত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে তমসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা "বিমানরাজ এই খানেই স্থির হও" বলিয়া এক গম্ভীররব আকাশ তল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সেই স্বরে সীতারও চৈতন্য সম্পাদন হইল। অবশ্য ইহা যে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর সীতার তাহা বুঝিতে কিছুমাত্রও বিলম্ব হইল না। জলপূর্ণ মেঘের শব্দের ন্যায় সেই গুরু গম্ভীর ধ্বনি সীতার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। তমসা অশ্রু মোচন করিতে করিতে ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন "বৎসে মেঘধ্বনিতে ময়ূরী যেমন চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কাহার এই অপরিস্ফুট স্বরে তুমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছ?" সীতা উত্তর দিলেন যে, ভগবতি! এই গম্ভীর রবকে কি আপনি অপরিস্ফুট বলিতেছেন, আমি কিন্তু ইহাকে আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তখন তমসা কহিলেন যে, হাঁ শুনিয়াছি বটে ইক্ষ্বাকুকুলনৃপতি তপস্যা রত কোনি শূদ্রের দণ্ড বিধানের জন্য জনস্থানে আসিয়াছেন। শুনিয়া সীতা বলিলেন যে, সৌভাগ্যক্রমে সেই নৃপতির রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সেই সময়ে আবার দূর হইতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "যেখানে দ্রুমগুলি ও মৃগগুলি পর্য্যন্ত আমার বন্ধু হইয়াছিল, যথায় প্রিয়ার সহিত সুদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলাম, বহু কন্দর ও নির্ঝরে ভূষিত গোদাবরীর প্রান্তস্থিত এইত সেই

গিরি তটগুলি সম্মুখে দেখা যাইতেছে। সীতা তখন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন, রামের দেহ প্রভাতকালীন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় আপাণ্ডুর পরিক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাঁহার সৌম্য ও গম্ভীর তেজ দেখিয়া সীতা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের এইরূপ আকার দেখিয়া সীতার হৃদয়ে দারুণ বেদনা সঞ্চার হইল। তিনি 'আমায় ধরুন' বলিয়া তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে পঞ্চবটী দর্শনে উদ্দামভাবে প্রজ্বলিত অন্তর্নীল দুঃখাগ্নির ধূমরাশির ন্যায় মোহে রামচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি হা প্রিয়ে জানকি, বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তমসা মনে মনে বলিতেছিলেন যে, গুরুজনেরা এই রূপই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সীতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, হায়! একি হইল? সেই সময়ে আবার রামচন্দ্র "হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসসখি, বিদেহ রাজপুত্রি" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া সীতা আবার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, এই হতভাগিনীর উদ্দেশেই নয়ন নীলোৎপল মুদ্রিত করিয়া আর্য্যপুত্র মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিতেছি, হায়! উৎসাহ ভঙ্গে বিবশ হইয়া তিনি একেবারে ধরণীপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবতী তমসে রক্ষা করুণ, আর্য্যপুত্রকে বাচান, এই বলিয়া সীতা তমসার চরণতলে নিপতিত হইলেন। তমসা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "কল্যাণি তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, তোমার করস্পর্শই তাঁহার অতীব প্রিয়, তাহাতেই তাঁহার সঞ্জীবনোপায় নিহিত রহিয়াছে," যাহা হয় হউক, ভগবতী যাহা বলিতেছেন তাহাই করিতেছি বলিয়া সীতা রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন।

ধরণী বিলুণ্ঠিত রামচন্দ্রের অঙ্গে সজল নয়না সীতার করস্পর্শমাত্রেই তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সীতা তাঁহাকে উৎসাহিত দেখিয়া হর্ষ সহকারে মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, ত্রিলোকের জীবন আবার যেন ফিরিয়া আসিল বলিয়া মনে হইতেছে। রামচন্দ্র তখন বলিয়া উঠিলেন "একি! হরিচন্দনের পল্লব দ্রবে কিংবা নিপীড়িত ইন্দু কিরণাঙ্কুরের সেকে, অথবা সন্তপ্ত জীবন ও চিত্তের পরিতর্পণ সঞ্জীবনী ওষধির রসে কেহ কি আমার হৃদয় সিক্ত করিয়া দিল? মনের সঞ্জীবন ও পরিমোহন এই স্পর্শ নিশ্চয়ই পূর্ব্ব

পরিচিত। ইহা সন্ত সন্তাপজাতা মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া আনন্দভরে আবার বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।" সীতা তখন কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া কম্পিত কলেবরে দূরে অপসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইহাই এক্ষণে আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। ভূমি শয়ন হইতে উঠিয়া আবার তাহাতেই উপবেশন করিয়া রামচন্দ্র বলিতেছিলেন যে, স্নেহময়ী সীতা দেবী কি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। সে কথা শুনিয়া সীতার মনে হইতে লাগিল যে, রামচন্দ্র তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে পারেন। বাস্তবিক রামচন্দ্র তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা তখন তমসাকে লইয়া দূরে অপসরণ করার ইচ্ছা করিলেন, পাছে রামচন্দ্রের বিনানুমতিতে তাঁহার আগমনে তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হন, সীতা তাহাই আশঙ্কা করিতেছিলেন। তমসা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন যে, বৎসে তোমার সে আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি এক্ষণে ভাগীরথীর বরপ্রভাবে বনদেবতাদিগেরও অদৃশ্যা। সীতার তখন সে কথার স্মরণ হইল। রামচন্দ্র আবার হা প্রিয়ে জানকি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সীতা প্রণয়াভিমান সহকারে গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেম, যে, আর্য্যপুত্র এক্ষণে আর ও কথা সাজে না। তাহার পর অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন যে, অথবা জন্মান্তরেও যাঁহার দর্শন লাভ অসম্ভব এবং এই হতভাগিনীর প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া যিনি এরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি বজ্রময়ীর ন্যায় নির্দ্দয় হইব কেন ? আমিত ইঁহার হৃদয় জানি, ইনিও আমার হৃদয় জানেন। সেই সময় চারিদিক দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্র সখেদে বলিয়া উঠিলেন হায় ! এখানে ত কেহই নাই দেখিতেছি। সীতা তখন তমসাকে বলিতে লাগিলেন ভগবতি ! অকারণে আমায় পরিত্যাগ করিলেও এক্ষণে ইঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যে কি হইতেছে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। তমসা উত্তর দিলেন, "বৎসে, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। তোমার হৃদয় নৈরাশ্যে একেবারে উদাসীন হইয়াছিল, স্বামীর অকারণ পরিত্যাগরূপ অপ্রিয় কার্য্যে কোপ কলুষ হইয়া উঠে। সুদীর্ঘ বিরহে এই আকস্মিক মিলন ঘটায় এক্ষণে বিস্ময়স্তিমিতের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। আবার প্রিয়পতির সৌজন্যে প্রসন্নভাবও ধারণ করিতেছে, এবং তাঁহার শোকোচ্ছ্বাসে গাঢ় করুণায় পূর্ণ হইয়া প্রেমভরে যেন গলিয়া পড়িতেছে।" রামচন্দ্র তখন বলিতে-

ছিলেন, “দেবী তোমার স্নেহার্দ্র শীতলস্পর্শ মূর্ত্তিমান অনুগ্রহের ন্যায় আমাকে আহ্লাদিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু আনন্দদায়িনী তুমি কোথায় রহিয়াছ ?’ শুনিয়া সীতা বলিতে লাগিলেন যে, অগাধ স্নেহসম্ভার, আনন্দনিষ্যন্দী সুধা মাখা আর্য্যপুত্রের বিলাপ বচনগুলি শুনিয়া প্রত্যয়বশে আমার জন্মলাভ অকারণ পরিত্যাগ শল্য বিদ্ধ হইলেও এক্ষণে আদরণীয় বলিয়াই মনে হইতেছে। সেই সময়ে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন যে, প্রিয়তমা কোথায় ? কল্পনার পরিশীলন পটুতায় রামের ভ্রমোৎপত্তি ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

সহসা বনমধ্যে হইতে আবার ‘কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ।” এই শব্দ উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলভাবে সম্মুখে আগত যে করি শাবকটিকে সীতা দেবী স্বহস্তদত্ত শল্লকী পল্লবাগ্রে পরিপোষণ করিয়াছিলেন, বধূর সহিত জল বিহারে রত তাহাকে অন্য এক উদ্দাম যূথপতি বেগে আক্রমণ করিল, এ কথাও উচ্চারিত হইতে লাগিল। এ সমস্ত শুনিয়া রাম সীতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র প্রিয়তমার সেই পুত্রটির রক্ষার জন্য উত্থিত হইলে, সহসা বনদেবতা বাসন্তী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দেখিয়া এ কি দেব রঘুনন্দনকে দেখিতেছি যে, বলিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। রাম সীতা তাঁহাকে বাসন্তী বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর বাসন্তী করি-শাবকটির রক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, দেব সত্বর অগ্রসর হউন, এখান হইতে জটায়ু শিখরের দক্ষিণে সীতা তীর্থ দিয়া গোদাবরীতে অবতরণ করিয়া সীতাদেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন। জটায়ুর নাম শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, হা তাত, আপনার অভাবে আজ জনস্থান শূন্য বোধ হইতেছে। বাসন্তীর কথায় রামচন্দ্রের হৃন্মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। বনদেবতা তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। সীতা তমসাকে কহিলেন সত্য সত্যই কি বনদেবতারাও আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না ? তমসা উত্তর দিলেন যে, সকল দেবতা অপেক্ষা মন্দাকিনীর প্রভাবই অধিক। তখন সীতা তমসাকে সঙ্গে লইয়া রাম ও বাসন্তীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র গোদাবরীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সীতার পুত্র করভকটি জয়লাভ করিয়া বধূর সহিত বিচরণ করিতেছে। বাসন্তী তাহাতে রাম-

চন্দ্রকে আনন্দ প্রকাশ করিতে বলিলে, রামচন্দ্র আয়ুষ্মন, বিজয়ী হও বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সীতাও করিশাবকটি এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি তোমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, মৃণালস্নিগ্ধ উদ্গত দশনাঙ্কুরে যে তোমার কর্ণপুর হইতে নবনীপল্লব আকর্ষণ করিত, তোমার সেই পুত্রটী মদমত্ত করিপতিকেও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, সুতরাং যৌবনে যে কল্যাণের আশা করা যায়, সে তাহারই আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে" শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, চিরায়ুষ্মান সোম্যদর্শনা কান্তা হইতে যেন বিযুক্ত না হয়। রামচন্দ্র বাসন্তীকে আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, বৎসটী আবার কান্তানুরঞ্জনের চাতুর্য্যও শিখিয়াছে, প্রণয় ভরে লীলাচ্ছলে উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাসস্বরূপে প্রদান করিয়া বিকসিত পদ্ম সুবাসিত জলগণ্ডুষ বধূর মুখমধ্যে ঢালিয়া দিতেছে, আবার শুণ্ড দ্বারা জলকণা বর্ষণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া তুলিতেছে। অবশেষে সরল নালযুক্তনলিনী পত্রের ছত্রটীও বধূর মস্তকে ধারণ করিতেছে।" এদিকে সীতা তমসাকে বলিতে লাগিলেন যে, ভগবতী করিশিশুটীত এরূপ হইয়াছে, না জানি আমার কুশলব এতদিনে কেমন হইয়া উঠিয়াছে। তমসা উত্তর দিলেন যে, তাহারাও এইরূপ হইয়াছে জানিবে। সীতা তখন আবার বলিয়া উঠিলেন যে, আমি এরূপ হতভাগিনী যে, আমার কেবল পতিবিরহ নহে, পুত্রবিরহও ঘটিতেছে। শুনিয়া তমসা কহিলেন যে, ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে? সীতা আবার বলিতে লাগিলেন যে, আর্য্যপুত্র যখন আমার পুত্রদ্বয়ের ঈষদ্ বিরল কোমলধবল দশনেভূষিত, উজ্জ্বল-কপোল-পরিশোভিত, মধুর কাকলী ও হাস্যে মনোহর, কাকপক্ষযুক্ত অমল মুখপদ্মযুগল চুম্বন না করিলেন, তখন আমার এ প্রসবের ফল কি? তমসা উত্তর দিলেন যে, দেবতার অনুগ্রহে তাহাই হইবে। তখন সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, ভগবতি বৎসদ্বয়ের স্মরণে আমার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের জনকও নিকটে অবস্থিত তাই আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সংসারিনী হইয়া উঠিয়াছি। তমসা বলিতে লাগিলেন 'এ বিষয় কি আর বলিব। স্নেহের শেষ সীমা সন্তানকেই আশ্রয় করে, অপত্যই পিতামাতার পরস্পরের সংযোগস্থল। পতি পত্নী

উভয়েররই স্নেহের আস্পদ হওয়ায় বিধাতা সন্তানরূপ আনন্দময় একটী গ্রন্থির দ্বারা তাহাদের হৃদয় দুইটিকে বন্ধন করিয়াছেন।

সেই সময়ে নবোদ্গত মনোহর ও চঞ্চল পুচ্ছভূষিত ছটালঙ্কৃত মণিময় মুকুটের ন্যায় একটি ময়ুর বধূর সহিত আনন্দবিহ্বল হইয়া তাণ্ডব নৃত্য সমাপনের পর কদম্বতরু শাখায় বসিয়া কেকাধ্বনি করিতেছিল। এই ময়ুরটিকেই সীতাদেবী পালন করিয়াছিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সীতার দৃষ্টিও তাহার প্রতি নিপতিত হইল, এবং তিনি ময়ুরটিকে সেরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র 'তোমার আনন্দ বৃদ্ধি হউক' বলিয়া ময়ূরটীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সীতাও তাহাতে সম্মতি দিলেন। রামচন্দ্র আবার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তুমি যখন মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে, প্রিয়তমার চক্ষু দুইটীও সঙ্গে সঙ্গে তখন পুটমধ্যে আবর্ত্তিত হইত। সে সময় তাহার চটুল ভ্রূযুগলের নর্ত্তনে তাহাদিগকে কতই না সুন্দর দেখাইত। মুগ্ধাপ্রিয়া করকিসলয়ের তালে তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় নাচাইতেন। এক্ষণে আমি তাহা স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,' যে কদম্ব তরু শাখায় ময়ুরটী বসিয়াছিল তাহাকে সীতাদেবী পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সে কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আহা পশু পক্ষীদিগেরও পরিচয় বোধ আছে, যে কদম্ব বৃক্ষটীকে প্রিয়তমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এক্ষণে দেখিতেছি তাহাতে দুই একটি কুসুমও বিকসিত হইয়াছে, দেবীব গিরি ময়ুরটি তাহাকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থান করিয়া স্বজন সঙ্গের প্রীতি অনুভব করিতেছে"। রামচন্দ্র কদম্ব তরুটি চিনিতে পারিয়াছেন জানিয়া সীতা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

বাসন্তী পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্রের আমগনের জন্য তাঁহাকে এক্ষণে অভ্যর্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে তথায় উপবেশনের জন্য অনুরোধ করিয়া, বলিতে লাগিলেন—দেব, কদলীবন মধ্যবর্ত্তী যে শিলাতলে আপনি কান্তার সহিত শয়ন করিতেন, এই সেই শিলাখণ্ডখানি পড়িয়া রহিয়াছে। এইখানে বসিয়া সীতা হরিণ শিশুগুলির মুখে তৃণগুচ্ছ প্রদান করিতেন, সেইজন্য তাহারা এস্থানটি পরিত্যাগ করিতে পারিত না। রামচন্দ্র তাহা দেখিতে অশক্ত হইয়া সজল নয়নে অন্যস্থানে উপবেশন করিলেন। সীতা তখন বাসন্তীকে লক্ষ্য

করিয়া কহিলেন, 'সখি তুমি আমাকে ও আর্য্যপুত্রকে এই স্থানটি দেখাইয়া এ কি করিলে ? সেই আর্য্যপুত্র,সেই পঞ্চবটীবন,সেই সখী বাসন্তী,বিবিধ স্বচ্ছন্দ বিহারের সাক্ষী সেই গোদাবরী কাননপ্রদেশ, পুত্র নির্ব্বিশেষ সেই মৃগ পক্ষী পাদপকুল আর সেই আমি কিন্তু এ হতভাগিনী সে সকল দেখিলেও তাহার পক্ষে যেন ইহাদের অস্তিত্বই নাই। জীব লোকের পরিণাম এইরূপই বটে।" রামচন্দ্রের কাতরভাব নিরীক্ষণ করিয়া বাসন্তী তখন সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে ছিলেন, সখি সীতে, রামচন্দ্রের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না কেন ? সর্ব্বদাই ইচ্ছামাত্রেই দেখিতে পাইলেও যাঁহারা কুবলয়দলস্নিগ্ধ অঙ্গে তোমার নয়নের নব নব উৎসব সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তিনি বিকলেন্দ্রিয়, পাণ্ডুবর্ণ ও শোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে অতি কষ্টেই অনুমান করিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে নয়নাভিরাম বোধ হইতেছে। বাসন্তীর কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, আমি সমস্তই দেখিতেছি। তাহা শুনিয়া তমসা কহিলেন যে তুমি চিরদিনই এইরূপ ভাবে স্বামীকে দেখিতে থাক। সীতা আবার বলিতে লাগিলেন, হা দৈব ! আর্য্যপুত্র আমাকে ছাড়িয়া এবং আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিব, একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সে যাহা হউক অশ্রুর পতন ও পুনরুদ্গমের অন্তরালে জন্মান্তরেও দুর্লভদর্শন সেই আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই,' এই বলিয়া সীতা সস্পৃহ নয়নে রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। তমসা স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আনন্দ ও শোকে উচ্ছলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে কান্তদর্শন স্পৃহায় বিস্ফারিত তোমার স্নেহ নিষ্যন্দিনী শুভ্রা দৃষ্টি দুগ্ধধারার ন্যায় হৃদয়েশকে যেন স্নাত করিয়া তুলিতেছে।

বাসন্তী এতক্ষণ রামচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও চিত্তবিনোদন ঘটে নাই মনে করিয়া তিনি তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বনদেবতা তখন বলিতে লাগিলেন, "রামদেবের স্বয়ং আবার এই বনাগমনে মধুবর্ষী তরুগণ ফলপুষ্পের অর্ঘ্য প্রদান করুক, প্রস্ফুটিত কমল সৌরভবাসিত বনবায়ু প্রবাহিত হউক। পক্ষিগণ রাগযুক্ত কণ্ঠে অবিরল কলধ্বনি করিতে থাকুক।" নিমেষ মধ্যে সমস্ত পঞ্চবটীবন এইরূপই হইয়া উঠিল। তাহার পর রামচন্দ্র বাসন্তীকে উপবেশন করিতে

অনুরোধ করিলে, বাসন্তী উপবেশন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন যে, মহারাজ কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত, রামচন্দ্র যেন তাহা শ্রবণ না করার ভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মৈথিলী স্বীয় করকমলে অম্বু, নীবার ও শষ্প বিতরণ করিয়া যে বৃক্ষ, পক্ষী ও কুরঙ্গদিগকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমাব হৃদয় দ্রবের ন্যায় কি এক বিকার উপস্থিত হইতেছে, এনন কি তাহাতে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।" বাসন্তী আবার বলিলেন যে, মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত বাসন্তীর মহারাজ সম্বোধনটি রামচন্দ্রের নিকট প্রণয়শূন্য বলিয়া বোধ হইল, আবার কেবল লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করায় অশ্রুচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতে থাকায়, সীতার বৃত্তান্ত তিনি অবগত আছেন বলিয়া রামচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল। পরে রামচন্দ্র বাসন্তীর কথার উত্তর দিয়া কহিলেন যে হাঁ, কুমারের কুশল বটে, এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, দেব, আপনি এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন? সে কথা শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, সখি বাসন্তী তুমি এরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিলে কেন? আর্য্যপুত্র সকলের নিকটই প্রিয় সম্ভাষণের যোগ্য, বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর নিকট। বাসন্তী আবার "তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়ন কৌমুদী তুমি আমার অঙ্গে অমৃত ধারা এইরূপ শত শত প্রিয়বাক্যে সেই সরল প্রাণার চিত্তরঞ্জন করিয়া তাহাকেই —অথবা থাক ইহার পর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র উপযুক্ত স্থানেই বাক্যনিবৃত্তি ও মূর্চ্ছা হইয়াছে বলিয়া বাসন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, সংজ্ঞালাভ করিয়া বাসন্তী আবার বলিলেন যে, দেব আপনি এরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কেন? সীতা বাসন্তীকে বিরত হওয়ার কথাই বলিতেছিলেন। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, লোকে সহ্য করিতে পারে না বলিয়া। শুনিয়া বাসন্তী বলিলেন যে, তাহার কারণ কি? রামচন্দ্র উত্তর করিলেন যে তাহারাই জানে। তখন তমসা বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাদিগকে তিরস্কার করাই উচিত। বাসন্তী আবার বলিতে লাগিলেন, "নিষ্ঠুর, তোমার নিকট যশই প্রিয় দেখিতেছি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অপযশ আর কি হইতে পারে? প্রভু বলুন দেখি গহনকাননে সেই

হরিণনয়নার কি দশা ঘটিয়াছে, এবং আপনিই বা সে বিষয়ে কি মনে করিতে-ছেন ?" সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, সখি, তুমি নিষ্ঠুর ও কঠোর কারণ শোকসন্তপ্ত আর্য্যপুত্রকে আবার সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছ। তমসা বলিলেন যে, ইহা প্রণয় ও শোকাবেগেরই উক্তি, রামচন্দ্র উত্তর দিলেন "আমি কি আর মনে করিব ? ভয় ব্যাকুল এক বর্ষীয় কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলনয়না ও প্রস্ফুরিত গর্ভভারে অলসগমনা প্রিয়তমার কোমল নবমৃণালসমা জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতিকা হিংস্র জন্তুগণ নিশ্চয়ই গ্রাস করিয়াছে," সীতা তখন বলিয়া উঠি-লেন যে, আর্য্যপুত্র এই দেখ আমি জীবিত রহিয়াছি।

রামচন্দ্র আবার হা প্রিয়ে জানকি তুমি কোথায় বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা বলিলেন যে, হায়! আর্য্যপুত্রও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন দেখিতেছি। তমসা বলিয়া উঠিলেন, "বৎসে, উহা এ অবস্থারই উপযোগী বটে, দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ নির্ব্বাপণ করাই উচিত। কারণ গভীর জলাশয়ের জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে জল নির্গমন করাই তাহার প্রতীকার, শোক ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিলে প্রলাপাদির দ্বারাই হৃদয়কে শান্ত করিতে হয়। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের সংসারযাত্রা বহুবিধ ক্লেশে পূর্ণ, তাঁহাকে অভিনিবিষ্টচিত্তে যথাবিধি এই বিশ্বসংসার পালন করিতে হয়, নিদাঘতাপে কুসুম যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ প্রিয়াশোক তাঁহার জীবনকে পরিম্লান করিয়া তুলিতেছে। তিনি যে, বিলাপ করিয়া দুঃখ প্রশমন করিবেন তাহারও উপায় নাই, কারণ তিনি স্বয়ংই তোমাকে ত্যাগ করিয়া-ছেন, আবার এখনও পর্য্যন্ত যে তিনি জীবনধারণ করিয়া আছেন, তাহা কেবল বিলাপের জন্য, কাজেই রোদনটাকে পরম লাভই বলিতে হইবে।" রামচন্দ্র আবার কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন 'হায় কি কষ্ট! গাঢ়োদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে না, বিকল দেহ-ভার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু একেবারে চৈতন্য হারাইতেছে না। অন্তঃ-দাহে অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু জীবন সূত্রত ছিন্ন হইতেছে না।" শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, এইরূপই বটে। রামচন্দ্র আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিবর্গ আমার গৃহে সীতাদেবীর স্থান

আপনাদের অভিমত না হওয়ায় তাঁহাকে নির্জ্জন অরণ্যে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি, তজ্জন্য অনুশোচনাও করি নাই। চির পরিচিত এই সকল স্থান দর্শনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই উপায়ান্তর না থাকায় এক্ষণে এইরূপ রোদন করিতেছি। আপনারা কিছু মনে না করিয়া প্রসন্ন হউন। রামচন্দ্রের কাতরভাব দেখিয়া তমসা বলিয়া উঠিলেন যে, ইহার শোকসাগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। বাসন্তী তখন বলিলেন যে, দেব, অতীত বিষয়ে আর শোক করিয়া কি হইবে? এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন "সখি কি বলিলে ধৈর্য্য! দেবী শূন্য জগতের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইতেছে, সীতা এ নামও বিলুপ্ত হইতে চলিল, কিন্তু রাম কি জীবিত নাই?" শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, আর্য্যপুত্রের কথা গুলিতে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। তমসা বলিতে লাগিলেন, "তাহা হইতে পারে বটে, এই স্নেহার্দ্র ও শোক দারুণ বাক্যগুলি নিতান্ত প্রিয় নহে। এগুলি তোমার উপরে বিষ মিশ্রিত মধু ধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে," রামচন্দ্র আবার বাসন্তীকে বলিলেন, "অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্রাকার জলদঙ্গার শল্যের ন্যায়, অথবা সবিষ দশনের তুল্য মর্ম্মচ্ছেদী হৃদয়নিহিত তীব্র শোকসঙ্কু কি আমি সহ্য করিতেছি না?" শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, আমি এরূপ মন্দভাগিনী যে আবার আর্য্যপুত্রের ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিলাম। রামচন্দ্র স্বীয় হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করিলেও পূর্ব্বপরিচিত বস্তুসমূহের দর্শনে তাঁহার শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল, তিনি বলিতেছিলেন, 'চঞ্চল উর্ম্মিমালার ন্যায় ক্ষুভিত ইন্দ্রিয়গণের আবেগ নিরোধের জন্য আমি অতিকষ্টে অন্তরে যে সমস্ত যত্ন করিতেছি, কেমন এক চিত্তবিকার, অপ্রতিহত বেগ জল-প্রবাহের সৈকত সেতু ভেদের ন্যায় তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া প্রবলবেগে প্রসারিত হইতেছে।" সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, আর্য্যপুত্রের এই দুর্ব্বার দারুণ শোকাবেগে আমারও দুঃখ প্রস্ফুরিত হইয়া যেন হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

রামচন্দ্রকে শোকবিহ্বল ও বিপন্ন দেখিয়া বাসন্তী তাঁহার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করার অভিপ্রায়ে বলিলেন যে, দেব, এই চির পরিচিত জন স্থান প্রদেশগুলি দেখিয়া আপনি চিত্ত বিনোদন করুন। "তাহাই হউক" বলিয়া রামচন্দ্র উত্থিত হইলেন ও চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সীতা কিন্তু বাসন্তীর

এই বিনোদনোপায়কে দুঃখ সন্দীপনের কারণ বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। রাম ও বাসন্তী ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরিচিত কুঞ্জের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাসন্তী সেই কুঞ্জটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব আপনি সীতার আগমনপথের দিকে চাহিয়া এই লতাগৃহেই উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কিন্তু কৌতুকভরে হংসশ্রেণী দেখিতে দেখিতে গোদাবরী সৈকতে বিলম্ব করিতেছিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে অত্যন্ত বিমনা দেখায় কাতরভাবে কমলকোরকনিভ প্রণামাঞ্জলিবন্ধন করেন," সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন যে, সখি বাসন্তি তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরা দেখিতেছি, কারণ হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবিষ্ট শল্য বারম্বার আলোড়ন করিয়া এ হতভাগিনী ও আর্য্যপুত্রকে সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছে। রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন, "অয়ি চণ্ডি, জানকি, তোমাকে যেন ইতস্ততঃ দেখিতেছি, কিন্তু তুমি ত আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ না। হায় দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখাইতেছে, অবিরত জ্বালায় অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছি। অন্তরাত্মা বিধুর ও অবসন্ন হইয়া অন্ধতমে যেন নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। প্রবলমোহে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। মন্দভাগ্য আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না," এই বলিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া সীতা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সীতাও হা আর্য্যপুত্র, এই হতভাগিনীর জন্যই সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার তোমায় বারম্বার এইরূপ জীবন সংশয়কর দশাপরিণাম ঘটিতেছে, হায়, হায়! আমিও হত হইলাম, বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন যে, বৎসে পুনর্ব্বার তোমারই পাণিস্পর্শ রামভদ্রের সঞ্জীবনোপায়। তখনও পর্য্যন্ত রামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করেন নাই দেখিয়া বাসন্তী ব্যাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয় সখি সীতে, তুমি এখন কোথায়? তোমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা কর। সীতা তখন ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের চৈতন্য পুনরাগত হইল, তাহা দেখিয়া বাসন্তী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন।

চেতনা লাভ করিয়া রামচন্দ্র বলিতেছিলেন, "সেই সংস্পর্শ—ত্বক্, মেদ,

মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি বাহিরের ও অন্তরের শরীর ধাতুগুলিকে অকস্মাৎ যেন অমৃতময় প্রলেপের দ্বারা লিপ্ত করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে, আবার নিরতিশয় আনন্দদানে অন্যপ্রকার মোহ আনয়নও করিতেছে। তাহার পর আনন্দে চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, সখি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, বাসন্তীর তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিলে রামচন্দ্র বলিলেন যে, আর কি, সীতাকে পুনর্ব্বার পাইয়াছি। বাসন্তী উত্তর দিলেন যে, তিনি কোথায়? রামচন্দ্র তখন সীতার স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে করিতে কহিলেন যে, এই দেখ তিনি সম্মুখেই রহিয়াছেন। বাসন্তী সীতাকে দেখিতে পাইতে ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নিকট ইহাকে রামচন্দ্রের প্রলাপোক্তি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, দেব রামচন্দ্র একেত হতভাগিনী প্রিয়সখীর শোকে দগ্ধ হইতেছে, তাহার উপর আপনি এইরূপ দারুণ মর্ম্মচ্ছেদী প্রলাপ বাক্যে পুনর্ব্বার তাহাকে ভস্মীভূত করিতেছেন কেন? সীতা তখন বলিতেছিলেন যে, আমি এখন এখান হইতে অপসৃত হওয়ারই ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু দীর্ঘকালের অনুরাগ বশে সৌম্য ও শীতল আর্য্যপুত্রস্পর্শে সুদীর্ঘ ও দারুণ সন্তাপ হরণ করিয়া আমার হস্তকে বজ্রলেপ দ্বারা সম্বদ্ধ করিতেছে, তাহাতে সে স্বেদাক্ত ও অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হইয়া বিবশ হইয়া পড়িয়াছে এবং কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বাসন্তীর কথায় রামচন্দ্র উত্তর দিলেন "সখি আমার কথা প্রলাপ বাক্য হইবে কেন? বিবাহকালে মঙ্গলসূত্র ভূষিত যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইচ্ছামাত্রেই যাহার অমৃত শীতল স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া চির পরিচিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তুহিন করকার ন্যায় মনোরম ও গলিত নবনীর অঙ্কুরতুল্য প্রিয়তমার সেই হস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার হস্তখানি ধরিয়া ফেলিলেন। স্বীয় হস্তের পরিচয় প্রদান শুনিতে শুনিতে সীতা বলিতেছিলেন যে, আর্য্যপুত্র সেই আর্য্যপুত্রই আছেন দেখিতেছি। তাহার পর স্পর্শ যতই প্রগাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল সীতা ততই বিহ্বলা হইয়া পড়িতেছিলেন। রামচন্দ্রেরও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, তিনি বাসন্তীকে বলিতে লাগিলেন যে, "সখি আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গণ নিমিলিত প্রায় হইতেছে। পাছে আমি আবার সীতাকে হারাই এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। অতএব তুমি ইহাকে ধরিয়া রাখ।" বাসন্তী কিন্তু রাম-

চন্দ্রকে উন্মত্তই মনে করিতে ছিলেন। ধৃত হইবার ভয়ে সীতা তখন হস্ত আকর্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "হায় কি কষ্ট উপস্থিত হইল, স্বেদসিক্ত কম্পিত জড়তাপ্রাপ্ত প্রিয়ার করপল্লব আমারও ঘর্ম্মাক্ত কম্পযুক্ত অবশ হস্ত হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।"

ক্রমে রামচন্দ্র অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় কখনও চঞ্চল কখনও নিস্পন্দ, কখনও অনল ও আধার, কখনও আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সীতা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তিনিও তখন স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্নেহ হাস্য ও আনন্দ সহকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তমসা বলিতেছিলেন, প্রিয়স্পর্শ সুখে বৎসা স্বেদযুক্তা, রোমাঞ্চিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইয়া যেন নব বারিধারায় সিক্তা সমীরান্দোলিতা স্ফুটকোরকা কদম্বযষ্টির ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছেন। শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, আমার দেহ অবশ হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকট বড়ই লজ্জিত হইতেছি, ইনি হয়ত মনে করিতেছেন, স্বামী আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। সেই সময়ে রামচন্দ্র আবার বিলাপ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন যে, কৈ প্রিয়তমা ত এখানে নাই। হা বৈদেহি, তুমি নিশ্চয়ই নির্দ্দয়া। সীতা তখন বলিতে লাগিলেন যে, আমি সত্য সত্যই নির্দ্দয়া, নতুবা তোমাকে এরূপ ভাবে দেখিয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছি কেন? রামচন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন যে, দেবি তুমি কোথায়, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে এরূপ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া তোমার পরিত্যাগ করা উচিত নহে। শুনিয়া সীতা কহিলেন যে,আর্য্যপুত্র তুমি বিপরীত কথাই বলিতেছ,আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, তুমিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। বাসন্তী রামচন্দ্রকে শান্ত করার চেষ্টা করিয়া কহিলেন যে, দেব প্রসন্ন হউন, স্বীয় লোকোত্তর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া লোকাভিভূত আত্মাকে সুস্থির করিয়া তুলুন, কোথায় আমার প্রিয় সখী রহিয়াছেন? রামচন্দ্র তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সত্য সত্যই সীতা এখানে নাই, নতুবা বাসন্তী তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না কেন? তবে কি ইহা স্বপ্ন? কিন্তু আমি ত নিদ্রিত হই নাই, রামের আবার নিদ্রা কোথা

হইতে আসিবে? নিশ্চয়ই সেই বারম্বার মনঃকল্পিত সীতা সমাগমে সম্ভূতা ভগবতী প্রতারণা দেবী আমার অনুসরণ করিতেছেন," সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন, নিদারুণা আমিই আর্য্যপুত্রকে প্রতারিত করিতেছি।

রামচন্দ্রের চিত্ত অন্তদিকে আকর্ষণ করিয়া বাসন্তী তখন বলিতে লাগিলেন "দেব, দেখুন, দেখুন, জটায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন রাবণের কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত রথখানি পড়িয়া রহিয়াছে। আবার পিশাচবদন গর্দ্দভগুলির কঙ্কালাবশেষও দেখা যাইতেছে, এইখানে খড়্গ দ্বারা জটায়ুর পক্ষচ্ছেদের পর দীপ্তিমতী সীতাকে ধারণ করিয়া বিদ্যুদ্বক্ষ মেঘখণ্ডের ন্যায় রাবণ আকাশে উত্থিত হইয়াছিল। শুনিয়া সীতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন যে, হা আর্য্যপুত্র, তাত জটায়ু নিহত হইতেছেন, আমিও অপহৃত হইলাম, রক্ষা কর রক্ষা কর। রামচন্দ্রও সবেগে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, রে তাত প্রাণহন্তা, সীতাপহারী পাপাত্মা তুই কোথায় যাইবি। বাসন্তী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন যে, দেব রাক্ষসকুল প্রলয়ের ধূমকেতু এখনও কি আপনার ক্রোধের পাত্র বিদ্যমান আছে। সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন যে, হায়! আমিও যে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া উঠিলাম। রামচন্দ্র আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সত্য সত্যই আমি প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছি।" তখন প্রিয়তমার উদ্ধারের নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন এবং বীরগণের বিমর্দ্দনে জগতে অদ্ভুত রসের অবতারণা করায় এই সমস্ত বিনোদন ব্যাপারে মুগ্ধাক্ষীর পূর্ব্ব বিরহ রিপুনাশের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নিরবধি বিরহ কিরূপে মৌনাবলম্বন করিয়া সহ্য করিব।" শুনিয়া সীতা কহিলেন যে, যদি সত্য সত্যই এ বিরহ নিরবধি হয়, তাহা হইলে আমিও ত হত হইলাম। রামচন্দ্রের বিলাপের শেষ হইতেছিল না। তিনি আবার বলিতে লগিলেন "যেখানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত আমার সখ্যব্যর্থ, কপিগণের বীর্য্য নিষ্ফল, জাম্বুবানের প্রজ্ঞা অকার্য্যকারী, বায়ুপুত্র হনুমানের গমন অসম্ভব, বিশ্বকর্ম্মাতনয় নলের পথ নির্ম্মাণ ক্ষমতার অতীত এবং লক্ষ্মণের বাণও প্রবেশে অসমর্থ, জগতের মধ্যে এমন কোন স্থানে প্রিয়তমা তুমি লুক্কায়িত রহিয়াছ? রামের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা অপেক্ষা পূর্ব্ব বিরহ বরং ভালই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

পঞ্চবটীতে রামচন্দ্রের আর থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বাসন্তীকে বলিতেছিলেন যে, সখি রামের দর্শন এখন কেবল সুহৃদদিগের রোদনের কারণ। তোমাকে আর কতক্ষণ কাঁদাইব। আমাকে বিদায় দেও। সে কথায় সীতা তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া উদ্বেগ সহকারে বলিয়া উঠিলেন যে, ভগবতি আর্য্যপুত্র যে চলিয়া যাইতেছেন! তমসা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন যে, চল, আমরাও আয়ুষ্মান কুশ লবের বর্ষবৃদ্ধির মাঙ্গলি অনুষ্ঠানের জন্য ভগবতী ভাগীরথীর চরণপ্রান্তে গমন করি। সীতা তখন কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন যে, ভগবতি প্রসন্না হউন। ক্ষণকালের জন্য এই দুর্লভ জনকে একবার দেখিয়া লই। রামচন্দ্র সেই সময় বলিতেছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য সহধর্ম্মচারিণী যে হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহাই দর্শন করিয়া এই বাষ্পাকুল চক্ষুর বিনোদ সম্পাদন করিব। রামচন্দ্রের সহধর্ম্মচারিণী পর্য্যন্ত উচ্চারণে সীতা উৎকম্পিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শুনিয়া আবেগভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, আর্য্যপুত্র, তুমি আমার সেই আর্য্যপুত্রই আছ। আজ আমার পরিত্যাগ লজ্জাশল্য উৎপাটিত হইয়া গেল। আর্য্যপুত্র যাহাকে আদর করেন, এবং যে আর্য্যপুত্রের চিত্ত বিনোদন করিয়া জীবলোকের আশা-বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে সে নিশ্চয়ই ধন্য। সে কথায় তমসা সহাস্যে স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে, বৎসে, ইহা তোমারই আত্মপ্রশংসা। সীতা লজ্জিত হইয়া অধোমুখে মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, ভগবতী আমাকে পরিহাস করিলেন দেখিতেছি। সেই সময় বাসন্তী রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, এই সমাগমে আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিগমন সম্বন্ধে বলিতেছি যে, যাহাতে কার্য্যহানি না হয় তাহাই করুন। শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, বাসন্তীও দেখিতেছি আমার প্রতিকূলচারিণী হইয়া উঠিল। তমসা সীতাকে বলিলেন যে, এস বৎসে আমরাও যাই, সীতা অতিকষ্টে উত্তর দিলেন যে, চলুন তাহাই করিতেছি। তমসা তখন বলিতে লাগিলেন যে "কেমন করিয়াই বা তুমি যাইবে? দর্শন লালসায় প্রসারিত তোমার চক্ষু স্বামী শরীরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ফিরাইয়া লও যার চেষ্টায় তোমার মর্ম্মছিন্ন হইয়া যাইতেছে।"

তাহার পর সীতা সে স্থান পরিত্যাগের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিতে ছিলেন না। তিনি অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁহার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, সেই আর্য্যপুত্রের চরণ-কমলে প্রণাম করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন যে, মেঘের অপসরণ ও পুনরাবরণের মধ্যে আর কত-ক্ষণই বা পূর্ণচন্দ্র দর্শন করা যায়। সীতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তমসা তখন বলিতেছিলেন "আহা কার্য্য কারণ ভাবের কি বিচিত্র রচনা কৌশল! জলরাশি যেমন আবর্ত্ত, বুদ্‌বুদ, তরঙ্গ প্রভৃতির আকারে নানারূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহারা সলিল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ একমাত্র করুণ রস নিমিত্তভেদে ভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করে।" রাম-চন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বিমানরাজ পুষ্পককে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। সকলে তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তমসা ও বাসন্তী যথাক্রমে সীতা ও রামকে লক্ষ্য করিয়া এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। "আমাদিগের সহিত বসুন্ধরা ও মন্দাকিনী এবং নবছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক কুলপতি বাল্মীকি ও অরুন্ধতীসহায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তোমার প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন।' এইরূপে অদৃশ্যা ছায়াসীতার সমাগমে রামচন্দ্র আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়া পঞ্চবটী হইতে বিমানারোহণে অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য সকলেও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

ছায়া সীতা। *

সীতাহারা রামচন্দ্র উদাস পরাণে,
ভ্রমিছেন পরিচিত ভূমি জন স্থানে,
প্রতি তরু প্রতি লতা,
দিতেছে হৃদয়ে ব্যথা,
সীতার স্মরণে চিত্ত হয়েছে বিকল,
অবিরল অশ্রু ধারা বহিছে কেবল,

যেই স্নিগ্ধ লতাটীরে হৃদয় কাননে,
স্থাপিয়া ছিলেন রাম অতীব যতনে,
উন্মূলিতা করি তারে
নিজে দিয়েছেন দূরে,
হৃদয় খুঁজিতে কিন্তু মেলেনা হৃদয়,
লতাসহ গেছে ছিঁড়ি লতার আশ্রয়,

পঞ্চবটী বনমাঝে প্রত্যেক স্মরণে,
সীতার লাবণ্য ছায়া পড়িতেছে মনে,
সরলতা মাখা মুখ,
দিতেছে হৃদয়ে দুখ,
আজি যেন অকস্মাৎ কানন ভরিয়া,
সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি বেড়ায় নাচিয়া।

প্রত্যেক তরুর প্রতি পাতায় পাতায়
সীতার মধুর ছবি যেন দেখা যায়,

---

* জন্মভূমি প্রথমবর্ষ হইতে উদ্ধৃত।

বায়ুভরে লতা দুলে,
যেন সীতা যান চলে,
প্রতি ফুলে ফুলে যেন সীতার আকার,
রামের নয়ন আজ হেরে অনিবার।

সেই প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ গোদাবরী জলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন উঠিছে উথুলে,
রামের হৃদয়ে যেই,
সমস্ত জগতে সেই,
অন্তর বাহির যেন একে পরিণত,
সীতা মূর্ত্তি জাগিতেছে দুয়েতে সতত,

জনস্থান বনদেবী বাসন্তী সুন্দরী,
সাজায়ে দিলেন আজ পঞ্চবটী ভরি,
থরে থরে ফুল রাশি,
হাসিছে মধুর হাসি,
তরুলতা সরোবর হাসিছে সকল,
সীতাহারা রাম প্রাণ করিতে শীতল।

নির্ব্বাসিতা সীতামুখ কিন্তু প্রতিক্ষণে,
আনিছে পিশাচী স্মৃতি অনুতাপ সনে,
পঞ্চবটী শোভা হেরি,
রামের হৃদয় ভরি,
দারুণ শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া,
সীতা, সীতা, করি প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া।

হেরি সেই করভকে সীতার নন্দনে,
অস্থির শ্রীরামচন্দ্র স্মৃতির দংশনে,

ছায়া-সীতা।

Eugraved and Printed by the Mohila Press, Calcutta

কদলীর বনমাঝে,
সেই শিলাখণ্ড রাজে,
যাতে বসিতেন দোঁহে, সীতা তৃণরাশি
দিতেন হরিণ শিশু-মুখে মৃদু হাসি।

এখন (ও) সীতার লাগি মৃগ শিশুগণ,
সেই খানে দলে দলে করে বিচরণ,
পুষ্পিত কদম্ব শিরে,
হেরি শিখী শিশুটীরে,
সীতা করতালি ভরে নাচিত যেমন,
বিম্বিত করিছে তাহা স্মৃতির দর্পণ।

যেই তরু মূলে সীতা নিজকর দিয়া,
গোদাবরী জলরাশি দিতেন ঢালিয়া,
বিকীর্ণ নীবার কণ,
খুঁটিত যে পাখিগণ,
কীর্ণ তৃণগুচ্ছ যারা করিত চর্ব্বণ,
রামের নয়ন হেরে সেই মৃগগণ।

সম্মুখে অখণ্ড শ্যাম কানন সুন্দর,
ঊর্দ্ধে নীলাকাশ রাজে অতি মনোহর,
অদূরে মধুর স্বরে,
গোদাবরী ধীরে ধীরে,
আপনা ঢালিয়া দিতে সিন্ধু পানে ধায়,
সতী নারী ঢালে প্রাণ যথা পতি পায়।

দেখিতে দেখিতে যেন বাহির অন্তরে,
সীতারূপ ভরি গেল নিমেষের তরে,

রামের চৈতন্য নাশি,
সীতার রূপের রাশি,
রামের মনের মাঝে উঠিল উজলি,
মূর্চ্ছিত হইয়া রাম পড়িলেন ঢলি,

সহসা কে যেন আসি, চন্দনের রস,
ঢালি দিল রাম দেহে অলস বিবশ,
কিংবা নিষ্পীড়ন করি,
কৌমুদীর রাশি ধরি,
তাহার বিমল সেক শরীরে বরষে,
চৈতন্য আসিল কার পাণির পরশে ?

কে হায় অদৃশ্যে থাকি রামের জীবন,
সুখের সাগর গর্ভে করিল মগন,
সেই স্পর্শ সেই কর
রামের বক্ষের পর
কোথা সীতা রামনেত্র হেরেনা ত হায়,
সঞ্জীবনী সুধাদানে কে তবে বাঁচায় ?

ক্ষণেক চেতনা লভি ক্ষণে অচেতন,
ধরিতে সে ছায়াময়ী কেবলি যতন,
ধর ধর হয় যেই,
অমনি লুকায় সেই,
সত্তামরী করিবারে যথা কল্পনায়,
চঞ্চল মানবচিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়।

কি যে "ছায়া" বুঝিবারে পারে কোন জনে,
চেতনা কি শুধু মায়া বুঝিবে কেমনে,

রামের অন্তর হতে,
আসিল কি আচম্বিতে,
সীতারূপ অর্দ্ধ আত্মা যা ছিল মিলিয়ে,
রামের আত্মার সহ এক আত্মা হয়ে।

অথবা বাহিরে যেই ছায়া বিশ্ব ভরি,
তরুলতা ফুল মাঝে ছিল আলো করি,
এবে ঘনীভূত হয়ে,
রাম মূর্চ্ছা ভেঙ্গে দিয়ে,
তাহাদের সত্ত্বা মাঝে মিশায় আবার
আনন্দ শান্তির যারা অনন্ত আঁধার।

অথবা অন্তরস্থিতা ছায়া বিমোহিনী,
বাহ্য ছায়া সনে মিশি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী,
এক হয়ে দুই ছায়া,
যেন মূর্ত্তিমতী দয়া,
রামের চৈতন্য হরি, চেতনা লভিয়া,
লুকায় রামেরে তাহা পুনঃ প্রদানিয়া ?

নহে "ছায়া" ভবভূতি কল্পনা কুমারী
আর্য্যনারী মূর্ত্তি এযে ত্রিলোক সুন্দরী,
অর্দ্ধপতি আত্মা যেই,
ছায়ারূপে এ ত সেই,
যখন পতির প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া
যথা থাকে সে অমনি আসিবে ছুটিয়া।

দুইটী আধেক আত্মা মিশেছে যখন,
থাকুক না ভিন্নস্থানে সদা দুই জন,

একটীতে টান দিলে,
দ্বিতীয় আসিবে চলে,
আর্য্য পতি পত্নী এই রহস্য সুন্দর
দুয়ে এক পূর্ণ আত্মা অক্ষয় অমর,

আর্য্যনারী ছায়া নহে কল্পনা উচ্ছ্বাস,
গভীর তত্ত্বের ইহা গভীর বিকাশ,
সামান্য রমণী নয়,
আর্য্যনারী সমুদয়,
"যে দেবীর ছায়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান"
আর্য্যনারী আত্মা মাঝে তাঁরি অধিষ্ঠান।

তিনিইত আর্য্যনারী রূপে অবতরি,
হতভাগ্য জীবগণে লন কোলে করি,
জীবের লাগিয়া তাঁর
কাঁদে প্রাণ অনিবার,
তাই তিনি আর্য্যনারী ধরিয়া আকার
ঢালি দেন কোমলতা ভারত মাঝার।

সেই ছায়া ক্রমে ক্রমে যেতেছে চলিয়া,
অনন্ত কালের গায়ে যায় যে মিলিয়া,
হতভাগ্য আমাদের,
ঘটেছে ভাগ্যের ফের,
তাই ভারতের এত গভীর পতন,
শান্তিহীন স্ফূর্ত্তিহীন ভারত ভবন।

মাগো মা! তোমার সেই ছায়া শুভকরী,
দেখাও ভারতে পুনঃ করুণা ঈশ্বরী,

প্রতি আর্য্যনারী প্রাণে,
সেই ছায়া দেও এনে,
ছুটুক শান্তির স্রোত ভারতে আবার,
অশান্তির আবিলতা হোক ছার খার।

বরপণের চরম প্রতীকার।

শ্রীহট্ট সহরে চাঁদনি ঘাটের উপরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভয়ানাথ ন্যায়ালঙ্কার উপবিষ্ট; সময় অপরাহ্ণ চারিটা—ঢং ঢং করিয়া নদীর তীরবর্ত্তী টাওয়ার ক্লকে বাজিয়াছে; নিকটবর্ত্তী টাউনহলে এক বিরাট সভার আয়োজন হইতেছে; ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত একটি যুবক—নাম হরিচরণ দেব বি, এ, স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক—ঐ পথে সভায় যাইতেছেন; ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে দেখিয়া একটি প্রণাম দিয়াই দ্রুতপাদ বিক্ষেপে চলিয়াছেন; ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও হরিচরণ, এত ব্যস্ত হইয়া কোথায় চলিতেছ?"

হরি। মহাশয় কি শুনেন নাই, কলিকাতায় স্নেহলতা নামে একটি বালিকা তাঁহার বিবাহার্থে 'বরপণ' যোগাইতে গিয়া মাতাপিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন দেখিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার সম্মানার্থ এবং বরপণ প্রথার অপকারিতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত আজ টাউনহলে সভা হইবে—বোধ হয় এক্ষণে আরম্ভ হইয়া গেল, তাই দ্রুতবেগে যাইতে ছিলাম।

ন্যায়ালঙ্কার। তা বেশ যাবে যাও; তবে সভাতে মামুলি ধণের কতকগুলি বর্ক্তৃতা ছাড়া প্রকৃত কাজ কি কিছু হইবে?

হরি। কুমারী স্নেহলতার একখানি আলেখ্যপট টাউনহলে তদীয় পুণ্যস্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ রক্ষিত হইবে এবং যুবকগণ প্রতিজ্ঞা করিবেন বিবাহের সময়ে পণস্বরূপ কেহ কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

ন্যায়ালঙ্কার। ভাল কথাই বটে! কিন্তু হরিচরণ তুমি সভায় যাইবার জন্য হয়তো উদ্বিগ্ন আছ; নচেৎ তোমাকে কিছু বলিতাম। তোমাকে সচ্চরিত্র বলিয়াই জানি; সুশিক্ষিত তো নিশ্চয়ই। বলিলে কথাগুলি হয়তো তুমি নিতান্ত উপেক্ষনীয় মনে করিতে না।

হরি। মহাশয়, সভায় আর যাইব না; আপনার ন্যায় বহুদর্শী সমাজ-নায়ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছ হইতে এ বিষয়ের কিছু শুনিবার কৌতূহল হইতেছে; বলুন।

ন্যায়ালঙ্কার। তবে এখানে বসিয়া শুন। কিন্তু জান তো, বুড়া হইয়াছি, অনেক বাজে কথা হয়তো বলিব, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিও। প্রাসাদবাসী মহারাজ হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই কন্যা বিবাহকে একটা 'দায়' মনে করেন; তাৎপর্য্য এই যে সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা মেয়েটি যেন ঘরে বরে ভালতে পড়ে। বরটি যেন কুলের চূড়া হয়, ধনৈশ্বর্য্যে লক্ষ্মীবান্ হয়। লেখাপড়ায় মূর্ত্তিমান্ হয়, দেখতেও যেন পরম রূপবান্ হয়। কিন্তু এইরূপ বর কয়টি পাওয়া যায়? এই দেখ বরোদার মহারাজের একটি মাত্র কন্যা,—তার জন্যে কত বেগ পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক মহাধনীরই এইরূপ যখন অবস্থা, তখন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে ঈপ্সিত বর যুটান কত ক্লেশকর ভাবিয়া দেখ। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে সকলকেই বিশেষতঃ নির্দ্ধনকে এই ক্লেশের বোঝা মাথায় বহন করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে—সর্ব্বস্বান্ত না হইলেও ইহাতে যে নাকালের চূড়ান্ত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েরা স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণা পিতৃমাতৃ বৎসলতাও তাহাদের খুব অধিক। স্নেহলতার ন্যায় সকলেই ভাবিতে পারে "আমি অভাগীর জন্যে বাবা মা এত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের ক্লেশের অবসানার্থে আমার মরিয়া পড়াই ভাল"। তাহা হইলে ঘরে ঘরে এতাদৃশ আত্মহত্যা দেখিতে পাইবে। বিশেষতঃ আত্মহত্যা বড়ই সংক্রামক—স্নেহলতার এতাদৃশ আত্মহত্যার কাহিনী মেয়েদের কর্ণগোচর হইলে তাহাদের আত্মহত্যার প্ররোচনা ঘটিতে পারে। ইহার উপর যদি স্নেহলতার প্রশংসাবাদ হইতে থাকে, তাঁহার মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়, আলেখ্যাদি গৃহে গৃহে বিরাজ করে তবে "এটা একটা বড়ই প্রশংসার কাজ" মনে করিয়া অল্পবুদ্ধি অনেক বালিকা

এইরূপে আত্মঘাতিনী হইতে পারে। * আত্মহত্যার ন্যায় পাপ বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। কলির প্রবলতা বশতঃ শাস্ত্রোক্ত পাপ পুণ্য বিচার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের এই সভা সমিতির দ্বারা অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। অথবা আত্মঘাতিনী মেয়ের সংখ্যা বাড়িবে মাত্র।

হরি। মহাশয় যথার্থই বলিতেছেন। আমরা হুজুকে মাতিয়া স্নেহলতার আত্মহত্যাটাকে একটা মস্ত বাহাদুরি বলিয়া রটাইতেছি; কিন্তু বাস্তবিক আত্মহত্যা যে সংক্রামক তাহা ভাবিয়া দেখি না। বঙ্কিমবাবু তাঁহার উপন্যাসে আত্মহত্যার অবতারণা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার একটি কন্যা আত্মঘাতিনী হইয়া তাঁহাকে চিরানুতপ্ত করিয়া গিয়াছে।

ন্যায়ালঙ্কার। হাঁ, ঠিক্ বুঝিয়াছ। তার পর অপর কাজ, যুবকদের দ্বারা বরপণের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করান। ইহাতেও অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। ছেলেরা অধিকাংশই স্বাধীন নহে, মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের অধীন; তাহাদের বিবাহাদির অভিভাবকেরাই বন্দোবস্ত করিবেন। ছেলেরা এখন এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া জেটামিই প্রকাশ করিবে—দেখাইবে যেন তাহারা স্বাধীন, অভিভাবকের মতামত তাহারা গ্রাহ্য করে না। এইরূপ জেটামির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? যদি প্রতিজ্ঞা করিতে হয় অভিভাবকদের তাহা করা উচিত ছিল। কিন্তু 'প্রতিজ্ঞা' করা যত সহজ তাহা পালন করা তত সোজা নহে। আমাদের দেশের লোকের প্রতিজ্ঞাপালনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারেও আমাদের জাতির লঘুতার—হুজুগপ্রিয়তার আর একটা দৃষ্টান্ত বাড়িবে মাত্র। বিশেষতঃ পণগ্রহণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি তাহা প্রতিপালনও করে, তবে যেখানে যৌতুকাদিতে পাওয়ার প্রত্যাশা সমধিক সেই খানেই বিবাহ করিবে। তাহা হইলে 'নগদ টাকা' না দিতে হইলেও অন্য বাবদে কন্যার অভিভাবককে উৎপীড়িত হইতেই হইবে।

হরি। তবে উপায়?

---

* বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; অতএব পূর্ব্বে যাঁহারা স্নেহলতার সচিত্র প্রংসশাবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই অনেকেই এখন সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন।

ন্যায়ালঙ্কার। উপায় আছে; এবং সেই উপায়টাই তোমাকে বলিব, মনে করিয়াছি। আগে নিদান ঠিক কর, পরে ঔষধ প্রয়োগ করিব। বলতো এই বরপণ প্রথাটা কিরূপে উৎপন্ন হইল?

হরি। মহাশয় আমাদের শ্রীহট্ট জেলায় এই প্রথা অতিশয় অভিনব, এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই; তাই বোধ হয় আমি ইহার নিদান ভালরূপ ঠিক করিতে পারিব না।

ন্যায়ালঙ্কার। বাপু হে, এটা এমন কোনও জটিল সামাজিক ব্যাধি নয় যে নিদান ঠিক্ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। টোলের পণ্ডিত হইলেও আমি দুই একখানি সংবাদ পত্র পড়িয়া থাকি, তাহাতে মধ্যে মধ্যে যে সকল বিবাহবার্ত্তা প্রকাশিত হয়, গল্পচ্ছলেও যে সকল কাহিনী প্রচারিত হয়, তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছি ইহার মূলে কি। তুমিতো আমা অপেক্ষা ঐ সকল অনেক অধিক পড়িয়া থাক।

হরি। মহাশয় আপনারা বহুদর্শী সমাজতত্বজ্ঞ প্রাচীন ব্যক্তি, আপনারা একটা বিষয় যতদূর তলাইয়া দেখিতে পারেন, অল্পদর্শী যুবক আমরা, দুই চারি পাতা ইংরেজী পড়া আছে মাত্র, সমাজের কথা কমই জানি। আমরাও সংবাদ পত্রে ঐ সকল কাহিনী পড়ি চক্ষের উপরও দু একটা দেখিতেছি। কিন্তু যদিও মতামত প্রকাশ করিতে না পারি এমন নহে; তথাপি আপনার সমক্ষে তাহা করিতে সাহসী হই নাই।

ন্যায়ালঙ্কার। বেশ বাপু, তোমার বিনয়ে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বরাবর দেখিতে পাই দু'পাতা ইংরেজী পড়িয়াই, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ্ পাইতে পা[illegible] আজকালকার যুবকগণ নিজকে সর্ব্বতঃ পারদর্শী মনে করে। তো[illegible]ংকারের ভাবে বাস্তবিক প্রীত হইয়াছি। সমাজতত্ব বড়ই জটিল; নবয়ু[illegible]রা দুইচারি পাত ইংরেজী পুস্তক অথবা তাহার তরজমা বাঙ্গালা কেতাব পড়িয়াই যে সামাজিক আচার ব্যবহারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া থাকে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অধিক আর কি বলিব আমরা নিজের ভাগিনেয়টিকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে ইস্কুলে দিয়েছিলাম; সে তোমারই সমান পড়া পড়িয়াছে—কিন্তু কি বলিব, শিলংএ চাকরি করিতে গিয়া এখন স্নানসন্ধ্যা নিয়মমত করিতেছে না, অখাদ্য জিনিসেও নাকি রুচি হইয়াছে। সে

যা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় ধরা যাউক। বরপণ প্রথা বাড়িবার মূল কারণ দেশে ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব; ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের বিপরীত সম্পর্ক; যেখানে ধর্ম্মজ্ঞান ক্ষীণ হয় সেইখানেই জানিবে অর্থকে সারসর্ব্বস্ব মনে করা হয়। আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জোরেই স্মরণাতীত কাল হইতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। এখন ইহার যে দুর্দ্দশা দেখিতেছ তাহা এই ধর্ম্মের জোর কমিয়া আসিয়াছে. সেইজন্য। আজকাল প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষাদীক্ষা নাই—অর্থ উপার্জ্জনের উৎকট লালসায় বশীভূত হইয়া ইংরেজী শিক্ষার দিকে লোক ধাবিত হইতেছে। ইংরেজীতে অত্যুচ্চ শিক্ষিত সুতরাং অর্থকেই সার সর্ব্বস্ব মনে করিতেছে। বরপণ প্রথাও ইহাদের মধ্যেই কেবল দেখিতে পাইবে। ইংরেজী শিখিতে হইলে টাকার প্রয়োজন, তাই ইংরেজী শিক্ষার্থী শ্বশুরের কাছ হইতে টাকা নিয়া বিবাহ করিয়াছে। প্রথমে এই ভাবেই সমাজে এই বরপণ প্রথা ঢুকিয়াছে—প্রমাণ এই আমাদের শ্রীহট্ট জেলা। এখানে যে যে স্থলে প্রথমতঃ পণ দেওয়া হইয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই এই "পড়ার সাহায্য" বাবদ। তারপর যদি ছেলে পাস করা হয়, অভিভাবক তখন টাকা চান. ছেলে পড়াইতে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে—ধার করিতে হইয়াছে তাই শোধ দিবার নিমিত্তে। এইরূপে প্রথা যখন পড়িয়া গেল, তখন যাহাদের অভাব নাই তাহারাও ছাড়েনা, বলে, 'কন্যার বিবাহে দিয়াছি, ছেলের বিবাহে আদায় করিব।"

হরি। মহাশয়। একটা কথা বুঝিতেছি না। ইংরেজী শিক্ষার্থী বা শিক্ষিত মধ্যেই যখন এই বরপণ গ্রহণ প্রথার প্রাদুর্ভাব, লোকে ইংরেজীওয়ালা-দের নিকট কন্যা বিবাহ না দিলেই তো পারে।

ন্যায়ালঙ্কার। তুমি তো দেখিতেছি বড়ই সরল বুদ্ধি। আরে বাপু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থ—অর্থ—অর্থই সার; সেই অর্থ ইংরেজীতেই আসে। সাধারণের বিশ্বাস এবং ইহা নিতান্ত অমূলকও নয়—ইংরেজী যাহারা জানেনা তাহারা অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। পাণ্ডিত্য হিসাবেও একজন ইংরেজীওয়ালাকে যে চক্ষে লোকে দেখিবে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিতকে সেই চক্ষে দেখে না তা তিনি হউন না কেন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, অথবা শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন।

হরি। মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে কেহ পণ গ্রহণ

পূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই—বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কেহ পণ দিতে চায় না বলিয়াই এইরূপ হইবে।

ন্যায়ালঙ্কার। কেবল তাহাও নহে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সচরাচর একটু শাস্ত্রের ভয়ও করিয়া থাকেন; পণ লইয়া বিবাহ করাটা শাস্ত্রতঃ পাপ;—ইংরেজী-ওয়ালার সেই ভয় নাই। তবে কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেও যে এই পাপ ঢুকে নাই একথা বলা যায় না। নিজের বিবাহে পায় নাই বলিয়া নেয় নাই; ছেলেটি যদি পাস্ করা হয় তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে যে ছাড়িবেন একথা বলিতে পারি না। যাউক, এখন এই রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে বলিব। যদি বলি "বরপণ গ্রহণ করাটা পাপ, এই পাপে সমাজের অনিষ্ট হইতেছে," ইত্যাদি তবে কেহ শুনিবে না। লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি যদি থাকিত তবে ইহার উদ্ভবই হইত না।

হরি। তা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

ন্যায়ালঙ্কার। সেইটাই তোমাকে বলিতে যাইতেছি খুব স্থির চিত্তে শুনিবে। এখন সকলেই "লাভ ক্ষতির" হিসাব করিয়া কাজ করে। ধর্ম্মটাও "লাভ ক্ষতির" হিসাবে কসিয়া যদি করণীয় দেখে, তবে লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। বরপণ প্রথার মূলে একটা কথা আছে যে, কন্যা বিবাহ দিবার যোগ্য বর ধনে মানে বিদ্যায় উপযুক্ত বড় কম পাওয়া যায়; কিন্তু বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা অধিক, কেন না কন্যার ধন বা বিদ্যা না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই একটু রূপ থাকিলেই হইল; কুল প্রাচীন পদ্ধতির লোকে দেখে বটে—কিন্তু নব্যেরা বড় আমলে আনে না। অথচ কন্যার বিবাহ যত দূর পারা যায় যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দিতেই হইবে—এই সংস্কারটা এখনও লোপ হয় নাই। রোগের এই নিদান ধরিয়া সমাজসংস্কারপ্রয়াসী একদল বলিতেছেন "কন্যাবিবাহটা এত অত্যাবশ্যক মনে না করিলেই তো সব লেটা চুকিয়া যায়; পাত্র পাও ভালই বিবাহ দেও; নচেৎ আমরণ আইবুড় থাকুক না হানি কি? সাহেবদের-সমাজে তো এইরূপ আছেই—হিন্দুর মধ্যেও বঙ্গীয় কুলীনদের ঘরে 'যমবরা' কন্যাও তো দেখা যায়।" অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারাই কুলীন কুমারীর দুঃখদর্শনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন—এবং বালবিধবার আমরণ ব্রহ্মচর্য্য বিধান প্রথার উপর খড়্গহস্ত।

হরি। আচ্ছা, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে নিষেধ বলিয়া হয়তো আপনি তাহার সমর্থন না করিতে পারেন। কিন্তু কুলীন কন্যাদের আমরণ অবিবাহিত থাকাটাও কি আপনি সমর্থন করেন ?

ন্যায়ালঙ্কার। না হে বাপু না—তুমি আমার ভাব বুঝিতে পার নাই। আমরণ কন্যাকে আইবুড় রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ—ইহা আমাদের সমাজে নাই—ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বাঙ্গালার যে সকল স্থানে কৌলিন্য প্রথা আছে তাহাতে ইহা প্রচলিত। ইহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় প্রথা। এই জঘন্য প্রথায় বঙ্গের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেকথা বলিতে গেলে অনেক বাজে কথা পাড়িতে হয়। তবে আমি বলি যে তোমরা দয়া পরবশ হইয়া যদি কুলীন কুমারীদের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন কর, তবে ঘরে ঘরে তাদৃশ 'কুমারী' দেখিবার জন্য কেন পরামর্শ দিতেছ ?

হরি। হাঁ, বুঝিলাম।

ন্যায়ালঙ্কার। তবে প্রকৃষ্ট উপায় হয়, যদি কন্যার সংখ্যা কমাইতে পার, তা হলে কন্যার মূল্য বাড়িবে, বরপণ উঠিয়া যাইবে।

হরি। মহাশয় কথাটা খুব ভালই বলিয়াছেন; কিন্তু এটা নূতন নহে; শুনিয়াছি রাজপুতেরা কন্যা বিবাহে এইরূপ জ্বালাতন হইয়া সূতিকাগৃহেই কন্যাদিগকে মারিয়া ফেলিত। আমাদের বঙ্গীয় কুলীনগণ ঐ ব্যবস্থাটা যে করেন নাই, ইহা আমি আশ্চার্য্য মনে করি।

ন্যায়ালঙ্কার। বাপু হে পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া এই বৃদ্ধের কথাগুলি শুনিতে হইবে। রাজপুতেরা অতি নিষ্ঠুরের ও পাষণ্ডের ন্যায় কাজ করিয়াছে, কুলীনেরা হাজার হোক ব্রাহ্মণ, তাই তত নিষ্ঠুর হইতে পারে নাই। কিন্তু আমি যে উপায় বলিব তাহা পাষণ্ডের আচার নহে, শাস্ত্রানুমোদিত বিধি; নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান নহে, সংযমের সাধনা। তবে এতদুপলক্ষে স্ত্রীসহবাসের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

হরি। মহাশয় বিষয়টা তবে অশ্লীল হইয়া পড়িবে নাকি ?

ন্যায়ালঙ্কার। ঐ যে, ইংরেজী শিক্ষার বিকার তোমাকেও দখল করিয়াছে! বাপু আর কিছু হউক না হউক, হাল সভ্যতাটা 'লেফাপা দুরস্ত'' বটে! ভিতরে খেম্‌টা নাচ খুব চলিয়াছে, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু উপদেশব্যপদেশেও

যদি একটু খোলা কথা বলা যায় তাহাতে ঘোরতর রুচি বিকার উপস্থিত হয়। দেখিতেছি এই প্রসঙ্গে তোমার আপত্তি আছে, আর বলিব না। এখনও সভায় বক্তৃতাদি চলিতেছে—যাইতে পার।

হরি। পায়ে ধরি পণ্ডিত মহাশয়, মাপ করুন; বাস্তবিক এইরূপ বলিয়া আপনার ন্যায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটে অযথা চাপল্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি সভায় যাইব না—আপনার বক্তব্যই শুনিয়া কৃতার্থ হইতে চাই।

ন্যায়ালঙ্কার। তবে শুন। বলিয়াছি যে বর-পণ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে কন্যার সংখ্যা অল্প করিতে হইবে। এবং কন্যার অনুপাতে পুত্রসংখ্যাও বাড়াইতে হইবে। শুধু তাহা নয়, কন্যা ও পুত্রের যে সকল গুণ থাকিলে বিবাহার্থে সমাদৃত হয়, সেটাও দেখিতে হইবে অর্থাৎ কন্যা যাহাতে সুন্দরী ও সুশীলা হয় এবং পুত্র যাহাতে বিদ্বান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহার নিমিত্তে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হরি। মহাশয়! তাহাও কি সম্ভাব্য? আপনি ইচ্ছা করিলেই কি আপনার সন্তান 'পুত্র' হইবে 'কন্যা' হইবেনা, ভবিষ্যতে যাহারা সৎ হইবে এই-রূপ সন্তান ভিন্ন অসৎ ছেলে মেয়ে হইবে না?

ন্যায়ালঙ্কার। যদি ঋষিবাক্য বিশ্বাস কর, যদি বেদাঙ্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথা মান, তবে ইহা অসম্ভাবিত নহে। শুন শাস্ত্রে কি আছে—

স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে ষোল দিন পর্য্যন্ত উহার গর্ভসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা থাকে। তন্মধ্যে প্রথম তিনদিন একেবারে অস্পৃশ্যা; চতুর্থদিনে গর্ভাধান হইলে অল্পায়ু ও গুণবর্জ্জিত পুত্র হয়; পঞ্চমে দুর্ভাগা কুরূপা কন্যা হয়। ষষ্ঠে মূর্খ ও কুরূপ পুত্র; সপ্তমে সৌভাগ্যরহিতা দীনদরিদ্রা কন্যা; অষ্টমে ব্যাধিযুক্ত নিষ্ঠুর স্বভাব পুত্র; নবমে রূপসী ও সাধ্বী কন্যা; দশমে বিদ্বান্ ও ধনাঢ্য পুত্র; একাদশে গুণবতী কন্যা; দ্বাদশে যশোবিদ্যাযুক্ত পুত্র; ত্রয়োদশে পতি পিতৃকুল মনোহরা কন্যা; চতুর্দ্দশে মেধাবী মহাবীর্য্য পুত্র; পঞ্চদশে স্বামিপ্রিয় ধর্ম্মানিষ্ঠা কন্যা, এবং ষোড়শে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুত্র জন্মিবে। আমি সংক্ষেপে মাত্র দোষের উল্লেখ করিলাম। ইহাতে দেখিতে পাইতেছ যে, ঋতুর যুগ্ম দিনে পুত্র এবং অযুগ্ম দিনে কন্যা হইবার কথা এবং প্রথম আটদিনে সন্তান দুঃশীল হইবার সম্ভাবনা।

হরি। মহাশয় ইহার কারণ কি? শুনিয়াছি ইহুদিরা ঋতুর দশমদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাস করে না, ইহাতে আমাদের শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ অনুসরণ দেখা যাইতেছে।

ন্যায়ালঙ্কার। তা ভালই যাহা সত্য তাহা দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে প্রায়শঃ ফলোবিধায়ক হইয়া থাকে। তুমি যে "কারণ" জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমরা শাস্ত্র বাক্য অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করি, 'কারণ' বলিতে পারিব না; যদিই বা অনুমানতঃ একটা কিছু বলি. আমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ একজন হয়ত উহার খণ্ডন পূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন। প্রজ্ঞাচক্ষুঃসম্পন্ন অতীন্দ্রিয়দর্শী মহর্ষিদিগের বাক্যে "বিশ্বাস" করাই আমাদের উচিত। হেতু-প্রদর্শন অল্পবুদ্ধি আমাদের কর্ম্ম নহে।

হরি। আমার মনে ইহার 'হেতু' একটা প্রতিভাত হইতেছে; পুরুষের বীর্য্য সর্ব্বদাই সমভাবাপন্ন কিন্তু স্ত্রীলোকের রজঃ প্রথম তিন দিন ত খুবই প্রবল, তৎপরেও আবার কয়েক দিন সেই রূপই থাকে; পরে উহার জোর কমিয়া গেলে, সন্ততিতে 'রজঃ' এর পরিমাণ কম বর্ত্তে—তাহাতে রজোগুণে (ক্রোধাদির) মাত্রাও সন্তানে অল্পতর হইয়া থাকে। আর পর্য্যায়ক্রমে একদিন পুংসন্তান ও অপরদিন স্ত্রীসন্তান হইবার কারণ বোধ হয় এই—নারীগণের জরায়ুতে ফুলের গর্ভকেশরের ন্যায় কতকগুলি গর্ভকোষ থাকে—ঐগুলি হয়তো দুই ভাগে থাকে, কতকগুলি পুংশুক্রকীট ধারণোপযোগী, কতকগুলি স্ত্রীশুক্রকীট ধারণে সমর্থ; ঐ দুই প্রকার কোষ হয়তো পর্য্যায়ক্রমে সংকোচিত ও প্রসারিত হয়—যুগ্মদিনে 'পুং, গুলির একটি, অযুগ্ম দিনে 'স্ত্রী'গুলির একটি প্রসারিত হয়। এদিকে পুরুষের অবস্থিত বীর্য্যে পুং ও স্ত্রী শুক্রকীট উভয়ই থাকে। যুগ্ম দিনে পুং কীট তদনুকূল গর্ভকোষে লব্ধপ্রবেশ হয়—অযুগ্ম দিনে স্ত্রীকীট গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়।

ন্যায়ালঙ্কার। তোমার যুক্তিটা আপাততঃ সাধু বলিয়াই তো বোধ হইতেছে। তুমি কি শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছ?

হরি। না, করি নাই; একটা অনুমান করিলাম মাত্র; আমার ইচ্ছা আরও কলিকাতায় আমার কোনও ডাক্তার সুহৃৎকে এবিষয়ে গবেষণা করিতে বলিব।

ন্যায়ালঙ্কার। তা বেশ। কিন্তু তোমার কথাতেই তো বুঝা গেল, যে এই-

রূপে একটা যুক্তি দাঁড় করাইয়া যদি শাস্ত্র প্রমাণিত করিতে হয়—আর তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কেহ উহাতে ছিদ্র পায়, তবে যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমর্থিত শাস্ত্রও 'নস্যাৎ' হইয়া যায়। যাউক এখন এতদ্বিষয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রে আর কি কথা আছে বলিতেছি; তুমি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশ্বাস কর কি?

হরি। কিছু কিছু করি; কোনও কোনও সাহেবকেও ইহা মানিতে দেখি। বহুদিন হইল "থিওশফিষ্ট" পত্রিকায় একজন মাদ্রাজী জ্যোতিষীর কাহিনী জনৈক সাহেব প্রচার করেন; আমি তাহা পড়িয়াছি। ইহাতেই আমারও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

ন্যায়ালঙ্কার। ভাল কথা। সাহেবেরাও যে বিশ্বাস করেন একথা শুনিয়া সুখী হইলাম। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের "জ্যোতিস্তত্ত্ব" হইতে এ বিষয়ে যতটা জানিয়াছি তাহা বলিতেছি। যুগ্মদিনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিথি নক্ষত্র বার ইহাদের পুংস্ত্ব আছে—নন্দা ভদ্রা পুং তিথি। নন্দা—প্রতিপৎ ষষ্ঠী ও একাদশী; ভদ্রা,—দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী। নক্ষত্রের মধ্যে হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা পুং নক্ষত্র —তন্মধ্যে মূলাকে অশুভ বলিয়া বর্জ্জন করিবে। বারের মধ্যে রবি, মঙ্গল, ও বৃহস্পতি পুং বার। পুংবার পুং তিথি ও পুং নক্ষত্রে গর্ভাধান হইলে পুংসন্তান হইবার কথা। সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে পর্ব্বদিন বর্জ্জনীয়। চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এইগুলি পর্ব্বদিন। চন্দ্রশুদ্ধিও দেখা উচিত।

হরি। মহাশয়, যদি ঋতুর যুগ্মদিনে গর্ভাধান হইলে পুত্র সন্তান হয়, তবে আর পুং বার তিথি নক্ষত্রাদির প্রয়োজন কি?

ন্যায়ালঙ্কার। বাপু হে বৈদ্যদের ঔষধ ব্যবস্থা দেখিয়াছ কি? বড়ি দিবে, তাহার সঙ্গে 'সহপান', তৎপশ্চাৎ 'অনুপান'; একটা অন্যটার পরিপোষক। তারপর অন্য একটি কথাও স্মরণ রাখা উচিত। রঘুনন্দন মনু বাক্যাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও যুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান হইলে পুং সন্তান ও অযুগ্ম রাত্রিতে হইলে স্ত্রীসন্তান হইবার কথা, তথাপি অযুগ্ম রাত্রিতেও পুরুষের শুক্রাধিক্যে পুং সন্তান এবং যুগ্ম রাত্রিতেও রজঃ পরিমাণের আধিক্যে স্ত্রীসন্তান হইবে—সমবায়িকারণের (রজঃশুক্রের) নিমিত্তকারণ (কাল) অপেক্ষা বলবত্তা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব পুং বার পুং তিথি পুং নক্ষত্র প্রভৃতি

আরও দুই একটা কারণ সন্নিপাতে পুরুষের বীর্য্যাধিক্য এবং স্ত্রীর রজঃ পরিমাণের স্বল্পত্ব ঘটিতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য অপর একটা কথাও বলিয়াছেন—স্ত্রীর "ক্ষীণা" হওয়া উচিত, রঘুনন্দন ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আহার লাঘবাদি দ্বারা ক্ষীণা।

হরি। মহাশয়, ইহাতে আমার একটা কথা হঠাৎ স্মরণ হইল। পূর্ব্বে রুষিয়ার বর্ত্তমান জারের কেবল কন্যা সন্তানই হইত—তিনি ইহাতে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। জারমহিষীকে গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে জনৈক প্রবীণ ডাক্তার কর্ত্তৃক অনুমোদিত লঘুপথ্যাদি আহার করিতে হইয়াছিল।

ন্যায়ালঙ্কার। তা, হইবেই তো! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা সত্য, তাহা দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ। আচ্ছা তোমাদের ইংরাজি কেতাব গুলিতে এই সকল বিষয়ে বিশেষ কোনও উপদেশ নাই কি?

হরি। আছে বোধ হয়—তবে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে কোনও কথা উপদিষ্ট হয় নাই। বহুদিন হইল এ দেশে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়—নাম—"পুত্রকন্যার জন্ম বিষয়ে মানবেচ্ছাধীনতা।" ঐ খানি ইংরেজী গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ; এখন বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য। ডাঃ গঙ্গাদীন "ইয়ংমেনস্ গাইড" (যুবক সহায়) নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতেও প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। তদনুরূপ বাঙ্গালায় আরও পুস্তকাদি বোধ হয় ছিল—কিন্তু অশ্লীল ভূয়িষ্ট হওয়াতে প্রচার লোপ পাইয়াছে।

ন্যায়ালঙ্কার। কিন্তু বিষয়টী সকলের হিতকর এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত; তোমার ডাক্তার বন্ধু ছাড়াও আরো দু'একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিও। বরং আমাদের এই সামান্য আলোচনাটি কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিতে পারিলে ভাল হয়। কেননা এবিষয়ে অনেক ব্যক্তির অনেক অধিক কথা জানা থাকিতে পারে; এতদ্দৃষ্টে তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিলে সমাজের উপকার হইতে পারে।

হরি। মহাশয় ঠিক্ বলিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনাকারীরা বোধ হয় অনেক কথা বলিতে পারেন। আমার এক পিসা মহাশয় ছিলেন—তিনি গর্ভাধানের লগ্ন মাত্র বলিয়া দিয়া জনৈক দৈবজ্ঞ দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর কোষ্ঠি

করাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে ঐ শিশুর জন্মাদি ঠিক দৈবজ্ঞের গণনা-যুক্ত সময়েই হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় কোন্ লগ্নে গর্ভাধান হইলে কিরূপ সন্তান হইবে ইহার সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়া দিতে পারেন—তদনুসারে বলিলে সৎসন্তান বা পুংসন্তান লাভ ইচ্ছানুসারে তো হইতে পারে।

ন্যায়ালঙ্কার। ঠিক কথা। লঘুজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ঐ সকল বিষয় জানা যায়। আমার সমস্ত কথা স্মরণ হয় না—বৃদ্ধ হইয়াছি কিনা?—সায়ংসন্ধ্যার সময়ও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই কথা সংক্ষেপ করিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম। আলোচনা করিলে এবিষয়ে আরো অনেক কথা বলিবার ও জানিবার আছে। অনেক ঔষধ আছে যাহাতে সন্তান পুংসন্তান ও সৎসন্তান হয়। রঘুনন্দন তাঁহার আহ্নিকতত্ত্বে এইরূপ একটা কথা বলিয়াছেন—পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত কণ্টকারিকার মূল তুলিয়া পিষিয়া রাত্রিতে স্ত্রীর দক্ষিণনাশাপুটে মন্ত্র পড়িয়া নস্য দিলে সন্তান হয়। বৈদ্য গ্রন্থে আরো ঔষধ আছে। ফলকথা আলোচনায় তথ্য আবিষ্কার আরো হইতে পারে। তবে যতটা আলোচনা তোমার সঙ্গে করা গিয়াছে তাহা মোটামুটি গোচের হইলেও, বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবেই বলিয়া আশা করা যায়।

হরি। কিন্তু ইংরাজীতে একটা কথা আছে, ঘোড়াকে পুকুরে লইয়া যাইতে পার, কিন্তু ঘোড়া নিজে জল না খাইলে উহাকে জল খাওয়ান অসম্ভব। আপনি উপদেশ প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কেহ মানিয়া চলিবে কি? ধরুন, ঋতুর তিন দিন যে স্ত্রী অস্পৃশ্যা তাহা কে না জানে। অথচ কলিকাতা অঞ্চলে শুনিয়াছি অনেকে রজস্বলার পক্বঅন্নও আহার করিয়া থাকে এবং পৃথক শয়নের ব্যবস্থাও নাকি নাই।

ন্যায়ালঙ্কার। তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আইনে কত কি নিষেধ আছে, কে না জানে। অথচ আইন লঙ্ঘনকারীরও অভাব নাই। এই জন্য কি হাল ছাড়িয়া দিয়া আইন কানুন উঠাইয়া দিতে হইবে? আর কলিকাতা অঞ্চলের কথা যে বলিয়াছ, আমার বোধ হয় 'বঙ্গবাসী' যাহাদিগকে 'বাবু' বলেন সেইরূপ লোকের আচার ব্যবহারেই তোমার লক্ষ্য। তা, এই আমাদের অঞ্চলে ঐরূপ দুই একজন পাইবে—তবে সেই প্রদেশে কিছু অধিক—কেননা সাহেবী

সভ্যতা সেখানে বহুদিন আগে হইতেই সুপ্রচারিত হইয়াছে। তা যাই হউক আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া যাইব—লোকের যাহাতে সামান্যমাত্রও উপকার হয়, তাহার যথামতে ব্যবস্থা করিব—যদি উহাতে একজনেরও উপকার হয় কৃতার্থ হইব। মনে রাখিও যে বিষয়ের আলোচনা করিলাম সে বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ! হয় তো অভিজ্ঞতা জন্মিলে দুই একজন পরিণামে নিজের সাংসারিক লাভের কথা ভাবিয়াও কিছু সাবধান-সংযমপরায়ণ হইতে পারে। ইহাও যে বর্ত্তমান বিকাসোন্মুখ সমাজের পক্ষে পরম লাভ।

হরি। তবে এখন সায়ংসন্ধ্যা করুন—প্রণাম। বরপণ প্রথার সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে মহাশয়ের নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করিলাম, তাহা বড় মূল্যবান্। ইহাতে সংযমশিক্ষার সহায়তা হইবে ;—এই সংযমের অভাবেই আমাদের নৈতিক, দৈহিক, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে ; এবং এইরূপ সংযমসাধনেই এই সকল ব্যাধির উপশম হইবার কথা। আমি নিশ্চয়ই আপনার উপদেশ কোনও পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

সবুজ সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রা।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার "শাশ্বতীর' সম্পাদক হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আপনি মাসিক পত্রের সম্পাদক হইবেন, অথচ নূতন সাহিত্যের কোন খোঁজ খবর রাখিবেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা! আপনার পুরাতত্ত্ব লইয়া থাকাই ভাল ছিল। সেই সকল পুরাতন জিনিষই আপনার আদরের বস্তু, আপনি তাহাদিগের প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন,তাই নূতন কোথায় কি হইতেছে, আপনি তাহা খুঁজিবার অবকাশ পান না। এরূপ অতীত লইয়া কাল কাটাইলে চলিবে কি? একবার বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

ঐ দেখুন বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নূতম ফসলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ফলের ফসল নহে, ফুলের ফসল নহে, পাতার ফসল। তাহার নাম "সবুজ পত্র" —হরিৎ পত্র নহে, সবুজ পাতা নহে, "সবুজ পত্র"! নামটি খুব মনোমুগ্ধকর

নহে কি? আপনার "শাশ্বতী"র মত কটমট নহে, কেমন মোলায়েম। আপনি হয়ত বলিবেন, শাশ্বতী মানে চিরস্থায়ী, সেজন্য তাহা পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন হইবেই ত? সবুজ পাতা ত দু দিনের জিনিষ—বসন্ত তাহার প্রাণ, শরৎ আসিলেই নেই—তাহা পাকিয়া ঝরিয়া পড়িবে। কিন্তু আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। চির সবুজ পাতাও ত আছে—যেমন কলার পাতা, নারিকেলের পাতা, সুপারির পাতা, তাল পাতা—ইংরেজীতে ইহাদের নাম evergreen। এইজন্য ঐ দেখুন "সবুজ পত্রের' মলাটের উপর একটা ডাঁটা সহিত তালপত্রের ছবি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে তালপাতাটা সবুজ রঙের না হইয়া কাল রঙের হইয়াছে। তবে মলাটের রঙ অবশ্য সবুজ, তাই রক্ষা।

"সবুজপত্রের" সম্পাদক হইয়াছেন "শ্রীপ্রমথ চৌধুরী" ওরফে মিঃ পি চৌধুরী, ওরফে বীরবল। তাঁহাকে চিনিলেন ত? ঐ যে যিনি "সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা" প্রবন্ধে কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষা অর্থাৎ slang সাহিত্য রচনার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সবুজ পত্রের ভাষাও অবশ্য সেই চলিত ভাষা। তাহার নমুনা নিম্নে দিতেছি :—

"সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে' তোলা। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নবশাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে বড় যে অভাব তা কতকটা দূর ক'র্‌তে পার্‌ব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা তারি জ্ঞান।"

মিঃ চৌধুরী তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রধান সহযোগিরূপে পাইয়াছেন। সুতরাং সাহিত্যে মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা কিন্তু ঠিক কলিকাতার চলিত ভাষা নহে, যথা—

"বাংলা দেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি।— — সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতর বোধ হয় হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজের বাঙ্গালার অধ্যাপক মিঃ এণ্ডার্শন সাহেবের নিকট—"বাংলা ছন্দ" সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষাও এইরূপ—

"আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে,—ইহা আমি অনেক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি।"

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এতদিনে বুঝিয়াছেন, কলিকাতার কথোপকথনের চলিত ভাষা কলিকাতার বাহিরে বিশেষতঃ বিদেশে সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে। সুতরাং পুস্তকাদি রচনায় সাধু ভাষা ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। মিঃ চৌধুরী এই কথাটা কবে বুঝিবেন? নিজ বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় কথিত ভাষার পার্থক্য এত বেশী যে এক স্থানের কথিত ভাষায় পুস্তক রচনা করিলে অন্য স্থানের লোকে তাহা বুঝিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ময়মনসিংহের চলিত ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কলিকাতার অনেক কথিত ভাষা কেহ বুঝিবে না. আবার এখানকার কথিত ভাষা ত কলিকাতার লোকের নিকট হিব্রু কিম্বা গ্রীক হইবে! অথচ ময়মনসিংহের লোকের লিখিত বাঙ্গলা কলিকাতার লিখিত বাঙ্গলা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। ইহাতেই মনে হয় বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবিধানের এক প্রধান সম্বল যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য, সুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধি আনয়ন করা কেবল "সবুজ পত্রের"ই উপযুক্ত। সভ্য দেশের ন্যায় সাধুভাষাও সকল শ্রেণীর লোকের উত্তম মিলন ক্ষেত্র।

সবুজ পত্রের সম্পাদক "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা সবুজ পত্রের সূচনা করিয়া সবুজপত্র দ্বারা আপনাদের প্রাচীন সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কার্য্যের প্রধান সহায়। আপনি অবশ্যই খোঁজ রাখেন, কবিবর কতক দিন যাবৎ মিশ-নারীব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বীণাপাণিদত্ত স্বর্ণবীণা দূরে রাখিয়া তাহার স্থানে এক সাবল গ্রহণপূর্ব্বক সেই সাবলের দ্বারা আপনাদের তথা কথিত অচলয়াতন সমাজের ভিত্তি খুঁড়িতে ও প্রাচীর ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সবুজপত্রে তিনি আবার কতকগুলি কচি 'সবুজ পাতা'কে মন্ত্রপূত করিয়া সেই আধমরা প্রাচীনসমাজের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাইয়াছেন। আপনার "শাশ্বতী" নাকি প্রাচীনসমাজের মুখপাত্র, অথচ আপনি এই যুদ্ধ যাত্রার

কোনই খবর রাখেন না। আপনি আর একটী লক্ষ্মণ সেন দেখিতেছি। সেই অভিযান মন্ত্র একবার শ্রবণ করুন :—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে সবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!
* * * * * * * *
খাঁচা খানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়।
আর ত কিছুই নড়ে নারে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু দুইটী ডানায় ঢাকা;
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

কিন্তু—মা—ভৈঃ! কোন ভয় করিবেন না। এইসকল কচি সবুজ পাতা আপনাদিগকে প্রাণে মারিয়া আপনাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে না। আপনাদিগকে বাঁচানই তাহাদের উদ্দেশ্য, তবে ঘা মারিয়া। তাহার Modus operendi (প্রণালী) টা : কিরূপ ; তাহাও সম্রাট বলিয়া দিয়াছেন—

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কি বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা আর সাঁচায়!
আয় প্রচণ্ড আয়রে আমার কাঁচা!"

এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে কি ঘটনা হইবে তাহা একবার মানস পটে চিত্রিত করুন।

একজন বৃদ্ধ গৃহস্থ তাঁহার গৃহে নিদ্রিত। ঘরের দরজা অবশ্য বন্ধ। বাড়ীর চারিদিক পাকা প্রাচীরে ঘেরা। বাড়ী ঘর অন্ধকারে আবৃত। নিশা-কালে একদল "সবুজ পত্র" অর্থাৎ লিলিপুটান্ (Liliputan) সৈন্য সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি মশাল, আর তাহাদের দলপতির হাতে এক বিশাল সাবল। দরজায় ঘা দিতে দিতে সেই কাঠের কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরের দাওয়ায় লোহার পিঞ্জরে একটা শুকপক্ষী চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। সেটা চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং মশালের আলো দেখিয়া খাঁচার মধ্যে পাখা দিয়া ঝটাপট আরম্ভ করিল। তখন একজন সবুজ সৈন্য খাঁচার দ্বার খুলিয়া শিকল কাটিয়া সেই পাখীটাকে উদ্ধার করিল। ইতিমধ্যে ঘরে নিদ্রিত বৃদ্ধ গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি ভাঙ্গা দরজা দিয়া হঠাৎ আলো দেখিয়া এক বিষম কাণ্ড মনে করিয়া বিছানা ছাড়িয়া দৌড়াইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং চীৎকার করিয়া প্রতিবেশীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন—"তোমরা কে কোথায় আছ, দৌড়িয়ে এস, আমার ঘরে ডাকাত পড়েছে—এরা স্বদেশী ডাকাত!" এই কথা শুনিয়া দলপতি বলিলেন—

"মিথ্যা কথা! আমরা স্বদেশী ডাকাত নহি!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তবে তোমরা কি? এত রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী সদলবলে আক্রমণ করিয়াছ কেন?"

দলপতি—"আক্রমণ করি নাই। তোমাকে জাগাতে এসেছি!"

"সে কেমন? ডাকিলেই ত আমি জাগিতাম? বাড়ীর প্রাচীর না ভাঙ্গিয়া,—ঘরের দরজা না ভাঙ্গিয়া কি লোককে জাগান যায় না?"

"তা' তুমি জাগ কৈ? আমি তোমাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি, তোমরা আমাকে চিনিলে না। আমি কয়েক বৎসর যাবৎ তোমাদিগকে প্রাচীরের বাহির করিবার জন্য কত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছি, কিছুতেই তোমাদের সাড়া নাই। তাই অবশেষে আমি তোমাদিগকে জাগাইবার জন্য এই সবুজ সৈন্যদল ("Green leaf society"?) গঠন করিয়াছি। ইহাদের শিক্ষার

জন্ত আমি একটা স্কুল খুলিয়াছি। ইহারা ঘরে ঘরে গিয়া তোমাদিগকে জাগাইবে। এখন তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাদের সঙ্গে না আসিলে, ইহারা তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।”

“কোথায়— আমাকে তোমরা কোথায় নিয়া যাবে?”

“কেন—যেথানে খোলা হাওয়া, উজ্জ্বল আলোক, সেই স্বাধীনতার দেশে—সাগর পারে।”

“ঐ রে—সর্ব্বনাশ কর্‌লে রে! আমাকে কুলি করিয়া চালান দিবে, কে আছ, আমাকে রক্ষা কর,—রক্ষা কর।”

ইহা বলিয়া সেই বৃদ্ধ গৃহস্থ কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবেশিবর্গ দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে সেই সবুজ মুক্তিফৌজদলের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এইরূপে “মিথ্যা ও সাঁচায়” লড়াই হইতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে মিথ্যারই জয় হইল, অর্থাৎ সবুজ সৈন্স দল পরাস্ত হইল। তখন তাহারা দলপতির সহিত চম্পট দিল। কিন্তু দলপতি হটিবার পাত্র নহেন। তিনি পলাইতে পলাইতে আর এক নূতন গান জুড়িয়া দিলেন,—

“আমরা চলি সম্মুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিড়ব বাধা রক্ত পায়ে
চলব ছুটে রৌদ্রছায়ে
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি কাঁদ কুঁদবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।”

সবুজ সৈন্যগণ গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এই গান গাইতে গাইতে “সম্মুখ পানে” পিঠটান দিল।

ইতি সবুজ সৈন্যাভিযান পর্ব্বাধ্যায়ে প্রথমঃ সর্গঃ।

---

(২)

সবুজের পদ্যাভিযান শুনিলেন, এবার গদ্যাভিযান শ্রবণ করুন ;—

"আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম্ম বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহার বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়ে পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ্গ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখা দুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব ঐ খাঁচা টুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা ঝাপট সম্ভব সেই টুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয়, তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।"

উদ্ধৃতাংশে অলঙ্কারের ছটায় চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। কিন্তু শিল্প প্রদর্শনীতে যে সব অলঙ্কার প্রাইজ পায় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই কালের হাতে ঝুটা বলিয়া ধরা পড়ে। তবে কালের ডিক্রীজারির সময় হয় ত সেই মণিকারকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম কি তাহা আমরা এতদিনে কবিবরের অলঙ্কারের সাহায্যে স্পষ্টরূপে বুঝিলাম। "বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব খাঁচাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা ঝাপট সম্ভব সেই টুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ।" সনাতন ধর্ম্মের এরূপ যথার্থ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই—ওয়েবরও নয়, মোক্ষমূলরও নয়। কবিবরের এই ব্যাখ্যা পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে সমবেদনা জাগিয়া উঠে, এমন কি চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়। যে বেচারিরা সেই লোহার খাঁচার মধ্যে আটক থাকিয়া নিয়ত পাখা ঝাপট করিতেছে, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া কোন পাষাণ প্রাণ না দ্রবীভূত হয়? সেই খাঁচাটুকুর মধ্যেই তাহাদের যতটুকু স্বাধীনতা, তার বাহিরেই অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ! কি ভয়ানক কথা! তবে একটা কথা এই, পাখী-দের সেই ঈশ্বর দত্ত পাখা অনেক সময়েই তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে নিয়া যায়।

কারণ ঈশ্বর সেই পাখার কতকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা সেই পাখার পাহারা দেন না। এই জন্য, পাখী যাহাতে ছুট পাইয়া জঙ্গলে না যায়, তাহাকে আটক রাখিয়া ভালরূপে উড়ান শিখাইতে হয়। তাই খাঁচা নির্ম্মাণের আবশ্যক হয়। এখন দেখিতে হইবে, ঈশ্বরসৃষ্ট জঙ্গলই ভাল না মানবসৃষ্ট খাঁচা বা স্কুল ভাল। তবে মানব যদি তাহার সেই স্কুল জঙ্গলে স্থাপন করেন, তবে ঈশ্বরের সহিত সহজেই রফা করা চলে। কিন্তু বনের বিদ্যালয়ে সব রকম শিক্ষা হয় না। তাই লোকালয়ে খাঁচা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এদেশে মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি কতকগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাই পাখীদিগের শিক্ষার জন্য লোকালয়ে কতকগুলি খাঁচা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই খাঁচা-গুলির নাম স্মৃতিশাস্ত্র। সেগুলি নিতান্ত রাবিস্ মাল, ছেলে ভুলানো খেলনা, একথা কবিবরের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সেই সব খোসাভুসি আমাদের আসল শস্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু খোসা ভিন্ন ভিতরের শস্য প্রস্তুত হয় কি? ঐ কথা কে শুনে। দাদা হুকুমজারি করি-লেন, ঐ সব ছাই পাঁশ দূরে নিক্ষেপ কর। ভাইও এবার বলিতেছেন—ঐ বিধি নিষেধের লোহার খাঁচা ভাঙ্গ। "অনন্ত আকাশ ভরা নিষেধ"—ইহা কি কম আপশোসের কথা! "মিথ্যা কথা বলিও না"—এই এক নিষেধ। "পর দ্রব্যে লোভ করিও না"—এই এক নিষেধ। "অস্থানে গমন করিও না"—এই এক নিষেধ। "পরস্ত্রীতে প্রেম করিও না"—এই এক নিষেধ। "মদ্য পান করিও না"—এই এক নিষেধ। "গোমাংস ভক্ষণ করিও না"—এই এক নিষেধ। এইরূপে শত শত নিষেধ আছে—ঐ খাঁচাটুকুর বাহিরে। পদে পদে এতগুলি বাধা ঠেলিয়া মানুষ কি করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? বিশেষতঃ আধু-নিক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ, যাহাদের "সবুজ" বয়স—যাহারা 'যৌবনের রাজ-টীকা' পরিয়াছে—তাহারা কোন গরজে সেই খাঁচাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে? সবুজপত্রের অন্যতম কবি তাহাদের প্রাণের কথা যথার্থরূপে "সবুজ পাতার গানে ব্যক্ত করিয়াছেন," যথা—

"সুখ নাহিক শান্তি নাহি, আনন্দ নাই আওতাতে,
সোণার রোদে সবুজ মোরা আলোক মদের মৌতাতে।

মেতেছে মন—প্রাণ মেতেছে না জানি কোন সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয় গানে।

* ০ *

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো দ্যায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুনছ কথা? চল্‌ছে "জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য—বলছে সবুজ পত্র.তা।"

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলোর আস্বাদ পাইয়া কোন মূর্খ পাখী মোক্ষলাভের যন্ত্র সেই খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে? আরও বিশেষতঃ সেই খাঁচার শলাগুলা এক সময়ে যত শক্ত ছিল এখন আর তত শক্ত নাই। পাখীদের পাখার ঝাপটে—তাহার অনেক শলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আর এমন কামারও নাই যে সেগুলি মেরামত করে। কিন্তু অভ্যাসের দোষে এখনও অনেক পাখী সেই ভাঙ্গা খাঁচার মধ্যে কয়েদ থাকিতেই ভালবাসে, তাহারা ফাঁক পাইয়াও বাহিরে পলাইয়া যায় না। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। আবার আর একটা আশ্চর্য্য দৃশ্যও দেখা যায়। যে সকল পাখী সবুজ কাঁচা বয়সে "আলোকমদের" নেশাতে পাখার দাপটে খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারা মুক্ত আকাশে তথা বনে জঙ্গলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সাদা বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিবার জন্য তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এটা তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের বুদ্ধির দোষ বলিতে হইবে।

ফরাসী বিপ্লবের ঠিক পূর্ব্বে একদল সাহিত্যিক এইরূপে সে দেশের খাঁচা ভাঙ্গিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টসমাজে বেশী নয় দশটি বিধিনিষেধাজ্ঞা প্রচলিত ছিল, তাহাও তাঁহাদের অসহ্য হইল। তখন সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার নামে সেই বিধিনিষেধের খাঁচা ভাঙ্গিবার ধুম পড়িয়া গেল। তাহার ফলে ঘোর সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। সাম্যমৈত্রীর উত্তেজনায় দেশ শোণিত-স্রোতে ভাসিয়া গেল। পরে অনেক কষ্টে দেশে শান্তিস্থাপন হইল। কিন্তু লোকে আর পূর্ব্বধর্ম্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইল না। ক্রমে তাহারা ঈশ্বরকে সে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। এদিকে কোন প্রকার বাধা না থাকায় লোকে 'যৌবনের রাজটীকা" পরিয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিল, তাহাদের

ভোগলালসা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভোগ বিলাসের নিত্য নূতন ফ্যাসন্ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হইল। যাহারা বিবাহ করে, তাহাদেরও সন্তান হওয়া বন্ধ হইল। রাজ্যের লোকসংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিয়া মন্ত্রিসভা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা অবিবাহিত লোকের উপর এক নূতন রাজকর ধার্য্য করিলেন। এইরূপে ফরাসী দেশে ঈশ্বরের স্থানে সয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ফরাসী দেশ আবার ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের আদর্শ। Parisian fashion অন্যান্য দেশে সাদরে গৃহীত হয়। সুতরাং অন্যান্য দেশেও অল্প বিস্তর ফরাসী রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ইয়ুরোপের ভোগমূলক সভ্যতা চরমে উঠিয়াছে; এখন তাহার প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। ঈশ্বর কি চিরদিনই তাঁহার রাজ্য সয়তানের হাতে ছাড়িয়া দিবেন? তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। এই যে ইয়ুরোপে মহাসমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কে জানে ইহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত নাই? হয়ত যুদ্ধ করিতে করিতে সেই সকল পার্থিবভোগ সর্ব্বস্ব প্রবল পরাক্রান্ত জাতির শৌর্য্য বীর্য্যপরাক্রমের দর্পনাশ হইলে, তাহারা আবার শান্তিময় রাজ্যে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহারা নিবৃত্তিমার্গের অমৃত-ধারার জন্য আকুল হইবে।

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিতে চায় নাই, এরূপ জাতি এদেশেও ছিল, এবং এখনও আছে। বৌদ্ধ যুগে একবার এ দেশে স্মৃতিশাস্ত্রের খাঁচা ভাঙ্গা হইয়াছিল, তাহার ফলে সেই সমাজ কিছু দিন পরেই ভোগ লালসার স্রোতে গৌতমবুদ্ধের নির্ব্বাণমন্ত্র ভাসাইয়া দিয়া নানাপ্রকার ব্যাভিচার ও অত্যাচারের মধ্যে নিজ ধ্বংসের বীজ বপণ করিল। এ দেশের সাঁওতাল, কোল, কুরমী, ভূমিজ প্রভৃতি জাতি সকল বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে কখনও যায় নাই, কোন কামারও তাহাদের জন্য লোহার খাঁচা নির্ম্মাণ করে নাই। তাহারা চিরদিন বন্য পশুপক্ষীর মত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ অসভ্য ছিল এখনও সেইরূপই আছে। সংপ্রতি খ্রীষ্টান মিসনারী কামারগণ তাহাদের জন্য বিদ্যালয় ও গির্জ্জার খাঁচা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কতকটা সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ যতই সভ্য হইতে থাকে, ততই তাহার খাঁচার সংখ্যাও

বাড়ে, এবং সেই খাঁচার শলা গুলিও বেশী শক্ত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের খাঁচা কোনো স্মৃতিশাস্ত্রকার নির্ম্মাণ না করিলেও তাহা কম শক্ত নহে। সেই খাঁচার শলাগুলির নাম convention সামাজিক নীতি। সাধ্য কি সামাজিক মানবের তাহা অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে চলা। এরূপ অনেক মহাত্মার কথা শুনা যায়, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেদের দৈনিক জীবনকে একটা গণ্ডির মধ্যে নিয়মিত করিয়া চলিতেন। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benja mine franklin) প্রত্যহ প্রতি ঘণ্টায় কি কাজ করিবেন, তাহার একটা youtine বাঁধা থাকিত। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগণও আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহাই করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয়নকাল পর্য্যন্ত আমাদের কখন কি কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন সেই সকল কল্যাণকর বিধান মানি না ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের পার্থিব উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কি করিয়া স্বভাবতঃ মলিনসত্ব মানব চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমে সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর সহিত মিলিত হইতে পারে ইহাই তাঁহাদের বিধিব্যবস্থার মূলমন্ত্র ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং নিজেরাও কঠোর তপস্যাদ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করা হইয়াছে, অন্যদিকে তাহার চির স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাঁচায় বদ্ধ থাকিয়া মানুষের চিত্তশুদ্ধিলাভ হইলে, সেই খাঁচার দ্বার আপনিই খুলিয়া যায়। আধ্যাত্মিক পথে উন্নত সাধু-সন্ন্যাসিগণের কোন বিধিনিষেধ নাই। "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

অতএব যে খাঁচা মানুষকে মানুষ করিয়া পরিশেষে তাহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণের অধিকারী করিতে পারে সে খাঁচার শলাগুলি যে ঈশ্বরদত্ত পাখা হইতে "পবিত্র' হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে মানুষ তাঁহার হাতে যে জিনিষ যে ভাবে পাইয়াছে তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। তাহা হইলে ঈশ্বরদত্ত পদযুগল থাকিতে লোকে গাড়িতে চড়ে কেন? আকাশে

উড়ে কেন, জলে ভাসে কেন? Nature এর উপর art চিরদিনই প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর রাগ করেন না, বরং মানুষের শক্তি সামর্থ দেখিয়া খুসী হন। যেখানে মানুষ তাঁহাকে পাইবার জন্য খাঁচা বাধে তিনি সেই খাঁচায় বদ্ধ মানুষের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করেন। আর যেখানে মানুষ তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিজের পাখায় নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় উড়িয়া বেড়ায়, তিনি অনায়াসেই তাহার সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন।

ইতি সবুজ সৈন্যাভিযান পর্ব্বাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

—:—

গৌড়।

হে গৌড়! সমৃদ্ধি তব গত বহুকাল,
ডুবেছে তিমিরে তব গৌরব তপন!
চৌদিকে ধ্বংসের স্তূপ! কি জীর্ণ কঙ্কাল
মজিদ, মিনার স্তম্ভ প্রমোদ ভবন!
কোথা সে দীর্ঘিকা, হর্ম্ম্য অস্ত্র কোষাগার?
উড়িছে পতাকা কোথা প্রাসাদ-শিখরে!
কোথা নৃত্য-গীত-বাদ্য মঞ্জীর ঝঙ্কার?
ভগ্ন গৃহচূড়ে চর্ম্মচটিকা বিহরে।
হায়রে, গিয়াছে সব কালের লীলায়।
কোটী প্রাণী যেথা, সেতা নাহি একজন!
মিশেছে ঐশ্বর্য্য-রাশি পথের ধূলায়।
এবে যে প্রেতের পুরী ভীষণ দর্শন।
চকিতে চমকে পান্থ হেরি এ দশায়।
তরাসে তরণী বাহি ত্বরিতে পলায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খুব চওড়া রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ দোকান। আমরা সেই রাস্তায় অনেক দূর চলিয়া একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম, এখানে কালী কমলীবালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে, বণিক পঞ্চায়তদিগের ধর্ম্মশালাও আছে, বিস্তর যাত্রী ঐ সকল ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেছিল, আমরাও যথাসম্ভব স্থান দখল করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে, এক শ্রীনগর ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজধানী, আর একটা গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অনেক অংশে বাহ্যিক শোভা সম্পদহীন, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা ভরপুর। সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি একটা মহান গম্ভীর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা শুধু প্রাণ দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়। চতুর্দ্দিকে আকাশস্পর্শী অসমান পর্ব্বতশৃঙ্গ মধ্যে অলকানন্দার নির্ম্মল জলপ্রবাহে জলমধ্যস্থ উপলখণ্ড প্রতিনিয়ত ধৌত হইতেছে। যেখানে বড় বড় প্রস্তর স্তূপ মাথা তুলিয়া নদীর গতি ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেখানে কি ভীষণ স্রোতবেগ, মানুষ কি ছার, হাতী পড়িলেও বুঝি ভাসিয়া যায়। নদীর তীরে অসমতল পর্ব্বত উপত্যকায় কত রকমের ফুলের গাছ, এক রকমের চন্দ্র-মল্লিকার ন্যায় ফুল দেখিলাম, ফুলগুলি যেন মাটী ফুড়িয়া উঠিয়াছে ; সেই গন্ধহীন ফুলরাশিতে সে স্থানের শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা মুগ্ধনেত্রে সেই অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছি, এমন সময় কয়েকটী বালক বালিকা আমাদের নিকট আসিয়া বসিল এবং হয়ত ভাবিল, যে অনাদৃত দৃশ্য তাহারা পতিদিন দেখিতেছে এবং যেই ফুল-রাশির উপরে তাহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায় আমরা সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং নির্নিমেষ নয়নে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আছি, আমরা কোন দেশী জানোয়ার ? তাহারা যাহাই ভাবুক, আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া এই স্বর্গীয় শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। রাত্রি হইয়া আসিল, আর বাজার দেখা হইল না, বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

আজ ১৯ মাইল হাঁটা হইয়াছে, দেব-প্রয়াগ হইতে শ্রীনগর একদিনে আসিয়াছি। রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন ৭ই জ্যৈষ্ঠ, প্রাতঃকালে উঠিয়া বাজার প্রভৃতি দেখিতে বহির্গত হইলাম। শ্রীনগরে একটী মাত্র বড় রাস্তা, সেই রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রায় ৪০।৫০ খানি নানা রকমের দোকান, সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়, এমন কি পাহাড়ের অন্যান্য স্থানে যাহা পাওয়া যায় না তাহা এখানে পাওয়া যায়। এখান হইতে ব্যবসায়ীরা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া উপরে বিক্রয় করিতে যায়। এখান হইতে মহাজনেরা কেরোসিন্ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বদরী কেদারে লইয়া গিয়া অসম্ভব মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। বেশ জমকাল বাজার যে কয়েকখানি দোকান আছে প্রায়ই হিন্দুর, মাত্র দুই একখানা মুসলমানের। শ্রীনগরে এই দুই একঘর মুসলমান ভিন্ন গাড়োয়ালে আর কোথাও মুসলমানের বসতি নাই। এখানে গাড়োয়ালের ইতিহাস একটু দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার নেপালরাজ গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন, গাড়োয়ালের রাজা সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পর্ব্বতের কোনও অদৃশ্য অংশে পলায়ন করেন। সেই সময় হইতে সমস্ত গাড়োয়াল নেপালের অধিকারভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে গাড়োয়াল রাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হয়েন এবং ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে গাড়োয়াল স্বাধীন করিয়া লন। সন্ধিপত্র এরূপ হইয়াছিল যে ইংরাজ গাড়োয়াল উদ্ধার করিয়া দিলে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ অর্দ্ধেক গাড়োয়াল ইংরাজকে দিতে হইবে। নেপাল রাজ্যের আক্রমণ হইতে গাড়োয়াল উদ্ধার করিয়া দিয়া সুচতুর ইংরেজ গাড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ অধিকার করেন। যে অর্দ্ধাংশ ইংরেজের অধিকার তাহার নাম ব্রিটিশ-গাড়োয়াল, অপর অর্দ্ধাংশ স্বাধীন গাড়োয়াল নামে খ্যাত। অলকানন্দার পূর্ব্ব পার ইংরেজের এবং পশ্চিম পার গাড়োয়াল রাজ্য, গাড়োয়ালের রাজা টিহরীনরেশ বলিয়া বিখ্যাত এবং রাজা টিহরীতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। গঙ্গোত্রী যাইতে হইলে টীহোরীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়। শ্রীনগরে যে সমস্ত পর্ব্বত দেখা গেল তাহার নাম অষ্টাবক্র পর্ব্বত। স্থানীয় লোকের নিকট শুনিলাম অষ্টাবক্র ঋষি অনেকদিন এই পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা বহু অনুসন্ধানেও ঋষিবরের তপস্যার স্থান

আবিষ্কার করিতে পারি নাই, এখান হইতে পাউরি ৮ মাইল, তথায় এই গাড়োয়ালের ইংরেজ শাসনকর্ত্তা বাস করেন, শুনিলাম সে স্থানটাও বেশ সহরের মত, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম অফিস, পুলিশ সবই সেখানে আছে, সময়াভাবে আমাদের সেখানে যাওয়া হয় নাই।

এই দুর্গম পাহাড়ময় রাজত্বেও ইংরেজ রাজের এত সুব্যবস্থা। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাহির হইতে ৮ টা বাজিয়া গেল, প্রায় ৮ মাইল চলিয়া "ভট্টিসেরা" চটীতে উপস্থিত হইলাম, অনেকটা নীচে অলকানন্দা প্রবাহিতা, স্নান করিতে যাইয়া একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া সম্মুখের শোভাময় দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অভ্রভেদী বিরাট পর্ব্বত আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পর্ব্বতের গাত্রে অপ্রশস্ত শস্যক্ষেত্র, দূর হইতে ঠিক যেন সিঁড়ি বলিয়া ভ্রম হইতেছে, সর্ব্বনিম্নে অলকানন্দার তুষার শীতল জলপ্রবাহ, জলমধ্যে নিমগ্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণিত প্রস্তররাশি, দূরে অতিদূরে অসমান পর্ব্বত শৃঙ্গ-গুলি মালাকারে গ্রথিত, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রকৃতিদেবী পর্ব্বতের মালা গাঁথিয়া বিশ্বস্রষ্টার গলদেশে পরাইতে অপেক্ষা করিতেছেন। এ সৌন্দর্য্যের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িলে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্টের অবসান হয়। হৃদয়ে এক অতি অপূর্ব্ব শান্তির উদয় হয়। বিহ্বলচিত্তে এই স্বর্গীয় শোভা দেখিতেছি, হঠাৎ সঙ্গীদ্বয়ের আহ্বান শুনিতে পাইলাম। অলকানন্দার সে খরস্রোতে অবগাহন করা দুঃসাধ্য। বড় একটা পাথরে বসিয়া ঘটীগঙ্গাস্নান করা গেল, চটীতে আসিয়া আহার ও বিশ্রামের পর পুনরায় রওনা হইলাম। প্রথমতঃ ২।৩ দিন চলিতে কষ্টবোধ হইয়াছিল, এখন যেন ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া আসিতেছে। যেদিন বিজনী চটীতে প্রথম চড়াই আরোহণ করি, প্রথমটা বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত যাওয়া গিয়াছিল কিন্তু অনুমান ১ মাইল চলিয়া অশক্ত হইয়া পড়িলাম। চড়াইয়ের যে কি কষ্ট অনুভব করিলাম। আর সেদিন চড়াই করিয়া রাত্রিতে তিনজনে কত আলোচনাই করিয়াছি। এক একজন যেন ভীমের ছোট খাট সংস্করণ। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার, এমন প্রলয় কাণ্ড কেহ যেন কখনও করে নাই, আমরাই যেন পথপ্রদর্শক। তবুও বীরগণের খালি হাত পা। আর বেচারী কাণ্ডীওয়ালা? সেই পাহাড়ী পৃষ্ঠে একমণ বোঝা লইয়া আমাদের আগে আগে চলিয়াছে। সময়ে সময়ে

তাহার শক্তি সামর্থ্যের কথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত। নিজেরা খুব বীর বাহাদুর এই কথা পরস্পরে বলিয়া খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেল, দেশে ফিরিয়া এই বীরত্ব কাহিনী বলিলে লোকে অবাক হইয়া আমাদের হাত পায়ের দিকে চাহিয়া থাকিবে; চাই কি ইতিহাসে রাজপুত বীরগণের নামের নীচেই এই বীরত্ব গাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। সে যাই হোক্ এই কয়দিন চড়াই উৎরাই করিয়া পা দুখানির উপরে এখন কতকটা আস্থা স্থাপন করা গিয়াছে। এই চটীর নিকটেই একটা বেশ বড় প্রস্রবণ, বর্ষাকালে প্রবলাকার ধারণ করে। অল্প কিছু দূর চলিয়াই চড়াই আরম্ভ হইল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রে চড়াই আরোহণ করা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ আর কি! তার উপর আবার জল নাই, আরও চমৎকার। যদিও এটা হিমালয় পর্ব্বত কিন্তু এখনও শীত পাওয়া যায় নাই। নদীর জল খুব ঠাণ্ডা, আর শেষ রাত্রিতে সামান্য শীত বোধ হইত। দুই মাইল এই কঠিন চড়াই উৎরাই করিবার পর "শান্তিযান" নামক একটী চটী পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রাণ ভরিয়া ঝরণার জলপান করিলাম। তৃষ্ণায় এত কষ্ট হইতেছিল যে প্রাণ যায় বুঝি! বদরী নারায়ণ বুঝি এইখানেই দয়া করেন। অল্পক্ষণ পরে আবার চলিতে লাগিলাম। এবার উৎরাই রাস্তা, প্রায় ২॥ মাইলের উপর উৎরাই করিয়া "পাকরা" নামক একটী চটীতে উপস্থিত হইলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, একটু বেলাও আছে। চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যথাপূর্ব্ব চলিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটী দীর্ঘ চড়াই। আমাদের সন্দেহ হইল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন চটীতে উপস্থিত হইতে পারিব কি না। যদি না পৌঁছাতে পারি তবে ত এই শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড়ের ভিতর প্রাণটী হারাইতে হইবে। কেন আগের চটীতে থাকিলাম না? আর বৃথা চিন্তায় কোন ফল নাই বুঝিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে পা বাড়াইতে লাগিলাম। চড়াই রাস্তা শীঘ্র কি শেষ হয়, আর দ্রুতই কি চলা যায়? যথাসম্ভব দ্রুত চলিয়া দেড় মাইল চড়াই করার পরে কিছু দূর উৎরাই নামিতে হইল। এইরূপে চড়াই উৎরাইএর পথে সন্ধ্যার অন্ধকারের মুখে আমরা "গোলাপ রায়" নামক চটী পাইয়া রাত্রি যাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। চটী একেবারে জনাকীর্ণ, স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। দোকানীকে জিনিষ ক্রয়ের লোভ দেখাইয়া সেই

জনতার মধ্যেই কোনরূপে বসা গেল। একটা কথা আছে যে "বসিতে পারিলেই শয়নের যোগাড় হয়।" আমরা সেই প্রবচন অনুযায়ী নামমাত্র স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। দোকানদার জিনিষ ক্রয়ের জন্য বিরক্ত আরম্ভ করিল। এখনও দুই চারিজন যাত্রী আসিতেছে দেখিয়া সেই দোকানদার সওদা লইবার জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিল। আমরা তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায় সে আমাদিগকে প্রবঞ্চক ঠাওরাইয়া বলিয়া উঠিল, "নিক্‌লো হিঁয়াসে তুম্ লোক, সব হাম সমজ গয়া, যো কুছু সওদা লেনা জল্‌দী জল্‌দী লো, নেহি লেনা ত নিক্‌লো হিঁয়াসে। ইএ ধরমশালা নেহি।" আমরা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে অকারণ ক্রোধ কেন বাপু! একটু পরে সবই লইতেছি। অন্যান্য দেশের লোকের মত আমরা সন্ধ্যাবেলাতেই খাই না, একটু বেশী রাত্রে খাইব। সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহার জ্বালাতনে অতীষ্ট হইয়া তখনই আটা ঘৃত লইয়া আসা গেল, এবং কোনরূপে রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই মেঘ সঞ্চিত ছিল, আমাদের আহারাদির পর শয়নের উদ্যোগ সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছাপ্পর ঘরে বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিলাম। আমাদের সৌভাগ্যের মধ্যে এই ছিল যে ঘরের যে ধারে আমরা বসিয়াছিলাম, বৃষ্টি আরম্ভ হইলে একটু বেড়ার দিকে সরিয়া বসাতে কতকটা রক্ষা পাওয়া গেল। অন্যান্য যাত্রীরাও ভিজিতে লাগিল। সঙ্গীদ্বয় বসিয়া রহিলেন আমি উহার ভিতরেই কম্বল মুড়ি দিলাম। বেশী রাত্রে সঙ্গীদ্বয়ও একরূপ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কোনরূপে রাত্রি প্রভাত হইল। পরদিন ৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে কম্বল গুটাইয়া রওনা হইলাম। রাত্রিতে এ চটীটা ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, আর দেখিবার অবকাশও বড় ছিল না। যদিও চটীতে ৩।৪ খানা দোকান ছিল, কিন্তু সব দোকানেই যাত্রী পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদিগকে অগত্যা এই দোকানেই আশ্রয় লইয়া দোকানদারের এই সুমধুর বচন শুনিতে হইয়াছিল। এই চটীতে সুন্দর একটী ঝরণা আছে, নিকটে কতকগুলি আম্রবৃক্ষ থাকায় স্থানটী আরও রমণীয় হইয়াছে। হিমালয় শোভা-সম্পদে অতুলনীয়, আবার স্থানে স্থানে এত অধিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহার দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। সে অনুপম সৌন্দর্য্যের কথা কি করিয়া বুঝাইব? প্রায় দুই মাইল একরূপ সড়ক রাস্তাতে চলিয়া প্রায়

১১ টার সময়ে আমরা "রুদ্র প্রয়াগ" নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে নদীর ধারে রুদ্রপ্রয়াগের মন্দির, দোকান ইত্যাদি একখানি ছবির মত বোধ হইতেছিল। এ পারে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের মধ্য দিয়া ডাক বাঙ্গালার রাস্তা গিয়াছে, নিকটে একটী সুন্দর ঝরণা আছে, নীচে কয়েকস্থানে ঝরণার বেগে ময়দার কল চলিতেছে। অনেক দূর হইতে ঝরণার জল বাঁধিয়া আনিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করান হইয়াছে। ঘরের নীচে ষ্টিমারের পাখার ন্যায় পাখা আছে। পাখার সহিত উপরে প্রকাণ্ড জাতা সংলগ্ন। পাখা জলের বেগে ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতা ঘুরিয়া ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। পাহাড়ীরা বেশ বৈজ্ঞানিক মাথা খাটাইয়া যন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে যেখানে এইরূপ কল আছে, সেখানে আটা কত সস্তা। অলকানন্দার উপরে একটি পুল পার হইয়া আমরা কিছু উচু রাস্তায় চলিয়া বাবা কালীকম্লী বালার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখিয়াছি যে কুলীগণ রাস্তা মেরামত করিতেছে। পাহাড়ের রাস্তা ঠিক থাকে না, সর্ব্বদা কুলী লাগিয়াই রহিয়াছে। উপর হইতে বড় পাথর পড়িয়া রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সেই পাথর খানা সরাইতে ৫।৬ জন লোকের একদিন লাগিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রায়ই রাস্তা দেখিয়া থাকেন, অনেক স্থানে তাঁহার "বাংলা" আছে। এই চড়াই উৎরাই রাস্তায় এ দেশী ঘোড়া বেশ চলিতে পারে। অনেক সঙ্গতিপন্ন যাত্রী ঘোড়া ভাড়া করিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীলোকেও ঘোড়ায় যাইতেছে দেখিলাম। তিব্বতী ব্যবসাদার শ্রীনগর হইতে মালপত্র ঘোড়া খচ্চর কিম্বা ছাগলের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া বদরী কেদারে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। একদলে ৩।৪ জন লোক ৫০।৬০ টী ছাগল লইয়া যাইতেছে। যখন ছাগল অথবা খচ্চরের দল চলিতে থাকে তখন রাস্তায় চলা বড় অসুবিধা হয়। পাহাড়ের দিকে ঘেসিয়া দাঁড়াইতে হয়। ধারে দাঁড়াইলে সেই তিব্বতী বলবান ছাগলের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। একবার উপর হইতে দেহটা ছাড়িয়া দিলে গড়াইতে গড়াইতে হাড় কয় খানি একেবারে গঙ্গায় দাখিল হইয়া যায়। শুনিলাম একজন সাধু নাকি সন্ধ্যাপরে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অপ্রশস্ত রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীদিগের নিষেধ না মানিয়া অল্প কিছুদূর গিয়াই সেই সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথে হোচট খাইয়া পড়িয়া যান, প্রথমে

নীচে একটা পাথরের উপর পড়িবামাত্রই মাথাটা ছিটকাইয়া পড়ে। এই রূপে হাত পা সমস্ত গেল, অবশেষে হাড় হইতে মাংস খসিতে খসিতে শুধু পঞ্জর খানি গঙ্গার জলে পড়িল। পড়িয়া যাইবার ভয়েই কেহ সন্ধ্যাপরে এসব ভয়ঙ্কর রাস্তায় চলে না। সাধে কি আর "বদরী' বিশালা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

আগমনে নিবেদন।

এস মা, শস্যসম্ভারপূর্ণ বাঙ্গলার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন, তোমার অলক্তকরক্ত চরণরাগে রঞ্জিত করিয়া সংবৎসর পরে আবার বাঙ্গালীর ঘরে ফিরে এস মা, তোমার আগমনে আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল সুনীল শোভায় ভরিয়া উঠুক, মন্দপবন কমলগন্ধ অঙ্গে মাখিয়া অনুকূল গতিতে প্রবাহিত হউক, ভীমনাদিনী স্রোতস্বতী ভাদ্রের সেই কূলপ্লাবন পরিত্যাগ করিয়া আবার কলকল নাদে তাহার যথার্থ পথে বহিয়া যাউক, তোমার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া পৃথিবী ধন্য হউক, আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। মনে পড়ে সেই বিসর্জ্জনের দিনের কথা, এক বৎসর পূর্ব্বে যে দিন তোমাকে "পুনরাগমনায়চ" বলিয়া বিদায় দিয়াছিলাম, তোমাকে পাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, প্রাণের ব্যথা কহিতে না কহিতে, তোমার কোলে মুখ রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে না কাঁদিতে, ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বড় আশার—বড় আকাঙ্ক্ষার ধন, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া, তোমার দু'টা কথা শুনিতে না শুনিতে, তোমার হৃদয় ভরা অপরিসীম স্নেহ ও করুণার এক বিন্দু পান করিতে না করিতে, মাতৃহারা সন্তান আমরা, তোমার স্নেহশীতল প্রশান্ত মূর্ত্তির উপর আমাদের মাতৃত্বের দাবী ফুটিতে না ফুটিতে, সেই ক্ষুদ্র তিনটী দিন পরেই যে দিন তোমাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেই তিনটী দিন, চক্ষের নিমেষে কোনখান দিয়া কেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। তুই কখন আসিলি, আসিয়া হাসিতে হাসিতে কখন মণ্ডপ আলো করিয়া, আমাদের অন্ধকার, আমাদের চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া বসিলি, তাহা বুঝি নাই, কেবল মনে পড়ে তুই আসিয়াছিলি, আবার আসিয়াই, দেখিতে না

দেখিতে, তিনটী দিন যাইতে না যাইতে চলিয়া গেলি। কোথা হইতে আসিলি, আবার কোথায় চলিয়া গেলি, কোন্ অজানা দেশে, কোন অজ্ঞাত প্রদেশে প্রবেশ করিলি, তাহা জানিনা, অনেক খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পাই নাই। মা, তোমার এই যাওয়া আসার রহস্য কি, এই লীলা বিলাসের উদ্দেশ্য কি, তাহা তুমিই জান, ক্ষুদ্র আমরা, তুচ্ছ ঘৃণ্য কীটাদপি কীট আমরা, আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব, কেমন করিয়া জানিব, তাহা জানিনা, তাহা বুঝিনা, তাহা জানিতে বা বুঝিতে চাহিও না।

কিন্তু মা তোমার এই যাওয়া আসার, এই ক্ষণেকের দেখা শুনার, উদ্দেশ্য বা রহস্য যাহাই থাকুক, ইহার দ্বারা তোমার যে উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হউক ইহার দ্বারা আমাদের যে প্রাণের পিপাসা মিটে না, আকাঙ্ক্ষার যে নিবৃত্তি হয় না। সেই এক বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম, সে যে কি বেদনা, সে যে কি দুঃখ, তাহা তুই কেমন করিয়া বুঝিবি। আছে কি না ঠিক জানি না, তোমার যদি কেহ আপনার জন, কোন প্রার্থনার ধন থাকে, আর ভাবিয়া দেখ দেখি, কিছুদিন পরে যদি সে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আবার পর মুহূর্ত্তেই বিদায় প্রার্থনা করে, তবে তাহার সেই প্রার্থনা তখন তোমার নিকট কেমন লাগে! সে বিদায় তোমার প্রাণে তখন কিরূপ রসের সঞ্চার করে? তখন তাঁহাকে বিদায় দিতে, তোমার হৃদয় কি ফাটিয়া দুইখানা হইয়া যাইতে চায় না! সে প্রার্থনা কি তোমার প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ঢালিয়া দেয় না? এক বৎসর পূর্ব্বে সেই বিজয়ার দিনে, ঠিক তেমনি জ্বালা, তেমনি যন্ত্রণা হৃদয়ে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে, "মা আবার আসিও" বলিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাহার পর দীর্ঘ এক বৎসর কাটিয়া গেল. তুই আর আসিলি না, আর একটী বারও দেখা দিলি না।

অনন্তকালসমুদ্রে একটী বৎসর ক্ষুদ্র একটী বুদ্‌বুদের ন্যায় নগণ্য হইতে পারে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের সাক্ষীস্বরূপিণী তুমি, তোমার নিকট একটী বৎসর অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র আমি, মাত্র কয়েকটী বৎসর লইয়া আমি, আমার নিকটে তো একটী বৎসর ক্ষুদ্র নয়, আমার দৃষ্টিতে তো একটী বৎসর নগণ্য নয়, আমার জীবনকালের তুলনায় তো একটী বৎসর তুচ্ছ

নয়। তাই বলিতেছিলাম, সেই চলিয়া গেলি, তাহার পর দীর্ঘ এক বৎসর কাটিয়া গেল, কৈ, আরতো আসিলি না, আর একটী বারওতো দেখা দিলি না। সত্য বটে মা, আমরা তোমাকে ডাকিতে জানি না, যথাযথরূপে তোমাকে স্মরণ করিতে পারি না তাই সকল সময়ে তোমার দর্শন লাভ ঘটে না, কিন্তু মা তোমাকে ডাকিতে জানি না বটে, যথাযথরূপে তোমাকে স্মরণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু মা, কৈ তা বলিয়া তোকে তো একেবারে ভুলিয়াও যাইতে পারি না, একেবারে বিস্মৃত হইয়াও থাকিতে পারি না, থাকিয়া থাকিয়াই যে তোমার কথা মনে পড়ে। সংসারের পত্যেক ঘটনা, প্রতি নিষ্ফলতাই যে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মনে নাই সে কতদিনের কথা, যে দিন তোর কোল হইতে প্রথম ভূমিতে নামাইয়া দিলি, তুই দিলি কি আমিই নামিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই, হইতে পারে, আমিই অবাধ্য হইয়া তোর কথা না শুনিয়া, আব্দার অত্যাচারে তোকে জ্বালাতন করিয়া মাটিতে নামিয়াছিলাম, তোর কোল ত্যাগ করিয়া তোকে ছাড়িয়া কি জানি কি আশায়, কি জানি কার প্রলোভনে, ধূলায় অবতরণ করিয়াছিলাম, যদি আমিই নামিয়া থাকি, যদি অবাধ্য হইয়া তোর কথা না শুনিয়া আমিই তোকে ছাড়িয়া থাকি, তবে সে দোষ কার, আমার না তোমার? তুই যদি জোর করিয়া আমাকে কোলে রাখিতি, অবোধ শিশু আমি, খেল্‌না দিয়া আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতি, তাহা হইলে বোধ হয় তোর কোল ছাড়িতাম না, আজ মাতৃহারা, জীবনের সুখশান্তি হারাইয়া এরূপ অন্ধকার দেখিতাম না। নামাইয়া দিয়াছিলিত, এখানে নামাইয়া দিলি কেন, এই জ্বালাময় উত্তপ্ত ঊষর ক্ষেত্রের মাঝখানে ছাড়িয়া দিলি কেন? দিলি তো তাহা চিরদিনের জন্যই দিলি। যখন উত্তপ্ত বালুকারাশি, পদতল দগ্ধ করিতে লাগিল তখন চেতনার সঞ্চার হইল, ডাকিলাম, মা, পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলাম, মা, দেখিলাম তুমি নাই, আর কেহই নাই, সেই উত্তপ্ত মরুক্ষেত্রে একা পড়িয়া আমি। বড়ই ভয় হইল, কত ডাকিলাম, মা মা বলিয়া কতই চীৎকার করিলাম কিন্তু আর চাহিলি না, আর একটীবারও তেমন করিয়া কোলে তুলিয়া লইলি না। সেই হাটিতে আরম্ভ করিয়াছি; আজ পর্য্যন্ত সমানে হাটিয়াই চলিয়াছি। কিন্তু মা আর যে পারি না, পা' যে আর চলে না, শরীর যে অবশ হইয়া পড়িল।

কি আশার হাটিব, কোন সুখে কোন্ উৎসাহে ছুটাছুটী করিব। যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, দগ্ধ মরুর কঠোর চিত্র, যে দিকে পদক্ষেপ করি, সেইখানেই দেখি, অশান্তির তীব্র হুতাশন। অনেকবার প্রতারিত হইয়াছি, অনেক সময় অশান্তির জ্বালামালায় দগ্ধ হইয়া শান্তি সুশীতল সলিলের জন্য পাগল হইয়াছি। দেখিয়াছি, সম্মুখে বিচিত্র শান্তির সরোবর। তখনই সেইদিকে অগ্রসর হইয়াছি, উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছি। হরি, হরি, সেখানে গিয়া দেখিয়াছি, তাহা তো সরোবর নহে তাহা জলভ্রম, তাহা মরীচিকা। এইরূপ অনেকবার বঞ্চিত হইয়াছি, অনেক আশায় নিরাশ হইয়াছি, আর না, আর প্রতারিত হইব না, তাই প্রাণ তোর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে মা। এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় কেবল তিনটী দিনের জন্য একবার দেখা দিয়াছিলি, তাহার পর ছয়টা ঋতু চলিয়া গিয়াছে, বারটা মাস অতীত হইয়াছে, আর আসিস্ নাই আর একটী বারও দেখা দিস্ নাই। তাই আজ যুক্ত করে, কাতর অন্তরে ডাকি আয় মা। এসময়ে তুই আসিবি, তোর অভয়প্রদ প্রশান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা ধন্য হইব, সম্বৎসরকাল এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি মা, আমাদের সে আশায় নিরাশ করিও না। মা! তোমার এই ক্ষণেকের দেখা, এই ক্ষুদ্র তিনটী দিনের সন্দর্শনে যে আমার প্রাণের পিপাসা মিটেনা, আকাঙ্ক্ষার যে নিবৃত্তি হয় না। আবার সেই তিনটী দিন পরেই মাতৃহারা হইয়া সুখ শান্তিহীন সংসার-ক্ষেত্রে চিত্ত যে আর বিচরণ করিতে চায় না। তাই বলি মা তোমার এই আগমন, মাত্র তিনটী দিনের জন্য না হইয়া এ হতভাগ্যের ভাগ্যে, চির দিনের জন্য হউক। তোমার ঐ শ্রীমূর্ত্তি অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া চির দিন সুধা বর্ষণ করুক। জ্ঞানীর মুখে শুনিতে পাই, "তোমার আগম নির্গম নাই, তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা, আমরা অন্ধ, তাই তোমাকে দেখিতে পাই না।" আমাদের সেই অন্ধত্বের মধ্যে যখন যখন একটু দৃষ্টি শক্তির প্রস্ফুরণ হয় তখন তখনই তোমার অনুপম রূপ লাবণ্য আমাদের নেত্র পথে সমুদিত হইয়া এক অভাবনীয় রসে হৃদয়কে আপ্লবিত করিয়া তুলে। মা, তুমিই না একদিন শ্রীমান অর্জ্জুনের অন্ধত্ব দূর করিয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলে, আমরা অর্জ্জুনের ন্যায় ভাগ্যবান না হইতে পারি কিন্তু মা, আমরা তো তোর সন্তান, অর্জ্জুনের ন্যায়ই

সন্তান, তাই বলি মা দে আমাদের এই অন্ধত্ব দূর করিয়া দে, সেই চক্ষু ফিরাইয়ে দে, যে চক্ষু দ্বারা আমরা তোর ঐ অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-সুধা, জীবন ভরিয়া পান করিতে পারি, যে চক্ষু দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দর্শনের দ্বারা তোমার দর্শন, আমাদের শ্রবণের দ্বারা তোমার শ্রবণ, আমাদের ঘ্রাণের দ্বারা তোমার ঘ্রাণ, আমাদের প্রাণের দ্বারা তোমার প্রাণ, আমাদের মনের দ্বারা তোমার মন, এইরূপে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা তোমার প্রত্যেক অঙ্গ আকড়াইয়া ধরিয়া তোমার কোলের ছেলে আবার তোমার কোলের ছেলে হইয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য।

দিল্লী।

(প্রাচীন ইতিহাস)

পৃথ্বীরাজ।

বিজয়লক্ষ্মী পৃথ্বীরাজকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা অদৃশ্যে থাকিয়া যে মহাচক্র চালিত করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দুজাতির সমস্ত আশা ভরসা একেবারেই নিষ্পেষিত হইয়া যায়। সে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, গৃহবিচ্ছেদে ভারতের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছিল। রাজপুত রাজগণ পরস্পরে পরস্পরের বিরোধী থাকায়, অবিরত সঙ্ঘর্ষে ক্রমে তাঁহাদের বলক্ষয় হইতে থাকে, ইহাতেই মুসলমানগণের ভারত-বিজয়ের মহাসুযোগ উপস্থিত হয়, একথা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। ভীম রায়ের সহিত পৃথ্বীরাজের নিরন্তর বিবাদে কিরূপে উভয় পক্ষের বলনাশ হইয়া অবশেষে ভোলাভীমের অবসান ঘটে, আমরা তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে কনোজপতি জয়চন্দ্রের সহিত ভয়াবহ সংগ্রামে কিরূপে চৌহান ও রাঠোরের সৈন্য সামন্তগণ কালসাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হয়, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। দিল্লীর সিংহাসন লাভ করা অবধি জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের

মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়। এতদিন ব্যাপিয়া সেই কলহানল প্রধূমিত হইতে-ছিল, ক্রমে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। জয়চন্দ্রের অলোকসামান্যা দুহিতা সংযোগিতা এই অনলের ইন্ধন স্বরূপা হন। তাঁহার রূপবহ্নিও অনেক রাজাকে পতঙ্গবৎ দগ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজকেও সন্তাপিত করিয়া তুলে। জয়চন্দ্রের দৃষ্টি যেমন দিল্লী সিংহাসনের প্রতি নিপতিত হইতেছিল, পৃথ্বীরাজের দৃষ্টিও সেইরূপ সংযোগিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পৃথ্বীরাজ পরিণামে সংযোগিতাকে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন জয়চন্দ্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। এমন কি পৃথ্বীরাজও তাহা হইতে অবশেষে বঞ্চিত হন। এই বিবাদানলে রাজপুত বীরগণ ভস্মীভূত হইয়া যায়। দিল্লী সিংহাসন শ্মশানবক্ষে অবস্থিতি করিতে থাকে। শাহাবুদ্দিন স্বীয় বেগবায়ুভরে সেই শ্মশানের ভস্মরাশি উড়াইয়া দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন, ভারতেও মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। কিরূপে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের মধ্যে মহাসমর বাধিয়া উঠিল। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি।

জয়চন্দ্রের পিতা বিজয়পাল দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। কটকের সোম-বংশীয় রাজা মুকুন্দদেব বিজয়পালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যাকে প্রদান করেন। বিজয়পাল পুত্র জয়চন্দ্রের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের এই রাণীর গর্ভেই সংযোগিতার জন্ম হয়। সংযোগিতার এক জ্যেষ্ঠা ও আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনীটির নাম তারা, তারা ছায়ার ন্যায় সংযোগিতার অনুসরণ করিতেন। জয়চন্দ্রও সংযোগিতাকে প্রাণসম ভালবাসিতেন। ক্রমে সংযোগিতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে জয়চন্দ্র তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এক ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বিনয়-মঙ্গল পাঠ করাইয়া সুশিক্ষিতা করিয়া তুলেন। এই বিনয় মঙ্গল বিনয় মাহাত্ম্যেই পূর্ণ। এই সময়ে পৃথ্বীরাজের যশঃকিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় সংযোগিতার হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আবার তাঁহার উন্মাদয়িত্রী রূপসুধার কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজও বিচলিত হইয়া পড়েন। উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরাগের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে যে এক প্রবল বাঁধ পাষাণশৈলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল তাহা অতিক্রম করা অত্যন্ত দুর্ঘটই হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, অবশেষে দুই দিক হইতে প্রবাহিত অনু-

রাগের স্রোত সেই বাঁধটীকে ভাসাইয়া দেয়। তজ্জন্য যে রক্তধারা ছুটিয়াছিল, তাহাতে ভারতজননী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন ও অবশেষে মুসলমানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। এই বাঁধই জয়চন্দ্রের বাধা। যে জয়চন্দ্র বহুদিন হইতে পৃথ্বীরাজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছিলেন, তিনি যে তাঁহার সহিত সংযোগিতার মিলনে বাধা দিবেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ভীষণ বাধায় যে শোণিত স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

এই সময়ে জয়চন্দ্র এক রাজসূয় যজ্ঞের ও সংযোগিতার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। প্রায় সকল রাজাই তাঁহাকে সার্ব্বভৌম নরপতি স্বীকার করিয়া যজ্ঞে যোগদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহ তাহাতে অসম্মত হন। জয়চন্দ্র প্রথমে পৃথ্বীরাজের নিকট স্বীয় মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাতামহরাজ্য দিল্লীর অর্দ্ধাংশ চাহিয়া পাঠান। বলা বাহুল্য পৃথ্বীরাজ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সঙ্গে সঙ্গে কণোজ-রাজ যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিয়া দিল্লীশ্বরকে দ্বারপালের কার্য্য গ্রহণের জন্য অনু-রোধ করিয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সমস্ত কার্য্যই রাজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম। সেই জন্য জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করার ইচ্ছায় দূত পাঠাইয়া দেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহার সে আহ্বান গ্রাহ্য করেন নাই; অধিকন্তু তাহাতে আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া যজ্ঞ ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন। জয়চন্দ্র সাহাবুদ্দীনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞোপলক্ষে স্বীয় রাজ্যরক্ষার জন্য তিনি ভ্রাতা বালুকা রায় ও মুসল্‌মান সর্দ্দার খোরাসান খাঁকে নিযুক্ত করেন, এবং যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজের এক স্বর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া রাখেন। ইহাতে পৃথ্বীরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি বালুকা রায়কে নিহত করিয়া শুভকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়া যজ্ঞধ্বংসের অভিলাষী হইলেন। সৈন্যসামন্তসহ যাত্রা করিয়া পৃথ্বীরাজ কনোজ রাজ্যে আগমন করিলেন এবং গৃহদাহ ও লুণ্ঠনাদি করিয়া প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালুকা রায়ের নিকট সে সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের

সঙ্ঘর্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, পৃথ্বীরাজের সামন্তগণ আপনাদের বিস্ময়কর পরাক্রমে রাঠোর সৈন্য বিধ্বস্ত প্রায় করিয়া তুলিলেন। বালুকা রায়ও উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কণ্হ চৌহান ধাবিত হইয়া তরবারির আঘাতে বালুকা রায়কে দ্বিখণ্ড করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। রাঠোর সৈন্যগণও পলায়ন আরম্ভ করিল। তাহার পর পৃথ্বীরাজ বালুকা রায়ের রাজধানী লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মুসলমান সৈন্য ও কনোজ রাজ্যের প্রান্তরক্ষী সৈন্যেরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজ সে বাধা অতিক্রম করিয়া বালুকা রায়ের রাজধানী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। তাহার পর তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হন।

এদিকে জয়চন্দ্র মহাধুমধামের সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বালুকা রায়ের স্ত্রী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনাইলে যজ্ঞ ভ্রষ্ট হইয়া গেল এবং জয়চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সমস্ত সৈন্য সজ্জিত করিয়া পৃথ্বীরাজকে দমন করার ইচ্ছা করিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই সময় মৃগয়া করিতে অরণ্যে উপস্থিত হন। জয়চন্দ্রের সৈন্যেরা সেই সংবাদ অবগত হইয়া রাত্রিকালে তাঁহার শিবির আক্রমণ করে, কিন্তু সামন্তগণের পরাক্রমে তাহারা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। যজ্ঞ ধ্বংস হইলেও জয়চন্দ্র সংযোগিতার স্বয়ম্বরের আয়োজন পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু সংযোগিতা পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরাগিণী হওয়ায় তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হন। জয়চন্দ্র কন্যাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সংযোগিতা পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত বিক্রমের প্রশংসা করিয়া সেই অদ্বিতীয় বীরের সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করেন। * জয়চন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরের এক স্বতন্ত্র প্রাসাদে অবস্থিতি করার জন্য আদেশ দেন।

---

* জিহি লুহার গুনি দুত্তি। সাহি শংকর গহি বন্ধৌ॥
জিহি লুহার গহি সগ্দ। পঙ্গ জন্নহ ঘর রুন্ধৌ॥
জিহি লুহার সাঁড়সী। ভীম চালুক অহি সাহির॥
জিহি লুহার আরম্ন। বরৈ বর মানস পাহির॥
পাবক্ক সবর বর নৈরি সহ। অরনি মণ্ডী জিহিঁ বাররৌ।
ভবভূত ভবিষ্যৎ ব্রত মনহ। কুল চহুয়ানহ তাররৌ॥

জয়চন্দ্র পৃথীরাজকে দমন করার জন্য নানা প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিল্লীরাজ্যে বহুরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলেন, এমন কি দিল্লী নগরী হইতে ৫ ক্রোশ দূরস্থিত গ্রামাদি লুটিয়া লইলেন। আবার ওদিকে হংসীপুরের নিকট শাহাবুদ্দীনের সৈন্য অগ্রসর হওয়ায় পৃথ্বীরাজ কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কৈমাস প্রভৃতি কয়েকজন সামন্তকে দিল্লী রক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখিয়া হংসীপুরের দিকে অগ্রসর হন। তথাকার দুর্গ সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করিয়া পৃথ্বীরাজ মৃগয়া করিতে যাত্রা করেন। তাহার পর তিনি আজমীরে এক বৎসর অবস্থিতি করিতে অভিলাষী হন। চামণ্ড রায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান সামন্ত হংসীপুর রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। শাহাবুদ্দীন অনেক দিন হইতে হংসীপুর অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন এই সময়ে তাঁহার মাতা বেগম সাহেবা মক্কা যাত্রার উপলক্ষে হংসীপুরের নিকটে উপস্থিত হন। চামণ্ড রায় তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লন। বেগম সাহেবা অবমানিত হইয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও শাহাবুদ্দীনকে ইহার প্রতিশোধ লইতে বলেন। শাহাবুদ্দীনও অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া তাতার খাঁকে হংসীপুর আক্রমণের জন্য পাঠাইয়া দেন। তাতার খাঁ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হংসীপুর আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু চামণ্ড রায় প্রভৃতির নিকট পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। অলীল খাঁ নামে আর একজন সর্দ্দার দুর্গ অধিকার করিতে আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরাজয়ের সংবাদ শাহাবুদ্দীনের নিকট পঁহুছিলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আবার বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এবার মুসলমান সর্দ্দারগণ প্রচণ্ড বেগে হংসীপুরের দুর্গ আক্রমণ করিল, সামন্তগণ তাহাদের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কেবল দেবরায় ব্যচারী নামে এক বিশ্বস্ত সামন্ত কিছুতেই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইয়া রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। অলীল

অথবা রাজন রাজগ্রহ। অথবা মায় লুহানি॥
বিধি বন্দিয় পট্টল সিরহ। ইহ মুব গন্ধ্রব জানি॥
আরল্লী অজমের ধুম্মি ধমনী, কর ম ণ্ডীমণ্ডোবরং॥
মোরীরা মর সুণ্ড দণ্ড দমনো; অগ্নিং উচিষ্টা করী॥
রণথম্ভং থির থম্ভ সীস অহিনং, জলদিষ্ট কালঞ্জরং॥
ক্রপ্পানং চহুয়ানং জাল রহিয়ং, ঘড়নোপি গোরী ঘড়া॥

খাঁ দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। হংসীপুরের দুর্দ্দশা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ তাহার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। চিতোরে সমর সিংহের নিকটেও সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি অগ্রে আসিয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ওদিকে পৃথ্বীরাজও দিল্লী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহ আপনাদের স্বাভাবিক পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মুসলমান সৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন। সামন্তগণও প্রাণ পণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে মুসলমান সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। তাতার খাঁ লজ্জিত হইয়া গজনী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। * হংসীপুর আবার হিন্দুপতাকায় শোভিত হইয়া উঠিল।

সাহাবুদ্দীন কোন না কোনরূপে পৃথ্বীরাজকে দমন করার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না। এক সময়ে তাঁহার পৃথ্বীরাজের অধিকৃত মহোবা গড় আক্রমণের অভিলাষ হইল, খোরাসান খাঁ তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলে, মহোবার থানাপতি নিঢ্ঢুর রায় পৃথ্বীরাজের নিকট সে সংবাদ প্রেরণ করেন। সামন্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পৃথ্বীরাজ পজ্জুন রায়কে মহোবা রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই পজ্জুন রায়ই প্রথমে মহোবার থানাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পজ্জুন রায় পুত্র মলয় সিংহও অন্যান্য স্ববংশীয়গণের সহিত মুসলমান সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে, তাহারা পরাজিত হইয়া যায় এবং সাহাবুদ্দীন গজনী অভিমুখে গমন করেন। মলয় সিংহ এই যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর পজ্জুন রায় দিল্লী উপস্থিত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে নাগরে গমন করিতে বলেন, অন্যান্য সামন্তের প্রতি মহোবা রক্ষার ভার অর্পিত হয়। লজ্জিত ঘোরী পজ্জুন রায়কে শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। গুপ্ত চরদ্বারা দিল্লী হইতে সংবাদ আনাইয়া তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নাগরাভিমুখে ধাবিত হন। মুসলমান সৈন্যেরা নাগরগড় অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। রাজপুতগণ পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে মুসলমানগণের উপর নিপতিত হয়। ঘোরীর সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু

* ইন পরন্ত তত্তার গৌ। গ্রবব সু নংঘ্যো সাহি॥
লজ্জ গ্রবব ভৈ মৈ ছুটো। সু জোতি বল নাঁহি॥

পৃথ্বীরাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

Engraved and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

রাজপুতগণের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলনা। মলয় সিংহ সাহাবুদ্দীনের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া ফেলেন। পজ্জুনরায় ঘোরীর সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ এক হাজার অশ্ব পঞ্চদশটী হস্তী দণ্ড লইয়া নির্লজ্জ সাহকে মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া সেবার মুক্তি প্রদান করেন। * লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পজ্জুন রায়কেই প্রদান করা হয়।

এদিকে জয়চন্দ্র আবার যজ্ঞারম্ভের আয়োজন করিয়া পৃথ্বীরাজকে অবমানিত ও পরাজিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে সমর সিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করা হয়। বলা বাহুল্য, সমর-সিংহ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। জয়চন্দ্র তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে উদ্‌যোগী হন ও সাহাবুদ্দিনকেও উত্তেজিত করিয়া তুলেন। যমুনা পার হইয়া যখন জয়চন্দ্রের সৈন্যেরা দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। কৈমাসের প্রতি দিল্লী রক্ষার ভার ছিল। জয়চন্দ্র প্রবলবেগে দিল্লী আক্রমণ করিলে কৈমাস অন্যান্য সামন্তের সহিত বাধা প্রদানে উদ্যত হন। জয়চন্দ্র দিল্লী দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। কৈমাস পৃথ্বীরাজের নিকট সে সংবাদ প্রেরণ করিলে পৃথ্বীরাজ পশ্চাৎদিক হইতে জয়চন্দ্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। আবার দুর্গ হইতে সামন্তগণও বহির্গত হইয়া তাহাদের উপর নিপতিত হন। দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জয়চন্দ্রের সৈন্যেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, দিল্লী শত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে। তাহার পর জয়চন্দ্র আবার চিতোর অভিমুখে ধাবিত হন। সমর সিংহ সে সংবাদ পাইয়া আপনার সর্দ্দারগণকে আহ্বান করেন। সেই প্রভুভক্ত সর্দ্দারগণ আপনাদের ধর্ম্মরাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, জয়চন্দ্র চিতোর আক্রমণ করিলে সমর সিংহ আপনার সর্দ্দারগণের সহিত তাহার বাধা প্রদান

---

* ছঁরি রাজ সুরতান। সুজস শির কুরন্ত ধারিয়॥
সহস বাজ দশপঞ্চ। দণ্ড গৈবুর সুকরা রিয়॥
কহৈ রাজ শুনি সাহ। তুম্ সু নরনাহ কহা বহ॥
বার বার প্রৌঢ়া প্রমান। দণ্ড করি ঘর জাবহু॥
কোরান করীম করম্ম তজি। হমসু পৈজ পৌরান কিয়॥
কুরন্ত সমহ সুর খেত যনি। ঘোর লজ্জ খুরসান কিয়॥
দণ্ডমণ্ডী সুরতান সির। ছঁরি দয়ৌ চহুয়ান॥
ও সু ধুম হিন্দুবান কুল। করিগ চন্দ বখবান॥

আরম্ভ করেন। কনোজ সৈন্যেরা সমর সিংহকে বেষ্টন করিলে সর্দ্দারগণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, জয়চন্দ্র পরাজিত হইয়া কনোজ অভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হন।

রাজলক্ষ্মী চির চঞ্চলা, তিনি কখনও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। এতদিন তিনি পৃথ্বীরাজের মস্তকে যে কল্যাণ বর্ষণ করিতেছিলেন, ক্রমে তাহার ধারা রোধ করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মিল। দিল্লীসাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রসাদধারা ক্রমে সাহাবুদ্দীনকে সিক্ত করিয়া তুলিল। পৃথ্বীরাজের যে সামন্তগণ একমন একপ্রাণ হইয়া প্রভুর সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও চিত্তচাঞ্চল্য আরম্ভ হইল। রাজকুমার রেণু সিংহ (রেণুসী) মাতুল চামণ্ড রায়ের অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়েন, চন্দ্রপুণ্ডীর তাহার আলোচনা করিয়া পৃথ্বীরাজের চিত্তে সন্দেহের বীজ বপন করেন। এই সময়ে সাহাবুদ্দিনের নিকট হইতে গৃহীত রাজার প্রিয়হস্তী শৃঙ্গারহার উন্মত্ত হইয়া উঠায় চামণ্ড রায় তাহাকে নিহত করিয়া ফেলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চামণ্ড রায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। রাজার কুলপুরোহিত গুরুরাম রাজাদেশে চামণ্ড রায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। ইহার পরই প্রধান মন্ত্রী কৈমাসের শোচনীয় হত্যা সম্পন্ন হয়। পৃথ্বীরাজ স্বহস্তে কৈমাসের প্রাণ সংহার করেন। কৈমাসের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পৃথ্বীরাজ মৃগয়ায় বহির্গত হইলে, রাজার প্রিয় কর্ণাটী নর্ত্তকীর সহিত কৈমাসের প্রণয় সংঘটিত হয়। প্রধানা মহিষী ইচ্ছিনী তাহা অবগত হইয়া গোপনে পৃথ্বীরাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। পৃথ্বীরাজও গোপনে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুতালোকে কর্ণাটীর ভবনে কৈমাসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিয়া ফেলেন, কর্ণাটী দিল্লী হইতে পলায়ন করে। কৈমাসের মৃত্যুতে সামন্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হন। পৃথ্বীরাজও পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কবি চন্দ্র তজ্জন্য পৃথ্বীরাজকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। এইরূপে ক্রমে পৃথ্বীরাজের অশুভ সূচনা আরব্ধ হয়।

সাহাবুদ্দীন আর কত দিন স্থির থাকিতে পারেন, তিনি আবার পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমে দিল্লীতে গুপ্তচর পাঠাইয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া ঘোরী অনেক সৈন্য-সামন্তের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। তাতার খাঁ যুদ্ধের সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এদিকে পৃথ্বীরাজের নিকটও সে সংবাদ পঁহুছিল। তিনি প্রধান প্রধান সামন্তের সহিত আবার নির্লজ্জ ঘোরীকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন ও পাণিপত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহাবুদ্দীনও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া রাজপুত সৈন্যের সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রাজপুত ও মুসলমান আপনাদিগের স্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমান সৈন্যগণ রাজপুতদিগকে মথিত করিতে করিতে ক্রমে পৃথ্বীরাজের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজার সমীপস্থ সামন্তগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এদিকে লোহানা ও পাহাড় রায় সাহাবুদ্দীনকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। অন্যান্য সামন্তেরাও ক্রমে আসিয়া যোগদান করিলেন। অবশেষে ছয় জন সামন্ত ঘোরীকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সাহাবুদ্দীন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। লোহানা তাঁহার হস্তীর মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় রায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, ঘোরীর সমস্ত দ্রব্যাদি রাজপুতগণ লুটিয়া লইল। বন্দী সাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজের নিকট নীত হইলেন। পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দীনকে লইয়া দিল্লী আগমন করেন। তথায় একমাস ঘোরীকে রাখিয়া আট সহস্র অশ্ব, ও অনেক ধন রত্ন দণ্ডবিধান করিয়া ঘোরীকে মুক্ত করিয়া দেন। * দণ্ডলব্ধ অর্থ সামন্তগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

পৃথ্বীরাজ যেমন আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজধানী দিল্লীকেও সুশোভিত করিয়া তুলেন। দিল্লী সে সময়ে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করে। নগরের বাহিরে যমুনাতীরস্থ নিগমবোধ ঘাটে এক বিচিত্র উদ্যান রচিত হয়, তথায় কেশর, কুঙ্কুম, গোলাপ, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া নন্দনকাননকেও পরাজিত করিয়া তুলে।

---

* গহিয় সাহি আলম। গয়ে প্রথিরাজ অপ্প গ্রহ॥
পোস মাস পঞ্চমিয়। শেত শুক্রবার ক্রত্তি কহ॥
জোগ সকল গহি সাহ। সজ্জি দিল্লী সম্পত্তো॥
অতি মঙ্গল তোরন। উছাই নীসান ঘুরত্তো॥
দীন তীশ রখ্যি গোরি গরুত্ম। অতি আদর আসন্ন বর॥
করি দণ্ড সাহ অষ্টংসু হয়। গয়সু সত্ত লিয় মুক্কিকর॥

দিল্লী নগরী নানারূপ বাদ্যধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত হইতে থাকে। যেখানে অনঙ্গ পাল দিল্লী দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজ তথায় আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই মনোহর প্রাসাদে সুশোভিত হইয়া দিল্লী ইন্দ্রপুরী তুল্য হইয়া উঠে * প্রাসাদের চারিদিকে অন্যান্য সামন্তগণেরও ভবন নির্ম্মিত হয়। দরবার গৃহ বিচিত্র শয্যায় বিভূষিত থাকে, রাজার মস্তকোপরি রত্নমণ্ডিত ছত্র এবং অঙ্গে নানা মণিমাণিক্য শোভা পাইত। এই সময়ে রাজকুমার রেণুসিংহও প্রধান প্রধান সামন্তগণের পুত্রগণকে লইয়া নিজের একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। তিনিও আপনার দলবল সহ নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, নগরে নানারূপ উৎসব হইত। বিশেষতঃ বসন্তোৎসবে দিল্লী অত্যন্ত শোভাশালিনী হইয়া উঠিত। পৃথ্বীরাজের প্রাসাদাদি দিল্লী-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার স্থানে পাঠান সম্রাট্‌গণের কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইতে থাকে, এখনও দুই এক স্থলে পৃথ্বীরাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

---

* ঘুরি মুম্মির চংব নিসান ঘুরং। পুর হৈ প্রথিরাজ কি ইন্দ্রপুরং॥
প্রথমং দিলিরং কিলয়ং কহনং। ডুহনা পৌরি প্রসাদ ঘনা সভনং॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, পৌষ সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি,পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে পৌষ মাসেই ভি, পি করিব। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ, ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora.) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুর্ব্বৃদ্ধি

Mohila Press, Calcutta.

শাশ্বতী ২য় খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩২১। ৮ম সংখ্যা।

আলোচনা।

অনধিকার চর্চ্চা।

অনধিকার চর্চ্চা তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ঘটায়, তাঁহারা আপনাদিগকে বিশ্বপণ্ডিত মনে করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ত তাঁহাদের করতল-আমলকবৎ, প্রাচ্য শিক্ষাও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন। যে সকল শাস্ত্র গুরুমুখ ব্যতীত শিক্ষার কোনও উপায় নাই, সেই সমস্ত দুরূহ সংস্কৃত শাস্ত্রের বাঙ্গলা বা ইংরেজী অনুবাদ, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লব্ধ সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছেন। সুতরাং তাহা যে গলদ্‌গোময় হইয়া উঠিতেছে, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইঁহারা বেদের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বেদান্তকে পাশ্চাত্যদর্শনের সহিত মিলাইতেছেন। স্মৃতির ব্যাখ্যাকারগণের মত উপেক্ষা করিয়া আপনারাই নূতন মত প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা চিরদিন পরের কথা লইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, কোন কালে একটুও স্বাধীন চিন্তার ধার ধারেন নাই, তাঁহারা কঠিন রহস্য সকলের মীমাংসা করিতে বদ্ধপরিকর! ইহা অপেক্ষা অনধিকার চর্চ্চা আর কি আছে? যে ভাষায় সামান্য জ্ঞান পর্য্যন্তও নাই, সেই ভাষায় লিখিত দুরবগম্য তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতে তাঁহারা অগ্রসর! ইহা কি স্পর্দ্ধার কথা নহে? অনেক গ্রন্থে ও মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে এই অনধিকার চর্চ্চার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত পরোচ্ছিষ্টভোজী চীৎকারপরায়ণ জীবগণের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

দেশের দুরবস্থা।

এবার দেশের দুরবস্থার একশেষ ঘটিয়াছে। অর্দ্ধ বঙ্গ ব্যাপিয়া দারুণ ম্যালেরিয়ায় লোক সকল প্রত্যহ যমমন্দিরে যাইতেছে। তদ্ভিন্ন সংক্রামক পীড়াও আপনাদের প্রভাব প্রকাশে ত্রুটি করিতেছেনা। শেষ দিকে বৃষ্টির অভাব হওয়ায় অনেক স্থানের বহু ধান্য মরিয়া গিয়াছে। পাটের ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় কৃষক ও জমীদার অর্থশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। আবার স্থানে স্থানে পঙ্গপালও দেখা দিয়াছে।

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

এই ছয় প্রকার ঈতির মধ্যে এবার অনেক গুলিরই আবির্ভাব হইয়াছে। পরিণামে যে কি ঘটিবে তাহাই ভাবিয়া আমরা আকুল হইয়া পড়িতেছি। দেশের সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে বিশেষরূপই লক্ষ্য করা উচিত। নতুবা দেশের মধ্যে হাহাকারের স্রোত বহিয়া যাইবে।

সাহিত্য সম্মিলনী।

এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। তাহার উদ্যোগ আয়োজনও হইতেছে। স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপ ইহার জন্য বিশেষরূপেই চেষ্টা করিতেছেন। অভ্যর্থনা সমিতিও উদাসীন নহেন। আশা করি, এবারকার অধিবেশনও সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইবে। তবে সাহিত্যসম্মিলনী আজিও যে স্থায়িভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। সম্মিলনী চিরদিনই যে শিশু থাকিবে তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এখন হইতে তাহাকে স্থায়ী কার্য্যেই মনোযোগ দিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির দিকে তাহার লক্ষ্য থাকা উচিত। সে উন্নতি কি তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থির করুন। একটা কথা আমরা বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যের গতি উদ্দাম ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। এ গতি যে সৎ সাহিত্যের অনুকূল তাহা বলা যায় না। সাহিত্যে সংযমও আবশ্যক।

রাঢ় ও বীরভূমি অনুসন্ধান সমিতি।

রাঢ় ও বীরভূমি অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া

আমরা সুখী হইলাম। ৺পূজার পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ অজয়তীরস্থ শ্যামরূপারগড়, ইছাই ঘোষের দেউল, কেন্দুবিল্ব প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে এই সকল স্থানের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। তাঁহারা সত্বর ধনভূম, পঞ্চকোট, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানও পরিদর্শন করিবেন। বিরাট্‌ রাঢ় প্রদেশের প্রাচীন তথ্য সংগ্রহে বাঙ্গলার ইতিহাস যে নূতন আলোকে আলোকিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

—:*:—

ভারতীয় জাতিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পিতা সন্তানহিতাকাঙ্ক্ষী; সাধ্যমত সন্তানগণের মধ্যে কাহাকে শাস্ত্রবিদ্যা, কাহাকে শস্ত্রবিদ্যা, কাহাকে চিকিৎসাবিদ্যা, কাহাকে শিল্পবিদ্যা, কাহাকে বা ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিবিদ্যায় নিযুক্ত করিলেন। অবশ্য যে পিতা সর্ব্বজ্ঞ ও অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি সন্তানগণের বুদ্ধি, মেধা ও রুচি প্রবৃত্তির তারতম্য অনুধাবন করিয়াই এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিদ্যায় ব্যাপৃত করিবেন। সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নত হইলেন, অসামান্য শক্তিলাভে অধিকারী হইলেন, ইহা পিতার অসমদর্শিতা বা পক্ষপাতিতার নিদর্শন কি?

দেশে যখন মহামারী, তখন চিকিৎসক পুত্রের, যখন দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব, তখন বীরপুত্রের আদর বাড়িবে। কালভেদে কাহারও আদর অধিক কি অল্প হইল, তজ্জন্য কি পিতা দোষী? সাধারণতঃ পিতার এইটুকু ত্রুটি হইতে পারে যে, সন্তানগণের প্রকৃতির তারতম্য বুঝিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি না করিতে পারেন। সেরূপ ব্যবস্থা করিলে কোন পিতাকে বিফলপ্রযত্ন হইতে হইত না। এই ত্রুটিতে পিতার অসর্ব্বজ্ঞতা, অসর্ব্বশক্তিমত্তা, প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্‌, এ ত্রুটি তাঁহার হইতেই পারে না।

বর্ত্তমানে এই জাতিভেদের কারণ অনেকগুলি হইতে পারে কিন্তু ইহা অনুভবগম্য সত্য যে, এই বিভাগের বীজভূত কারণ সৃষ্টিগত বৈষম্য। যে গুণ, যে

জাতীয় শক্তি লইয়া যিনি যেরূপ জন্মলাভ করেন; অনুকূল অবস্থা পাইলে তিনি তাহারই পূর্ণতালাভ করিতে পারেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বশতই কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ পুণ্যবান্, কেহ পাপী। "এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম করোতি (কারয়তি) যনেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর কাহাকে উৎকৃষ্ট, ও নিকৃষ্ট, পুণ্যবান্, ও পাপী করেন। যিনি সৎকার্য্যকারী, তিনি সম্পত্তির অধিকারী, যিনি অসৎকার্য্যকারী, তিনি অধোগতির অধিকারী। ইহার নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নিয়ামক মাত্র। এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শস্যোৎপত্তির কারণ সাধারণ ভাবে বৃষ্টিকেই বলা হয়; বৃষ্টি শস্যোৎপত্তির সাধারণভাবে হেতু, কিন্তু বিভিন্নভাবাপন্ন বীজই অসাধারণ কারণ। তদ্রূপ এই জাগতিক যাবতীয় বৈষম্যের সাধারণ কারণ—পরমেশ্বর। কিন্তু অসাধারণ কারণ—ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্ম। অবিদ্যা-সম্ভূত বাসনা এই ধর্ম্মাধর্ম্মের জনয়িত্রী—এই হেতু ঐ অসাধারণ কারণ বলা যাইতে পারে। বাসনা কাম।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, সৃষ্টির আদিতে যখন ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বা বাসনার সম্ভাবনা নাই, তখন আর বর্ত্তমান অসাধারণ পার্থক্য জন্মিবে কোথা হইতে ?

(উত্তর) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, বৈষম্য জগতের স্বভাব। বীজগত সূক্ষ্মভেদই সৃষ্টির ধর্ম্ম। স্বীকার করি, সৃষ্টির আদিতে ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বা বাসনার সম্ভাবনা নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বা বাসনা সে সময়ে না থাকিলেও বস্তুগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান ছিল, ঐ বস্তুগত বৈচিত্র্যই একপ্রকার পার্থক্য। আর ঐ বৈচিত্র্যই কালে ধর্ম্মাধর্ম্ম মূলক কর্ম্ম বা বাসনা যোগে এই স্থূল পার্থক্যে উপনীত হইয়াছে। পার্থক্যের স্থূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্ম, সূক্ষ্ম কারণ সৃষ্টিবৈষম্য। সাধারণ কারণই ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্ম। অসাধারণ কারণ বীজগত বৈষম্য।

সৃষ্টির প্রথমে যে বৈষম্য তাহা শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতাসূচক নহে। বৈষম্য বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে কোনটি বড় বা ছোট নহে। গুণ পৃথক্, কার্য্য পৃথক্, শক্তি পৃথক্, আকারও পৃথক্, তাহা হইলেও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সবাই প্রধান। প্রয়োজন

অনুযায়ী দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে যখন যাহার উপযোগিতা অধিক দেখা যায়, তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় মাত্র। বস্তুগত সূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্যই. সকল মানবের আকার, মনোবৃত্তি, রুচি, দোষ গুণও কার্য্য একবিধ হইতে পারে না। অধুনা জাতিভেদের যে আকার দৃষ্ট হয়, সৃষ্টির আদিতে বাস্তবিক সে আকার ছিল না। তবে ইহার কারণীভূত সূক্ষ্ম উপাদান অবশ্যই বর্ত্তমান ছিল। নচেৎ বিভিন্ন প্রবৃত্তি, পৃথক কার্য্যকারিণী ইচ্ছা হইবে কেন ?

উপাদানের পরস্পরসাদৃশ্য ও অন্যান্যবিরুদ্ধতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ! সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তির নিকট এক উপাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয় না। নিজ নিজ উপাদানের সারাংশ যাহাতে অধিক, তাহা সমজাতীয় উপাদানবিশিষ্ঠ পদার্থের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমন কি, সমজাতীয়ের মধ্যে সার্ব্বভৌম আধিপত্য পাইলেও বিষমজাতীয়ের তুলনায় হয়ত তাহা নিকৃষ্ট। এক উপাদানের সহিত অপর বিরুদ্ধ উপাদানের তুলনাই সম্ভব নহে। জলীয় উপাদান শ্রেষ্ঠ, কি বাষ্পীয় উপাদান শ্রেষ্ঠ, এ বিচার বৃথা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণাত্মক। কাজেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পৃথক পৃথক্ ক্রিয়া জীবেই লক্ষিত হইবে। সত্ত্বোপাদানে যে সকল ব্যক্তি গঠিত হইলেন, তাঁহাদের শক্তি, কার্য্য, গতি, বৃত্তি, ব্যবহার সমস্তই অপর গুণোপাদানে গঠিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ভিন্নমত হইল। সত্ত্বোপাদানের বিশেষত্ব মানবকে শান্ত, প্রসন্ন, সংযমী, বাহ্যবিতৃষ্ণ করিবে, দৈহিক শক্তির খর্ব্বতা সাধন করিয়া মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত করিবে। যাঁহাদিগকে সংসারে জন্মিয়া যদৃচ্ছালব্ধ আহারে সন্তুষ্ট, লৌকিক সুখভোগে উদাসীন, আভ্যন্তরিক তত্ত্বে ব্যাপৃত দেখা যাইল, সেই পরিতৃপ্ত শান্ত দান্ত স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হইল। বিষয় ভোগে তৃপ্তি নাই, লালসার জয়ই জীবনের লক্ষ্য, অজ্ঞেয়তত্ত্বান্বেষণই মানবের চরম উদ্দেশ্য--ইহা যাহারা বুঝিলেন, কাম জয় করিবার নানাবিধ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিলেন, জ্ঞানমার্গকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। শম, দম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চ্চা, বৈরাগ্য, সত্য, সারল্য, অমায়িকতাও ক্ষমা ইঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ভারত চিরদিনই শান্তিপ্রিয়, জ্ঞানপিপাসু, ভাবপ্রবণ, কাযেই জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্মণজাতির শ্রেষ্ঠতা উদ্ঘোষিত হইল। শ্রুতি বলেন "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ।" ভারত

ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবী সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন নাই বা দিতে পারে না।

যাঁহারা সংসারে আসিয়া বাসনার পূরণকেই জীবনের সার ভাবিলেন, বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তারকেই মানবের প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করিলেন, নিজেদের সুখ সচ্ছন্দতার উপায় নির্দ্ধারণ করাই অত্যাবশ্যকীয় স্থির করিলেন, তাঁহাদিগেরই ক্ষত্রিয় আখ্যা। রজোগুণোপাদানে ইঁহারা জাত বলিয়া দৈহিক বলী, বিলাসী, প্রভুত্বকামীও দাতা। রজোগুণের কার্য্যই বাহ্যজগতের উন্নতি। বাহ্য জগতের উন্নতির প্রধান হেতু, প্রভুত্ব, স্পৃহা ফলভোগ। প্রভুত্ব ও ভোগ, দৈহিকশক্তিও ধনলভ্য। বাহ্য জগতের যাবতীয় বল, সকল পার্থিব শক্তিই দৈহিক শক্তি সাধ্য। ভারতে দ্বিতীয় পদবীতে স্থান। জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই যে ইঁহারা দ্বিতীয়, তাহা নহে।

যাঁহাদের আভ্যন্তরিক ও দৈহিক শক্তির কোন প্রাখর্য্য নাই। যাঁহাদের নিকট জ্ঞানপথ কঠিন, প্রভুতাবিস্তারমার্গ বিপৎসঙ্কুল। যুদ্ধ, বিগ্রহ, হত্যা কূটনীতি যাঁহারা পছন্দ করিলেন না, অথচ ভোগকেই চরমসুখ মনে করিলেন, নির্ব্বিরোধ কৃষি, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি সুপথ উপায়ই অবলম্বন করিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য। ভারতভূমি জ্ঞানের আকর, শাস্ত্রশাসিত, আচারপূত; কাজেই ইঁহারা ব্রাহ্মণের নিম্নে। আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, দৈহিক শক্তি সাপেক্ষ্য, আর তাহা অবশ্যবাঞ্ছনীয়; কাজেই ক্ষত্রিয়েরও নিম্নে। ভারতে তৃতীয় পদবীতে ইঁহাদের স্থান। জগতের সর্ব্বত্রই যে ইঁহারা তৃতীয়, তাহা নহে। ক্ষুৎপিপাসা, শীতগ্রীষ্ম সহিষ্ণুতা, শান্তভাব, প্রভৃতি ইঁহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ।

যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, সহজ চিন্তাশূন্য সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধ সেবাধর্ম্মই সুখকর বোধ করিলেন, তাঁহারাই শূদ্র। তাই শাস্ত্রশাসিত, আচারপূত ভারতে ইঁহারা চতুর্থ। ক্ষুদ্রনদী যেমন মহানদীর সাহায্যেই সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, কীট যেমন পুষ্প সংসর্গেই দেবতার মস্তকে সহজে আরোহণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ শূদ্র ব্রাহ্মণের সাহায্যে ধর্ম্মচর্চ্চা, ব্রাহ্মণের অধীন থাকিয়াই উন্নতি, ব্রাহ্মণের সেবা দ্বারাই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিবেন। শূদ্র দ্বিবিধ—এক শূদ্র, অপর গর্ভদাস। শাস্ত্রীয় কঠোর নিয়ম সাধারণতঃ গর্ভদাসগণের

জন্ত। শূদ্রগণের জন্য যে কিছু নহে তাহা বলিতেছি না। গর্ভদাসগণ আধুনিক কোল ভিল সাওতাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও ভয়ানক ছিল। শূদ্র অবশ্য নিকৃষ্ট ছিল; তবে তন্মধ্যে যে কেহ কেহ উন্নত ছিল না, তাহা নহে। শূদ্রের সেবাধর্ম্মই প্রধান ছিল কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে দেখা যায়, কৃষিকার্য্যও শূদ্রগণের ছিল। "শূদ্রস্য কৃষিকর্ম্মচ" এই শূদ্র অনার্য্য কি না, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। আমরা শূদ্রকে অনার্য্য বলি না; কারণ বর্ণ চারিটি—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণাশ্রম ভাগ আর্য্যগণের জন্যই। শূদ্র আর্য্য, না হইলে বর্ণা-, শ্রম মধ্যে গণ্য হইবে কেন? হইতে পারে, খুব আদিমযুগে ত্রয়ী বর্ণের কথাই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তখন শূদ্রকে আর্য্য মধ্যে পরিগণিত করা হয় নাই; যখন পরিগণিত করা হইল, তখন শূদ্র কিঞ্চিৎ উন্নত ছিল। আর বেদে যখন চতুর্ব্বর্ণের কথাই আছে, তখন শূদ্রকে আর্য্য বলিতে হয়।

অনার্য্য ও আর্য্যগণের রক্তমিশ্রণ যে শূদ্রমধ্যে হয় নাই, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহারা শূদ্র নামে পরিচিত; তাঁহারা প্রাচীন যুগের একজাতি, শূদ্র নহে। শূদ্র একজাতি, সে শূদ্র কোথায়? বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুইটি বর্ণই আছে, ক্ষত্রিয় কোথায় গেল? সমাজে বৈশ্যেরই সংখ্যা অধিক; সে বৈশ্য কোথায় গেল? বুঝিতে হইবে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ক্রমে শূদ্রত্বে পরিণত হইয়া আসিয়াছেন, আধুনিক শূদ্রগণের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ হইতে হিন্দু হইয়াছে। কেহ কেহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতির সহযোগে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করেন, কাঁহারও ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে পতিত হইয়াছেন কাঁহারাই বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি অসমবর্ণ সহযোগে উদ্ভূত হইয়াছেন—তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

আভ্যন্তরিক বলে ব্রাহ্মণের তুল্য কেহ নাই; অপার্থিব ভাব তুলনায় ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে জাতীয় উপাদানে ব্রাহ্মণ গঠিত, সেই জাতীয় হিসাবে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সকল গুণের একমাত্র আধার ব্রাহ্মণই ছিলেন না, থাকিতে পারেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জবালা সংবাদে, সত্যকামের সেই অকপট সত্যবাদিতা,

সেই আদর্শ সরলতা, সর্ব্বসমক্ষে পিতৃ নাম উচ্চারণে অক্ষমতা, একমাত্র ব্রাহ্মণেই সম্ভব।

আর ক্ষত্রিয় যে জাতীয় উপাদানে গঠিত, সে জাতীয় উপাদানে ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। মহাভারতে পরশুরামশিষ্য কর্ণের বজ্রকীটদষ্ট উরু হইতে যখন রক্তস্রোত বহিয়াছিল, তখনও কর্ণ গুরুর ধ্যানভঙ্গ করেন নাই এ জাতীয় সহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণ পরিচয়েই কর্ণ পরশুরামের শিষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়েন, কিন্তু এই জাতীয় আদর্শ সহিষ্ণুতার জন্যই পরশুরাম কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিলেন। তাহা হইলে এই জাতীর সহিষ্ণুতায় কর্ণ অতুল্য। তবে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দুই একজন রাজর্ষি ব্রাহ্মণ্য গুণ সম্পন্ন ছিলেন তাহা সাধারণ ক্ষত্রিয়ের কথা নহে। আর ব্রাহ্মণ মধ্যেও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ছিলেন, তাহাও সাধারণ দৃষ্টান্ত নহে।

আবার বৈশ্যের গুণ সাগরপথে তিল তিল করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন, অর্থের জন্য স্ত্রীপুত্রবিরহিত জীবনযাপনা, প্রবাসক্লেশ স্বীকারাদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। বৈশ্যের রজোভাব ও তমোভাব দুইই ছিল। সেবকোচিত গুণে আবার সেবনাধর্ম্মে প্রবৃত্ত শূদ্র শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নাই। নারীগণ সেবাধর্ম্মে অদ্বিতীয় তাই শূদ্রধর্ম্মিণী।

জগতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য অবিসংবাদিত হইলেও কোথাও ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলী, অস্ত্রশস্ত্রে কৌশলী প্রভুত্বের স্বর্ণশিখরে আরূঢ়, ধনবান, তাহারা কি আধুনিক জগতে কোন কোন ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানী বিদ্বান্ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত নহেন?

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের মর্য্যাদা সমাজে কি অধিক নহে? আর আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে শিল্পবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। শিল্প বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কি পাশ্চাত্য জাতি জগদ্বরেণ্য নহে? ভারতবাসী আর্য্যগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত নহেন? সংসার ত্যাগী বিরাগী ব্রাহ্মণের আদর্শ পাশ্চাত্য জাতিতে নাই; আছে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের আদর্শ। তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেষ্ঠ কালভেদে, দেশভেদে, অবস্থাভেদে শ্রেষ্ঠতা পাইতে পারেন। আর পাশ্চাত্য জাগতিক গতি যেরূপ ভাবে দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রতীত হয়, সময়ে শ্রমজীবী সেবকদলই প্রধান হইবে। তখন শূদ্র-প্রাধান্য জগতে দৃষ্ট হইবে।

স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব উপাদানে যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রে সর্ব্বোপাদানে যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন, এমন কথা নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হওয়া সহজ, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হওয়া সহজ নহে; হইতে পারেন কি না, সে সন্দেহও বিদ্যমান। তদ্রূপ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু বৈশ্য শ্রেষ্ঠ হওয়া সহজ নহে।

শাস্ত্রের শাসন যথা—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"; তখন স্ব স্ব ধর্ম্মকে নিম্ন মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। তবে সামাজিক হিসাবে যাহার যে অংশে আধিপত্য, সে অংশে তাহার আধিক্য অবশ্যই মানিতে হইবে। ন্যায্য প্রাপ্য হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা উচিত নহে।

"চাণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ।"

তবে আর ব্রাহ্মণের দাম্ভিকতা, শূদ্রের অনাশ্বাসের কারণ কি? ব্রাহ্মণ যোগ্য হউন না হউন, তাঁহাকে সমান ভক্তি করা শূদ্রের মহত্ত্ব। শূদ্রের জাতীয় ধর্ম্মই ব্রাহ্মণানুবর্ত্তন। যে ব্রাহ্মণ পাপপরায়ণ, স্বপথভ্রষ্ট, ধর্ম্মত্যাগী, তাঁহার অপেক্ষা ধার্ম্মিক স্বপথসেবী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্র শতগুণে শ্রেষ্ঠ। পরলোকে দেহান্তে উক্ত ব্রাহ্মণের অধোগতিই পরাজয়; উক্ত শূদ্রের ঊর্দ্ধগতিই জয়। তবে ব্রাহ্মণ্য রক্ত দেহমধ্যে প্রবহমান, ব্রাহ্মণ্যসংস্কার গূঢ়ভাবে অবস্থিত বলিয়া বর্ত্তমান দেহে সামাজিক হিসাবে উক্ত ব্রাহ্মণও কিঞ্চিৎ সম্মানের অধিকারী। ব্রাহ্মণ—অর্দ্ধেক জন্মগত, অর্দ্ধেক গুণগত। জন্ম ও গুণগত ব্রাহ্মণ্য যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই পূর্ণ ব্রাহ্মণ। জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া যিনি শূদ্রবৎ, তিনি অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ। আর যিনি জন্মে শূদ্র হইয়া গুণে ব্রাহ্মণবৎ, তিনিও অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ। সামাজিক হিসাবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অধিক সম্মানিত হইলেও প্রকৃত দ্বিতীয় ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহকালে কয়েক দিনের জন্যই না হয়, প্রথমের শ্রেষ্ঠতা; কিন্তু চিরদিনের জন্য পরলোকে, দেহান্তরে নিকৃষ্টতা। জন্মগত ও গুণগত ব্রাহ্মণ্য যাহাতে লাভ হইতে পারে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা শাস্ত্রকারগণ করিয়া গিয়াছেন। জন্মগত জাতি প্রথম বিচার্য্য। নচেৎ গুণ বিচার করিয়া শৈশবে কিরূপ সংস্কার কার্য্য হইবে, যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে? আর ইহাতে সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনাও বড়ই অধিক। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপ্রাশন এমন কি উপনয়নাদির জন্মগত জাতিত্বের উপর নির্ভরতা ব্যতীত উপায় নাই। কাজেই প্রথমতঃ জন্মগত

জাতি স্বীকার, দ্বিতীয়তঃ গুণ বা কর্ম্মগত জাতি স্বীকার। সভ্য নির্ব্বাচনের মিয়াদ যত দিন, ততদিন তিনি অক্ষম হইলেও তাঁহাকে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু মিয়াদ ফুরাইলে তাঁহার উর্দ্ধপদ আর থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। আমাদেরও জাতিত্বের দাবী দেহত্যাগ পর্য্যন্ত। দেহত্যাগ যত দিন না হয়, তত দিন উক্ত জাতিত্বের কথঞ্চিৎ সম্মান দিতে আমরা বাধ্য।

জাতি বিষয়ে যতদূর আলোচনা হইল, তাহাতে দেখা গেল, জন্মলব্ধ বৈষম্যে জাতিভেদের সূচনা, পরে গুণ ও কার্য্য ভেদে ইহার পরিণতি। তবে উভয় মতই অপেক্ষণীয় নহে কি? তথাপি এইরূপ ঘোরতর বৈষম্য কেন? মত বিরোধ কেন? পরস্পর ঘৃণা, ঈর্ষা ভাবই বা কেন?

শ্রীরামসহায় ভট্টাচার্য্য। সম্পাদক।
কাঁটালপাড়া সাহিত্য সম্মিলনী।

কবিকথা।

(ভবভূতি)

উত্তর রামচরিত।

(৬)

লব ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে মহাসমর বাধিয়া গেল, সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই সূর্য্যকুলকুমারদ্বয়ের মূর্ত্তি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল, ক্ষত্রিয়তেজোলক্ষ্মীর প্রকাশে তাহাদের কান্তিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরস্পরে অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দেবাসুরগণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রান্তদ্বয়ে গুণসংযোগে ভীষণ শব্দ উৎপাদন করায়, কঙ্কণ ঝণাৎকারের ন্যায় কিঙ্কিণীরবে মুখরিত বিপুল কোদণ্ড বিস্ফারিত হইয়া অবিরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কুমারদ্বয়ের চূড়াগুলি কম্পিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহাদের লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল, সেই সময়ে উভয়ের মঙ্গলের জন্য দিব্য দুন্দুভিও নিনাদিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধর বিদ্যা-

ধরী উজ্জ্বল বিমানে বসিয়া সেই বীরদ্বয়ের মস্তকে প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক কমল মালায় সহিত দেবতরুর তরুণ মণিময় মুকুল সমূহের মকরন্দবাসিত পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল, চন্দ্রকেতুর আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে অকস্মাৎ আকাশতল যেন তড়িচ্ছটায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল, ক্রমে বোধ হইতে লাগিল যেন বিশ্বকর্ম্মার শাণ যন্ত্রে বিঘূর্ণিত মার্ত্তণ্ডের জ্যোতিঃসম সমুজ্জ্বল ভগবান্ নীল লোহিতের ললাট নেত্রের আবরণ মোচন হইয়া গেল। বিমান গুলির পতাকা ও চামর সকল দগ্ধ ও বিচিত্রবর্ণ হওয়ায় তাহারা দূরে অপসৃত হইল, আবার ধ্বজদণ্ডে বদ্ধ চেলাঞ্চলে অগ্নিশিখা পড়িয়া কুঙ্কুমচ্ছুরণের শোভা সম্পাদন করিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বজ্রখণ্ডের প্রস্ফুটনের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ সমূহে পূর্ণ তাঁহার লেলিহানজ্বালামালা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, আশঙ্কায় বিদ্যাধর বিদ্যাধরীকে স্বীয় গাত্রে আচ্ছাদিত করিয়া পলায়নের উপক্রম করিল, বিদ্যাধরের অঙ্গ স্পর্শে বিদ্যাধরী পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল,—ভাগ্যক্রমে বিমল মুক্তাফলের ন্যায় শীতল স্নিগ্ধ মসৃণ মাংসল নাথদেহ স্পর্শে আমার সকল সন্তাপ দূরে গিয়াছে। আনন্দে আমার নয়ন দুইটি ঈষৎ মুকুলিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে। শুনিয়া বিদ্যাধর কহিল,—প্রিয়ে! আমি আর কি করিলাম, অথবা প্রিয়জন কিছু না করিলেও নিকটে থাকিয়া সে সুখ প্রদান করে, তাহাতেই দুঃখরাশি দূরীভূত হইয়া যায়, সেই-জন্য যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ।

সেই সময়ে লব বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে নভোমণ্ডল চঞ্চল বিদ্যুল্লতায় সমুদ্ভাসিত মত্তময়ূরকণ্ঠের ন্যায় শ্যামল মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং অবিরল বারিধারার পতনে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। নিখিল প্রাণী প্রবল পবনে বিকম্পিত গম্ভীর শব্দে নিনাদিত মেঘজালের ঘনান্ধকারে গাঢ় নিরুদ্ধ হইয়া একেবারে সমগ্র বিশ্বের গ্রাসে সমুদ্যত নীলকণ্ঠের কণ্ঠকন্দরে অথবা যুগান্ত যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণের নিরুদ্ধ সর্ব্বদ্বার কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া চন্দ্রকেতুও বায়-ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তখন সেই মেঘরাজি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মায়াপ্রপঞ্চের ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার ন্যায় বায়ুবেগে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সহসা

রামচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সসম্ভ্রমে উত্তরীয়াগ্র ঘূর্ণিত করিয়া ও মধুর বাক্যে কুমারদ্বয়কে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া বিমানরাজ পুষ্পককে অবতরণ করাইতে লাগিলেন। সেই মহাপুরুষের উচ্চারিত শব্দ শুনিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে লব শান্তভাব অবলম্বন করিলেন, এবং চন্দ্রকেতুও তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধর বিদ্যাধরী পুত্র মিলিত রাজার কল্যাণ কামনা করিয়া আকাশমার্গ হইতে অন্তর্হিত হইল।

পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া রামচন্দ্র চন্দ্রকেতুকে বলিতেছিলেন, "দিনকর কুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো! তুমি শীঘ্র করিয়া এস ও আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। তোমার তুহিনবর্ণ শীতল অঙ্গ স্পর্শে আমার চিত্তদাহ উপশান্ত হউক।" তাহার পর তিনি চন্দ্রকেতুকে উঠাইয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—দিব্যাস্ত্রধারী তোমার দেহের কুশল ত? চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন,—এই অদ্ভুত প্রিয়বয়স্যের লাভে যে অভ্যুদয়ের সঞ্চার হইয়াছে তাহাতেই কুশল ঘটিয়াছে। তাই নিবেদন করিতেছি, আমাকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন সেইরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এই বীরবরকেও অবলোকন করুন। রামচন্দ্র লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তখন বলিতে লাগিলেন, "বৎস সৌভাগ্যের বিষয় যে তোমার বয়স্যটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি সম্পন্ন। লোক সকলের পরিত্রাণের জন্য, মূর্ত্তিমান অস্ত্রবেদতুল্য ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার নিমিত্ত, শরীরী ক্ষাত্রধর্ম্মসম রাশীভূত সামর্থ্য ও পুঞ্জীভূত গুণের ন্যায়, জগতের পুণ্য নির্ম্মাণরাশীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া বীরশিশুটি যেন অবস্থান করিতেছে।" রামচন্দ্রকেও দেখিয়া লব বলিতেছিলেন "এই মহাপুরুষের আকার পবিত্রতা ও মহিমায় বিমণ্ডিত। আশ্বাস স্নেহ ও ভক্তির একমাত্র মহাশ্রয় স্থল, অথবা প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান প্রাসাদ তুল্য বলিয়াই ইঁহাকে বোধ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য ইঁহাকে দেখিয়া বিরোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, প্রগাঢ় আনন্দরসের সঞ্চার ঘটিতেছে। সে ঔদ্ধত্য যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে, বিনয়ে অবনত করিয়া তুলিতেছে, সহসা কেমন যেন পরাধীন হইয়া পড়িতেছি, অথবা তীর্থস্থানের ন্যায় মহাত্মাদিগের কি এক অনির্ব্বচনীয় মহামূল্য উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।" রামচন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন, "এ বালকটি যেন সদ্যদুঃখের অবসান ঘটাইতেছে এবং কোন অবিজ্ঞাত কারণে যেন অন্তরাত্মাকে স্নেহসিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

অথবা স্নেহ কারণের অপেক্ষা রাখে ইহা নিতান্তই বিরুদ্ধ। কোন আন্তরিক কারণেই পদার্থনিচয় পরস্পরের সংসক্ত হইয়া থাকে। প্রীতি কখনও কার্য্য কারণের উপর নির্ভর করে না। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম বিকশিত হয়, এবং চন্দ্রোদয়েই চন্দ্রকান্তমণি দ্রব হইয়া যায়।"

লব চন্দ্রকেতুকে রামচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার তাতপাদ বলিয়া উত্তর দিলেন। শুনিয়া লব কহিলেন যে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে ইনি আমারও তাহাই হইলেন, কিন্তু তিনি রামায়ণ কথায় চারিজনেরই বিষয় জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি কে জানিতে চাহিলে চন্দ্রকেতু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তাত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তখন উল্লাস সহকারে লব বলিয়া উঠিলেন,—কি ইনি রঘুনাথ, তাহা হইলে অদ্য সুপ্রভাত হইয়াছে বলিতে হইবে; কারণ অদ্য এই দেবের দর্শন লাভ ঘটিল। তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের প্রতি বিনয় ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন,—তাত বাল্মীকিশিষ্য লব আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—এস আয়ুষ্মন্! তাহার পর তিনি লবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার বিনয় প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। পরিণত পূর্ণাবয়ব পদ্মের গর্ভদলের ন্যায় পীন, মসৃণ, সুকুমার এবং চন্দ্র কিরণ ও চন্দনরসের ন্যায় শীতল তোমার অঙ্গস্পর্শ আমাকে আনন্দিত করিয়া তুলিতেছে। লব তখন মনে মনে বলিতেছিলেন যে, আমার প্রতি ইনি এরূপ অকারণ স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, আমি কিন্তু ইঁহাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া অস্ত্রধারণ পর্য্যন্ত করিয়াছি। তাহার পর তিনি রামচন্দ্রকে প্রকাশ্যে কহিলেন,—তাত লবের মূঢ়তা ক্ষমা করিবেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস তুমি কি অপরাধ করিয়াছ? সে কথার উত্তরে চন্দ্রকেতু কহিলেন,—যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষিগণের নিকট আপনার প্রতাপ ঘোষণা শুনিয়া ইনি বীরোচিত আচরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "ইহাই ত ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার। তেজস্বী কখনও অন্যের তেজঃপ্রসার সহ্য করিতে পারে না। উহা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ অকৃত্রিম স্বভাব, যদি দেব দিনকর অবিশ্রান্ত করবর্ষণে উত্তপ্ত করিয়া তুলেন, তাহা হইলে সূর্য্যকান্তমণি কি অবমানিতের ন্যায় তেজ উদ্গিরণ করে না?" শুনিয়া চন্দ্রকেতু কহিলেন,—ক্রোধও এ বীরের পক্ষে শোভা পায়

দেখুন, ইহার প্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্রে আমাদের সমস্ত সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে। সৈন্যগণের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র লবকে অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে বলিলেন ও চন্দ্রকেতুকেও সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

লবের ধ্যান মাত্রে অস্ত্র সকল প্রশমিত হইল, তিনিও রামচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন, তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "বৎস যে সকল অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রয়োগ ও সংহার করিতে হয় তাহা গুরূপদেশের অপেক্ষা করে, ব্রহ্মাদি পুরাতন গুরু সকল বেদ ও ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য সহস্রাধিক বৎসর তপস্যা করিয়া আপনাদের তপোময় তেজঃস্বরূপ এই সকল দিব্যাস্ত্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। পরে ভগবান কৃশাশ্ব সহস্র বৎসর পরিচর্য্যা লাভের পর বিশ্বামিত্র ঋষিকে এই অস্ত্রবিষয়ক মন্ত্রোপনিষদের উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র আমাকে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ গুরু পরম্পরা ক্রমে এই অস্ত্রের লাভ ঘটিয়া থাকে। তুমি কাহার নিকট হইতে ইহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ তাহাই এক্ষণে জানিতে চহিতেছি।" সে কথায় লব উত্তর দিলেন,—এই অস্ত্র সকল আমাদের দুই জনের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—জগতে কি না সম্ভব হয়? প্রকৃষ্ট পুণ্যফলে এই অনির্ব্বচনীয় মহিমালাভও ঘটিতে পরে। কিন্তু তোমরা দুই জন কে? লব উত্তর দিলেন—আমরা দুই যমজ ভ্রাতা। রামচন্দ্র বলিলেন—তাহা হইলে দ্বিতীয়টি কোথায়? সে সময়ে অদূরে কুশ ঋষিবালককে বলিতেছিলেন,—ভাণ্ডায়ণ শুনিলাম রাজসৈন্যের সহিত নাকি আয়ুষ্মান লবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ কথা কি সত্য? ভাণ্ডায়ণ তাহা যথার্থ বলিলে কুশ তখন বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে অদ্য ভুবনে অধিরাজ শব্দ অস্তমিত এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রানল নির্ব্বাপিত হউক"। কুশের প্রতি রামচন্দ্রের দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন "ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় শ্যামকান্তি বালকটি কে? ইহার ধ্বনিতে আমাকে নবনীল নীরধরের ধীরগর্জ্জনে উদ্ভিন্নকোরক কদম্ব তরুর ন্যায় পুলকিত করিয়া তুলিতেছে"। সে কথায় লব বলিলেন,—ইনি আমার জ্যেষ্ঠ আর্য্য কুশ। এইমাত্র ভরতমুনির আশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। শুনিয়া রামচন্দ্র কৌতূহল পরবশ হইয়া কুশকে আহ্বান করিবার

জন্ত লবকে অনুরোধ করিলেন। লবও তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্ত কুশের নিকট অগ্রসর হইলেন।

কুশ তখন বিস্ময় হর্ষ ও ধৈর্য্যের সহিত ধনুরাকর্ষণ করিয়া বলিতেছিলেন। "ভগবান্ বৈবশ্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অভয় দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, গর্ব্বিতগণের দহনের জন্ত যাঁহারা স্বীয় ক্ষত্র প্রতাপাগ্নি প্রদীপিত করিয়া থাকেন, সেই আদিত্যবংশীয় নৃপতিনিচয়ের সহিত যদি আমার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে শাণিত অস্ত্রসমূহের উজ্জ্বলপ্রভায় প্রদীপ্তগুণ আমার এই কার্ম্মুক ধন্ত হইবে"। এই বলিয়া কুশ বেগভরে ধাবিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই ক্ষত্রিয় বালকটির কি অনির্ব্বচনীয় পৌরুষাতিশয়, ইহার দৃষ্টি ত্রিজগতের সত্ত্ব সারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছে, বীরোদ্ধতগতিতে বসুন্ধরা অবনত হইয়া পড়িতেছেন, কৌমারাবস্থায়ও গিরিসম গুরুত্বে বিমণ্ডিত হওয়ায় বালকটিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সাক্ষাৎ বীররস বা স্বয়ং দর্পই যেন আগমন করিতেছে"। ইতিমধ্যে লব কুশের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কুশকে অভিবাদন করিলে, কুশ তাঁহাকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'উহা কিছু নয়' বলিয়া লব উত্তর দিলেন, ও কুশকে ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে অবস্থান করিতে বলিলেন। কুশ তাহার কারণ জানিতে চাহিলে, লব কহিলেন—দেব রঘুপতি এখানে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিতেছেন এবং আপনাকে দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিয়া কুশ বলিয়া উঠিলেন,—তবে কি তিনি সেই রামায়ণ কথার নায়ক বেদরত্নের রক্ষক। লব 'তাহাই বটে' বলিয়া উত্তর দিলেন। কুশ তখন বলিলেন,—সেই পুণ্যদর্শন মহাত্মার সাক্ষাৎকার অভিলষনীয় বটে, কিন্তু কি ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। লব বলিয়া দিলেন—গুরুজনের নিকট যেরূপ ভাবে গমন করিতে হয় সেইরূপ বিনয় সহকারে যাইতে হইবে। কুশ কহিলেন—এরূপ কথার কারণ কি? লব তখন বলিতে লাগিলেন,—উদারহৃদয় সুজন উর্ম্মিলাতনয় চন্দ্রকেতু প্রিয়বয়স্য বলিয়া সম্বোধন করিয়া আমার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে এই রাজর্ষি আমাদের ধর্ম্মপিতা হইয়াছেন। শুনিয়া কুশ কহিলেন,—সম্প্রতি ক্ষত্রিয়ের

নিকটও বিনয় প্রকাশ নিন্দনীয় নহে। লব আবার বলিতে লাগিলেন—আর্য্য! এই মহাপুরুষকে অবলোকন করুন। ইহার প্রভাব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকৃতি দেখিলেই বোধ হয় ইনি বিবিধ লোকোত্তর চরিতের মহিমায় বিমণ্ডিত। সে কথায় কুশ রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য ইহার আকৃতিটি কি প্রসন্নতাপূর্ণ এবং প্রভাবও কি পবিত্র! রামায়ণ কবি বাগ্দেবীকে যে কথাকারে পরিণত করিয়াছেন তাহা উপযুক্তই হইয়াছে।

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—তাত বাল্মীকি-শিষ্য কুশ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। 'আয়ুষ্মন এস এস' বলিয়া রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন "বাৎসল্যভরে আমি জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় স্নিগ্ধকায় তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি"। কুশকে আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্র মনে মনে কহিলেন, "এ কি এ বালকটি কি আমার পুত্র? আমার দেহজাত স্নেহসারটুকু কি সর্ব্বাঙ্গ হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়িল? অথবা আমার চৈতন্যধাতু বাহিরে প্রাদুর্ভূত হইল! কিংবা সান্দ্রানন্দে ক্ষুভিত-হৃদয়ের দ্রবধারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল? কারণ ইহার স্পর্শে আমার অঙ্গ যেন অমৃত রসে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে"। সেই সময়ে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের মুখমণ্ডলেও তাহা নিপতিত হইতেছিল। উহা দেখিয়া লব তাঁহাকে কহিলেন,—তাত, তপনদেব আপনার ললাটদেশ সন্তাপিত করিতেছেন, তাই বলিতেছি এই শাল তরুর ছায়ায় ক্ষণকাল উপবেশন করুন। 'বৎসের যাহা অভিরুচি' বলিয়া রামচন্দ্র কুশ লবকে লইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাহার পর তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যদিও ইহাদের আচরণে বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাইতেছে তথাপি গতি স্থিতি আসন প্রভৃতিতে ভাবী সাম্রাজ্য লাভের সূচনা ঘটাইতেছে। সমুজ্জ্বল রশ্মিমালায় যেমন নির্ম্মল রত্নকে ও মকরন্দবিন্দু যেমন বিকশিত পদ্মকে শোভিত করে, সেইরূপ ইহাদের স্বাভাবিক লাবণ্যবিলাস কান্তিময় দেহটিকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই বালক দুইটিতে রঘুকুলকুমারদিগের ছায়া অনেক পরিমাণে নিপতিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইহাদিগের দেহ পূর্ণাবয়ব পারাবতের কণ্ঠসম শ্যামল, বৃষের ন্যায় বিশাল স্কন্ধ, বাহুমূল অবন্ধুর। প্রসন্ন সিংহের ন্যায় অচঞ্চল দৃষ্টি। এবং

ধ্বনিও মাঙ্গল্য মৃদঙ্গের ন্যায় গম্ভীর।” রামচন্দ্র আবার লব ও কুশকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কেবল যে আমার আকৃতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে তাহা নহে। নিপুণভাবে অবলোকন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জনকসুতার অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবও এই শিশু দুইটিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার এইরূপ মনে হয় যেন অভিনব শতপত্রের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন প্রিয়তমার বদনমণ্ডল আমার নয়নগোচর হইতেছে। মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্ত পঙ্‌ক্তি, মনোহর ওষ্ঠ, সেই কর্ণপাশ এবং নয়নযুগল রক্তনীল হইলেও তাহাদের সৌন্দর্য্য গুণ কিন্তু সেইরূপই দেখিতেছি। এই ত সেই বাল্মীকির তপোবন। এই খানেই ত দেবীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। ইহাদের আকৃতি ও বয়সপ্রভাব ও এইরূপ জৃম্ভকাস্ত্র সকল ইহাদের নিকট স্বতঃ প্রকাশিত হইয়াছে আমার স্মরণ হইতেছে চিত্রদর্শন সময়ে প্রসঙ্গক্রমে যে অস্ত্র সঞ্চারের কথা বলিয়াছিলাম বোধ হয় তাহাই ঘটিয়াছে। গুরূপদেশ ব্যতীত অস্ত্রলাভ করা যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণের পক্ষেও শুনি নাই, আর হৃদয়ের সুখাতিশয্যে আমার আনন্দপ্লাবিত আত্মারও বিশ্বাস জন্মাইতেছে। দেবীর গর্ভভার যে দ্বিধা বিভক্ত ছিল, তাহা আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।” বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “পূর্ব্বসঞ্জাত প্রণয় পরিচয়ের আধিক্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নির্জ্জন প্রদেশে বিশ্বাস ভরে কিঞ্চিৎ লজ্জা পরিত্যাগ করিলেও স্বাভাবিক লজ্জায় মুকুলিতলোচনা প্রিয়ার উদরে করতলপরামর্শকালে আমিই প্রথমে তাহার দুইটি গর্ভগ্রন্থি জানিতে পারিয়াছিলাম, কিছুদিন পরে তিনিও তাহা বুঝিতে পারেন। তবে কি উঁহাদিগকে কোন উপায়ে জিজ্ঞাসা করিব?”

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লব বলিয়া উঠিলেন “তাত, এ কি, জগতের মঙ্গলস্বরূপ আপনার বদনমণ্ডল অশ্রুসম্পাতে হিমসিক্ত কমলের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল কেন?” কুশ তখন বলিতে লাগিলেন “বৎস, সীতাদেবীর বিরহে রঘুপতি কি দুঃখই না ভোগ করিতেছেন? প্রিয়ানাশে সমগ্র জগৎ অরণ্য বলিয়াই বোধ হয়, সেই অগাধ প্রেম, আবার এই নিরবধি বিরহ, রামায়ণে অনভিজ্ঞের ন্যায় এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?” লবকুশের কথাবার্ত্তা শুনিয়া রামচন্দ্রের চিত্ত আবার উৎ-

কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—ইহাদের আলাপ ত নিঃসম্পর্কীয় ও উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে, তবে আর উহাদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিব? হৃদয়! সহসা তোমার এরূপ স্নেহচঞ্চল বিকার ঘটিল কেন? হৃদয়াবেগ এইরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, শিশুরাও আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছে, যাহা হউক এ ভাবকে দূর করিতেই হইতেছে। তাহার পর তিনি প্রকাশ্যে কুশলবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বৎসদ্বয়, শুনিয়াছি ভগবান্ বাল্মীকির সরস্বতীধারা সূর্য্যবংশের প্রশস্তি রামায়ণ কথায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কিছু শুনিতে কৌতূহল হইতেছে। সে কথায় কুশ বলিলেন—আমরা সমগ্র রামায়ণ কথাই পাঠ করিয়াছি। বালচরিত্রের শেষ অধ্যায়ের এই শ্লোক দুইটি স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। রামচন্দ্র তাহা উচ্চারণ করিতে বলিলে, কুশ বলিতে লাগিলেন "সীতা স্বভাবতঃই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন, তিনি কিন্তু নিজগুণনিচয়ে সেই প্রিয় ভাবটিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। রামও সেইরূপ সীতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ই পরস্পরের প্রীতিযোগটি বিশেষ রূপে জানিত।" শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "হায়! এ কথায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে দারুণ আঘাতই লাগিল, হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে, অকস্মাৎ দশা বিপর্য্যয়ে বিরস ও বিয়োগবহুল সংসার বৃত্তান্ত সন্তাপই প্রদান করিতেছে। নিরতিশয় বিশ্বাসপূর্ণ সে আনন্দ কোথায়? পরস্পরের সে যত্নই বা কোথায়? আর সেই প্রগাঢ় কৌতুকরস কোথায়? সুখে দুঃখে হৃদয়ের সেই এক ভাবই বা কোথায়? তথাপি এই পাপপ্রাণ এখনও রহিয়াছে, ইহার অবসান ঘটিতেছে না। কি কষ্ট! প্রিয়ার গুণরাশি যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া যে সময়কে মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল, এবং যাহা স্মরণ করিতে হৃদয়ে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই সময়ের কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তখন মৃগাক্ষীর বক্ষঃস্থল ঈষৎ উন্নত হইয়া ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং যদিও যৌবন অনুরাগ ও মনোরথের সম্পর্কে মন্মথ প্রগাঢ়ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রগল্‌ভতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি দেহে সেরূপ অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই।"

কুশও আবার বলিতে লাগিলেন,—মন্দাকিনী ও চিত্রকূটের নিকট বনবিহার কালে রঘুপতি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সেই শিলাপট্ট-খানি তোমারই জন্য সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহার চারিদিকে বকুলবৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি

করিতেছে,” লজ্জা ঈষৎ হাস্য, স্নেহ ও খেদের সহিত রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন “শিশুজন বিশেষতঃ অরণ্যচারী মুগ্ধস্বভাবই হইয়া থাকে, হা দেবি, সেই সময়ের নিভৃত ক্রিয়া কলাপের সাক্ষী সে প্রদেশের কথা স্মরণ হয় কি? যাহার অলকগুচ্ছে আবৃত ললাট শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুর উদয়ে শীতল হইয়া উঠিত, মন্দ মন্দ মন্দাকিনী মারুতে চঞ্চল অলকগুচ্ছে যাহার ললাটচন্দ্রদ্যুতি আবৃত হইয়া পড়িত, কুঙ্কুমরাগবর্জ্জিত যাহার কপোলযুগল সমুজ্জলই দেখাইত, আবরণ শূন্য হইয়াও যাহার কর্ণপাশ সুন্দরই বোধ হইত, তোমার সেই মনোহর মুখখানি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রিয়জনের মূর্ত্তি যেন নির্ম্মিত ও সম্মুখে স্থাপিত হইয়া প্রবাসেও সান্ত্বনা দান করিয়া থাকে। কল্পনার নাশেই জগৎ জীর্ণারণ্য হইয়া উঠে। তাহার পর হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইয়া যায়।”

সেই সময়ে শিশুগণের কলহ শুনিয়া বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথমহিষীগণ, জনক এবং অরুন্ধতী সভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। শীঘ্র শীঘ্র আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও আশ্রমের দূরত্বের জন্য শ্রমকাতর এবং জরাজীর্ণ তাঁহাদের আগমনের বিলম্ব ঘটিতেছিল। দূর হইতে কেহ কেহ তাহা ব্যক্ত করায় তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—কি ভগবতী অরুন্ধতী, ভগবান বশিষ্ঠ, মাতৃগণ এবং রাজর্ষি জনক সকলেই এখানে আগমন করিতেছেন! ইঁহাদের নিকট কিরূপে তবে মুখ দেখাইব? তাহার পর কাতরভাবে জনকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “সম্বন্ধের স্পৃহণীয়তার জন্য বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ যাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, পুত্রকন্যার বিবাহ মঙ্গলস্বরূপ সেই উৎসবে তাত দশরথ ও তাত জনকের আনন্দমিলন দেখিয়াছিলাম। এই নৃশংস ব্যাপারের পর সেই পিতৃসম রাজর্ষির এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছি না। অথবা রামের পক্ষে দুষ্করই বা কি আছে?” এই সময়ে জনকের দৃষ্টিও রামচন্দ্রের উপর নিপতিত হইল। তিনি প্রভাবমাত্রাবশিষ্ট রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইতে না হইতে রাজ্ঞীগণও সংজ্ঞা হারাইলেন। অন্য সকলে তাহা বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হা তাত, হা মাতৃগণ, হা রাজর্ষি জনক, জনক ও রঘুদিগের সমগ্র গোত্রমঙ্গল সীতায় অকরুণ এই পাপাত্মার

প্রতি আপনাদের করুণা প্রকাশ বৃথা।” তাহার পর তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, কুশলবও তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

---

(৭)

পতিতপাবনী ভাগীরথীর পবিত্র তীরে আজ এক অভিনব মহোৎসব উপস্থিত। আদি কবি বাল্মীকি রামায়ণ কথা হইতে যে এক বিচিত্র নাটক রচনা করিয়া অপ্সরাদিগের দ্বারা অভিনয় করার জন্য ভরত মুনির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, অদ্য ভাগীরথীতটস্থ রঙ্গভূমিতে তাহাই অভিনীত হইবে। মহর্ষি রামলক্ষ্মণ প্রভৃতিকে তাহা দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় একটি সমাজ সন্নিবেশ করিতে বলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি সে ভার প্রদান করিলে লক্ষ্মণ তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই উপলক্ষে ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়সহ পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাকুল, দেব, অসুর, তির্য্যক ও উরগবর্গের নেতৃগণের সহিত সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসমূহকে স্বীয় তপঃ প্রভাবে একত্র সমবেত করিয়াছেন। লক্ষ্মণই মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য প্রাণিগণের যথাযোগ্য স্থানে উপবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে রামচন্দ্রও বাল্মীকির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজ্যাশ্রমে বাস করিলেও কষ্টকর মুনিব্রত আচরণ করিতেছিলেন, রঘুনাথকে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রঙ্গদর্শকগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন কি না? 'সকলেই উপবেশন করিয়াছেন' বলিয়া লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন। রামচন্দ্র কুশলবের জন্য চন্দ্রকেতুর ন্যায় সম্মানাস্পদ আসন প্রদান করিতে বলিলে লক্ষ্মণ কহিলেন—তাঁহাদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক স্নেহ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে রাজাসনেই উপবেশন করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে অন্যান্য সকলেও উপবেশন করিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ অভিনয় আরম্ভ করার জন্য বলিলেন।

তখন সূত্রধার উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "সত্যবাদী ভগবান্ বাল্মীকি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎকে আজ্ঞা করিতেছেন যে, আমরা আর্ষনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র করুণ ও অদ্ভুতরসে পূর্ণ যে সন্দর্ভ রচনা করিয়াছি, কার্য্যের গুরুত্বানুরোধে তোমরা তাহার প্রতি অবহিত হও।" সে কথায়

রামচন্দ্র বলিলেন—ইহাতে এই কথা বলা হইতেছে, যে মহর্ষিগণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবদ্‌গণের অমৃত সার রজোতীত প্রজ্ঞান্ অব্যাহত, সুতরাং তাঁহাদের কথায় সন্দেহ জন্মিতে পারে না। তাহার পর যবনিকা অন্তরালে শব্দ হইল, "হা আর্য্যপুত্র, হা কুমার লক্ষ্মণ একাকিনী মন্দ-ভাগিনী অরণ্যে অশরণা আসন্নপ্রসববেদনা জীবনে হতাশা আমাকে শ্বাপদ-কুলে গ্রাস করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এ হতভাগিনী ভাগীরথী বক্ষে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে," তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন—হায় কি কষ্ট! আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম ইহা তাহা অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর বলিয়াই বোধ হইতেছে। সূত্রধার আবার বলিতে লাগিল "বিশ্বম্ভরার আত্মজা সীতা দেবীকে রাজা মহাবনে পরিত্যাগ করায় তিনি প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।" এই বলিয়া প্রস্তাবনা শেষ করিয়া সূত্রধার চলিয়া-গেল, রামচন্দ্রের হৃদয় শোকে অধীর হইয়া পড়িল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—দেবি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নাটকাভিনয় বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তথাপি রামচন্দ্র ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, রামই তোমার এই দৈব দুর্ব্বিপাকের কারণ। লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করিলেন। 'বজ্রময় আমি প্রস্তুত হইয়াছি' বলিয়া রামচন্দ্র অভিনয় দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাহার পর এক একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া গঙ্গা ও পৃথিবীর বেশধারিণী দুইটি অভিনেত্রী সীতাবেশধারিণী আর একটি অভিনেত্রীকে ধারণ করিয়া রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—বৎস লক্ষ্মণ আমাকে ধর, কি এক অবিজ্ঞাত আকস্মিক অন্ধকারে যেন আমি প্রবেশ করি-তেছি। ওদিকে গঙ্গা ও পৃথিবী অভিনয় আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিল, "কল্যাণি বৈদেহি আশ্বস্তা হও, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, জলমধ্যে তুমি রঘুবংশধর দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছ।" সীতা তখন অভিনয় আরম্ভ করিয়া, "ভাগ্যক্রমে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছি, হা আর্য্যপুত্র" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন—আর্য্য! আর্য্য! আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, রঘুবংশের কল্যাণময় অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, অবিরল বিগলিত অশ্রুধারায়

প্রাবনে রামচন্দ্র তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ওদিকে রঙ্গস্থলে "আশ্বস্ত হও" বলিয়া পৃথিবী সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সংজ্ঞালাভের অভিনয় করিয়া সীতা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?" এবং গঙ্গাকে দেখাইয়া কহিল, "ইনিই বা কে ?" পৃথিবী বলিল "ইনি তোমার শ্বশুরকুলের দেবতা ভাগীরথী" সীতা তখন "ভগবতি, আপনাকে প্রণাম করি" বলিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলে "চারিত্রমহিমায় বর্দ্ধিত কল্যাণসম্পৎ লাভ কর," বলিয়া ভাগীরথী আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে কথা শুনিয়া 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন। ভাগীরথী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিল "ইনি তোমার জননী বিশ্বম্ভরা"। সীতা পৃথিবীকে বলিল "মাতঃ হায় আপনাকে এরূপ অবস্থায় আমাকে দেখিতে হইল"। "এস বৎসে, এস পুত্রি !" বলিয়া পৃথিবী সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হওয়ায় অভিনয় করিল। আনন্দ সহকারে লক্ষ্মণ তখন বলিতে লাগিলেন—সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী ও ভাগীরথী আর্য্যার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রও ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার অভিনয় দেখিতেছিলেন তিনিও বলিয়া উঠিলেন এ অতি করুণ দৃশ্য।

ভাগীরথী আবার বলিতে লাগিল, "বিশ্বম্ভরাও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, অপত্য স্নেহেরই জয় বলিতে হইবে। এই অপত্যস্নেহেই মোহগ্রন্থিরূপে সমস্ত চেতন প্রাণীর অন্তরে অবস্থিতি করে এবং ইহা এক দুশ্ছেদ্য সংসার তন্তু। বৎসে বৈদেহি দেবি ভূতধাত্রি আশ্বস্ত হও'। সংজ্ঞালাভের অভিনয় করিয়া পৃথিবী বলিয়া উঠিল "দেবি সীতাকে প্রসব করিয়া কিরূপেই বা আশ্বস্ত হই। একে রাক্ষসদিগের মধ্যে বাস, তাহার পর আবার পতিকর্ত্তৃক ত্যাগ এ সকল নিতান্তই দুঃসহ। "ভাগীরথী বলিতে লাগিল "কোন্ জন্তু ফলোন্মুখ দৈবের দ্বাররোধে সমর্থ হইয়া থাকে" ? পৃথিবী কহিল "ভাগীরথি, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, রামভদ্রের এরূপ আচরণ কি উপযুক্ত হইয়াছে ? বালক রামচন্দ্র শৈশবে যে পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, কৈ তাহার ত সম্মান রাখেন নাই। আমার ও রাজর্ষি জনকের গৌরবরক্ষা করিলেন কৈ ? আর অগ্নি ছায়ার ন্যায় অনুসরণ ও গর্ভস্থ সন্তানেরও কি সম্মান রাখিয়াছেন ?" সে সময় সীতা বলিল "হায় আর্য্যপুত্রের কথা স্মরণ

করিয়া দিলেন দেখিতেছি।” পৃথিবী তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল “কে তোমার আর্য্যপুত্র?” তখন সলজ্জভাবে অশ্রুমোচনের অভিনয়ের সহিত সীতা বলিল, “অথবা জননী যাহা বলেন।” তখন রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—মাতঃ পৃথ্বি! আমি এইরূপই হইয়াছি বটে। পৃথিবীর কথায় গঙ্গা বলিতে লাগিল “ভগবতী বসুন্ধরে প্রসন্ন হউন। আপনি এ সংসারের শরীরস্বরূপ তবে অবিজ্ঞাতের মত জামাতার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন কেন? জগতে ঘোর অযশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুদূর লঙ্কাদ্বীপে যে অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল, সকলের তাহাতে কিরূপে প্রত্যয় জন্মিবে? প্রজামণ্ডলীর মনোরঞ্জন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের কুলব্রত। সুতরাং এই ধর্ম্মসঙ্কটে বৎস রামভদ্র কি আর করিতে পারেন।” লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন—প্রাণিগণের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞানে দেবতাদিগের, বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর শক্তি অব্যাহত, সেই জন্য মা, তোমার উদ্দেশে এই অঞ্জলিবদ্ধ করিতেছি। রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন—মাতঃ ভগীরথের কুলে আপনি চিরদিনই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ভাগীরথীকে উত্তর প্রদান করিয়া পৃথিবী বলিল, “দেবি আমি নিত্যই আপনাদের প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছি, কিন্তু আপাত-দুঃসহ স্নেহাবেগে এইরূপই বলিতেছি। রামভদ্রের সীতার প্রতি স্নেহও আমি জানি। দৈববশে বৎস সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া শোকদগ্ধচিত্ত রামচন্দ্র স্বীয় লোকোত্তর ধৈর্য্য ও প্রজাপুঞ্জের পুণ্যফলেই আজিও জীবিত রহিয়াছেন;” শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন যে সন্তানের প্রতি গুরুজন করুণাপরবশই হইয়া থাকেন।

সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন করার অভিনয় করিতে করিতে পৃথিবীকে বলিতে লাগিল “মা, আমাকে নিজ অঙ্গে লয় করিয়া দিন।” সে কথায় রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—ইহা অপেক্ষা আর কি বলিতে পারেন। ভাগীরথী সে কথায় কিন্তু বলিল, “ঈশ্বর না করুন অবিলীন হইয়া তুমি সহস্র বৎসর জীবন ধারণ কর।” পৃথিবীও বলিল—বৎসে তোমার এই সন্তান দুইটিকে ত পালন করিতে হইবে। তখন সীতা বলিতে লাগিল “আমি অনাথা উহাদিগের লইয়া কি করিব।” রামচন্দ্র আবার বলিলেন—হৃদয় তুমি ত বজ্রময়ই হইয়া আছ। সীতার কথায় ভাগীরথী উত্তর দিল “তুমি সনাথা হইয়াও কিরূপে অনাথা হইলে? সীতা বলিল—এই হতভাগিনীর সনাথত্ব কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না,” তাহা

শুনিয়া গঙ্গা ও পৃথিবী বলিয়া উঠিল—জগতের মঙ্গলস্বরূপিণী তুমি আপনাকে অবজ্ঞাত করিতেছ কেন? তোমার সংসর্গে আমাদেরও পবিত্রতা প্রকর্ষলাভ করিয়াছে। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সে কথা লক্ষ্য করিতে বলিলে 'লোকে শুনুক' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। সেই সময়ে নেপথ্যে এক কলকল শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—বোধ হয় আরও কিছু অদ্ভুততর ব্যাপার ঘটিতেছে। সীতা গঙ্গা ও পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিল "সমস্ত অন্তরীক্ষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল কেন?" তাহারা উত্তর দিল "বুঝিয়াছি কৃশাশ্ব হইতে বিশ্বামিত্র এবং তাহার নিকট হইতে রামচন্দ্র যে অস্ত্রসকল গুরুপরম্পরা ক্রমে লাভ করিয়াছিলেন,জৃম্ভকাস্ত্রের সহিত তাহারাও আবির্ভূত হইয়াছে।" আবার নেপথ্যে শব্দ হইল, "দেবি সীতে, আপনাকে নমস্কার আপনার পুত্রদ্বয় এক্ষণে আমাদের আশ্রয়স্থল ; কারণ দেব রঘুনন্দন আলেখ্যদর্শন সময়ে এইরূপই বলিয়াছিলেন।" তখন সীতা বলিয়া উঠিল "হায় কি সৌভাগ্য! অস্ত্র দেবতারা আবির্ভূত হইতেছেন। লক্ষ্মণ বলিতেছিলেন—আর্য্যইত বলিয়াছিলেন এই অস্ত্রগুলি এক্ষণে তোমার সন্তানকে আশ্রয় করিবে. রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন "হে পরমাস্ত্র দেবতাগণ নমস্কার, আপনাদিগকে লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম, অনুধ্যান মাত্রে এক্ষণে বৎসদ্বয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন, আপনাদের কল্যাণ হউক।" তিনি আবার বলিলেন—বিস্ময় ও আনন্দের সমাবেশে আমার চঞ্চল শোকতরঙ্গ আন্দোলিত হইয়া যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় দশা ঘটাইতেছে।

গঙ্গা ও পৃথিবী সীতাকে কহিল "বৎসে আনন্দ প্রকাশ কর, তোমার পুত্রদ্বয় এক্ষণে রামভদ্রের তুল্য হইয়া উঠিল।" সীতা উত্তর করিল "ভগবতীদ্বয় তাহা হইলে কে ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার সাধন করিলেন"! তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "বশিষ্ঠরক্ষিত রঘুবংশের বংশবর্দ্ধিনী হইয়া সীতাদেবী পুত্রদ্বয়ের সংস্কার কর্ত্তার সন্ধান করিতে পারিতেছেন না ইহা অতীব কষ্টকর"। সীতার কথায় গঙ্গা পৃথিবী বলিল—বৎসে,তুমি ও বিষয়ের জন্য বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন? স্তন্যত্যাগের পর উহাদিগকে বাল্মীকির হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিব, তিনিই ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসাধন করিবেন; রঘুবংশীয়দিগের বশিষ্ঠের এবং জনকবংশীয়দিগের শতানন্দের ন্যায় বাল্মীকি উভয় পক্ষেরই গুরু।" সে কথায় রামচন্দ্র কহিলেন—ভগবতীরা সুবিবেচনাই করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে

বলিতে লাগিলেন—'আর্য্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি এই সকল কারণেই কুশলবকে আপনার পুত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এই বীর শিশু দুইটী আজন্ম সিদ্ধান্ত্র এবং ভগবান বাল্মীকির নিকট হইতেই সংস্কার লাভ করিয়াছে, তদ্ভিন্ন ইহাদের বয়সও দ্বাদশ বৎসর"। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন —আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আমি যেন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাহার পর পৃথিবী সীতাকে কহিল "এস বৎসে রসাতল পবিত্র করিবে চল," শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন—প্রিয়তমা তবে কি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন! পৃথিবীর কথায় সীতা উত্তর করিল—"মা আপনার অঙ্গে আমায় লয় করিয়া লন,আমি লোকান্তর পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিব না।" রামচন্দ্র তখন বলিতেছিলেন—না জানি ইহার কি উত্তর আছে; পৃথিবী বলিল—"স্তন্য-ত্যাগ পর্য্যন্ত তোমার পুত্রদ্বয়কে আমার আদেশে পালন কর। তাহার পর তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও", ভাগীরথীও কহিল—তাহাই উচিত বটে" তাহার পর গঙ্গা পৃথিবী ও সীতাবেশধারিণী অভিনেত্রীত্রয় নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—তবে কি বৈদেহীর বিলয়ই সম্পন্ন হইল? হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, চরিত্রদেবতে! তুমি লোকান্তরে গমন করিয়াছ? এই বলিয়া রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন "ভগবন্ বাল্মীকি রক্ষা করুন এই কি আপনার কাব্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য"। তখন দূর হইতে শব্দ হইল "মর্ত্ত্যামর্ত্ত্য স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সকলে বাল্মীকির আদিষ্ট পবিত্র অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন কর।" সহসা যেন মন্থন দণ্ডে আবর্ত্তিত হওয়ার ন্যায় ভাগীরথীর জলপ্রবাহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। দেবতা ও ঋষিগণে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার পর ভগবতী ভাগীরথী ও বসুন্ধরার সহিত সীতাদেবী জলরাশি হইতে সমুত্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ সকলকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। গঙ্গা ও পৃথিবী বলিতে লাগিলেন' 'জগদ্বন্দ্যে অরুন্ধতি, আমাদিগকে ভজনা করুন। পুণ্যপ্রভা বধূ সীতাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিলাম"। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিতে বলিয়া, দেখিলেন যে, তখনও পর্য্যন্ত তিনি চৈতন্যলাভ করেন নাই। দেখিতে দেখিতে অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "বৎসে বৈদেহি তুমি শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হও ও লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া

তোমার পাণির প্রিয়স্পর্শে বৎসকে সঞ্জীবিত করিয়া তুল” সীতা তখন সসম্ভ্রমে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন ও কহিলেন—আর্য্য-পুত্র আশ্বস্ত হউন। সেই সময়ে তাঁহাদের সকল গুরুজনও তথায় আগমন করিলেন। ভাগীরথী এবং পৃথিবীও উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়া আনন্দ সহকারে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন “একি!” তাহাব পর সীতাকে দেখিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া কহিলেন ‘কি দেবি! আবার গুরুজনদিগকে দেখিয়া সলজ্জ ও সস্মিতভাবে বলিতে লাগিলেন—“এ যে দেখিতেছি মাতা অরুন্ধতী এবং ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার সহিত সকল গুরুজনই উপস্থিত”। অরুন্ধতী ভাগীরথীকে দেখাইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন—বৎস ইনিই সেই ভগীরথকুলদেবতা সুপ্রসন্না গঙ্গাদেবী। গঙ্গা তখন বলিলেন—জগৎপতি রামভদ্র আলেখ্য দর্শনকালে আমাকে বলিয়াছিলেন ‘মাতঃ আপনি দেবী অরু-ন্ধতীর ন্যায় পুত্রবধূ সীতার কল্যাণ চিন্তায় রতা হউন।’ এক্ষণে তাহা স্মরণ করুন, আপনার সে বাক্য :সম্বন্ধে আমি ঋণমুক্ত হইলাম। অরুন্ধতী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিলেন—ইনি তোমার শ্বশ্রূ ভগবতী বসুন্ধরা। তখন পৃথিবী :বলিতে লাগিলেন—সীতার নির্ব্বাসনের সময় বৎস বলিয়াছিলে ভগবতি বসুন্ধরে শ্লাঘ্যচরিত্রাদুহিতা জানকীকে অবেক্ষণ করিবেন। প্রভু ও বৎসের সে আজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি। গঙ্গাও পৃথিবীর কথায় রামচন্দ্র কহিলেন—আমি মহাপরাধ করিলেও ভগবতীদ্বয় আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই করিয়া-ছেন। তাহার পর দেবী অরুন্ধতী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ওহে পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ, ভগবতী জাহ্নবী ও বসুন্ধরা যাঁহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, পূর্ব্বেও ভগবান বৈশ্বানর যাহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ যাঁহার স্তুতিবাদ করিতে-ছেন, সেই সূর্য্যকুলবধূ দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবীকে পরিগ্রহ করা হইতেছে। এ বিষয়ে তোমরা কি বিবেচনা করিতেছ?” তখন অরুন্ধতীকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রজাগণ ও সমস্ত প্রাণীসমূহ সীতাদেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল, লোক পাল ও সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবর্ষণে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ তাহা সকলকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন। অরুন্ধতী আবার রামচন্দ্রকে সম্বোধন:করিয়া কহিলেন, “জগৎপতি রামচন্দ্র হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির পুণ্যপ্রকৃতি প্রিয়তমা সীতা

দেবীকে এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞে ধর্ম্মানুসারে সহধর্ম্মচারিণী নিযুক্তা কর।" সে কথায় সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আর্য্যপুত্র সীতার দুঃখ দূর করিতে বিশেষরূপেই জানেন। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন "ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য" লক্ষ্মণও কহিলেন "কৃতার্থ হইলাম" সীতাও বলিয়া উঠিলেন "আ বাঁচলাম" লক্ষ্মণ তখন সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন "আর্য্যে নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করিতেছে"। সীতাও তাহার উত্তরে বলিলেন "বৎস এইরূপ আচরণ করিয়াই দীর্ঘজীবী হইয়া থাক।

অবশেষে অরুন্ধতী মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ভগবন্ বাল্মীকি সীতাগর্ভসম্ভূত রামভদ্রের পুত্র কুশলবকে আনয়ন করুন। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুশলবকে লইয়া বাল্মীকি তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাহাদের গুরুজনদিগের সহিত পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বৎস কুশলব এই রঘুপতি তোমাদের পিতা, এই লক্ষ্মণ তোমাদের কনিষ্ঠ তাত, সীতাদেবী তোমাদের জননী, আর এই রাজর্ষি জনক মাতামহ। হর্ষ শোক ও বিস্ময়ের সহিত জনকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন—কি! পিতা! কুশ-লবও বলিতে লাগিলেন—হা তাতঃ! হা মাতঃ! হা মাতামহ! রামচন্দ্র তখন কুমারদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন —বহুপুণ্য ফলে তোমাদিগকে লাভ করিলাম। সীতাও বলিলেন – বৎস কুশ এস, বৎস লব এস লোকান্তর হইতে আগত তোমাদের জননীকে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া আলিঙ্গন কর। কুমারদ্বয় তখন সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমরা ধন্য হইলাম। সীতা মহর্ষি বাল্মীকিকে প্রণাম করিলে, "বৎসে চিরদিনই এইরূপই হইয়া থাক" বলিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর সীতা বলিতে লাগিলেন "ওমা পিতা, কুলগুরু, শ্বশ্রূজন, পতি সহিত আর্য্যা শান্তাদেবী, লক্ষ্মণ ও সুপ্রসন্ন আর্য্যপুত্রের চরণ এবং কুশ ও লব সকলকেই যুগপৎ দেখিতেছি। তাই যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছি"। সেই সময়ে কিছু দূরে কল কল শব্দ উত্থিত হইল, বাল্মীকি উত্থান করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে লবণহন্তা মথুরেশ্বর আগমন করিতেছেন। শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন —কল্যাণই কল্যাণের অনুসরণ করিয়া থাকে। তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন "এই সমস্ত অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু প্রত্যয় করিতে পারিতেছি না। অথবা

অভ্যুদয়ের প্রকৃতিই এইরূপ"। তাহার পর বাল্মীকি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—রামভদ্র তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব বল, রামচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিলেন, ইহার পর কি আরও প্রিয়কার্য্য আছে? তথাপি এইরূপই হউক, গঙ্গা ও জননীর ন্যায় জগতের কল্যাণকরী মনোহরা এই রামায়ণী কথা পাপ বিনাশ করিয়া পবিত্রতা সম্পাদন ও মঙ্গল বর্দ্ধন করুক। আর অভিনয়ে বিশ্বস্তরূপা শব্দব্রহ্মবিদ্ পরিণতপ্রজ্ঞ কবির এই বাণী পণ্ডিতগণ পর্য্যালোচনা করিতে থাকুন।" অবশেষে সকলে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

Plato is my friend, but Truth is more my friend.

ভর্ত্তার উত্তর।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

২৭ নং মাখন বড়ালের গলি, কলিকাতা।

পরম কল্যাণীয়াসু—

গত শ্রাবণমাসে 'সবুজ পত্রে' লিখিত তোমার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। জানইত আমার আফিসের কাজের ভিড় আর চিঠি লেখাটাও বড় আসে না। একটু একটু করিয়া অনেক দিনে লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আমাদের কেরাণীর কলম, সব কথা গুছাইয়া লিখিতে পারি নাই। তোমার কবিতা লেখা অভ্যাস, তোমার মত set hand কোথায় পাইব? আশা করি, এ ক্ষেত্রেও 'অক্ষম'কে নিজগুণে 'ক্ষমা' করিবে।

আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, ফারখত দিয়াছ, হয়ত হিন্দুর ঘরে ডাইভোর্সের প্রচলন থাকিলে পরামর্শের জন্য কৌঁসুলীর বাড়ীও ছুটিতে, তথাপি দেখিতেছি 'শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ লিখিয়াছ! বোধ হয় এটা 'ভ্রমরের' নজিরে—'স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য'। আমিও সেকেলে ধরণে 'পরম কল্যাণীয়াসু' পাঠ লিখিলাম, কেননা তুমি যাহাই ভাব, আমি এখনও তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। আশা করি, ইহাতে তোমার হাসি পাইবে না।

যখন কাছে ছিলে, তখনও কোন দিন বাড়াবাড়ি করিয়া 'প্রিয়তমে','প্রাণাধিকে', 'প্রেয়সি', 'হৃদয়েশ্বরি', প্রভৃতি গালভরা সম্বোধন গুলি করি নাই, এখনত করিবার পথই রাখ নাই। এখন আর তুমি পিঞ্জরের পক্ষিণী নও, মুক্ত আকাশে উধাও হইয়া উড়িতে শিখিয়াছ, রবির তীব্র আলোকে উৎফুল্ল হইয়াছ, এখন কি আর দুটা আদরের, উচ্ছ্বাসের ডাকে তোমায় খাঁচায় ফিরাইয়া আনিতে পারিব? না, শীষ দিয়া, 'নাচ শ্যামা তালে তালে' বলিয়া আমার জীবন-সঙ্গীতের তালে তালে তোমাকে নাচাইতে পারিব? এখন উলটাইয়া তুমিই 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে', ইত্যাদি দোরোখা গান ধরিবে। পত্রের শীর্ষে 'স্বামী' বলিয়া পরিচয় দিতেও ভরসা হইল না; তুমি ফট্ করিয়া বলিয়া বসিবে 'আমি কি ঘড়াবটি তৈজস পত্রের সামিল যে আমার মালিক বলিয়া দাবী করিতেছ?' যাহা হউক, যখন তোমাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়া পাকস্পর্শের দিন থালা-ভরা অন্নব্যঞ্জন, কস্তাপেড়ে শাড়ী ও এক থান সিন্দুর দিয়া তোমার সকল ভার লইয়াছিলাম, তখন 'ভর্ত্তা' বলাইবার দাবী রাখি। আশা করি, তোমার নব্য রুচিতে কথাটি অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পত্রে অনেক কাটাকাটা বোল শুনাইয়াছ, ডিক্রী ডিস্‌মিসের মুন্‌সফ বাবুর মত অনেক ইসু ধার্য্য করিয়াছ। আমাদের 'ধর্ম্মের সংসারের' অনেক খুঁত কাড়িয়াছ। নারীর সঙ্গে, বিশেষতঃ আপনার নারীর সঙ্গে, পাঁচালীর লড়াই করা দাশুরায়ের আমলে চলিলেও এ রবীন্দ্রীয় যুগে ত চলিবেনা। এখন নাকি সাহিত্যে রুচি বদ্‌লাইয়াছে। তবু তোমাদের মত ব্যাপিকাকে দু'কথা শুনাইয়া না দিলে মাথায় চড়িয়া বস, তাই তোমার কথা গুলির জবাব দিতেছি। ভাবিয়াছিলাম কিছু বলিব না, 'নীরবে সহ্য করিব', কিন্তু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কলম ধরিলাম।

একটা বড় হাসির কথা। 'শ্রীচরণকমলেষু' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছ, 'চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্না' বলিয়া শেষ করিয়াছ। অসঙ্গতিটা চোখে পড়ে নাই? তুমি না 'বিদ্বানী'?

তুমি এই পনর বৎসরে আমাকে একখানি চিঠি লিখিবার মত ফাঁকটুকু পাও নাই বলিয়া আপশোষ করিয়াছ। পতিপত্নীর অবিচ্ছেদে একত্র বাস উভয় পক্ষের পরম সৌভাগ্য এই কথাই জানিতাম। কিন্তু তুমি দেখিতেছি

সেরূপ মনে কর নাই। তোমরা কবি মানুষ, বোধ হয় এরূপ একত্র বাসে বিরহের মাহাত্ম্য অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না বলিয়াই তোমার ইহাতে আপত্তি। তা চিঠি লেখার এতই যদি সাধ ছিল, তবে ২৭ নং মাখন বড়ালের গলিতে বসিয়াও ত সে সাধ মিটাইতে পারিতে। তোমার মত ভাবপ্রবণার যখন পলকে প্রলয় হয়, তখন এ ঘর হইতে ও ঘরে, অন্দর হইতে সদরে, রোজ ভালবাসা জানাইবার বন্দোবস্ত করিলেই চলিত। অথবা আমার এক বন্ধুপত্নী যেমন পতির সঙ্গে এক গৃহে বাস করিয়াও রোজ ডাকে একখানি করিয়া প্রেমলিপি (অবশ্য পতিকে) পাঠাইতেন, তুমিও তাহাই করিলে না কেন? তবে আমরা নিতান্ত গদ্যময়, আমরা এই বুঝি যে আজকালকার বালিকামহলে 'কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারণং' একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইলেও, লেখাপড়া শিখিয়া ঘড়ি ঘড়ি প্রাণনাথকে প্রেমপত্র পাঠানই নারীজীবনের চরম সার্থকতা নহে। 'শুধু পিয়নের পথে, চেয়ে থাকি কোন মতে, বহিয়া না যেতে চাহে দিন',—মনের এরূপ অবস্থা কোন মতেই সুস্থ বা স্বাভাবিক বলা যায় না।

আমি কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র (তোমার মতে কারাগার) ছাড়িয়া কোথাও তোমাকে লইয়া বাহির হই নাই বলিয়া চিঠির আরম্ভেই আমাকে যেন একটু খোঁটা দিয়াছ। সুখে দুঃখে পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে ইহাই আমাদের সংসারের নিয়ম। টবের ফুলের মত একা একা ফুটিয়া 'আঁধার শাখা উজল' করিলে চলিবে না, স্রোতের ফুলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া কাহার কোশায় উঠিব বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও চলিবে না। সুতরাং সাহেবলোকেদের মত শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্ব্বস্বে মিলিয়া 'মধুচাঁদ' করিতে যাওয়া আমাদের পোষায় না। বুড়া মাবাপকে ঘরে রাখিয়া, গৃহের অন্যান্য পরিজনকে ছাটিয়া ফেলিয়া, একটু ফাঁক পাইলেই ছুটিতে মিলিয়া সিমলাশৈলে বা দার্জ্জিলিংএ, নিতান্ত পক্ষে মধুপুরে বা শিমূলতলায় কাটাইব, এই আত্মসুখসর্ব্বস্বতা শিখিতে পারি নাই; তাই তোমার সখ মিটাইতে পারি নাই। যাইতে হইলে যে বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই যাইতে হয়, সে ঢের টাকার মামলা।

তুমি খুব জোর কলমে লিখিয়াছ, আর তুমি আমাদের 'মেজ বৌ' নও। আপন মুখে যে কবুল জবাব দিলে সেও মন্দের ভাল। সত্য সত্য আর কোন্

মুখে 'মেজ বৌ' নামে পরিচয় দিবে? 'মেজ বৌ' নাম ডুবাইয়াছ যে! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ' দুর্জ্জয় বৌকাঁটকী শাশুড়ী ও ঘর ভাঙ্গানী বড় যা লইয়া ঘর করিয়া গৃহস্থ বধূর আদর্শ রাখিয়া গেল, আর তুমি ব'নয়াদি ঘরের বৌ হইয়া একেবারে নাটার ফলের মত ছিট্‌কাইয়া গেলে! ছিঃ, এই তোমার আক্কেল?

দেখ, তুমি যে এম্‌নি একটা কাণ্ড বাধাইবে তা' আমি আগেই কতকটা আঁচিয়াছিলাম। যখন আষাঢ়ে 'সবুজ পত্রে' তোমার বোষ্টমী দিদির পরিচয় পাইয়াছিলাম—(হরিদাসী বৈষ্ণবীর কথা বলিতেছিনা, 'আন্দী বোষ্টমী'র কথা বলিতেছি)—তখনই বুঝিয়াছিলাম তোমরা এই এক নূতন ধূয়া ধরিলে—সংসারের সঙ্গে আপোষ করিয়া আর থাকিবে না; আবার সে দিন দেখিলাম 'শেষের রাত্রিতে' বালিকাবধূ মণিও ঐ বুলি কপ্‌চাইতে সুরু করিয়াছে। নব-নারীর (New Woman) ঢংই এই। তোমাদের কয় বোনেরই দেখিতেছি এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান। কেবল তোমার বৈমাত্রেয় ভগিনী দুইটি—'নৌকাডুবি'র কমলা ও 'চোখের বালি'র আশালতা তোমাদের ধারা পায় নাই। তবে তুমি হয়ত নিজেদের সাফাইএর জন্য বলিবে, আশা ও কমলা ত তখনও পর্য্যন্ত 'দিল্লীকা লাড্ডু' স্বামীর আস্বাদ ভাল করিয়া পায় নাই, তাই তাদের স্বামীর প্রতি অত টান ছিল। পনর বছর ধরিয়া স্বামীর সঙ্গে ঘর সংসার করিলে তাহাদেরও আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব হইত। হাঁ মেজ বৌ (ঐ দেখ, আগের অভ্যাস মত মুখ ফসকাইয়া 'মেজ বৌ' বলিয়া ফেলিয়াছি), এই জন্যই বুঝি নভেল নাটক বিবাহেই শেষ হয়? 'পশমের কাজের উল্টা পিঠটা' আর দেখান হয় না?

তুমি গোপনে গোপনে কবিতা লিখিতে ভালবাসিতে। কিন্তু রামপ্রসাদ যেমন বলিয়াছিলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি,' আমারও তেমনই বলিতে ইচ্ছা করে, কবিতা লিখিয়া মধুর হওয়ার চেয়ে সুখদুঃখময় সংসারের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাই বড়। তুমি তাহা পারিয়াছ কি? আশ্চর্য্য দেখিলাম, তুমি গোমেষকে ভালবাসিয়াছ বলিয়া নিজের কবিসুলভ কোমল হৃদয়ের বড়াই করিয়াছ, কিন্তু যে সংসারে একাদিক্রমে পনর বৎসর বাস করিলে, সে সংসারে কাহাকেও আপনার করিতে পার নাই।

তোমার মেয়েটি শৈশবেই মারা গেল বলিয়া আঁতুড়ঘরের দোষ দিয়াছ। কিন্তু মিছামিছি আঁতুড়ঘরের নিন্দা কেন? আঁতুড়ঘরে ত তুমিও হইয়াছিলে, তুমি ত মর নাই। (এক একবার মনে হয় মরিলেই যেন ভাল ছিল।) আসল কথা কি জান? তোমার বোষ্টমীদিদির মত তোমারও মাতৃহৃদয় প্রস্তুত হয় নাই, তাই তোমার মেয়েটি ও বোষ্টমীদিদির ছেলেটি মারা গেল। ভাবপ্রবণতার বশে কবিতা লেখা অভ্যাস আছে বলিয়া, সন্তান হারাইয়া সন্তানের মায়ার কথা বেশ মিঠে সুরে বলিয়াছ বটে (বোষ্টমীদিদিও অনাদরে সন্তানটি হারাইয়া পরে অমন অনেক কথা বকিয়াছেন)—কিন্তু প্রকৃত মাতৃভাব তোমাতে বিকাশ পায় নাই—তাই ভগবান্ তোমাকে এমন দাগা দিয়াছেন। তথাপি কি তোমার চৈতন্য হইয়াছে? কৈ, তুমি ত বাঙ্গালীর ঘরের নিঃসন্তানা বালবিধবা পিসিমার মত পরের ছেলেকে আপন করিতে জাননা, বন্ধ্যা সৎমা লবঙ্গলতার মত, 'হালদার গোষ্ঠী'র বড় বৌএর মত পেটে সন্তান না ধরিয়াও মা হইতে শেখ নাই। যাহা হউক, জননীর মাহাত্ম্য যে কিছু কিছু বুঝিয়াছ, সেও ভাল। নবনারী হইয়াও যে মনুর 'প্রজনার্থং মহাভাগা' বচনকে অশ্লীল ভাবিয়া নাসিকা কুঞ্চন কর নাই, এই যথেষ্ট।

স্ত্রীলোকের মরণ নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ এবং সেই ছুতায় পুরুষ জাতিকে দু' কথা শুনাইয়া দিয়াছ। কিন্তু হিন্দুর ঘরের স্ত্রীলোক অধিক দিন বাঁচে কেন, তাহা কখনও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিয়াছ কি? তাহাদের সংযম এবং শুদ্ধাচারই তাহাদিগের দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্যের নিদান। জননীর জাতি না বাঁচিলে যে মহামায়ার সংসার অচল হইত। তবে এখন যে নূতন হাওয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এটুকু রক্ষা পাইবে কিনা আশঙ্কার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুমি চিঠির অনেক স্থলে আপনার বুদ্ধির ও রূপের গরব করিয়াছ। তুমি যাহাকে বুদ্ধি বল, তাহা বুদ্ধি নহে—একগুঁয়েমি, তাহারই চরমফল তোমার গৃহত্যাগ। এই একগুঁয়েমি দেখিয়াই তোমার মাতাঠাকুরাণী তোমার ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদাই 'বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন'। ইহারই অপর নাম অসংযম। নিজের দোষকে গুণ মনে করিয়া লইয়া অনবরত তাহার তোয়াজ করিলে সে দোষের কখন সংশোধন হয় না। যাক্, সে কথায় কাজ নাই। আমরা তোমার রূপ

দেখিয়া বাছাই করিয়া তোমাকে ঘরের বধূ করিয়াছি অথচ সেই রূপের পদে পদে অনাদর করিয়াছি, এই লইয়া তুমি খুব একচোট ঝাল ঝাড়িয়াছ। রূপবতী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করা আমাদের শাস্ত্রের আদেশ, কিন্তু সেই সুরূপাকে কাচের আলমারীতে সাজাইয়া না রাখিলেই ও ফুলতুলসী দিয়া পূজা না করিলেই যে তাহাকে হতশ্রদ্ধ করা হয়, এমন নহে। পটের বিবির স্থান আমাদের সংসারে নাই। 'রূপ ত মোহেরই জন্য'—এ দার্শনিক তত্ত্ব নব্যতন্ত্রের নভেল লেখক প্রকটিত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা হিন্দুর কথা নহে। হিন্দুনারী জানে —"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ; যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী"। ইহার অতিরিক্ত সে আর রূপের মূল্য জানে না। হিন্দুর গৃহে রূপের বাতি আর্কল্যাম্পের মত জ্বলিয়া পথের লোককে ধাঁধাইয়া দেয় না, লক্ষ লক্ষ অবোধ পতঙ্গকে সেই রূপের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রলুব্ধ করে না। হিন্দুনারী বুঝে—রূপ ধূপ, ইহা সংসারের কর্ম্মের আগুনে পুড়িয়া দেবতার উদ্দেশে আত্মদান করিবে। ইহা হোমকুণ্ড, অগ্নিকাণ্ড নহে—ইহা গৃহস্থের যজ্ঞের অঙ্গ, গৃহদাহের উপাদান নহে। পল্লীগৃহে মৃণ্ময় আঙ্গনায় গোময়লেপনতৎপরা বধূটীর হস্তের ছড়াহাঁড়ীর কাদা প্রকৃতই 'গঙ্গামৃত্তিকা' ইহাই তাহার সীঁথার সিন্দুরকে উজ্জ্বল করে, ইহাই তাহার 'মনোমোহিনী টীপ'।

কিন্তু এ সকল কথা তোমাদের মত নব্যা সভ্যা ভব্যারা মানিতে চাহেন না। বাহ্য চাকচিক্য বিলাস বিভ্রমেই তোমাদের প্রাণের টান দেখা যায়। এইরূপ মতি গতি হওয়াতেই তুমি 'নর্দ্দমার ধারে গাবের গাছের নতুন পাতাগুলির রাঙা টক্‌টকে' রং দেখিয়া ভুলিয়াছ। কিন্তু ইহাও ত জান, 'বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অঙ্কুর বার করে, শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁট কাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়'। আমাদেরও ঠিক সেই দশা হইতেছে। বিলাতী পশ্চিম সভ্যতা-নর্দ্দমায় যে সব আগাছার জন্ম, পশ্চিমে বাতাসের ঝাপটায় তাহারই বীজ উড়াইয়া আনিয়া আমাদের দেওয়ালে ফেলিতেছে, আর তাহাই আমাদের সমাজের পাকা ইমারতের সন্ধিতে সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

বিন্দুর কথাটা ফেনাইয়া লিখিয়া চিঠিখানি ভরাইয়াছ। বিন্দুকে আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় না দেওয়াতে আমাদের যেটুকু দোষ হইয়াছে, শুধু সেটুকু বলিয়া

ক্ষান্ত না হইয়া মেয়েমহলে ও চাকরাণীমহলে তাহার সম্বন্ধে যে সব আজগবী কথা রচিত হইয়াছিল সেগুলি শুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছ। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম,নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান গৃহীর কর্ত্তব্য এবং এ কর্ত্তব্যে আমাদের ত্রুটি হইয়াছে—কিন্তু বিন্দুর দুঃখকষ্টের জন্য অপরাধী আমরা বেশী না বিন্দুর খুড়তুত ভাইএরা বেশী? গালি পাড়িতে হয়, তাহাদিগকে গালি পাড়, কেননা আমাদের সমাজে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দূরসম্পর্কের আত্মীয়—আত্মীয়ার ভরণ-পোষণের ভরসা—একান্নবর্ত্তিপরিবার। জ্ঞাতিই জ্ঞাতিকে আশ্রয় দিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। পত্নীর ভ্রাতা বা ভগিনী আসিয়া ভগিনীপতির গৃহে দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন, এটি হালের আইন। কুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লওয়া আমাদের সামাজিক প্রথায় নিন্দনীয়, এমন কি স্ত্রীলোকের কুটুম্বগৃহে নিমন্ত্রণে আসা পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে পল্লীগ্রামের সমাজে বারণ, কেননা কুটুম্বের গৃহে গেলে মান থাকে না। এই বুঝিয়াই বড় বধূঠাকুরাণী বিন্দুর জন্য সঙ্কোচ বোধ করিতেন, সর্ব্বদা অপ্রতিভ অপ্রতিভ থাকিতেন। ইহাতেই তুমি তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ঠাওরাইয়াছিলে!

বিন্দুর মৃত্যুতে বড় বৌ ঠাকুরাণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, সেটাও তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা বা হৃদয়হীনতার প্রমাণ নহে। আজকাল যেরূপ নভেলী কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহাতে প্লট আর একটু জমিলে শেষে কোন্ দিন 'বিষবৃক্ষ' বা 'চোখের বালি'র পুনরভিনয় হইয়া পড়িত, অথবা তোমার ভ্রাতার সঙ্গে বিন্দুর একত্র গৃহত্যাগে 'বিচারক' গল্পের পুনর্ব্বিচারের যোগাড় হইত কিনা কে জানে? আমাদের 'ধর্ম্মের সংসারে' সেটা সত্য সত্যই সহিত না। বাস্তবিক গুরুকৃপায় বিন্দু মরিয়া বাঁচিল, ওরূপ জঘন্য পরিণাম হইতে পরিত্রাণ পাইল।

লক্ষহীরার মামুলী গল্প লইয়া পুরুষ জাতিকে টিটকারী দিয়াছ। কিন্তু এটুকু ভাবিয়া দেখ নাই, এই সকল আখ্যান অর্থবাদ—প্রকৃত ইতিহাস নহে। স্ত্রীজাতিকে পতিভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আখ্যানকার একটু মাত্রা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা হইতে 'ইতিহাসের ধারা' উদ্ধার করিবার চেষ্টা বাতুলতা। কুষ্ঠরোগীকে সমাজ দূরে পরিহার করিল, কিন্তু কুৎসিত ব্যাধির ভয় তুচ্ছ করিয়া পত্নী সেই স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। বিলাতী কবি টেনিসন এই যে চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহাও কি তোমার মতে স্বাধীনতা-হীনতার পরিচয়?

ইংরাজীর নজীর দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না; তুমিও অবশ্য তোমার ছোট বোন 'হৈমন্তী'র মত ইংরাজীওয়ালী। তোমার বাক্যিতে যেরূপ ঝাঁজ, ইহাতে বেশ বুঝি যে তুমি অনেক খানি ইংরাজী বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছ; স্বদেশী সিদ্ধিতে এত বুক জ্বলে না, এ নিশ্চয় বিলাতী সরাপ।

বিন্দুর স্বামী পাগল, অতএব বিন্দু এমন স্বামী ত্যাগ করিলে খুব একটা সৎসাহসের কাজ করিত, এরূপ আভাসও দিয়াছ। কিন্তু তাহার স্বামীর উন্মাদরোগ কি প্রকৃতই খুব উৎকট ছিল? বিন্দুর এজাহারে ত একথা প্রমাণ হয় না। আর রোগটাও ত শিবের অসাধ্য ব্যাধি নহে, চিকিৎসা-শুশ্রূষায় যে সারিত না কে বলিল? যাহা হউক, যে দেশে পাগলা মহেশের গৃহিণী গৌরী আদর্শ পত্নী, সে দেশে ত বিন্দুর ব্যবহারের কেহ গুণগান করিবে না। একবার টেনিসনের Romney's Remorse কবিতায় উন্মাদগ্রস্ত স্বামীর লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা অথচ সেবাতৎপরা পতিব্রতা পত্নীর চিত্র দেখ। 'Look here, upon this picture, and on this'! সে ত সাহেবের তুলির লিখন—গুরুবাক্য। তবে তিনি কিপ্লিংএর মত নোবেল প্রাইজ পান নাই বলিয়া যদি তাঁহাকে আমলে না আন!

বিন্দুর আত্মহত্যার জন্য আমাদিগকে নিমিত্তের ভাগী করিয়াছ। বিশাল সমাজ-সিন্ধুতে এরূপ দু একটা বিন্দু থাকিবেই। কিন্তু সে জন্য সমাজকে ধিক্কার দিয়া 'ওরে দুষ্ট দেশাচার,' বা 'Cursed be the social lies' বলিয়া বাঙ্গালায় বা ইংরাজীতে কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গিরণ করা সুস্থমনের কার্য্য নহে। সমাজে এক আধটা কুকাণ্ড দেখিলেই সমাজটা অশ্রদ্ধেয় হেয় হয় না। শরীরে রোগ ঢুকিলে মানুষের কদর্য্য চেহারা হয়, প্রকৃত চিকিৎসক রোগ দূর করিতে চেষ্টা করেন, রোগীকে অশ্রদ্ধা করেন না। বিলাতে পতিঘাতিনী মিসেস্ মেব্রিক ও বাঙ্গালায় পতিঘাতিনী ব্রাহ্মণী মাতঙ্গিনী আছে বলিয়া বলিতে পার না, ব্যভিচারই বিলাতী বা হিন্দুসমাজের স্থায়িভাব। ঘরের লোকের মত স্নেহহস্তে ক্ষত স্থান পরীক্ষা কর; বাহির হইতে আততায়ীর মত আক্রমণ করিও না।

আর ইহাও বলি, আমাদের দেশে যে নারীর আত্মহত্যা দিন দিন সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহা কি সমাজের অত্যাচারের ফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে? সংস্কারকদিগের বক্তৃতার দাপটে অনেক সময় এইরূপ ধারণা জন্মায়

বটে, কিন্তু যে দিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, বেলিয়াঘাটায় একটী বৌ স্বামীকে আম খাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, স্বামী সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই বলিয়া বৌটি অভিমানে আত্মহত্যা করিল, সেই দিন হইতে বুঝিলাম, প্রকৃত গলদ কোথায়? অভিমান, একগুঁয়েমি, যতই বাড়িবে, ততই এই সব অত্যাহিত ঘটিবে। বিলাতী সমাজের দেখাদেখি ব্যক্তিতন্ত্রতার প্রসার যতই হইবে, ততই সমাজের অকল্যাণ হইবে। কিন্তু এ কথা কাহাকে বুঝাইব? যিনি বুঝেন, তিনিই আজকাল উল্টা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের অদৃষ্ট!

বরপণের কথা লইয়াও ইঙ্গিতে আমাদিগকে একটু ঠেস দিয়াছ। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এ দোষ দেখিয়াছ কি? তোমার না হয় রূপ ছিল তাই বাটা লাগে নাই, তোমার বড় যা ত সাকারা সুন্দরী নহেন, তাঁহার বাপ কি আমাদের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন? বাস্তবিক এই পণপ্রথা, আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা নহে, এ অনাসৃষ্টি অনাচারও বিলাতী সমাজ হইতে আসিয়া আমাদের স্কন্ধে ভর করিয়াছে। কুক্ষণে স্কুলের পড়ুয়ারা জানিতে পারিল যে গোল্ডস্মিথের পিতা একটি কন্যার বিবাহে ডাওয়ারী বা যৌতুক দিতে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই Deserted Village ও Vicar of Wakefield পড়া ইংরাজি নবিশেরা যখন যথাকালে বরের বাপ হইলেন তখন ঐ নজীর ধরিয়া তাঁহারা ছেলের বিবাহ দিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করিতে সুরু করিলেন। সেই অবধি এই পাপ সমাজে প্রবেশ করিল।

পুরীতে গিয়াছ, পুরুষোত্তমের দর্শন পাইয়াছ, আশা পূরাও। স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে মনে করিয়াছ, কিন্তু সে স্বর্গদ্বার অন্য অর্থে। বৈতরণীর ধারে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে ভাবিয়াছ, কিন্তু 'এ সে বৈতরণী নহে,' স্বামিত্যাগিনী 'শ্রী'র মত তুমিও তাহা একদিন বুঝিবে। জগন্নাথদেবের মত নব কলেবর ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছ, সে অভিলাষও পূর্ণ হইবে, আশীর্ব্বাদ করি, 'প্রফুল্ল'র মত তুমিও 'নূতন বৌ' সাজিবে। আমি বলিয়া রাখিতেছি, যতই 'কাব্যি কর' 'নাটক কর', আবার এই ঘরেই ফিরিতে হইবে, স্ত্রীলোকের এই ঘরই আপনার ঘর। কলঙ্কিনী শৈবলিনী ফিরিয়াছিল, অভিমানিনী সূর্য্যমুখী ফিরিয়াছিল, এত কথায় কাজ কি, তোমার ছোট বোন মণি পর্য্যন্ত ফিরিয়াছে, তুমিও ফিরিবে। প্রফুল্ল স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল, 'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।'

স্ত্রী বুঝে নাই, তাহার ফলে সে নিজেও গেল, একটা সংসার একটা রাজ্যও অধঃপাতে দিল। 'হাতে সুতা বাঁধ' কে ইংরাজীনবীশ কবি বিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর এই বিবাহ-বন্ধন 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া', ক্ষত্রিয়-কন্যা সাবিত্রী দেখাইয়াছিল 'এর কাছে যে যম ঘেঁষে না।' সন্দেহ থাকে, খাঁটি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের 'মন্ত্রশক্তি' খানি পড়িয়া দেখিও। বারে বারে কাল্পনিক জগৎ হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিতে চাহিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার কাহিনীটার কতখানিতে বস্তুতন্ত্রতা আছে আর কতখানি নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল?

তুমি আমাদের 'নামে কোনো নালিশ উত্থাপন করিতে' চাও না লিখিয়াছ। আমিও বলি, 'আমার এ চিঠি সে জন্য নয়'। বিদেশীর গড়া আইনের জোরে তোমার উপর দখল পাইবার জন্য আদালতে দৌড়াইব না। যদি রুক্মাবাই হইবার, নায়িকা সাজিবার, সাধ করিয়া থাক, সে সাধ মিটিবে না।

পক্ষান্তরে মীরাবাই হইবার সাধও মিটিবার নহে। স্ত্রীলোকের মধ্যে মীরাবাই সকলে হয় না। পুরুষের মধ্যেও বুদ্ধ চৈতন্য সকলে হয় না। সংসারে থাকিয়াও অহল্যাবাই, রাণী ভবাণী মহারাণী শরৎসুন্দরী হওয়া যায়।

যাক্, অনেক কথা-কাটাকাটি করিলাম, লম্বা লেক্‌চার ঝাড়িলাম, সাধুভাষার সদাব্রত খুলিলাম। স্ত্রীলোক পাইলে আমাদের পুরুষ মানুষের এ রকম লেক্‌চার ঝাড়িবার জন্য বড় মুখ চুলকায়। আর পত্নীর ত্রুটি দেখিলে পতি তাহা দেখাইয়া দিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সাধুভাষাটা ব্যবহার করিলাম, কেন না বিলক্ষণ জানি, তুমি যতই 'ন্যাকামি' কর, এসব কিছুই তোমার বুদ্ধির অগম্য নয়, তুমি ত সামান্যি মেয়ে নও। আর তোমার 'হৃদিস্থিত হৃষীকেশে'র ত কিছুই আটকাইবে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রী (মৃণালের) হেমচন্দ্র।

পুনশ্চ—পুঁটীর বড় সাধ, তাহার শ্রীহস্তের দু'ছত্রে লেখা এই চিঠির ভিতর গুঁজিয়া দিবেই। আহা! বেচারা জানে না, তার বৌদি আর বৌদি নাই, ভৌজি হইয়াছেন।

ছিচরণেষু—মেজ বৌদি, তুমি এতদিন ছিক্ষেত্তরে গ্যাচ। আসবার নামও কর না, তুমি কেমন ধারা মানুষ? যাক্ বৌদি, আমার নাম করে সমুদ্দুরে দুটো বেশী করে ডুব দিও। আর আসবার সময় খানকতক ঝিনুক এনো। তোমার ভাই পুণ্যির শরীল, ঘামাচি হয় না, কিন্তু মেজদার গায়ে যেন চটবোনা,—ওই ঝিনুকগুলো দিয়ে কেমন মুট মুট করে ঘামাচি গালা যায়! সেই সেবার দিদিমা এনেছিলেন। হ্যা বৌদি, বড় বৌদি বলছিল কি যে তুমি নাকি আর আসবেনা, জগন্নাথকে বরণ করেচ। তা নাকি আবার হয়। তবে যে বলে সাত পাকের বে চোদ্দ পাকেও খোলে না। ধেৎ

ইতি তোমার ছোট ঠাকুরঝী

পুঁটী।

সতীন্।

ক্ষুদ্র ইচ্ছামতীর কুলে, হরিহরপুর গ্রামে, বলরাম দাস তাহার দুইটী সংসার লইয়া একরূপ সুখে দুঃখে, ক্ষেত্রের শস্যে, নদীর মাছে, গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধে ও বাগানের তরিতরকারী বেচিয়া দিন গুজরাণ করিত।

ছোট বৌ রাইকিশোরী যুবতী সুন্দরী, বড় বৌ কাদম্বিনী তত সুশ্রী নয়, বয়সেও একটু ভাঁটা পড়িয়া আসিয়াছে—বোধ হয় পঁইতিরিশের কাছাকাছি হইবে।

বড় বৌয়ের সন্তান হইল না। সন্তানের জন্যই বিবাহ, সন্তান না হইলে পিতৃপুরুষের অধোগতি হয়, কথাটা দশজনে নানা রকমে বলরামকে বুঝাইতে লাগিল। বলরাম প্রথম প্রথম সে কথায় কাণ দিত না। আত্মীয় স্বজন বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই বলরাম মৃদু হাসিয়া উত্তর দিত, 'একটাকে খেতে দিতে পারিনে আবার দু'দুটো'। কিন্তু এ আপত্তি অধিক দিন রহিল না। বড় বৌও দুই এক দিন বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল, সেটা মাত্র লোক লজ্জায়। বলরাম অনেকটা নরম হইল। কিন্তু বিবাহ করিতে পণের টাকার দরকার। যাহা হউক প্রজাপতির নির্বন্ধ, পারের গ্রামের নবকৃষ্ণ মাঝির একমাত্র নবম বৎসরের কন্যা রাইকিশোরীর সহিত একশত এক টাকা পণে

একদিন শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অবশ্য টাকাটা গ্রামের নবীন মিত্রের নিকট শতকরা তিনটাকা দুই আনা সুদে ধার করিতে হইয়াছিল।

বলরামের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাহাতে রাইকিশোরী সুন্দরী। নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, সলজ্জ বড় বড় কৃষ্ণ চক্ষু—একরাশ কালো-চুল। নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ। মোটামুটি তাহাকে সুন্দরী বলিলে সৌন্দর্য্যের নিতান্ত অবমাননা হইত না। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—বলরাম ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি স্বভাবতঃই যে একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না।

কাদম্বিনীর তাহা সহ্য হয় না। সে কলহ লইয়াই আছে। বলরাম দাস নিরীহ প্রকৃতির লোক—সে প্রায়ই রাইকিশোরীকে বলে, 'দেখ, খবরদার ঝগড়াঝাঁটি করিস্‌নি। ও তোর অনেক আগে এসেছে—তোর চেয়ে ঢের বড়, যা বলে শুনিস্।' রাইকিশোরী স্বামীর কথা শুনিয়া চক্ষু নত করিয়া কাঁদ কাঁদ সুরে বলে, "কই, আমি তো দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিনি—দিদিই বরং গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করে।" বলরাম বলে, "এক হাতে কি তালি বাজে? খবরদার অমন করিস্‌নি।" কাদম্বিনী সত্যসত্যই বিনা কারণে অনেক সময় ঝগড়ার সূত্রপাত করে।

রাইকিশোরী যে তাহার সতীন্ কাদম্বিনী কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে না। সে তাহাকে বিষচক্ষে দেখে—প্রতি পদে পদে ত্রুটী ধরে। রাইকিশোরী জলভরা বড় বড় দুইটি চোক্ মাটির দিকে নত করিয়া বলে, 'আমি ত এ সংসারের কিছুই জানিনি দিদি! কোন্‌টা দোষের আমাকে বলে দিও, আমি তা কখন করব না। আমি তোমার ছোট্ট বোন'। কাদম্বিনী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মুখের নিকট হাত ঘুরাইয়া বলে, 'মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসি, ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়্‌সি। মার পেটের বোন্ এসেছেন! সতীন্ কখনও আপনার হয়? ন্যাকরা দেখে বাঁচিনে।' বড় বৌ নথ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়। রাইকিশোরীর চক্ষু দুইটি অশ্রুজলে ভরিয়া আসে। ছোট বৌ যথার্থই ভাল মানুষ।

বর্ষাকালে গ্রাম নদীর বন্যায় ভাসিয়া যায়—উঠানেও জল উঠে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে ছোট বৌ গরুর জাব্‌নী হেঁসেলের কাজ সমস্ত একলাই করে।

বড় বৌ নড়িয়া বসিতে চায় না। বলরাম কিছু বলিলে বলে, যার সংসার সেই করবে। আমি কে? এই অবিচ্ছিন্ন বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া রাই কিশোরী পীড়িতা হইয়া পড়িল।

কাদম্বিনী দেবতার নিকট মানত করিতে লাগিল, 'আপদটা শেষ হ'য়ে যাক্ আমার স্বামী আমার হোক্। ও ছুঁড়ি কোথাকার কে? উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল—আমার স্বামীকে পর ক'রে দিলে!

একদিন বলরাম বলিল, 'ও যে মরে একটু দেখ শুন। স্বামীর কথা শুনিয়া কাদম্বিনীর হাড় জ্বলিয়া গেল। মনে মনে সতীনের মুণ্ডপাত ও মৃত্যু প্রার্থনা করিতে করিতে স্বামীকে বলিল, 'আমার অত দেখবার সাধ নেই—যার সাধ থাকে সে প্রাণভরে দিন রাত্রি দেখুক'। বলরাম আর কাদম্বিনীকে কিছু বলিল না, নিজেই প্রাণপণে ছোটবৌয়ের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সতীনের প্রতি এই যত্নাতিশয্য কাদম্বিনীকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। সে ভুলিয়াও রাইকিশোরীর ঘর মাড়াইত না। সন্ধ্যার সময় বিছানায় শুইয়া পড়িত। সমস্ত রাত্রি সে দুইটী চোকের পাতা এক করিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দে রাত্রে উঠিয়া ঘরের নলের বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিত, তাহার স্বামী ছোটবৌয়ের শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছে। সে মনে মনে মিন্‌সের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া আসিত। মনে মনে বলিত!— বুড়া বয়সে প্রেম উথ্‌লে উঠেছে। মিনসে গুলো কি বেইমান? তখন সকল দোষ তাহার সতীনের উপর পড়িত। সে সমস্ত রাত্রি দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিত;—হে মা কালী! আমার স্বামী আমার করে দাও।

প্রবল জ্বর—রাইকিশোরী বেহুস হইয়া পড়িয়া আছে। চোক্ মিলিবার সামর্থ্য নাই। সাতদিন একভাবে কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হইল না। বলরাম উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে সমস্ত রাত্রি পত্নীর শুশ্রূষা করে, এমন কি পথ্যাদিরও ব্যবস্থা নিজেকে করিতে হয়। বিরক্তির ভয়ে বড়বৌকে কিছুই বলে না।

সাত দিনের দিন ভোররাত্রে রাইকিশোরীর জ্বর ত্যাগ হইল। সে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল পার্শ্বে তাহার স্বামী বিনিদ্র অবস্থায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া

তপোবন (বৈদ্যনাথ)

দিতেছে। তাহার করুণা ও প্রেমে সমস্ত হৃদয়খানি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শীর্ণহাত দুইখানি বাড়াইয়া স্বামীর শীতল হস্ত দুইখানি বক্ষের উপর প্রবল আবেগে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে অশ্রুবিন্দু নির্ম্মল পবিত্র জাহ্নবী বারি অপেক্ষাও শীতল। বলরাম ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদচ কেন?' রাইকিশোরী স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শী শতমুখী, মুখরা তরঙ্গিনী অপেক্ষা সুস্পষ্ট। বলরাম আর থাকিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জ্জুনের শরাহতা ভোগবতীর মত তাহার দুই চক্ষু দিয়া নির্ম্মল উৎস প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেহ কাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। এই কয়েক বিন্দু অশ্রুজলই উভয়ের হৃদয়ের সকল দুঃখ—সকল দৈন্যতা নিমেষে নির্ম্মলস্পর্শে ধৌত করিয়া দিল।

বর্ষাকালে জলে জলময়—ঘরের মেজে স্যাঁতসেঁতে হইয়া গিয়াছে। একদিন বলরাম বলিল, 'এমন ভিজে মাটিতে থাকলে তোমার অসুখ বাড়্‌বে। আমি বরং ঘরের এক পাশে একখানা মাচা তৈরী করে দি'। রাইকিশোরী স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল! কেন মিছামিছি কষ্ট ক'রবে আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা। আমি এতেই ভাল হব। বলরাম শুনিলনা—বাঁশ কাটারি ইত্যাদি লইয়া আসিয়া মাচা বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল। মাচা হইলে, ক্ষেতের খড় গরুকে খায়াইবার জন্য যে গাদি দেওয়া ছিল, তাহা হইতে কতকগুলি আনিয়া মাচার উপর বিছাইয়া, ছিন্ন কাঁথাখানি ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার উপর বিছাইয়া দিল। তাহার পর খড়ভরা বালিসটি বিছানায় রাখিয়া রাইকিশোরীকে বলিল 'আস্তে আস্তে উঠে এসে এর উপরে শোও'। ধীরে ধীরে পরম স্নেহে পত্নীর হাত ধরিয়া সে শয্যার উপর লইয়া আসিল। স্বামীর যত্নে রাইকিশোরীর দুইচক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—আবেগভরে সে স্বামীর হাত দুইখানি ধরিয়া শয্যার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল—ভাবিল স্বর্গ কোথায়? এর চেয়ে যদি আর কোথাও স্বর্গ থাকে আমি তা চাইনে, এমন সময় বড়বো সেই গৃহে আসিয়া স্বামীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'ভাল নূতন চাক্‌রী পেয়েছ!' সে কটাক্ষে বিষ ঝরিতেছিল। বলরাম কিছু না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল। কাদম্বিনী একবার ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাইকিশোরীর

মুখের দিকে চাহিল। সে ইক্ষণ ইন্ধন অপেক্ষাও উগ্র। রাইকিশোরীর বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না—ভয়ে চক্ষু নত করিল। একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাদম্বিনী কক্ষের বাহির হইয়া গেল। এই বিষাক্ত নিশ্বাসে কক্ষের সমস্ত বায়ু যেন কৃষ্ণ ধূমাচ্ছন্ন গাঢ় করিয়া তুলিল। রাইকিশোরীর শ্বাসরোধ হইয়া আসিল—সে জোর করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। জগৎ সংসার তাহার যেন শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, 'আমি দিদির কি ক'রেছি'? বলরামের যত্নে রাইকিশোরী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া পড়িল।

এদিকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বলরাম অসুস্থ হইয়া পড়িল। এই গুরুতর অসুস্থতার সময়ে কাদম্বিনী সতীনের প্রতি হিংসা দ্বেষ সব ভুলিয়া কায়মনোপ্রাণে স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। ছোটবৌ গৃহস্থালী, রোগীর পথ্য ইত্যাদি সমস্ত করে, বড়বৌ স্বামীর নিকট অধিকাংশ সময় থাকে, ও সময়মত নিজ বাগানজাত তরীতরকারী ইত্যাদি হাটে বেচিয়া আইসে। দুই সতীনে প্রাণপণ চেষ্টায় স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল, একুশদিন পরে বলরাম অন্নপথ্য করিল। যে সংসারে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর নিদ্রার সময় ব্যতীত অপর সময়ে ঝগড়া লাগিয়া থাকিত, সেই খানে এই একুশ দিন দুই সতীনে একটি কথাও হয় নাই। বলরাম ভাবিল এইবার বুঝি দুই বৌয়ে ভাব হইয়া গেল। সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। বলরাম ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া আসিল।

একদিন—তখন বর্ষা একটু কমিয়াছে—রৌদ্র উঠিয়াছে। ভরা ইছামতী নদী, ছলছল কলকল করিয়া তীরস্থিত বেতবনের ভিতর দিয়া—শ্বেতশীর্ষ কাশবন কাঁপাইয়া তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বলরাম ছিপ্ লইয়া বাটীর সম্মুখস্থ ঘাটে মাছ ধরিতেছিল—এমন সময় সেই চিরপরিচিত কলহ যেন একটু বর্দ্ধিত মাত্রায় বলরামের কাণে গেল। নিদ্রোত্থিতের নিকট হঠাৎ কোন বিপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে—সে যেমন স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—সেই রূপ বলরাম স্তব্ধভাবে বড় বধূর বিদ্বেষ মিশ্রিত কর্কশ স্বর শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া বাড়ীতে গেল। বাড়ীতে গিয়া দেখিল, কি সর্ব্বনাশ। বড়বৌ মাছ কুটিবার আইস বটি লইয়া ছোট বৌয়ের পশ্চাৎপশ্চাৎ ছুটিতেছে। বলিতেছে, 'তোকে আজ কেটেই

ফেল্‌বো, আমার সোয়ামীকে পর করা! তুই কোথাকার কে'? ছোটবৌ ভীতভাবে দৌড়িয়া রান্নাঘরের দিকে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় বলরাম বড়বৌকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। কাদম্বিনী সেই শানিত অস্ত্র-'মর হারামজাদি'-বলিয়া ছোটবৌয়ের উদ্দেশে ছুড়িয়া দিল। সেই বটী ছোট বউয়ের পায়ে লাগিয়া রক্তে ভাসিয়া গেল। বলরাম অনেক কষ্টে বিবাদ থামাইয়া বলিল, 'তোমরা আমাকে আর ঘরে থাকৃতে দেবেনা দেখ্‌ছি'! আমার দু'চোক যেখানে যায় চলে যাই—তোমরা দুই সতীনে কাটাকাটি ক'রে মর'। বলরাম রাগ করিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাটী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। বড়বৌ দৌড়াইয়া গিয়া বলরামের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'তুমি আজকের মত আমাকে মাপ কর। আর কখন এমন হবেনা'। বড় বৌয়ের কাকুতি মিনতিতে ক্রমে বলরামের রাগ পড়িয়া আসিল। সে বলিল, 'বেশ! কিন্তু আর কখনও এমন হ'লে আমি নিশ্চয়ই কোথাও চলে যাব। নিত্যি ঝগড়া ঝাটি আর সয়না'। বলরাম মুখভার করিয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। বড়বৌ নিজেই ছোট বৌয়ের ক্ষতস্থানে জলপটি বাঁধিয়া দিল। কিছু-দিন দুই সতীনের বড় একটা ঝগড়া শোনা গেলনা। বড়বৌ প্রায়ই বাটীতে অনুপস্থিত থাকিতে লাগিল।

সে দিন শরতের সন্ধ্যা। বর্ষাধৌত লতাগুলি নীরবে পূর্ণ যৌবনে বৃক্ষে আশ্রয় লইতেছিল—প্রকৃতি নবীনা। আকাশ পরিষ্কার, অথচ ঘনঘন মেঘের ডাকে পৃথিবীময় একটা উৎসব চলিতেছিল। গ্রাম্য বেড়ায় লতাগুলি স্বচ্ছ—সুন্দর—কোমল। বর্ষাবিধৌত গ্রাম্য মাটির সংকীর্ণ পথ গুলিতে আর কাদা নাই—শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন। গ্রামখানি যেন বর্ষাস্নাত হইয়া ঢল্‌ ঢল করিতেছিল।

সন্ধ্যাতেই চাঁদ উঠিয়াছিল। পথের ধারেই একখানি বড় আটচালা, জ্যোৎস্নার আলোকে চালের খড় গুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সম্মুখে একটু বাগানের মত দুই চারিটা ক্রোটনের গাছ—বারান্দার পাশেই একটা সেফালি পরিপূর্ণ পুষ্পে চন্দ্রের আলোকে মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলিতেছিল। একটি যুবক বারান্দায় বসিয়াছিল। সম্মুখের পথ দিয়া বাজরা মাথায় একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, কাদি'? 'হ্যাঁ গো এই হাট থেকে ফিরৃছি' বলিয়া রমণী আটচালার দিকে অগ্রসর হইল। রমণী কাদম্বিনা, যুবক নবীন মিত্র।

কাদম্বিনী বাজরা নামাইয়া দাওয়ার উপর বসিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল 'কি হোল' ?

'ছুঁড়ি বড্ড বেয়াড়া কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে'। 'একদিন ভুলিয়ে ঐ পড়োবাড়ীটার ধারে আন্‌তে পার না'? তাহার পর যা ক'রবার আমি ক'রবো'। 'আমি কি চেষ্টার ত্রুটী কচ্ছি বাবু! আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালালে। কোথাকার কে, দুদিন এসে একেবারে মিন্‌সেকে গাড়ল বানিয়েছে। মিন্‌সে কিনা তার হ'য়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে' ? 'আমিও ত তাই বল্‌ছি—একবার হাতে পেলে বুঝি। তার পর এমন কোথাও সরিয়ে দেব যে যমেও খুঁজে পাবেনা। সত্যি ছুঁড়ি ভারি সুন্দরী'।

'মুখে আগুন সুন্দরের—ঐ রূপেই ত আমার মাথাটা খেলে'।

'তোকে বলতে কি কাদি, বলরামকে একটু হাতে রাখ্‌বার জন্যই সুদি টাকাটার নালিশ করিনি। কদিন টাকা আদায়ের অছিলা করে ছুঁড়িটাকে দেখবার জন্য বলরামের বাড়ী গেলুম—ছুঁড়ি একবার ফিরেও চায় না। ছুঁড়ি-টার ভারি লজ্জা'। কাদম্বিনী গর্জ্জিয়া বলিল, 'ভারি লজ্জা।—লজ্জাবতী লতা! লজ্জা থাক্‌লে একটা পুরুষকে অমন ক'রে চোখে চোখে নাচাতে পারে।' ও সব তুমি কিছু ভেবনা। আমি খুব শিগ্‌গির তোমার কাছে হাজির ক'রে দেব—তুমি কোথায়ও সরিয়ে দিও। আমি নিশ্চিন্ত হই—আমার ঘর সংসার আবার আমার হোক্'।

'তুই একদিন আমার কাছে আন্‌না। তার পর আমি সব ঠিক ক'রে নেব।' কাদম্বিনী তাহার সতীনকে নবীন মিত্রের কবলে আনিয়া দিবে স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বাহিরে তাহাদের পোষা দিশি কুকুরটি ডাকিয়া উঠিল। রাইকিশোরী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল কাদম্বিনী বলিতেছে 'চুপ—চুপ। আমিরে আমি'। ছোটবৌ ঘরের বাহিরে আসিয়া উঠানের দ্বার খুলিয়া দিল, কাদম্বিনী হাটের জিনিসপত্র লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আজ কাদম্বিনী খুব হাসিয়া হাসিয়া ছোটবৌয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

বলরাম দুই বৌয়ের সহিত একটা নিয়ম করিয়া লইয়াছিল—সে এক এক রাত্রে এক এক বধূর কাছে থাকিবে। সে রাত্রে রাইকিশো-

রীর পালা। রাইকিশোরী একখানি ফরসা কাপড় পরিয়া স্বামীর নিকট, শুইতে গেল।

কাদম্বিনীর সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। সে কেবল ঘরবাহির করিতে লাগিল। ছোটবৌয়ের পায়ের মলের মিষ্ট মধুর লজ্জাসঙ্কোচ মিশ্রিত উল্লাসময় সুর তখনও কাদম্বিনীর কাণে বাজিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল 'আমারও পায়ের মল একদিন এমনি মধুর সুরে বাজিত। আজ আর বাজেনা কেন? কিসের অপরাধে—কিসের ত্রুটীতে এমন হইল? কি অপরাধে স্বামী আবার বিবাহ করিলেন? অপরাধ—আমার সন্তান হইল না কেন? কই! যাহাকে বিবাহ করিলেন তাহার কি হইল? এই কথাটি যত মনে হইতে লাগিল, সে তাহার সতীনকে আরও তত বেশী অপরাধী সাব্যস্ত করিতে লাগিল।

সে দিন শনিবার। সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী ছোটবৌকে বলিল, দেখ, আমি একটা ওষুধ তুল্‌তে যাব, তাতে নাকি ছেলে হয়। তা তুইও একটু নিবি—আমিও নেব। লজ্জায় ছোটবৌয়ের মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—'আহা! তাঁর বড় সাধ একটি ছেলে হয়—সেই জন্যই তিনি একবৌ থাক্‌তে, আবার আমার বিয়ে করেছেন। যদি একটা টুকটুকে ছেলে কোলে দিতে পারি—' আনন্দে ছোটবৌয়ের বুক গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে লজ্জাসঙ্কোচপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'তাহলে ওষুধ তুলিতে কখন যাবে'। বড়বৌ বলিল, 'আর একটু ঘোর হলে' রাইকিশোরী সন্ধ্যার দীপ জ্বালিতে গেল। সে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া :তুলসী তলায় রাখিয়া প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে হরি! আমায় একটি সন্তান দাও'।

সন্ধ্যার পর কাদম্বিনী বলিল, 'আয় তোর চুলটা বেঁধে দি। সোমত্ত বয়েস—সন্ধ্যাবেলা আল্‌গা চুলে থাক্‌তে নেই'। রাইকিশোরীর অদৃষ্টে কাদম্বিনীর এরূপ দয়া ঘটে নাই। সে মনে মনে ভাবিল—তাইতো রোজ দিদি নিজেই চুল বাঁধে, ভাল কাপড় পরে—আমাকে ত একদিনও বলে না—বরং আমি একখানা ভাল কাপড় পরলে, বলে, আহা! কি সাজানই সেজেছ! বাজারে ঘর ভাড়া ক'রবি নাকি? কেবল ঐটেই বাকি—বলিয়া কত লাঞ্ছনা না করেন' আজ সে দিদির ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু কাদম্বিনীর যত্নে ও আগ্রহে শীঘ্রই তাহার সে ভাব দূর হইয়া গেল। কাদম্বিনী ছোটবৌয়ের

পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া খয়েরের টিপ্‌টী দিয়া একটি পান তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'খা'। রাইকিশোরী পান্‌টী লইয়া দিদিকে প্রণাম করিল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী—চাঁদ ওঠে নাই। সন্ধ্যার একটু পরেই কাদম্বিনী রাইকিশোরীকে লইয়া নবীন মিত্রের কথিত মত সেই পড়ো বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর প্রজাটী জমিদারের খাজনার দায়ে বাড়ী ঘরদোর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ভিটের চারিদিকে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে—কতকগুলি ঘর, খুঁটি পচিয়া একেবারে হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে লতান গাছ অনেক উঠিয়াছে। রান্নাঘরের চালাটী তখনও পড়ে নাই—তাহাতে তখনও প্রজার লাগান দুচারিটা কুমড়া চালে ঝুলিতেছিল। দক্ষিণ দুয়ারী ঘরখানি জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে ঠিক্ দাঁড়াইয়া আছে—একটু মাঝারি গোছের ঝড় হইলে সে চির সমাধি লাভ করিতে পারে। নিকটে লোকের বসবাস নাই। দু'একটা গরু ছাগল বৃষ্টির সময় এই জীর্ণঘর গুলিতে আশ্রয় লয়। সেই নির্জ্জন স্থানে কাদম্বিনী রাইকিশোরীকে লইয়া উপস্থিত হইল। রাইকিশোরী কাদম্বিনীর হাত খানি ধরিয়াছিল, ভয়ে তাহার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। মৃদুস্বরে কাদম্বিনী ডাকিল 'নবীন বাবু!' নবীন বাবু তাঁহার বিপুলদেহ লইয়া ধীরে ধীরে সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ কাদম্বিনী ঝাপ্টা দিয়া ছোট বউয়ের হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় রাইকিশোরী সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। নবীন বাবু রাইকিশোরীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভয় কি? এই ঘরের ভিতর এস," রাইকিশোরী অবাক হইয়া নবীন বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নবীন বাবু সেই সরল পবিত্র ভীত দৃষ্টিতে কেমন একটু কাতর হইয়া পড়িলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখ, তোমার জন্য আমি পাগল—তোমাকে না পেলে আমি বাঁচ্‌বোনা'। রাইকিশোরী তেমনি নির্ব্বাক, নিস্পন্দ মৃতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষে পলক নাই—বক্ষে স্পন্দন নাই। নবীন বাবু অগ্রসর হইয়া হাত ধরিতে গেলেন, অমনি বিকট্ আর্ত্তচীৎকার করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই খানেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। চীৎকারে রাইকিশোরীর চমক ভাঙ্গিল সেও ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই রাইকিশোরীর পায়ের পাশ দিয়া একটা বিষাক্ত সর্প বনের দিকে চলিয়া গেল। ভীত ভাবে রাইকিশোরী সরিয়া দাঁড়াইল।

বলরাম সেদিন নিজেই হাটে গিয়াছিল—,সঙ্গে আরও দুই চারিজন গ্রাম-বাসী ছিল। ঠিক সেই পথ দিয়াই তাহারা বাড়ী ফির্‌তেছিল। হঠাৎ পড়ো বাড়ী হইতে চীৎকার হওয়ায় তাহারা ব্যস্তভাবে সকলেই সেই দিকে ছুটিল. তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে সেই জ্যোৎস্নালোকে বলরাম দেখিল তাহার ছোটপত্নী রাইকিশোরী দাঁড়াইয়া। তাহার পদতলে নবীন মিত্র মাটীতে পড়িয়া ছটফট্‌ করিতেছে। নবীন বাবু বলরামকে দেখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন; 'পাপের ফল হাতে হাতে ফলেছে—তুমি আমায় মাপ কোরো। তোমার স্ত্রী সতী। আমি তোমার বড়স্ত্রীকে দিয়ে কৌশলে তাকে এখানে আনিয়েছিলেম। সতী অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌বার পূর্ব্বেই আমার সর্প দংশন হয়েছে।' তাহার পর অতি কষ্টে নবীন বাবু দুইহাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া রাইকিশোরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন। 'মা! আমি তোমার অবোধ সন্তান। আমায় মার্জ্জনা কোরো'। নবীনবাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখদিয়া গাজলা উঠিতেছিল। তিনি আবার সেই-খানেই ঢলিয়া পড়িলেন।

বলরামের সঙ্গের লোকেরা ধরাধরি করিয়া নবীনবাবুকে তাহার বাটীতে লইয়া গেল:। বলরাম স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। সেইরাত্রেই নবীনমিত্রের ইহলোকের সকল লীলাখেলা শেষ হইয়া গেল। *

কাদম্বিনী বাহিরের দাওয়ার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় বলরাম ছোটবৌকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। কাদম্বিনী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্‌ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কর্কশকণ্ঠে বলরাম বলিল, 'আমি তোমায় পরিত্যাগ কল্লেম, তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। আর তোমার আমি মুখদর্শন করতে চাইনে। সে রাইকিশোরীর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ফুল্ল জ্যোৎস্না—সম্মুখের নদীর তরঙ্গের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সাদা কাশের ফুল ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। বেতবনের ভিতর দিয়া একটা হাওয়ার সুর নদীর কূলে কূলে ভাসিয়া আসিতেছিল। কাদম্বিনী স্তব্ধ হইয়া

---

* মৃত্যুর পূর্ব্বে নবীন বাবু বলরামকে তাহার সুদে আসলে তিন শত টাকার ঋণমুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

দাঁড়াইয়া রহিল। এমন অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল সে জানেনা—হঠাৎ তাহার কাণে গেল, তাহার স্বামী তখনও ছোট বউয়ের সহিত গল্প করিতেছে। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার সমস্ত হৃদয়খানি শূন্য হইয়া গেল। নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—তাহার জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছিল।

তখন প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে গেল। তখনও বলরাম ছোটবৌয়ের সহিত কথা বলিতেছিল। সে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া উৎকর্ণ ভাবে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিল। একবার সে ব্যাকুলভাবে বাহিরের দিকে চাহিল,—বাহিরে তেমনি জ্যোৎস্না—তেমনি মৃদুমন্দ বায়ু—তেমনি নদীতরঙ্গ সকলই তেমনি আছে—শুধু তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কাদম্বিনী উন্মত্তের মত আড়ার সহিত কাপড় বাঁধিয়া গলায় দিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

সে মৃত্যুযন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ঘরের বেড়াতে লাগিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

এমন সময় ভোরের কাক ডাকিয়া উঠিল। সে স্বর বড় ভয়াবহ, বড় বীভৎস। বলরাম শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল। আবার বেড়ায় শব্দ, বলরাম ছুটিয়া গিয়া বড়বৌয়ের ঘরের বেড়ায় ফাঁক দিয়া ভিতরের ব্যাপার কি দেখিবার চেষ্টা করিল। ঘরের ভিতরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছে। অন্ধকারে ঘরের ভিতর কিছুই দেখা গেল না।

ব্যস্ত হইয়া বলরাম ঘরের ঝাঁপ ঠেলিল, ঝাঁপ ভিতর হইতে বন্ধ। সে তাড়াতাড়ি কাটারি আনিয়া ঝাঁপ কাটিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ! কাদম্বিনী আড়ার সহিত ঝুলিতেছে। সে হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তখনও কাদম্বিনী আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ফল হাত পা ছুড়িতেছিল।

বলরাম চীৎকার করিয়া ছোটবৌকে ডাকিল, ছোটবৌ এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক কষ্টে বলরাম আড়ায় উঠিয়া কাদম্বিনীকে নীচে নামাইল। কাদম্বিনী তখন অজ্ঞান। উভয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিল।

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। আর্দ্র কণ্ঠে বলরাম ডাকিল, 'বড়বৌ!' বড় বড় চোক করিয়া কাদম্বিনী বলরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টি বড় করুণ—বড় কোমল! তাহার পর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাদম্বিনী বলিল, 'আমার সোয়ামিকে পর ক'রে নিলে'। সে করুণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি বলরামের সমস্ত হৃদয়খানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। আজ কাদম্বিনীর অপরাধ অপেক্ষা তাহার নিজের অপরাধ অধিক গুরুতর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রাইকিশোরী ছলছল নেত্রে বড়বৌয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। হঠাৎ কাদম্বিনী উন্মাদিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া রাইকিশোরীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—

'ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয়না ॥
হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা ॥
বেড়ী বেড়ী বেড়ী।
সতীন মাগী চেড়ী ॥
পাখী পাখী পাখী।
সতীন মাগী মর্‌তে যাচ্ছে ছাতে উঠে দেখি ॥'

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

দিল্লী।

(প্রাচীন ইতিহাস)

পৃথ্বীরাজ

সংযোগিতাকে লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহার রূপমদে একেবারেই উন্মত্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে রাজকার্য্যের প্রতিও তাঁহার শৈথিল্য জন্মে। ওদিকে তাঁহার অন্যান্য মহিষীগণও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সংযোগিতার প্রতি ঈর্ষাশালিনী হইয়া উঠেন। প্রধানা মহিষী ইচ্ছিনী অধিকতর বিরক্ত হন। এমন কি তিনি রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার অভিলাষিণী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া আবার তাঁহার প্রণয়লাভ করেন। তাহার পর আবার মহিষীগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংযোগিতাও সপত্নীগণকে সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া রাখেন। রাজার অন্তঃপুরে যে অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, ক্রমে তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। ইহার পর মহিষীরা পৃথ্বীরাজকে মৃগয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করায়, পৃথ্বীরাজ তাহাতে সম্মত হন। তিনি মহিষীগণকে লইয়া পাণিপথের দিকে যাত্রা করেন, এবং অরণ্যে মৃগয়ার প্রবৃত্ত হন। সিংহ, বরাহ প্রভৃতির অনুসরণে সমস্ত অরণ্যে এক মহান্ কোলাহল উত্থিত হয়। পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার সামন্তগণ যখন সেই সমস্ত জন্তুর পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন মহিষীরা কৌতুক সহকারে তৎসমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং সেই রাজপুত বীরগণের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজ আবার অন্য এক আমোদ উপভোগে প্রবৃত্ত হন। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

দিল্লীর নিগমবোধ ঘাটে পৃথ্বীরাজ অষ্টমুষ্টি দল অষ্টহস্ত উচ্চ অষ্টধাতু নির্ম্মিত এক জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া, সমস্ত সামন্তগণের বল পরীক্ষার জন্য তাহার নিকট সমাগত হন। চন্দ্রপুণ্ডীরের পুত্র ধীরপুণ্ডীর আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের জন্য

উক্ত জয়স্তম্ভ ভেদ করার আদেশ প্রার্থনা করেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে আদেশ দিলে ধীরপুণ্ডীর অশ্বারোহণে স্তম্ভের নিকট গমন করিয়া তাহাকে ভেদ করিয়া ফেলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ধীরকে পুরস্কার এবং তাঁহাকে সমস্ত সামন্তের প্রধান পদ প্রদান করেন। ইহাতে চামণ্ডরায়, জৈত রায় প্রভৃতির অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মে। ধীর পৃথ্বীরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে সাহাবুদ্দিনকে আর একবার ধৃত করিয়া তিনি রাজার নিকট লইয়া আসিবেন। চামণ্ডরায় প্রভৃতি ইহা অসম্ভব মনে করেন। কিন্তু ধীর স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষণে সচেষ্ট হন। চামণ্ড রায়, জৈত রায় প্রভৃতি ধীরের প্রগল্‌ভতার কথা সাহাবুদ্দিনের নিকট গোপনে সংবাদ দিয়া পাঠান। সাহাবুদ্দিন ধীরকে দমন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন, ধীরও আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে বিস্মৃত হন নাই। এইরূপে পৃথ্বীরাজের সামন্তগণের মধ্যে ঈর্ষার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ করায় তাঁহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

এই সময়ে ধীরপুণ্ডীর সপরিবারে জলন্ধরী দেবীকে পূজা করিবার জন্য গমন করেন। সাহাবুদ্দিন সে সংবাদ অবগত হইয়া আট হাজার গোক্ষুর সৈন্য ধীরকে ধৃত করার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাহারা যোগীর বেশ ধারণ করিয়া ধীরের নিকট ভিক্ষাচ্ছলে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রমে সিন্ধুনদের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে, অবশেষে গজনীতে লইয়া যায়। সাহাবুদ্দিনের দরবারে উপস্থিত হইয়া ধীর আপনার অসমসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন এবং সাহাবুদ্দিনের সম্মুখেই তাঁহাকে ধৃত করার কথা বলেন। সাহাবুদ্দিন ধীরের বীরত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হিন্দুস্থান অভিমুখে ধাবিত হন।

মুসল্‌মান সৈন্যগণ সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া আজমীরে উপস্থিত হইল। তাতার খাঁ সসৈন্যে ধীরকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ধীরপুণ্ডীর দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার মহিষীগণ ধীরের নির্ব্বিঘ্নে আগমনে আনন্দপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু চামণ্ড রায় ও জৈত রায় ধীরের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়া সদাগরগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে সাহাবুদ্দিনও সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। ধীর

পুণ্ডীরও সুসজ্জিত হইয়া উঠেন। ঘোরীর আগমন শুনিয়া পৃথ্বীরাজের অন্যান্য সামন্তগণও সজ্জিত হইতে আরম্ভ করে। জৈত রায় ও চামণ্ড রায় সসৈন্যে অগ্রে ধাবিত হওয়ার জন্য উদ্যত হন। কবি চন্দ্র চামণ্ড রায়ের বেড়ী উন্মোচন করিয়া দেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ লোহানা আজান বাহুকে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার চামণ্ড রায়কে বেড়ী পরাইয়া দেন। অবশেষে চামণ্ড রায়কেও সেই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। মুসল্‌মান সৈন্যগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইতে আরম্ভ করে, রাজপুতগণও সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া শত্রু বিমর্দ্দনে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে চামণ্ড রায় তৎপশ্চাৎ জৈত রায়, ধীরপুণ্ডীর, বলিভদ্র রায় প্রভৃতি এবং এক পার্শ্বে পৃথ্বীরাজ ও অপর পার্শ্বে জাম রায় যাদব অবস্থিত ছিলেন। মুসলমান সৈন্যগণের অগ্রে হস্তী সকল স্থাপিত ছিল। রাজপুতগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠে। অবশেষে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। সে দিন রাজপুতগণই জয়লাভ করে। ঘোরীর পক্ষে অনেক সৈন্য নিহত হয়। চামণ্ড রায় অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মুসলমান সৈন্য মথিত করিয়া তুলেন। সাহাবুদ্দিনের সৈন্যরা তাঁহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে নাই তিনি অচল তালবৃক্ষ সমান অবস্থিতি করিয়া বেগবায়ু ভরে বিপক্ষগণকে ধূলিরাশির ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেন। অন্যান্য সামন্তরাও পরাক্রম প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। ফলতঃ সে দিবস রাজপুত বীরগণের বীরত্বে মুসল্‌মান সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া যায়। পর দিন প্রাতঃকালে আবার উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রাজপুতগণ সাহস সহকারে অগ্রসর হইল, পৃথ্বীরাজ ধাবিত হইয়া সাহাবুদ্দিনকে বেষ্টন করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ধীরপুণ্ডীর অগ্রসর হইয়া সাহাবুদ্দিনের সম্মুখীন হইলেন। সাহাবুদ্দিন অশ্বপরিত্যাগ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে ধীরপুণ্ডীর অশ্বারোহণে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রবলবেগে তাঁহার হস্তীকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। সাহাবুদ্দিনের অঙ্গ-রক্ষক সৈন্যগণ আপনাদের প্রভুকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ওদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণও ধীরপুণ্ডীরের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ধীরের অস্ত্রাঘাতে ঘোরীর হস্তী বিচলিত হইয়া তাঁহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। অমনি ধীর-

পুণ্ডীর ও হাড়াহাম্ভীর সাহাবুদ্দিনকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। * সাহাবুদ্দিন বন্দী হইয়া পৃথ্বীরাজের নিকট নীত হইলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে লইয়া দিল্লী আগমন করেন। তাহার পর আপনার দরবারে সাহাবুদ্দিনকে আহ্বান ও মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করায় সাহ লোহানা আজান বাহুকে সঙ্গে লইয়া যান, ও তাঁহার সহিত হস্তী অশ্ব প্রভৃতি দণ্ড প্রেরণ করেন। † তৎসমস্ত ধীরকে প্রদান করা হয় এবং পৃথ্বীরাজ তাঁহার যার পর নাই প্রশংসা করেন।

---

* উড়িগ রেন গয় বঙ্গ। সাহি সংমুহ গজ্জি পিল্লৌ॥
ধনিব ধীর পুণ্ডীর। সাহি সনমুখ অসি মিল্লৌ॥
দসন তুণ্ড কিয় দোর। মুণ্ড হুণ্ডার গুণ্ডা হল॥
গিরত ভূমি সুর তান। য়ান কিনো কোলাহল॥
ঝক ঝোরি তরি অবঝরি উজরি। গাহি হমেল হম্ভীর [illegible]॥
হয় কন্ধ ডারি অড্ডো অসুধ। পিজ পুণ্ডীর প্রমাণ কিয়॥

† দণ্ড সীস সুলতন। তীস গজ রাজ মত্তমদ।
পঞ্চশত ঐরাক। সুতর লস তীন উনং মদ॥
বহু বিভূতি চতুরঙ্গ। দণ্ড মাঙ্গ্যৌ যুর সানা॥
বর গোরী সুলতান। বন্ধী মুক্যো ওঁহ রাণী॥
আজান বাহ সংগ্রহ প্রপতি। দণ্ড কাজ সম্মহ দিয়ৌ॥
খুরসান খান ঝোরী প্রপাম। সুবর সাহি সম্মহ লিয়ৌ॥

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে চাঁদ কবির বর্ণনার সহিত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তির ঐক্য নাই। তাঁহারা সাহাবুদ্দিনের বন্দী হওয়ার কথা বলেন না। এবং চামণ্ড রায়ের সহিতই সাহাবুদ্দিনের সম্মুখ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন। তবে কোন কোন অংশে ইহার যে ঐক্য আছে তাহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। নিম্নে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল :—

The victorions Sultan then prepared another army, with which he attacked and conquered the fort of Sarhind. This fort he placed under the command of Ziau'-d din Kazi Tolak, (son of) Muhammad' Abdu-s Sala'm Nasaur Tolaki. This Kazi Ziau d din was cousin (son of the uncle) of the author's maternal grandfather. At the request of the Kazi, Majdu-d din Tolaki selected 1200 men of the tribe of Tolaki, and placed them all under his command in the fort so as to enable him to hold it until the return of the sultan from Ghazni. Rai kolah Pithaura came up against the fort, and the Sultan returned and faced him at Narain. All the Rais of Hindustan were with the Rai kolah. The battle was formed and the Sultan, seizing a lance, made a rush upon the

সাহাবুদ্দিনকে ধৃত করায় ধীর মনে মনে কিছু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। চামণ্ড রায় ও জৈত রায় পৃথ্বীরাজকে ক্রমে ধীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলেন, তাহার ফলে ধীরকে আপনার সবংশীয়গণের সহিত নির্ব্বাসিত হইতে হয়। সাহাবুদ্দিন তাহা অবগত হইয়া ধীরকে জায়গীর প্রদানে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ধীর তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ধীরের স্ববংশীয়গণ কিন্তু সে সময়

---

elephant which carried Gobind Rai of Delhi. The latter advanced to meet him in front of the battle and then the Sultan, who was a second Rustam, and the Lion of the Age, drove his lance into the mouth of the Rai and knocked two of the accursed wretch's teeth down his throat. The Rai, on the other hand returned the blow and inflicted a severe wound on the arm of his adversary. The Sultan reined back his horse and turned aside, and the pain of the wound was so insufferable that he could not support himself on horse back. The Musulman army gave way and could not be controlled. The Sultan was just falling when a sharp and brave young Khilji recognized him, jumped upon the horse behind him and clasping him round the bosom, spurred on the horse and bore him from the midst of the fight. When the Musalmans lost sight of the Sultan, a panic fell upon them; they fled and halted not until they were safe from the persuit of the victors. A party of nobles and youths of Ghorhod seen and recognized their leader with that lion-hearted khilji and when he came up they drew together, and forming a kind of litter with broken lances, they bore him to the hating place. The hearts of the troops were consoled by his appearence, and the Muhammadan faith gathered new strength in his life. He controlled the scattered forces and retreated to the territories of Islam leaving Kazi Tolake in the fort of Sorhind. Rai Pithaura advanced and invested the fort, which he besieged for thirteen months.

In the year 587, he marched against to Hindoostan, and proceeding towards Ajmere, he took the town of Bituhuda where he left Mullik zeea-ood Deen Toozuky with above a thousand chosen horse, and same foot to form its garrison. While on his return, he heard that Pithow Ray, Raja of Ajmeer with his brother Chawund Roy, the Raja of Dehly, in alliance with other Indian princes, were marching towords Bituhuda with two hundred thousand horse, and three thousand elephants. Mahamed Ghoory marched to the relief of his garrison; but passing beyond Bituhuda, he encountered the enemy at the village of Narain, now called

লাহোর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ধীর তজ্জন্য তাহাদিগকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছিলেন। লাহোর লুণ্ঠনের পর পৃথ্বীরাজ আবার ধীরকে আহ্বান করিয়া পাঠান। ধীরও রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লী যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু গজনী দরবারের অমাত্যগণ এক ষড়যন্ত্র করিয়া ধীরের হত্যা সম্পাদন করেন। তাঁহারা একদল সদাগরকে ধীর তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইবে বলিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলেন, অবশেষে গজনীর কতকগুলি সৈন্য তাহাদের সহিত যোগ দিয়া ধীরের প্রাণনাশ করে। ধীরের মৃত্যুতে পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত

Tirowry on the banks of the Soorsutty, fourteen mils from Tahnesur, and eighty from Dehly, where he gave them battle. At the first onset his right and left wings, being outflanked, fell back, till joining in the rear, his army formed a circle. Mahomed Ghoory was in person in the centre of his army, and being informed that both wings were defeated, was advised to provide for his own safety. Enraged at his counsel, he cut down the messenger, and rushing on towards the enemy, with a few followers, committed terrible slaughter. The eyes of Chowund Ray falling on him, he drove his elephant directly against Mahomed Ghoory, who perceiving his intention charged and delivered his lance full into the Raja's mouth, by which many of his teeth were knocked out. In the mean time the Raja of Dehly pierced the king through the right arm with an arrow. He had almost fallen, when some of his chiefs advanced to his rescue. This effort to save him gave an opportunity to one of his faithful servants to leap up behind Mahomed Ghoory, who faint from his loss of blood had nearly fallen from his horse, but was carried triumphantly off the field though almost wholly deserted by his army, which was persued by the enemy nearly fourty miles. After his defeat when he had recovered of his wound at Lahore, he appointed governors to the different provinces he possessed in India, and returned in person to Ghoor. At Ghoor he disgraced all those officers who deserted him in the battle, and compelled them to walk round the city with their horse's mouth bags, filled with barley hung about their necks, at the same time forcing them to eat the grain like brutes. The author of the Hubeeb-oos-Seer relates contrary to all my other authorities, that when Mahomed was wounded, he fell from his horse, and lay upon the field among the Slain till night. And that in the dark, a party of his own body-guard returned to search for his body, and carried him off to his camp.

দুঃখিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার সে ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ সংযোগিতার রূপ মোহ তাঁহাকে প্রতিক্ষণে আকর্ষণ করিতেছিল।

পৃথ্বীরাজ রাজকার্য্য অমনোযোগী হইয়া সংযোগিতার সহিত বিলাস বিভ্রমে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সামন্তগণের মধ্যেও ঈর্ষাগ্নি দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। কাজেই পৃথ্বীরাজের অন্তিম সময় যে উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি। সাহাবুদ্দিন সে সমস্ত বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন ও পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। দিল্লীর রাজলক্ষ্মী পৃথ্বীরাজকে আর স্নেহেরচক্ষে দেখিতে পারিলেন না, সাহাবুদ্দিনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল ইহার পরই উভয়ের মধ্যে যে মহাসমর সংঘটিত হয় তাহাতেই পৃথ্বীরাজের অবসান ঘটে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

ধূলি।

হা ধূলি, তোমায় কেমন করিয়া কঠিন চরণে দলি
প্রাণহীন হ'য়ে তপ্ত শয়নে আজি প'ড়ে আছ বলি'।
আমিও ছিলাম তোমারি মত,
নীরস ধূসর যুগ কত শত,
আজিকে না হয় প্রাণময় তনু আত্মজনম ভুলি।
কঠিন চরণে আজিকে দলিব কেমনে তোমায় ধূলি।

আজ যাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়মের বলে সবল জীবিত তনু।
কালি যদি তুমি গজরাজ হ'য়ে
ধরার রাজারে গৌরবে বয়ে
আমার অস্থি-চূর্ণ তূর্ণ উড়াইয়া যাও চলি
আজ তাহা স্মরি হা ধূলি তোমায় কেমনে চরণে দলি।

শ্রীকালিদাস রায়।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চারিজন বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুলী ঝাম্পাল বহিয়া লইয়া যায়। লম্বা দুই খানা বাঁশের মধ্যস্থলে একটী লোকের বসিবার উপযুক্ত দড়ির ছাউনী থাকে। আরোহী না বসিয়া যদি লম্বালম্বী শুইয়া চলে তাহা হইলে শ্মশানে লইয়া যাওয়া বোধ হয়। হরিদ্বার হইতে এইরূপ অনেক ঝাম্পাণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, কুলীদের মজুরী খুব বেশী, দেড়শত পোণে দুই শত টাকার কম নহে। তাহা ছাড়াও "ইনাম বক্শীশ" আছে। আর কাণ্ডী প্রায়শই ৫০ টাকায় পাওয়া যায়। আসাম শিলঙ্গের খাসীয়াদের থাবারন্যায়, একটী ঝুড়ীতে আরোহীকে বসাইয়া কাণ্ডীওয়ালা পিঠে করিয়া লইয়া যায়। পা দুই খানি বাহিরে-ঝুলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এক মহা বিড়ম্বনা। কাণ্ডীতে যাহারা যায় তাহারা হরিদ্বার হইতেই ঠিক করিয়া থাকে, কেহ কেহ রাস্তাতেও ঠিক করিয়া লয়।

সেই জঙ্গলের পথে প্রায় আড়াই ২॥০ মাইল চড়াই করিয়া পুনরায় এক মাইল উৎরাই করিবার পরে কুণ্ডচটী নামক একটী চটী পাওয়া গেল। চটীটা মন্দ নহে, অনেক কয়খানি দোকান আছে, দুই দিকে দুইটী বড় ঝরণা আছে। চটীর নিকটবর্ত্তী স্থান অনেকটা লইয়া সমতল। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে শস্য জন্মিয়াছে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে গম যবের ক্ষেত দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেশে চৈত্র মাসে সে সমস্ত শস্য উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর ভাল রাস্তাতে গিয়া ভীষণ চড়াই আরম্ভ হইল। একেবারে খাড়া পাহাড়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অতি কষ্টে উঠিতে হইতেছে। এ কয়েক দিনে এমন চড়াই পাই নাই। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারনাথ অবধি যদিও খুবই খারাপ, তবুও যে সমস্ত চড়াই পার হইয়াছি তাহা একরূপ ছিল কিন্তু আজ যে চড়াই তাহা আর কি বলিব, ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ এরূপ চড়াইয়ের কল্পনাও করিতে পারে না। লাঠি ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, পদতলে ক্ষুদ্র

বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, প্রতি পদ বিক্ষেপে হোঁচট লাগিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা। একদিকে বিশালকায় উন্নত শীর্ষ দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী, অন্য-দিকে সহস্র ফিট্ নিম্নে প্রসন্নসলিলা মন্দাকিনী প্রবহমানা। সম্মুখে পর্ব্বতের গা খুঁদিয়া দেড় হাত দুই হাত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর চড়াই করিতে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পাদুখানি একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল। আমরা তিন জনেই বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলাম, একটী ঝরণার ধারে কিছুক্ষণ বসিয়া আকণ্ঠ জলপান করিলাম, প্রাণে যেন শক্তি ফিরিয়া আসিল। একটী বৃহদাকার শিলাখণ্ডে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। আমরা সমতল বঙ্গদেশবাসী, শুনিয়াছিলাম যে বদরিকাশ্রমের রাস্তা অতিশয় কঠিন, কিন্তু এত যে কষ্ট হয় তাহা জানিতাম না। চড়াই উৎরাইয়ে হয়ত সামান্য মত পরিশ্রম হয়, কিন্তু এ যে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর অপেক্ষা। দেবতাবাঞ্ছিত হিমালয়ের অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি, গিরি নির্ঝরিণীর অনন্ত কল্লোল, নিত্যনবশোভাশালিনী প্রকৃতির আনন্দচ্ছবি, পার্ব্বত্য বৃক্ষের অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি সবই যেন ব্যর্থ বোধ হইতে লাগিল। হায় ভগবান্! এমন অসহিষ্ণু নিরাশ দুর্ব্বলচেতা অপদার্থকে কেন সৃষ্টি করিয়াছিলে? কত দিন হইল এইভাবে শূন্য প্রাণে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কত দুঃখকষ্ট কত বিপদ ঝঞ্ঝাবাত, মাথার উপর দিয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও ত পরীক্ষা হয়নি প্রভু। এ অশান্তিপূর্ণ পাপকলুষিত হৃদয় লইয়া কোথায় যাইব দয়াময়? দয়া কর প্রভু, হৃদয়ে শান্তি দাও। হিমালয়ের স্বর্গীয় শোভাসম্পদ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে দাও। তোমার ভক্তমুখেই ত শুনিয়াছি প্রভু যে বদরিকাশ্রম স্বর্গপুরী, সেখানে গেলে তোমার দর্শন পাওয়া যায়। হৃদয়ে বিশ্বাস ভক্তি আনন্দ দাও, শোভার আস্পদ হিমাচলের এ অলৌকিক দৃশ্যে মুগ্ধ করিয়া রাখ, শ্রান্তি কষ্ট দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করুক। আমি 'জয় নারায়ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' রবে পর্ব্বত কম্পিত করিয়া মহানন্দে তোমার পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইব। প্রভু তুমিই একমাত্র সহায়!!

চড়াইয়ের কষ্টে তিন জনই অভিভূত হইয়াছি। ভ—বাবু নীরবে সে কষ্ট সহ্য করিতেছেন কিন্তু শ্যা—দাদার স্ফূর্ত্তির অভাব নাই। তাঁহার উঠিতে বসিতে জয়ধ্বনি, সে ধ্বনিতে প্রাণে এক অননুভূত শক্তির সঞ্চার হয়। বৃদ্ধই আমাদের

পথ প্রদর্শক। সেই হরিদ্বার হইতে বৃদ্ধ সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন আমি মধ্যে আর ভ—বাবু পশ্চাতে। যখনই খুব ক্লান্ত হইয়া বলিতাম "দাদা! একটু না জিরুলে আর পারিনে"। অমনই তিন জনে বসিয়া পড়িতাম। একটু বসিতে না বসিতেই বৃদ্ধের তাড়া "ওঠ ওঠ চল, অনেক দূর যেতে হবে, আর দেরী করলে চলবে না"। মনে মনে তাঁহার উপর ভারী বিরক্ত হইতাম, কোনদিন হয়ত বলিয়া ফেলিতাম, বসুন মশায়, যাওয়া যাচ্ছে, ১৫ মিনিট না হতেই আপনি অমনি তাড়া আরম্ভ করলেন। দ্রুত গেলে আজই কি বদরিকাশ্রম পৌছতে পারব? ভাল লোকের সঙ্গে এসেছি", আমরা বিরক্ত হইয়াছি বুঝিতে পারিয়া তিনি স্নেহস্বরে কত কথা বলিতেন, আমাদের বিরক্তি ক্রোধ কোথায় চলিয়া যাইত। কতদিন তাঁহার নিকট কত রকম আবদার করিয়াছি, ছোট ভাই এর ন্যায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন, আর যত অন্যায় আবদার সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পাহাড়ে কি আনন্দে ছিলাম বলিতে পারি না। কোন চটীতে ক্লান্ত হইয়া গিয়া বসিলে তিনি নানা রকম গল্প আরম্ভ করিয়া দিতেন, হয়ত বা উপন্যাস শুনাইয়া আমাদের পথশ্রম কথঞ্চিৎ নিবারণের চেষ্টা পাইতেন। সত্যই তাঁহার সেই হৃদয়াকর্ষিণী বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের পথকষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইত। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে চড়াই করিতে করিতে যখন গলদঘর্ম্ম অবস্থায় পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতাম, বৃদ্ধ তখন নিজের কষ্ট ভুলিয়া দূর ঝরণা হইতে সুশীতল জল আনিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন, মধ্যাহ্নকালে কোন চটীতে উপস্থিত হইবামাত্র আমি ও ভ—বাবু সটান পড়িয়া যাইতাম। আর বৃদ্ধ ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করিয়া দোকানদারের নিকট চাউল দাইল কিনিতে বসিতেন। কত দিন দেখিয়াছি তিনি নিজে অসুবিধা ভোগ করিয়া আমাদের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহা করিয়াছেন। হৃদয়ে অটল বিশ্বাস এবং অসাধারণ ধৈর্য্য লইয়া যখন তিনি জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহানন্দে অগ্রসর হইতেন, তখন আমরা আনন্দ সহকারে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতাম। আর ভ—বাবু—তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্বভাবটীও বড় সুন্দর। ভ—বাবুর সঙ্গে অনেক রকম রহস্যালাপ হইত; সময়ে সময়ে শ্যা—বাবু সে রহস্যে যোগদান করিয়া আনন্দের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতেন। ভগবানের ইচ্ছায় হিমালয় ভ্রমণে যে দুইজন সঙ্গী পাইয়াছিলাম, তাঁহারা উভয়েই অতি অমায়িক লোক। তাঁহারা আমাকে নানা

রকমে সাহায্য করিয়াছেন, সে ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন। ভ—বাবু অনেক সময় পথশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ শ্যা—বাবুকে কোনদিন কাতর হইতে দেখি নাই। তাঁহার প্রশান্ত বদনে কোনদিন বিরক্তির ছায়া প্রকাশ পায় নাই। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস!! হায়! যদি সে বিশ্বাসের কণামাত্রও পাইতাম!

অতি কষ্টে প্রাণশঙ্কট রাস্তায় ৩ মাইল চড়াই করিয়া আমরা বেলা প্রায় ১১টায় গুপ্তকাশীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। কিছু দূর আমাদিগকে সামান্য জঙ্গল রাস্তায় চলিতে হইয়াছিল। এই জঙ্গলের মধ্য রাস্তায় একটী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক মাদলের বাদ্য সহকারে "জয় প্রভু কিদারনাথ আব দরশন তেরা" এই গান গাহিয়া যাত্রীবর্গের নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করিতেছে। আমরা তাহারই সম্মুখে একটী শিলাখণ্ডোপরি বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই ৪ জন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক যাত্রী সেখানে আসিলেন এবং আমাদিগকে বাঙ্গালী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। উভয় পক্ষের আলাপ পরিচয় আদি মোটামুটী হইবার পর আমরা তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। আরও খানিকটা উপরে উঠিতেই এক স্বর্গীয় দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। কি সুন্দর শোভা! সম্মুখের পর্ব্বতশ্রেণী আপাদ মস্তক বরফ মণ্ডিত। মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণ সেই পর্ব্বতের উপর পতিত হইয়া কি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যেন পর্ব্বতময় গলিত রৌপ্য ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, অথবা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পাষাণগাত্র পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য হইতে সহসা রজতগিরির আবির্ভাব হইয়াছে। আরও সুন্দর যে, সূর্য্যোত্তাপে সেই তুষাররাশি গলিয়া পড়িতেছে, সে চাকচিক্যময় দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করিতে পারা যায় না। আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধনেত্রে সেই স্বর্গীয় শোভা দেখিতে লাগিলাম। হৃদয় ভরিয়া গেল। বাস্তবিকই এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে এমন শান্তি শীতল দৃশ্য আছে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পরম শোভার আস্পদ হিমালয়ে ক্ষণে ক্ষণে নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি বিশ্বরচয়িতার অপূর্ব্ব রচনা কৌশল। আজ কয়েক দিন হইল হিমালয়ের কঠিন দুর্গম পথে চলিয়াছি, পথশ্রমে ক্লান্তিতে সময়ে সময়ে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু যখনই একটা শোভা সম্পদশালী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি তখনই ক্লান্তি অবসাদ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, আনন্দ আসিয়া দুঃখের স্থান অধিকার করি-

যাছে। মনে হইয়াছে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই স্বর্গসুখ অনুভব করি। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবিধ পার্ব্বত্য কুসুমস্তবক, এবং পার্ব্বত্য লতাপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের কুসুম রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দিক্ মোহিত করিতেছে, সমীর প্রবাহে সে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের শুভ্রকিরণ ধূসর পর্ব্বত গাত্রে, মন্দাকিনী সলিলে, প্রস্রবণে এবং পুষ্পবৃক্ষে প্রতিফলিত হইয়া এক অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত বিপুল সৌন্দর্য্যরাশি, পার্ব্বত্য পুষ্পের সুমধুর গন্ধ, বিহগকুলের বিচিত্র কূজন ও গিরি নির্ঝরিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস এই সমস্ত স্বভাবের শোভায় প্রাণমন মাতোয়ারা হইয়া স্বতঃই বিশ্বেশ্বরের অভয় চরণোদ্দেশে ধাবিত হয়। শান্তি এবং প্রফুল্লতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা গুপ্তকাশীতে প্রবেশ করিলাম, প্রথমতঃ একটী দোকানের দোতালায় ঘর ঠিক করিয়া বসা গেল। উপর হইতেই মন্দির এবং তৎসমীপবর্ত্তী কুণ্ড পাণ্ডা ও যাত্রীবর্গের ইতস্ততঃ ছুটাছুটী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্যা—বাবুর প্রতি আহারাদির বন্দোবস্তের ভার দিয়া আমরা দুই জনে সেই ক্ষুদ্র সহরটী দেখিতে বাহির হইলাম। নীচে নামিয়াই সঙ্গীয় ভ—বাবু কোথায় ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গুপ্তকাশী স্থানটী বড় রমণীয়। রাস্তার ধারে বেশ বড় কয়খানি দোকান আছে। একটী দোকানের এক পার্শ্বে পোষ্টাফিস, আমার কয় খানি চিঠি এই বাক্সে ফেলিয়া দিলাম। বিভিন্ন দেশের বহুতর যাত্রীতে স্থানটী পরিপূর্ণ, রাস্তা হইতে কয়েকটী সিড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে হইল। সেখানেও কয়েকখানি খাবারের দোকান। লুচী, জিলিপী, পাঁপর ভাজা কিছুরই অভাব নাই, বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণার মন্দির আছে, মন্দিরের সম্মুখেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মধ্যস্থলে একটী কুণ্ড। কুণ্ডের নাম মণিকর্ণিকা, দুইটী ঝরণার ধারা দুই দিক হইতে আসিয়া পড়িতেছে, দুইটী ধারার মুখ পিতল দ্বারা বাঁধান, একটী হস্তীমুখ, অপরটী গোমুখ, দুই ধারার নিকটে দুইজন পাণ্ডা বসিয়া যাত্রীদিগকে স্নান সংকল্প ইত্যাদি করাইতেছে। অশুদ্ধ উচ্চারণ মন্ত্রের কোন অর্থ নাই। এখানে গুপ্তদান করিতে হয়, এত যাত্রীর ভিতরে এখানে বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলাম না। আমরা মণিকর্ণিকার জলস্পর্শ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

পাণ্ডাজী আমার সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া কিছুই বলিল না, কিন্তু সঙ্গীয় ভদ্রলোকদ্বয়ের নিকট "প্রবেশের ফি" আদায় না করিয়া কিছুতেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিল না। অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে বিশ্বনাথ লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান। মূর্ত্তিটী রৌপ্য নির্ম্মিত পিনেট দ্বারা শোভিত। এক পার্শ্বে রৌপ্য চক্র ও তাহাতে রৌপ্য নির্ম্মিত মহামায়ার মুখ। অন্য পার্শ্বে রৌপ্য নির্ম্মিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি। আমরা দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিলাম এবং দ্বিতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এ মন্দিরের ভিতরে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত বৃষভারূঢ় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। এক পার্শ্বে পিতলের অন্নপূর্ণা এবং অন্য পার্শ্বে নারায়ণ মূর্ত্তি, সবই সুন্দর।

কোলাহলপূর্ণ বারাণসী নগরী পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ এই হিমালয় ক্রোড়স্থিত গুপ্তকাশীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ শোনা গেল, এই কাশীর নাম গুপ্তকাশী। উত্তর কাশী নামক আর একটী কাশী হিমালয়ে আছে। স্বনাম প্রসিদ্ধ কাশীর সহিত বাহ্য সম্পদে ইহার কোন সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয়। প্রকৃতিদেবী সযত্নে পাহাড়ের মধ্যে এই পরম রমণীয় স্থানটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী অফুরন্ত সৌন্দর্য্য বুকে লইয়া বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে ছবির মত এই সুন্দর ক্ষুদ্র সহরটী। ঠিক মন্দিরের সম্মুখের গেট পার হইয়া নীচে প্রশস্ত রাস্তায় পড়িলে দূরে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। আর স্বচ্ছ স্ফটিকধারার ন্যায় সেই তুষার সূর্য্যকিরণে গলিয়া পড়িতেছে। ভগবান মহাদেবের আনন্দ নিকেতন কৈলাসধাম হিমালয়ের কোন নিভৃত অংশে গুপ্ত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে কিন্তু গুপ্তকাশী কৈলাস হইতে যে কোন অংশে হীন নহে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমরা বাহিরে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম, পাঁপর ভাজা ও জিলিপী ভক্ষণও করা গেল। বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেই দোকানদার বাসা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে বলিল। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল তাহার আরও যাত্রী আসিয়াছে কাজেই জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আহারাদি হইয়া গিয়াছে আর জায়গা দখল করা কেন? আমাদিগকে বিদায় দিয়া অন্য যাত্রী তুলিতে পারিলে তাহার দু পয়সা লাভ হইবে। আমরা দেখিলাম অনেক যাত্রী আমাদের ঘরে আসিয়া পড়িল। অগত্যা তল্পী

তাম্বু গুটাইয়া সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রের ভিতরই গুপ্তকাশী হইতে রওনা হইতে হইল। পূর্ব্বে এরূপ হইবে জানিতে পারিলে কিছুক্ষণ দেরী করিয়াই আহারাদি করিতাম, কেননা পাক ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দোকানদারের তুলিয়া দিবার সাধ্য নাই। সেই অনলবর্ষী প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে আমরা কয়েকটী প্রাণী গুপ্তকাশী হইতে নিক্রান্ত হইলাম। কিছুদূর চলিয়া একটী বৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। পথশ্রমের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বৃক্ষমূলে উপাধানহীন প্রস্তরশয্যায় শয়নমাত্রেই নিদ্রাদেবী কৃপা করিলেন। পর্ব্বত ভ্রমণে আর যাহা কিছু হউক নিদ্রার অভাব ছিল না। যেমন করিয়া যে অবস্থাতেই দেহটাকে লম্বা করা গিয়াছে, করুণাময়ী নিদ্রাদেবী সেই অবস্থাতেই করুণাদানে বঞ্চিত করেন নাই। সুসিদ্ধ অথবা অর্দ্ধসিদ্ধ যেরূপ আহারেই উদর তৃপ্তি হউক, যেমন তেমন ভাবে একবার সটান পড়িতে পারিলেই নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইয়া যায়। কতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিলাম জানি না। সঙ্গীদ্বয়ের আহবানে উঠিয়া বসিলাম। বেলা তখন অপরাহ্ণ প্রায়। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিমের পাহাড়ে ডুবিয়া যাইতেছেন। অধিক বেলা নাই দেখিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইলাম। কয়েকটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটী বালিকা ছিল। বালিকা সকলের আগে আগে চলিয়াছে। চড়াই উৎরাইটা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া আজ আমাদের পরিত্যক্ত একটী চড়াই দেখিয়া বালিকা রুদ্ধকণ্ঠে তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল "মা আর একটী চড়াই।" আহা! সরলা বঙ্গবালিকা কোনদিন গৃহের বাহির হয় নাই, সমতল রাস্তার কি কষ্ট তাহাই জানে না তাহা আবার পাহাড়ের চড়াই—হয় ত মায়ের সঙ্গে নবীন উল্লাসে মাতিয়া একটা নূতন দেশ দেখিতে আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল দেশের মত রাস্তাতেই মায়ের সঙ্গে আনন্দে ছুটিয়া যাইবে। কোন কষ্ট হইবে না কিন্তু এই দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, হয় ত তাহার দেশভ্রমণের আনন্দ প্রবল দুঃখে পরিণত হইয়াছে। তাই একটী সামান্যমাত্র চড়াই দেখিয়াই তাহার স্নেহময়ী জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "মা আর একটী চড়াই।" মাতাও মেয়েকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত

করিলেন। আমরা এই দৃশ্য দেখিয়া নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গুপ্তকাশী হইতে ১॥০ দেড় মাইলে নালাচটী। কেদারনাথ দর্শন করিয়া যাত্রীগণ এই স্থান হইতে উখীমঠ হইয়া বদরিকাশ্রমের পথে গমন করে। নালাচটী হইতে দুই মাইলে মোতাদেবীর মন্দির এবং আরও দুই মাইলে নারায়ণ কোটী পাওয়া যায়। এখানে নারায়ণের মন্দির এবং আরও কয়েকটী মন্দির আছে। তথা হইতে প্রায় দুই মাইলে ওৎরাই নামিয় বেবেঙ্গ চটী। এখানে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। ঝরণা বলিয়াই অনুমান হয়। চড়াই রাস্তায় প্রায় তিন মাইল চলিয়া মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির পাওয়া গেল। মন্দিরের প্রাঙ্গণটী বেশ বাঁধান এবং একপার্শ্বে একটী দোল্‌না আছে। যাত্রীরা দোল খাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। আমাদিগকেও দোল খাইতে তথাকার পাণ্ডা অনুরোধ করিল। আমরা সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলাম এবং প্রায় ১ এক মাইল চলিয়া ফাটাচটী নামক একটী উত্তম চটী পাইলাম। এই চটীতে অনেকগুলি দোকান এবং একটী ধর্ম্মশালা আছে। আমরা একটী দোকানে আশ্রয় ঠিক করিয়া বাহিরে ঘুরিতে লাগিলাম। বাজারের মধ্যে একটী ঝরণা আছে তাহাতেই সকলের জলের কাজ হইয়া যায়। আমরা বাহিরে একটী সুন্দর স্থানে বসিলাম। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয় নাই। বিহঙ্গকুলের হর্ষকাকলী তখনও শ্রুতিগোচর হইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশ্রেণী ভীষণাকার দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সান্ধ্যপবন হেলিয়া দুলিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিয়া বেড়াইতেছে। বিশ্বেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, এবং আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। পরদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রিয়সঙ্গী জীবনসহচর সেই বাশযষ্টি হস্তে রওনা হইলাম। কয়েকটী ছোট চটী অতিক্রম করিয়া রামপুর নামক একটী সুন্দর চটী পাওয়া গেল। এ চটীতে অনেকগুলি দোকান আছে। চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

কলিকাতা, ২৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেস হইতে

শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১৩২১ ১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীগুরুদাস সান্ন্যাল, শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, চৈত্র সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি,পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে চৈত্র মাসের সংখ্যাই ভি, পি করিব। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:•:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখক-গণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ, ভা! সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora.) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অঞ্জলি।

Mohila Press, Calcutta.

শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১৩২১ ১০ম সংখ্যা।

আলোচনা।

স্ত্রীশিক্ষা।

আজকাল স্ত্রীশিক্ষা না হইলে ঘরসংসার একেবারে অচল হইয়া উঠে। ইহাই সকলের ধারণা হইতেছে। আমরা কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দুই একখানি বাঙ্গাল্য বহি এবং দুই-এক পাতা ইংরাজী পড়াইলে কি স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে? সাধারণে তাহা মনে করিলেও আমরা কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলিয়াই স্বীকার করি না। আমরা আমাদের সমাজের স্ত্রীশিক্ষার কথাই বলিতেছি। যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিতা হন মনে করেন, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। তাহাও প্রকৃত শিক্ষা কিনা সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। সে যাহা হউক, আমরা যখন সে সমাজের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না, তখন তাহার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সমাজে যে ভাবের স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। সে শিক্ষা আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তি মাত্র। আমরা দেখিতেছি আমাদের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইয়াই বরঞ্চ ঘর সংসারকে অচল করিয়া তুলিতেছে। নাটক উপন্যাস পড়িবার বিদ্যা হইলেই যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল ইহা বাতুল ও মূর্খেরই কথা, কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকেরা ইহা অপেক্ষা আর কিছু শিখিতে পারিতেছে কি? অবশ্য স্ত্রীলোকেরা কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে শিখিলে সংসারের সাহায্য হয় বটে, কিন্তু কেবল তাহা কবিতা লেখা ও উপন্যাস পাঠে পর্য্যবসিত হইলে তাহাতে সংসারের অপকার ভিন্ন উপকার

হয় না। স্ত্রীলোকেরা যদি বালক বালিকাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে আরম্ভ করে এবং সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখিতে শিখে, তাহা হইলে সংসারের প্রকৃত সাহায্য হয়। কিন্তু যদি কোন সংসারের পুরুষেরা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সেই ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলে সে সংসারের অবস্থা যে একেবারে সুখকর হয় তাহাও বলা যায় না। পুরুষের কার্য্যই বালক বালিকার শিক্ষা প্রদান ও সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখা। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পুরুষেরা যদি সমস্ত সময় তাহাতে ব্যয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই সেই বিষয়ে স্ত্রীলোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেরূপ স্থলে স্ত্রীলোকের শিক্ষার কিছু কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। কেবল লেখাপড়া মাত্র অভ্যাসকেই যে শিক্ষা বলা যায় তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকের কিছু কিছু লেখা পড়া অভ্যাস করা প্রয়োজন বটে, তবে তাহার সহিত যদি পতিকুলের ব্যক্তিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার, সন্তানপালন, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্র-গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবার আয়োজন ও পাচক ব্রাহ্মণের প্রতি সম্পূর্ণ ভার অর্পণ না করিয়া আপনাদেরও তাহার অংশগ্রহণ প্রভৃতির শিক্ষালাভ হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষাই সম্পূর্ণ বলিয়াই এক্ষণে মনে হয়। আজকাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে নানারূপ আধিব্যাধির আবির্ভাব হইতেছে তাহার কারণ সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাব। এই সম্পূর্ণ শিক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবার ফিরিয়া না আসিবে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গল নাই।

বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাব।

নানাপ্রকার ব্যাধিতে আমাদের দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। লোকে অল্পায়ু হইতেছে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহার একটী প্রধান কারণ, বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাব। দুগ্ধ আমাদের জীবনরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায়। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তাহারই ব্যবহার অধিক পরিমাণে করিতে হয়, কিন্তু খাঁটীদুগ্ধ মিলিবার উপায় নাই। গৃহে গোপালন করিয়া

দুগ্ধের ব্যবস্থা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দূষিত জলসংযুক্ত দুগ্ধ জন্মমাত্র হইতে সেবন করিয়া শরীরের মধ্যে যে সমস্ত রোগের বীজ প্রবেশ করে তাহাতেই ক্রমে আমরা আক্রান্ত হইয়া উঠিতেছি। বিশুদ্ধ ঘৃত পাইবার উপায় নাই, তাহাতে কত জন্তুর যে চর্ব্বি মিশ্রিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এইরূপ ঘৃত সেবন করিয়া পরিপাক শক্তি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে। বিশুদ্ধ তৈলও পাওয়া সুকঠিন, সর্পাদির সহিত নানাবিধ বীজ মিশ্রিত করিয়া তৈল হইতেছে, সে তৈলও সহজে পরিপাক হয় না। দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল ইহাই আমাদের প্রধান খাদ্য ও জীবনধারণের উপায়, তাহাদের অবস্থা এইরূপ। তদ্ভিন্ন ময়দা, ডাল প্রভৃতি খাদ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া পারিপাক শক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" এই অবস্থা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহার প্রতীকারের উপায় না হইলে ক্রমে ক্রমে আমরা যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমাদের জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বের নূতন আবিষ্কার।

এতকাল পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর সেন রাজগণের রাজধানীরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নদিয়া জেলার দেবগ্রামের নিকটস্থ বিক্রমপুরকে সেনবংশের রাজধানী বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। তথায় বল্লাল সেনের কোন কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। যদি তাহার স্থানে স্থানে খনন করিয়া সেনবংশের কোন কোন কীর্ত্তি চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা যে প্রত্নতত্ত্বের একটী নূতন আবিষ্কার তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার আবিষ্কৃত বিষয় আগামী সাহিত্য সম্মিলনীতে পাঠ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমরা তাহার সম্পূর্ণ তথ্য জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

এক সময়ে সম্মিলনীর ছড়াছড়ি।

এবার গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে বলিয়া জানা যাইতেছে। এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপ অধিবেশনে সকলে যে যোগ দিতে পারেন না ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমরা অনেক সময়েই দেখি যে এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, উদ্যোগকারিগণ কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। কোনরূপে অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া সংবাদপত্রে তাহার সংবাদ ছাপাইলেই যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে এরূপ অধিবেশন না করাই ভাল। সকলে যাহাতে যোগ দিতে না পারে এবং সকলে যাহা হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত না হয়, তাহার অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উদ্যোগকারিগণকে আমরা এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

কোন্‌টি মধুর ?

উপাসনা ক্ষেত্রে আমরা শান্ত, সখ্য, দাস্ত, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে ঈশ্বরের সহিত মাতা, পিতা, সখা, প্রভু, অপত্য ও কান্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইয়া থাকি। অধিকারী ভেদে যে কোন ভাবের যে কোন একটী সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়। সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে উপাসনাক্ষেত্রে প্রবেশ করা কঠিন হইয়া উঠে। উপাসনা রাজ্যের প্রথম স্তর বাহ্যপূজা, তাহার পর জপ যজ্ঞ ও ধ্যানধারণা, সর্ব্বশেষে মানস পূজার অধিকার জন্মে। এই বাহ্যপূজাতেই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন, এবং তাহাও যে অতীব গুরুতর আমরা নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সাধন প্রদীপ গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে।

শিষ্য। আপনার অনুগ্রহে আমাদের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইয়াছে।

'উত্তমা মানসী পূজা' এই বচনটীর অর্থ সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে বুঝিয়াছি, মানসিক পূজার ধ্যানধারণা ও জপযজ্ঞের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়া তাহা যে আমাদের ক্ষমতাতীত, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনধিকারী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্যপূজা বিষয়ে কি কারণে আমাদের অধিকার নাই তাহা বুঝিতে পারি নাই, এবং আমরা সাধারণতঃ যেরূপ বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা যদি প্রকৃত বাহ্যপূজা না হয়, তবে প্রকৃত বাহ্যপূজা কি? তাহাও জানি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দুইটী বিষয় বুঝাইয়া দেন।

আচার্য্য। সচরাচর নিত্য নৈমিত্তিক যে সমস্ত পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা কোন পূজার মধ্যেই যে গণনীয় হয় না তাহা সত্য, এবং অধিকাংশ লোকেই যে বাহ্যপূজার অনধিকারী তদ্বিষয়েও সংশয় নাই। যাহা অনুষ্ঠিত হয় উহা কেবল বাহ্যপূজার একটা প্রতিকৃতি মাত্র। বাহ্যপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃতভাব ও প্রকৃত নিয়ম প্রণালী ও প্রকৃত লক্ষণের সহিত উহার কিছুমাত্র সংশ্রব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহা দ্বারা কিছুমাত্র ফলের আশা করা যায় না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর, তবেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

'অথাতঃ সং প্রবক্ষ্যামি পূজায়া লক্ষণাদিকং।
আদৌ সম্বন্ধসংস্কারঃ কর্ত্তব্যোঽতি প্রযত্নতঃ।
স চ ষোঢ়াভবেৎ রাজন্ মাতৃত্বাদিবিভেদতঃ।
মাতৃত্বং জনকত্বঞ্চ প্রভুত্বং সখিতা তথা।
কান্তভাবোঽপত্যভাব ইত্যেবং ষড়্‌বিধোমতঃ।
যস্মিন যেনাধিকঃ স্নেহঃ মাত্রাদিষনুভূয়তে।
স চ তেনৈব ভাবেন যোজয়েৎ পর দেবতাং।
সদা তদ্ভাবনিরতস্তদ্ধেতু পরিচিন্তকঃ।
দৃঢ়ী কুর্য্যাৎ তথা ভাবং যথাদৃষ্টসুতাদিষু।
এবং কৃতেঽধিকারঃ স্যাৎ পূজায়াং নরপুঙ্গবঃ।
পূজাচ তৎস্নেহভাবাৎ পরিচর্য্যাদিকা ক্রিয়া।' ইত্যাদি।

ভাবার্থ—বাহ্যপূজার প্রকৃত অধিকার কি হইলে হয় এবং তাহার

প্রকৃত লক্ষণাদি বলা যাইতেছে। উপাসনা ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে জগদম্বার সহিত কোন একটী সম্বন্ধ সংস্কার করিয়া লওয়ার আবশ্যক, নতুবা উপাসনার অধিকার জন্মে না। সম্বন্ধ সংস্কারের নিয়ম এই, মাতৃত্বাদি ভেদে তাঁহার সহিত জীবের ছয়টী সম্বন্ধ হইতে পারে। যথা মাতৃত্ব পিতৃত্ব, প্রভুত্ব, সখিত্ব, স্বামিত্ব, ও অপত্যভাব। এই ছয়টী সম্বন্ধের মধ্যে যেটীর প্রতি যাহার হৃদয়ের আকর্ষণ থাকে তিনি সেইটীকেও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবেন। যাহার মাতার প্রতি অধিকতর মমতা, তিনি তাঁহাতে মাতৃভাব সংস্থাপন করিবেন। যাহার পিতৃস্নেহ অধিক তিনি পিতৃভাব, যিনি প্রভুর প্রতি মমতা সম্পন্ন, তিনি প্রভুভাব, যিনি বন্ধুপ্রেমিক তিনি বন্ধুভাব, কান্ত প্রেমিক কান্তভাব, এবং অপত্যবৎসল অপত্যভাব সংস্থাপন করিবেন। তন্মধ্যে শাক্তগণের কেবল মাতৃভাব এবং কন্যাভাব ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ সম্ভবে না। এবং শৈবের কেবল পিতৃভাব মাত্র। বৈষ্ণবের প্রভুভাব, কৃষ্ণমন্ত্রীর স্বামিভাব ও সখিভাব, গোপালমন্ত্রীর কেবল অপত্যভাব ব্যতীত আর কিছু সম্ভবে না। অতএব ইহার মধ্যে যাহার যেটী প্রিয়তম তিনি সেইটী সুদৃঢ়রূপে অভ্যাস করিবেন। যাঁহাকে যে সম্বন্ধের সংস্থাপন করিতে হইবে তিনি সর্ব্বদা তাহার ক্রিয়া ও কারণাদি চিন্তা করিবেন। যিনি মাতৃভাবপরায়ণ হইবেন তিনি সর্ব্বদা জগদম্বার মাতৃত্বের চিন্তা করিবার অর্থাৎ কি কারণে তিনি মাতা এবং মাতার ন্যায় কোন্ ক্রিয়া সাধন করিতেছেন্ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অবিকল্পিত যথার্থ মা বলিয়া ধারণা করিবেন এবং যাঁহাকে পিতৃভাব সংস্থাপন করিতে হইবে, তিনি অবিকল্পিত পিতা বলিয়া ধারণা করিবেন। প্রভুত্বাদি সম্বন্ধেও এই প্রকারই করিতে হইবে। এইরূপে এক একটী সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে বাহ্যপূজার প্রকৃত অধিকার জন্মিয়া থাকে। সম্বন্ধে অকপট বিশ্বাসী হইয়া পূজার অধিকারী হইবে। দৃশ্য মাতা পিত্রাদির ন্যায় মমতা পরবশ হইয়া জগদম্বার উপযুক্ত পরিচর্য্যা করাকেই বাহ্যপূজা বলে।”

সুতরাং প্রকৃত বাহ্য পূজা করিতে যে সকলেই সমর্থ নহে ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। তবে পুরাণেতিহাসে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই সেই ভাবে তাঁহার অর্চ্চনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার মধুর ভাবের বা কান্ত সম্বন্ধের উপাসনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুরাণাদিতে ব্রজগোপিকাদের সম্বন্ধে এই ভাবের উপাসনা কিছু পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত হইয়াছে, এবং সাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রে "অতএব তদভাবাদ্বল্লবী নাম্" ও নারদ ভক্তিসূত্রে "যথা ব্রজগোপিকনাম" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহার সমর্থন করাও হইয়াছে। ভগবানের সহিত যে যে ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় তাহা যে স্বাভাবিক উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত সম্বন্ধের কোনটীকে যদি অস্বাভাবিক উপায়ে স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় ইহাই বিবেচ্য। মনে করুন, উপাসক যদি আপনাকে পোষ্যপুত্র কল্পনা করিয়া উপাস্যকে পোষক পিতা স্থির করে, তাহা হইলে প্রকৃত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা তাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে কি না? অথবা যদি জগদম্বাকে জননী মনে না করিয়া ধাত্রীর সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহা যে একটু বক্রপথ হয়, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেইরূপ ভগবানকে পতি না ভাবিয়া যদি উপপতি ভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সে উপায় যে অস্বাভাবিক ও বক্র তাহা বলিতেই হইবে। কিন্তু প্রচলিত পুরাণাদিতে এই অস্বাভাবিক ও বক্রভাবেরই কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

"তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি: সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীবন্ধনাঃ॥"

অর্থাৎ উপপতি বোধেও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া গোপপত্নীরা মায়ামুক্ত হন। ঐ অবস্থায় গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আবার সেই সেই পুরাণে—

"হরি বুদ্ধ্যাতু সেবেত পতিং পতিপরায়ণা।"

অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোকেরা ভগবানের কান্তভাবে সেবায় অসক্ত, তাহারা নিজ স্বামীকে হরিবুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। এই স্বাভাবিক উপায়েরও কথা আছে। সে যাহা হউক, ব্রজগোপিকাগণের জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা আমাদের সমাজে যেন বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য পুরাণাদির অনুকরণে অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদাবলীতে আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে ভগবানকে কামরসের রসিক

করিয়া তুলিয়াছে, এবং তাঁহার সেবিকারাও উক্ত রসের রসিকারূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানে অজ্ঞানমূলক কামরস যে থাকিতে পারে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে সাধন প্রদীপ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

"তবেই জানা গেল যে, যতক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ মোহ, ততক্ষণই কাম আর তাহার চতুঃষষ্টি রস রঙ্গে বিরঙ্গে বিরাজ করিতে থাকে, কিন্তু বিবেকী পুরুষকে দেখিয়া উহা দূর হইতে পলায়ন করে, তাঁহাদের দৃষ্টিতে উহা ঘোরতর নরকের বিষয়, আবার প্রজনন শক্তিরূপ মাতৃপিতৃ শক্তি কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত, উহা জ্ঞানীরই ধন, জ্ঞানীরই সম্পত্তি, জ্ঞানিগণই তাহা দেখিতে পান; তাঁহারাই বুঝিতে পান, তাহার আদরও তাঁহারাই করেন, কিন্তু মূর্খ তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। * * প্রজননশক্তি স্বর্গের আদরণীয় পদার্থ। আর কামশক্তি আর তাহার রস নরকের পদার্থ ইহা স্থিরীকৃত হইল, সুতরাং এই দুইএর মধ্যে জগন্মাতা জগৎপিতার এই অজ্ঞানমূলক কামশক্তি বা তাহার রসের নাম গন্ধও নাই, আছে কেবল বিশুদ্ধ প্রজননশক্তিরূপ পিতৃমাতৃশক্তি ইহা জানাগেল।

* * * *

শিষ্য।—আপনার উপদেশমতে আদিরস কামবিকার তাহা স্বীকার করিলাম, পরমেশ্বরে তাহা থাকিতে পারে না ইহাও বুঝিলাম, কিন্তু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত অথবা লীলা প্রকটনের জন্য কিংবা সুখাস্বাদের জন্য নিজে ইচ্ছা করিয়া যদি কিছুকালের জন্য অলিপ্তভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা হইলেও কি দোষ আছে?"

আচার্য্য।—(সস্মিত) বাবা তোমার একথাটী একবারেই বালকের মত হইল। পরমেশ্বর যদি কামরসকে সুখজনকরূপেই অনুভব করিয়া কিছু কালের জন্য তাহার আলিঙ্গন করিবেন তবে আবার তাঁহার ঈশ্বরত্ব রহিল কোথা? সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানময় ঈশ্বরত্ব থাকিতে তিনি অজ্ঞান মোহ পরিকল্পিত রসকে কেমন করিয়া সুখময়রূপে অনুভব করিবেন? আর কেমন করিয়াই বা তাহা লইবেন? তৎপর ভক্তের সাধপূরণের জন্যই যদি তাঁহাকে লীলাই করিতে হয় তবে অজ্ঞানজ রস ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রজননশক্তি হইতে কি লীলা

খেলা সম্পন্ন হইতে পারে না ? তাহা অবশ্যই পারে। অতএব তিনি কামরস যে চান না, ইহা মনে মনে স্থির করিবে।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ কি তবে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি নহেন ?

আচার্য্য। ব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ কমলাপতি নারায়ণ পরমেশ্বর নহেন, একথা কোন্ ব্রাহ্মণ বলিবেন ?

শিষ্য। তাঁহাতে ঐ কামমূর্ত্তি আদিরস নাই ?

আচার্য্য। কদাপি নাই;—কস্মিন্‌কালেও নাই। সেবিকাগণেও যে কামরস থাকা উচিত নহে, সে বিষয়েও সাধন-প্রদীপের মত উল্লেখ করা যাইতেছে।

শিষ্য। স্ত্রীলোকেরা যদি কান্তভাবে উপাসনা করে ?

আচার্য্য। স্ত্রীলোকেরা কান্তভাবে চিন্তা করিলেই যে, কামরসের চিন্তা করিবে, তাহা তুমি বুঝিলে কিসে ? তাহারা কামরস বাদ দিয়া সেই পুষ্পাদি যাবৎ পদার্থে বিরাজমান অকলঙ্ক প্রজনন-শক্তির অনুধ্যান করিয়া কান্তভাব করিতে পারে না কি ? দ্বিতীয়তঃ, তাহাতেওত নিজের স্বামী হইতে পৃথক্‌রূপে তাঁহাকে পতি চিন্তা করার ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু নিজস্বামীকেই হরিবুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের কান্তভাব সুসিদ্ধ হইল এরূপ ব্যবস্থা আছে।—

'হরিবুদ্ধ্যা তু সেবেত পতিং পতিপরায়ণা'। (ভাগবত)।

অর্থ,—যে সকল স্ত্রীলোকেরা ভগবান্‌কে কান্তভাবে সেবায় আসক্ত, তাহারা নিজ স্বামীকেই হরিবুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে, কিন্তু পৃথক্‌ভাবে নহে; তাহা না করিলে তাহাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ব্যভিচার হয়, অতএব সে স্থলেও কোন মতেই কোন দোষ নাই।

শিষ্য। তবে গোপীগণ বিষয়ে কি হইবে ?

আচার্য্য। গোপীগণ যে, ভগবানের প্রজননশক্তি না দেখিয়া কামরসের চিন্তা করিতেন, ইহা তুমি কোথায় পাইলে ? আর ভগবান যে তাঁহাদের স্বামী নহেন, তাহাই বা কিসে বুঝিলে ? রাধিকাদি মূর্ত্তিকে কি তুমি সত্য সত্যই গোয়ালার পত্নী মানুষী বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাও ? অথবা হরিপ্রিয়া বলিয়াই ধারণা রাখ ? যদি তাদৃশী মানবী রূপে বিশ্বাস কর, তবে তোমার তাঁহাদের

পূজারাধনাদি করা সমস্তই বৃথা; আর যদি তাঁহাদিগকে হরিপ্রিয়া বলিয়াই বিশ্বাস রাখ, তবে আবার হরি তাঁহাদের অন্তপতি কি প্রকারে হইবেন? তাহা হইলেত হরিই তাঁহাদের পতি এবং আপন পতিকেই তাঁহারা পতি বলিয়া আরাধনা করিতেন—এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইল। বোধ হয় এই পক্ষই তোমার অভিমত হইবে। অতএব আপন পতিকেই হরিজ্ঞানে সেবা করা নারীদিগের কান্তভাবের আরাধনা ইহা বুঝিতে হইবে। তবেই সর্ব্বথা ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, পরমেশ্বরে কখনও কামরস নাই, এবং তাহা চিন্তা করিলেও অধঃপতিতই হইতে হইবে। কিন্তু তাঁহাতে আছে, সেই পরম পবিত্র প্রজননশক্তিরূপ পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তি। অতএব তাঁহাকে যাঁহারা রসময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; তাঁহারা অকলঙ্ক মাণিকে কলঙ্কারোপ করেন।

উপরোক্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভগবানে কামরস নাই এবং উপাসিকারাও তাঁহাকে কামভাবে বা উপপতিরূপে চিন্তা করিবেন না। স্বীয় পতিকে হরিবুদ্ধিতে সেবা করিবেন, আর রাধিকাদি গোপিকা সত্য সত্যই গোপপত্নী নহেন, তাঁহারা হরিপ্রিয়া। গৌতমীয় তন্ত্রে গোপী শব্দে প্রকৃতি এবং জন শব্দে তত্ত্বসমূহ বলা হইয়াছে।

"গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকম্।
অনয়োরাশ্রয়ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥"

দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে,—

"গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা-স্মৃতা।"

সুতরাং প্রকৃত গোপপত্নীগণের সহিত ভগবানের লীলা কতদূর সঙ্গত, তাহা সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদিও পুরাণাদিতে শিশুপালাদির শত্রু-ভাবে চিন্তার ন্যায় গোপপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিভাবে চিন্তায় তাহাদের মুক্তি অসম্ভব নহে, এবং ঈশ্বর বা শক্তিমানগণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ বা সাহস বহ্নির তুল্য তেজস্বী তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নহে বলিয়া কামলীলাসক্ত শ্রীকৃষ্ণের সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও ঐ প্রকার লীলা যে অস্বাভাবিক, বক্র ও বীভৎস ভাবের চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে যদি শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে সেই গোপনারীগণ গোপপত্নী না হইয়া গোপ কুমারী হইতে পারেন কি না, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রাচীন মহাকবি ভাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বন করিয়া 'বালচরিত' নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাসের গ্রন্থাবলী এতদিন লুপ্ত ছিল, সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর হইতে তাহা আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসকে চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় মহাশয় কালিদাসকে চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থির করিয়া কালিদাসের গ্রন্থে ভাসের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে চাণক্য অপেক্ষা আরও প্রাচীন স্থির করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চাণক্য খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। আবার আমাদের দেশীয় গ্রন্থকারগণের মতে সপ্তর্ষিমণ্ডল এক এক নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থিতি করায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ও নন্দবংশের রাজত্বকালে পূর্ব্বাষাঢ়ায় থাকায়, এবং নন্দবংশের রাজত্বকাল শত বৎসর হওয়ায়, চাণক্যের সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এগার শত বৎসর পরে স্থির হয়। তাহা হইলে ভাস চাণক্য অপেক্ষা আরও প্রাচীন হইলে, দেশীয় গ্রন্থকারগণের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সহস্র বৎসর মধ্যে তিনি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার লিখনভঙ্গিও প্রাচীন ঋষিদিগের তুল্য বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ভাসের বর্ণিত কৃষ্ণলীলা যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহু পরে রচিত হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভাস উক্ত লীলাসম্বন্ধে কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"দামকঃ—মাদুল! সব্বং দাব চিট্ঠদু। অজ্জ ভট্টি দামোদলো ইমস্‌সিং বুন্দাবণে গোবকণ্ণআহি সহ হল্লীসঅং ণাম পকীলিদুং আঅচ্ছদি। (মাতুল! সর্ব্বং তাবৎ তিষ্ঠতু। অদ্য ভর্ত্তৃদামোদরোঽস্মিন্ বৃন্দাবনে গোপকন্যকাভিঃ সহ হল্লীসকং নাম প্রক্রীড়িতুমাগচ্ছতি।)

বৃদ্ধগোপালকঃ—তেণ হি সব্বেহি গোবজণেহি সহ ভট্টিদামোদলস্‌স হল্লীসঅং পেক্‌খন্ধ। (তেনহি সর্ব্বৈঃ গোপজনৈঃ সহ ভর্ত্তৃদামোদরস্য হল্লীসকং পশ্যামঃ।)

দামকঃ—জং মাদুলো আণবেদি। (যৎ মাতুল আজ্ঞাপয়তি।)

(নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ।

(প্রবিশ্য)

বৃদ্ধগোপালকঃ—

অণুদিঅমত্তে সুয্যে পণমহ সব্বাদ(পে?)লেন সীসেণ।
ণিচ্চং জগমাদুণং গোণাণং অমিদপুণ্ণাণং ॥

অহো অহ্মাণং পক্কণাণং সমিদ্ধী। আডোবসজ্জাও পডহরূববেসাও বাহরিদুং গচ্ছামো। অহ্মাঅং গোবকণ্ণআও! ঘোসসুন্দরি! বনমালে! চন্দলেহে! মিঅক্খি! আঅচ্ছহ! আঅচ্ছহ! সিগ্‌ঘং। (অনুদিতমাত্রে সূর্য্যে প্রণমত সর্ব্বাদরেণ শীর্ষেণ। নিত্যং জগন্মাতৄণাং গবামমৃতপূর্ণানাম্ ॥ অহো অস্মাকং পত্তনানাং সমৃদ্ধিঃ। অটোপসজ্জাঃ পটহরূপবেসা ব্যাহর্ত্তুং গচ্ছামঃ। অস্মাকং গোপকন্যকাঃ! ঘোষসুন্দরি! বনমালে! চন্দ্ররেখে! মৃগাক্ষি! আগচ্ছতাগচ্ছত শীঘ্রম্)

(ততঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বাঃ)

সর্ব্বাঃ—মাদুল! বন্দামো। (মাতুল!) বন্দামহে।)

বৃদ্ধগোপালকঃ—দালিআ! এসো ভট্টা দামোদলো গোক্খীরপণ্ডরেণ ভট্টিণা সঙ্কলিসণেণ সহ গোবালএহিঅ পরিবুদো গুহাণিক্খিত্তো সিংহো বিঅ ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। (দারিকাঃ! এষ ভর্ত্তা দামোদরঃ গোক্ষীরপাণ্ডরেণ ভর্ত্ত্রা সঙ্কর্ষণেন সহ গোপালকৈশ্চ পরিবৃতঃ গুহানিক্ষিপ্তঃ সিংহ ইবেত এবাগচ্ছতি।)

(ততঃ প্রবিশতি গোপজনপরিবৃতো দামোদরঃ সঙ্কর্ষণশ্চ)

দামোদরঃ—(সবিস্ময়ম্) অহো প্রকৃত্যা রমণীয়ানাং গোপকন্যকানাং বেষগ্রহণবিশেষঃ।

এতাঃ প্রফুল্লকমলোৎপলবক্ত্রনেত্রা
গোপাঙ্গনাঃ কনকচম্পকপুষ্পগৌরাঃ।
নানাবিরাগবসনা মধুরপ্রলাপাঃ
ক্রীড়ন্তি বন্যকুসুমাকুলকেশহস্তাঃ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—এতে গোপদারকাঃ সমাগতাঃ।

রক্তৈর্বেণুকডিণ্ডিমৈঃ প্রমুদিতাঃ কেচিন্নদন্তঃ স্থিতাঃ

কেচিৎ পঙ্কজপত্রনেত্রবদনাঃ ক্রীড়ন্তি নানাবিধম্।

ঘোষে আগরি (মা ?) তা গুরুপ্রমুদিতা হুম্ভা(র ?)শব্দাকুলে

বৃন্দারণ্যগতে সমপ্রমুদিতা গায়ন্তি কেচিৎ স্থিতাঃ॥

বৃদ্ধগোপালকঃ—আম ভট্টা! সব্বা সন্নদ্ধা আঅদা।

(আম ভর্ত্তঃ! সর্ব্বে সন্নদ্ধা আগতাঃ।)

দামকঃ—জেদু ভট্টা। (জয়তু ভর্ত্তা।)

সঙ্কর্ষণঃ—দামক! সর্ব্বে গোপদারকাঃ সমাগতাঃ।

দামকঃ—আম ভট্টা! সব্বে সন্নদ্ধা আঅদা। (আম ভর্ত্তঃ সর্ব্বে সন্নদ্ধা আগতাঃ)!

দামোদরঃ—ঘোষসুন্দরি! বনমালে! চন্দ্ররেখে! মৃগাক্ষি! ঘোষবাসস্যানুরূপোঽয়ং হল্লীসকনৃত্যবন্ধ উপযুজ্যতাম।

সর্ব্বাঃ—জং ভট্টা আণবেদি (যৎ ভর্ত্তাজ্ঞাপয়তি)।

সঙ্কর্ষণঃ—দামক! মেঘনাদ! বাদ্যন্তামাতোদ্যানি।

উভৌ—ভট্টা! তহ। (ভর্ত্তঃ! তথা।)

বৃদ্ধগোপালকঃ—ভট্টা! তুম্হে হল্লীসঅং পকীলন্তি। অহং এত্থ কিং করোমি। (ভর্ত্তঃ! যূয়ং হল্লীসকং প্রক্রীড়য়। অহমত্র কিং করোমি।)

দামোদরঃ—প্রেক্ষকো ভবান্ ননু।

বৃদ্ধগোপালকঃ—ভট্টা! তহ। (ভর্ত্তঃ! তথা।)

(সর্ব্বে নৃত্যন্তি)

বৃদ্ধগোপালকঃ—হী হী সুট্ঠু ইদং। সুট্ঠু বাইদং। সুট্ঠু ণচ্চিদং। জাব অহং বি ণচ্চেমি। পরিস্সন্তো খু অহং। (হী হী সুষ্ঠু গীতম্। সুষ্ঠু বাদিতম্। সুষ্ঠু নর্ত্তিতম্। যাবদহমপি নৃত্যামি। পরিশ্রান্তঃ খল্বহম্।)

ইহার ভাবার্থ এই যে, একটি গোপালক আর একটি বৃদ্ধ গোপালককে বলিতেছিল যে, দামোদর বৃন্দাবনে গোপকন্যাদের সহিত হল্লীসক ক্রীড়া বা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে আসিতেছেন; সুতরাং সকলের অবস্থান করা উচিত। বৃদ্ধ গোপালক তাহাতে সম্মত হইয়া গোপজন সকলের সহিত তাহা দেখিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহার পর সেই বৃদ্ধ গোপালক সূর্য্যোদয় হইতে

না হইতে মস্তক অবনত করিয়া জগন্মাতা অমৃতপূর্ণা গবীদিগকে প্রণামের পর গর্ব্বাড়ম্বরবেশা গোপকন্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, ঘোষসুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি, শীঘ্র শীঘ্র এস। তাহারা আগমন করিলে বৃদ্ধ গোপালক বলিতে আরম্ভ করিল,—কন্যাগণ, আমাদের ভর্ত্তা দামোদর গোক্ষীর-শ্বেত ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের সহিত গোপালগণে পরিবৃত হইয়া গুহানিক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় এখানে আসিতেছেন। তাহার পর কৃষ্ণবলরাম গোপগণে পরিবৃত হইয়া সেখানে আসিলেন। গোপকন্যাগণকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—আহা! স্বভাবতঃ রমণীয় গোপকন্যাগণ আবার বিশেষভাবে বেশ ধারণ করিয়াছে। প্রফুল্লকমলোৎপলের ন্যায় বক্রনেত্রে শোভিতা কনকচম্পক পুষ্পের ন্যায় গৌরবর্ণা নানা বিচিত্র বসনে ভূষিতা মধুরভাষিণী এই গোপাঙ্গনাগণ বন্যকুসুমাকুল কেশপাশে হস্ত প্রদান করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বলরাম গোপ-বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—এই যে, গোপ বালকেরাও সমাগত হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আনন্দে রক্তবর্ণ ডিণ্ডিমাদি বাদ্য লইয়া শব্দ করিতেছে। কেহ কেহ বা পঙ্কজপত্রনেত্রে শোভিত বদনে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বাদ্য যন্ত্রের শব্দে বৃন্দাবন ধ্বনিত হওয়ায় তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ কেহ অত্যন্ত আনন্দিত এবং কেহ কেহ বা সমানন্দিত হইয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ গোপালকটি বলিল—ভর্ত্তা, সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। গোপালক দামক আসিয়া কৃষ্ণবলরামের জয়োচ্চারণ করিল। বলরাম দামককে কহিলেন,—গোপবালক সকলে সমাগত হইল কি? দামক উত্তর করিল যে, সকলেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপকন্যা-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ঘোষসুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি, ঘোষবাসের অনুরূপ হল্লীসক নৃত্যবন্ধ আরম্ভ কর। যাহা ভর্ত্তা আজ্ঞা করেন বলিয়া তাহারা উত্তর দিল। বলরাম দামক ও মেঘনাদ গোপ বালকদ্বয়কে বীণা, মুরজ, বংশী, করতাল প্রভৃতি বাদ্য করিতে বলিলেন। তাহারাও তাঁহার আদেশপালনে রত হইল। তখন বৃদ্ধ গোপালক বলিয়া উঠিল,—ভর্ত্তা, তোমরা হল্লীসক ক্রীড়া আরম্ভ করিলে, আমি এখানে তবে কি করিব? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—আপনি দর্শক হউন। বৃদ্ধ গোপালক তাহাতেই সম্মত হইল। তখন সকলে মিলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া

আনন্দভরে বৃদ্ধ গোপালক বলিতে লাগিল,—সুন্দর গীত, সুন্দর বাদ্য, সুন্দর নৃত্য হইতেছে। আমারও নাচিতে ইচ্ছা জন্মিতেছে, কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

মহাকবির এই বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণবলরাম গোপ-বালকবালিকাদেরই সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং ইহাই রাসলীলা। মহাকবির লিখিত গোপকন্যকা যে গোপকুমারী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বর্ণনা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ কন্যকা শব্দ কুমারী অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; অমরসিংহ কন্যা শব্দের কুমারী অর্থই লিখিয়াছেন। কন্যকা শব্দের ত্রিকাণ্ডশেষে কুমারী অর্থই লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন স্মৃতির মতে দশম বর্ষীয়া কুমারীকেই কন্যকা বলা হয়।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা"।

কোন কোন স্থলে নারী অর্থে কন্যা ও কন্যকা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা যে কুমারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ভাসের উদ্দেশ্য যে তাহাই, তাহা তাঁহার বর্ণনা হইতে ও দারিকা শব্দাদির প্রয়োগেও বুঝা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে যে গোপাঙ্গনা শব্দ আছে, তাহাতেও গোপপত্নী বুঝায় না। অঙ্গনা শব্দে সুন্দরাঙ্গী স্ত্রী বুঝায়, এবং তাহা স্ত্রী মাত্রেই প্রযুক্ত হয়। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রথমোক্তি গোপকন্যকা শব্দের সহিত তাহার একার্থই করিতে হইবে। সুতরাং ভাসের লিখিত গোপকন্যকা, দারিকা প্রভৃতি শব্দে ও তাঁহার বর্ণনায় তাহাদিগকে যে গোপকুমারী বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুরাণাদির বর্ণনায় দেখা যায় যে, গোপ-পত্নীগণ গুরুজন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে নিবারিত হইয়াছিলেন, ভাসের বালচরিতে দেখা যাইতেছে বৃদ্ধ গোপালক গোপকন্যাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণবলরামের সহিত ক্রীড়ার জন্য লইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাতেও বুঝা যায় যে, তাহারা বলিকা ও কুমারী। ফলতঃ ভাসের বর্ণিত গোপকন্যারা যে কুমারী, তাহা বুঝাইবার জন্য অধিকতর চেষ্টার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভাস ব্যতীত অন্য কোন কোন স্থলেও গোপনারীদিগকে কুমারী বলিয়াও বুঝা যায়। গৌতমীয় তন্ত্রের—

"গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ বৃন্দাবনগতং হরিম্।
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতম্॥
গোগোবৎসগণাকীর্ণং বৃহৎষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ।
অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈ স্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং বিভুম্।"

উহার আর এক স্থলের—

"যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বরভূষাভি র্গোপনারীভিরাবৃতম্।"

এবং সনৎকুমার তন্ত্রের—

"স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাসহস্রশঃ।"

এই উক্তিতে গোপকন্যাদিগকে যে কুমারী বুঝায় না, এমন নহে। তবে তাহাদের লীলা প্রভৃতি ভাসের বর্ণিত ক্রীড়ার ন্যায় মার্জ্জিত নহে; তাহা বলিয়া তাহাদিগকে গোপপত্নী বলা যায় না।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কিশোরবয়স্ক ছিলেন। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কিশোর বয়সের সময়। এই কিশোরবয়স্ক কৃষ্ণের লীলা কিরূপ গোপনারীদের সঙ্গে সম্ভব হয়, তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণিত রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপপত্নীগণের সহিত ক্রীড়া করিলেও তাহা যে কিশোর বয়সের অনুরূপ করিয়াছিলেন, একথা সুস্পষ্ট রূপেই লিখিত আছে।

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ।"

কিশোর কৃষ্ণের যুবতী পুত্রবতী গোপপত্নীগণের সহিত শৃঙ্গার রসের লীলা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বীভৎস বলিয়াই বোধ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা অন্যান্য পুরাণের বর্ণনা অপেক্ষা মার্জ্জিত। ভাসের বালচরিতের সহিত বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক পরিমাণে ঐক্য আছে। রাসলীলা সম্বন্ধের ঐক্যও—

"সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্‌।
জগৌ কলপদং সৌরিনানাতন্ত্রীকৃতব্রতম্‌।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্‌।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।"

এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত "সোঽপি কৈশোরকবয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকে বুঝা যায়। কিন্তু অন্যান্য পুরাণের—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

ইত্যাদি শ্লোকের সহিত উহার—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ॥"

ইত্যাদি শ্লোকের ঐক্যে উহাতেও গোপপত্নীগণের সহিতই রাসলীলা হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণ প্রাচীন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, এবং তাহা যে ঋষিপ্রণীত ইহাও আমরা অস্বীকার করি না। অনেক প্রাচীন মহাপুরুষ বিষ্ণুপুরাণ হইতে আপনাদের গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাসও যে বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বালচরিত রচনা করিয়াছেন, ইহাও বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাঁহার সময়ে বিষ্ণুপুরাণের যে অবস্থা ছিল, তাহার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাও বলিতে হইবে। নতুবা তাঁহার রচিত বালচরিতের হল্লীসক ক্রীড়ার সহিত বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলার অনৈক্য ঘটিত না।

ভাস যে ভাবে গোপকন্যাদের সহিত কিশোর কৃষ্ণের ক্রীড়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে স্বাভাবিক এবং তাঁহার সময়ে আমাদের সমাজে লোকে যে তাহাই জানিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মহাভারতের বর্ণিত শিশুপালের উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে কেবল গোপ, বাক্যঘাতী, স্ত্রীহত্যাকারী ইত্যাদি বলা হইয়াছে! গোপপত্নীগণের সহিত তাঁহার রাসলীলা ঘটিলে, তাঁহাকে লম্পট ও পরদারাসক্ত বলিয়াও অভিহিত হইতে দেখা যাইত। গোপকুমারীদের সহিত তাঁহার বাল্যকালের ক্রীড়া দোষাবহ নয় বলিয়া শিশুপাল তাহার নিন্দা করেন নাই।

এক্ষণে ভাসবর্ণিত লীলা হইতে যদি আমরা বুঝিয়া লই যে, গোপকুমারী-গণই শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাহাই যে স্বাভাবিক, ইহা বোধ হয় অনায়াসে বলা যাইতে পারে। অল্পবয়স্কা কুমারীগণ যদি কোন একটি সুন্দর কুমারকে পতি বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সেই ভাবকেই স্বাভাবিক ও মধুর বলিতে হইবে। তাহাতে কামরসের গন্ধ থাকে না, কিন্তু একটি মধুর প্রণয়ের ভাব ব্যক্ত হয়। কামরস যুবক-যুবতীরই সম্পত্তি। গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সখা ভাবে চিন্তা করিত, গোপকুমারীরাও সেইরূপ তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য চিন্তা করিত বলিলে ক্ষতি হয় না। প্রত্যেক গোপবালক মনে করিত, শ্রীকৃষ্ণ সকলের অপেক্ষা তাহাকে ভাল বাসেন। গোপবালিকাগণের প্রত্যেকের পক্ষেও তাহাই বলা যাইতে পারে। এরূপ ভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করা যে মধুর, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভগবান্ যদি সত্য সত্যই গোপাঙ্গনাগণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গোপকুমারীগণের সহিতই যে তাহা ঘটিয়াছিল, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ভাসের বর্ণনা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের সমাজে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ লীলার কথাই প্রচলিত ছিল। সাহিত্য হইতেই সমাজের চিত্র অনেক পরিমাণে বুঝা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন সমাজের নানাবিধ বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন হইতে আমাদের শাস্ত্রের এবং ধর্ম্মেরও যে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, একথা একেবারে অস্বীকার করিলে চলিবে না।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কুমারী গোপ-বালিকাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া এবং তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য চিন্তা, অথবা গোপপত্নী-গণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত একান্ত নির্লজ্জভাবে কামলীলা এবং তাঁহাকে উপপতি ভাবে চিন্তা করা, ইহাদের মধ্যে কোনটি মধুর? আমরা প্রথমটিকে মধুর ও দ্বিতীয়টিকে বীভৎস বলিয়াই মনে করি।

ছদ্মবেশ।

মন্ত্র পড়ি' ফুল লয়ে একে একে বিপ্রবর
ভাসাইছে জাহ্নবীর জলে,
পাচনিতে ধরি' ধরি' রাখাল বালক এক
কাণে গুঁজে,—ভরিছে অঞ্চলে!
হেরি বিপ্র কোপভরে রক্ত-আঁখি,—বালকেরে
ঢিল দিয়ে করিল প্রহার।—
"ওরে ঘৃণ্য, ওরে নীচ পূজা-পুষ্প ছুঁলি মোর
দেবতার পায় উপহার?"
রাখাল হাসিয়া কয়, "অপবিত্র যদি হয়
ফুল তবে ছুঁইবনা আর।"
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি' লুকা'ল জাহ্নবী-নীরে,
বিপ্র বসি' করে হাহাকার!

শ্রীকালিদাস রায়।

কাজ ও কথা।

কথায় কথায় কর্ত্তব্য নির্ণয়ে বিলম্ব হইতে দেখিলে, লোকে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে,—'এখন কাজের কথা হ'ক'। অতএব বুঝিতে হইবে, কাজ আগে—কথা পরে। 'কথার কাজ হ'ক' একথার অর্থ হয় না। কথা হইতেছে কার্য্য-দেহের অসম্পূর্ণ 'ফটো',—জ্ঞান-আলোকের গুণাগুণের উপর ফটোর ভালমন্দ নির্ভর করে। আবার, কথায় পাকা লোকের অপেক্ষা কাজে পাকা লোকের জ্ঞান-আলোক অধিক নির্ভরযোগ্য। কাজ মানুষের গোটা প্রকৃতিটা জড়াইয়া ধরিয়া আছে; ইক্ষুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যেমন ইক্ষুরস অবস্থিত, তদ্বৎ। আর, কথা হইতেছে রসের ফেনার মত, অথবা প্রকৃতির একাংশ মনসরোবরের তরঙ্গের লীলা প্রকটন মাত্র। ইহা কেবল উপরে ভাসে, তলস্পর্শ করিবার শক্তি রাখে না। জগতে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের কথা সামাজিকদিগের হৃদয় অধিকার করিত সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কথাকে কথা বলা যায় না; তাহার প্রকৃত নাম 'বাক্' যাহার অর্থ জ্ঞান, যাহা অতীব কঠোর সাধকের পক্ষেত ক্বচিৎ কদাচিৎ লভ্য কি না সন্দেহ কেন না 'বাক্' দৈবের হস্তে। দৈব অর্থে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়দেহকৃত ব্যাপারের অনুগ্রাহক অন্তর্য্যামী; অতএব উহা মনের নিকটেও অদৃষ্ট।

আমরা যে ইহা বুঝি না ঠিক তাহা নহে; তবে, সহজে যদি ধর্ম্মকে ফাঁকি দিতে পারা যায়, তাহা হইলে তীব্র সাধনার বলে ধর্ম্মকে রাজি রাখিবার কষ্ট স্বীকার করিতে চাইনা। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের উক্তি 'বাঙ্গালী ভারতের এথিনিয়ান্ জাতি,—ইহা একটা প্রবল কারণ; আর একটা কারণ হইতেছে এই যে, আমরা স্বজাতিসুলভ তর্কশক্তিদ্বারা (প্রমাণ দ্বারা নহে) বুঝাইতে পারি যে দুধ দই হইয়া গেলেও উপরের পুরুসরটুকু নষ্ট হয় না, আর সেই সরে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে;—অতএব আমরা কথা দ্বারা কাজের অভাব পূর্ণ করিতে পারিব। বাগ্‌দেবতার খবর লইব না, কথা-মোহিনীর নিকট আত্মনিবেদন করিব। কিন্তু সকলে একথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। শ্রীযুক্তপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় ১৩১৯ সালের মাঘের ভারতী পত্রিকায় এইরূপ বলিয়াছেন;—

"সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কর্ম্ম ক'রতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম্ম, যার ফল একে নয়, দশে লাভ করে, তা' ক'র্‌বার জন্ম মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা' কিছু মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। 'যা' মনে ধরা পড়ে, তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়, কথার সূক্ষ্ম-শরীর কার্য্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে।"

একথা স্বীকার করিতে হইলে বিম্বের পূর্ব্বে প্রতিবিম্বের জন্ম স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা করা যায় না। রাম চিরকালই রামায়ণের পূর্ব্বে জন্মিবেন। কথক ঠাকুরের কথায় শেষে আসিবেন না। যাহাকে কথাদ্বারা বুঝাইব, সেই বর্ণনীয় বিষয়ের চিচ্ছায়া বা Idea আমার পূর্ব্বকৃতকর্ম্মের আংশিক রূপতা মাত্র; সুতরাং আমার মনোবলের দৌড় কতদূর, তাহা সে আগেই বুঝিয়া আছে। যখন এমন ঘটে যে, কর্ম্মফলজনিত হৃদ্‌গত সংস্কার-বিম্ব দর্পণের দোষে অর্থাৎ মনোবলের উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে প্রতিবিম্বরূপে ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব করিতেছে, তখত মন যেন না ভাবেন তিনিই মননের কর্ত্তা; অতএব বলপ্রয়োগে ঐ বিম্বকে ফুটাইতে পারিবেন। ঐ বিম্ব সময় হইলে প্রতিবিম্বরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু কর্ম্মবীজরূপ সূক্ষ্ম শরীরটি পূর্ণায়তন প্রাপ্ত না হইলে সেরূপ সময় আসিবে না। এ হিসাবে কথা কাজের দ্বিতীয় জন্ম; আর, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহাকে কাজ বলিয়া থাকি, সেটি ঐ বিম্বের—কর্ম্মবীজের তৃতীয় জন্ম। সুতরাং অসময়ে বিম্বকে প্রতিবিম্বিত করা অসাধ্য, কেননা মন তখন নিজেই সংস্কারসমুদ্রের আলোড়নে পীড়িত। তবে অসাধ্য সুসাধ্য হইতে পারে, যদি মন হৃদগত বিম্বের পূর্ণ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে,—রসগোল্লার মত রসে ডুব দিয়া পাক খাইতে খাইতে (ক্রমে ক্রিয়া করিতে করিতে) রসের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে,—গোড়ায় কর্ম্মকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার আদি মধ্য-অন্তের সহিত সুপরিচিত হইয়া কর্ম্মসংস্কৃত হইতে পারে। কর্ম্মসংস্কৃতমনা না হইয়া কেবল কথার প্যাঁচে কর্ম্মকে বুঝাইতে গেলে, সোণা ফেলিয়া আঁচলে গের দেওয়া মাত্র সার। বায়কোষের

উপরে শোভা বিস্তার করতঃ শুভ্র ছানার গুলিগুলা তত্র শয়ানাবস্থাতেই যদি রসের থিওরির ব্যাখ্যা করিতে থাকে, তাহাতে দশের ত নহেই একেরও কিছু লাভ হইবে না। কাজের মানুষ সে ব্যাখ্যাতে কর্ণপাত করে না, কেননা কর্ম্মদেবী (যাহা প্রকৃতির দত্তরূপ) তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতেছেন।

অতএব, মন কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকৃতির হাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সে মনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমরা মনোবল লইয়া যতই বড়াই করি না কেন, কর্ম্মদ্বারা প্রকৃতির নিকটস্থ হইতে না পারিলে,—আমার আমিতে কি আছে কাজ করিয়া তাহার সম্যক—অন্ততঃ আংশিক পরিচয় লইতে না পারিলে, আমি যাহা বলিব, তাহা কেবলই কথার কথা, কাজের কথা নহে। একথা বৈষয়িক বিষয়ে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ততোধিক সত্য। আত্মানাত্ম বিবেকতত্ত্ব সংসারী ব্যক্তি শুনিলে শুনিতে পারেন এই পর্য্যন্ত; কিন্তু তাহার প্রকৃত শ্রোতা হইতে গেলে কাজের কাজী অর্থাৎ শমদমাদিসাধন সম্পন্ন হইতে হইবে। আর, তাহার বক্তা হইবেন যিনি স্বয়ং দ্রষ্টা, কেবল-জ্ঞাতা হইলে চলিবে না। অধ্যাত্মরাজ্যে ঘোর অরাজকতার দিনে একথা অগ্রাহ্য হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কথাটা সনাতন। যিনি কাজের কাজী নন, তাঁহার পক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধে কোনও কথা বলা ত দূরের কথা, তাঁহাকে ওসব কথা, শুনান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ গীতা ১৮—৬৭।

অতএব, যাহা বৈষয়িক হিসাবে সত্য, তাহা আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা হইতে পারে না। বিষয় কার্য্য, বিষয়ী কারণ;—কারণের গুণ কার্য্যে থাকিবেই। প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু আছে। সুতরাং দুইটার মধ্যে যাহাকেই ধরিতে চেষ্টা করি না কেন, উপায় একই,—কাজ। বিষয়কে জাপ্‌টাইয়া ধরিতে গেলে, প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ হওয়া চাই, যাহার নামান্তর স্ব-শক্তির পূর্ণপরিণতি; আর বিষয়ীকে ধরিতে হইলে, প্রকৃতির আত্মসমর্পণ ঘটান চাই,—আমি-হারা হওয়া চাই। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ উভয়ত্রই। যেমন বিশ্বাসের শত্রু তর্ক, দুধের শত্রু দধি, তেমনি কাজের শত্রু কথা। কথার জন্ম কাজ হইতে সত্য

বটে, কিন্তু কাজের মরণও কথার হাতে। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত প্রোজ্জ্বল।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্য হইতে একটা সাধারণ সূত্র বাহির করিতে পারা যায়। সেটা এই যে, যতদিন কোনও জাতি গরিষ্ঠ হইয়া না উঠিতে পারে ততদিন সে জাতি কথার বেণে হইবার অবসর পায় না। কথার পণ্ডিত মানুষকে তাহারা Dog of knowledge বলিয়া বুঝিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলে, যেখানে জ্ঞানের কুকুর যতই শুভ্রদন্ত বিকাশিত করুন না কেন, তাহারা লগুড় সঞ্চালন পূর্ব্বক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইবেই। রোমান্‌দিগের অভ্যুদয়ের যুগে রোমানেরা কথার প্যাঁচ শিখিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। তাঁহারা কর্ম্মকেই জীবনের স্বধর্ম্ম, অতএব জ্বলন্ত মূলতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতেন। তখন কৃষিকার্য্যের এতদূর উচ্চ মান ছিল যে, বড় বড় সেনাপতিগণ কৃষিজীবী পল্লীবাসীদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন, পক্ষান্তরে নাগরিকেরা অলস ও বিলাসী বলিয়া উপেক্ষিত হইত। শত শত বৎসর এইভাবে চলিয়া যখন রোমানেরা গ্রীক-দিগের সংস্রবে আসিয়া পড়িলেন, তখন কাটা-খাল দিয়া কুমীর প্রবেশ করিল। কথার মোহিনী মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদিগকে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ-প্রায় করিয়া তুলিল। পৌরুষিকশক্তির (Virilityর) অল্পে অল্পে অন্তর্ধান, তাহার স্থানে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতির প্রবেশ; উর্জ্জস্বলতার স্থানে কমনীয়তার, ত্যাগের স্থানে ভোগের আদর,—সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতনের বীজ উপ্ত হইল।

ভারতের কথাই ধর। রাম-সীতা কার্য্য,—বিশ্বরূপ বা বিশ্বরূপার বিশ্ব-বিমোহিনী চিচ্ছায়ার আংশিক প্রকটন; আর, রামায়ণ হইতেছে তাহার ফটো,—কার্য্য দেহের আংশিক প্রতিকৃতি। উহার সব দিকটা দেখিবার উপায় নাই,—সীতা নির্ব্বাসনের গূঢ়রহস্য বাল্মীকিরও অগোচর, কেননা তিনি সংসারী। তিনি হনুমানপ্রভুর মত দর্পণের ও-পিঠে কি আছে জানিবার জন্য প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ভক্তি পণ রাখিয়া নিরতিশয় যত্ন করিলে, অস্থিতে অস্থিতে যুগল-রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। পারেন নাই বলিয়া আমাদিগকে রামায়ণ দিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রণম্য, কিন্তু হনুমানপ্রভু শরণ্য।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

কবিকথা

(ভবভূতি)

মালতীমাধব।

(৪)

মকরন্দের নিকটে গিয়া মাধব সংজ্ঞা হারাইলেন, লবঙ্গিকা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ওদিকে মদয়ন্তিকা তখনও পর্য্যন্ত মকরন্দকে পরিত্যাগ করেন নাই। পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া মদয়ন্তিকা বলিয়া উঠিলেন,—ভগবতি প্রসন্না হউন, আমার নিমিত্ত যাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত, সেই বিপন্ন দয়ালু মহাভাগকে রক্ষা করুন। এই শোচনীয় দৃশ্যে অন্য সকলেও বিলাপ করিতে লাগিলেন, কমণ্ডলুজল হস্তে লইয়া কামন্দকী তখন মাধব ও মকরন্দের প্রতি প্রক্ষেপ করিলেন এবং মালতী প্রভৃতিকে বস্ত্রাঞ্চলে ব্যজন করিতে বলিলেন। তাঁহারাও তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মকরন্দ চৈতন্যলাভ করিয়া মাধবকে মূর্চ্ছিত দেখিতে পাইলেন, ও তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বয়স্য, তুমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে কেন? এই দেখ, আমি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি। তখন মদয়ন্তিকা সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—আহা! মকরন্দপূর্ণ চন্দ্র এক্ষণে জাগরিত হইয়াছেন। ওদিকে মালতী মাধবের ললাট স্পর্শ করিয়া লবঙ্গিকাকে কহিলেন,—প্রিয়সখি, সৌভাগ্যক্রমে তুমিও সুখী নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার প্রিয়বয়স্য জাগরিত প্রায়, মহাভাগ মকরন্দ ত চৈতন্য লাভই করিয়াছেন।" মালতীর করস্পর্শে মাধবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন 'এস, সাহসিক বয়স্য' বলিয়া মকরন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। মাধব ও মকরন্দের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন, আমিও সৌভাগ্যক্রমে জীবিতবৎসা হইয়া উঠিলাম। অন্য সকলেও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা চুপে চুপে মদয়ন্তিকাকে কহিলেন। সখি বুঝিয়াছ কি? ইনিই সেই। মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন—জানিয়াছি, সখি, ইনি মাধব আর ইনিই তিনি, তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিয়া উঠিল, এক্ষণে আমার কথা সত্য কিনা বল। তাহার উত্তরে মদয়ন্তিকা কহিলেন, তোমাদের মত লোকে

কি অন্যপ্রকার ব্যক্তির পক্ষপাতিনী হইতে পারে? কিন্তু সখি, এই মহানুভবের প্রতি মালতীরও অনুরাগ-প্রবন্ধ রমণীয়। এই কথা বলিতে বলিতে মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি সস্পৃহনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মকরন্দ মদয়ন্তিকার এই দৈবাৎ দর্শন কামন্দকীর মনে রমণীয় যোজন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। মকরন্দের সহসা আগমনের কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায় পরিব্রাজিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস মকরন্দ মদয়ন্তিকার জীবনরক্ষার জন্য ভগবান্ দৈব তোমাকে কি উপলক্ষে নিকটে আনিয়া ফেলিলেন। মকরন্দ বলিতে লাগিলেন। আজ আমি নগরমধ্যে একটি জনশ্রুতি শুনিয়া তাহাতে মাধবের চিত্তোদ্বেগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবলোকিতার নিকট হইতে কুসুমাকরোদ্যানের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। তাহার পর এখানে সত্বর উপস্থিত হইয়া এই অভিজাত কুমারীকে শার্দ্দূলের আক্রমণে নিপতিত দেখিতে পাইলাম। মকরন্দের কথা শুনিয়া মালতীমাধবের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কামন্দকীর মনে জনশ্রুতিটি নন্দনকে মালতী প্রদান বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন মাধবকে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস মাধব, তোমার প্রিয়সুহৃদের মোহনাশে মালতী তোমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন; তাই বলিতেছি, প্রীতিদানের অবসরই এই। মাধব উত্তর দিলেন,—"ভগবতি, মালতী যখন করুণাবশে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ সুহৃদের মোহে মুগ্ধ আমার বেদনা দূর করিয়াছেন, তখন আনন্দোৎসবে প্রিয় নিবেদকের পূর্ণপাত্র আকর্ষণের ন্যায় আমার হৃদয়ও জীবন আয়ত্ত করিয়া যথেচ্ছ বিনিয়োগ করুন"। শুনিয়া লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—এই প্রসাদ আমার প্রিয়সখীরও অভীষ্ট বটে। মদয়ন্তিকাও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—মহানুভব ব্যক্তিরা অবসর মত শ্রবণমধুর বচন প্রয়োগ করিতে জানেন। মালতী কিন্তু মকরন্দ কি উদ্বেগকারণ শুনিয়াছেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময়ে মাধবও বলিয়া উঠিলেন,—বয়স্য সেই উদ্বেগাধিক্যের জনশ্রুতিটি কি?

সহসা জনৈক লোক আসিয়া মদয়ন্তিকাকে কহিতে লাগিলেন,—"বৎসে, আজ পদ্মাবতীশ্বর তোমাদের ভবনে আসিয়া ভূরিবসুর কথায় বিশ্বাসে তোমার ভ্রাতা নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মালতী সমর্পণ করিয়াছেন। তাই নন্দন

আমোদ প্রমোদের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।” তখন মকরন্দও মাধবকে বলিলেন,—বয়স্য এই সেই জনশ্রুতি, তাহাতে মালতীমাধব বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। মদয়ন্তিকা আনন্দভরে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“সখি মালতি, এক নগরে বাস করায় ও একসঙ্গে ধূলিখেলা অবধি তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনী ছিলে; এক্ষণে আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিলে।” পরিব্রাজিকা একটু উপহাস করিয়া কহিলেন,—“বৎসে মদয়ন্তিকে, সৌভাগ্যক্রমে ভ্রাতার মালতী লাভে তোমাদের সুখবৃদ্ধি হইল।” মদয়ন্তিকা উত্তর দিলেন,—“এ সকল আপনাদের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে ঘটিল বলিতে হইবে।” তাহার পর তিনি লবঙ্গিকাকে বলিতে লগিলেন,—“সখি, তোমাদের লাভে এতদিনে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।” লবঙ্গিকা কহিল,—“আমাদেরও তাহাই বক্তব্য।” তাহার পর মদয়ন্তিকা বিবাহ-মহোৎসবে যোগদানের জন্য বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলে, তিনিও তাহাতে সম্মতি দিলেন, এবং দুই সখীতে উত্থিত হইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে মকরন্দ মদয়ন্তিকার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইতে লাগিল। লবঙ্গিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে কামন্দকীকে কহিল,—“ভগবতি হৃদয় পরিপূর্ণ উদ্বেলিত বিস্ময় ও আনন্দে সুন্দর আন্দোলিত ধৈর্য্যে মনোহর মকরন্দমদয়ন্তিকার বিকসিত নীলোৎপলদামসদৃশ কটাক্ষবিক্ষেপ দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, ইহারা মনোরথনিষ্পন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।” পরিব্রাজিকা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—“ইহারা পরস্পরে মানসসমাগম অনুভব করিতেছে। কারণ ইহাদের ঈষৎবক্র অপাঙ্গে সঙ্কুচিত প্রেমসঞ্চারে স্তিমিত ও ললিত, আকুঞ্চিত অন্তরানন্দানুভবে—মসৃণ, স্রস্ত ও নিষ্কম্প পক্ষ্ম বঙ্কিমনয়নের দৃষ্টি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।” তাহার পর সেই লোকটি মদয়ন্তিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—“সখি, এই জীবনদাতা পুণ্ডরীকলোচনকে আর কি দেখিতে পাইব? বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর দিয়া কহিলেন,—“দৈব অনুকূল হইলে, তাহা অসম্ভব নহে।” পরে তাঁহারা সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাধব তখন চুপে চুপে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“ভঙ্গুর মৃণালসূত্রের ন্যায় চিরসঞ্চিত আশাতন্তু এক্ষণে ছিন্ন হইয়া থাক্, মহান্ আধিব্যাধি নিরবধি প্রসা-

স্থিত হউক, চিত্তচাঞ্চল্য অকপটভাবে আমাকে আশ্রয় করুক, এবং বিধি নিরাকুল ও মদনও কৃতার্থ হউন। দৈব যখন প্রতিকূল তখন সমপ্রেমিক হইলেও সেই দুর্লভ জনের প্রার্থী আমার এই পরিণাম সমুচিতই হইয়াছে, ইহাতেও খেদ নাই। কিন্তু নন্দনে অর্পণ শুনিবার সময় প্রিয়তমার বদনখানি যে প্রভাক্ষয়ণে ম্লান প্রভাতচন্দ্রের কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অন্তরে দগ্ধ করিতেছে"। কামন্দকীও মনে মনে বলিতেছিলেন,—"মাধব ও মালতী বিমনা হইয়া পড়ায় আমাকে অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করিতেছে। নিরাশায় প্রাণধারণ দুষ্কর।" তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস মাধব, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে কর, ভূরিবসু আমাদিগকে মালতী সমর্পণ করিবেন?" সলজ্জভাবে 'না না' বলিয়া মাধব উত্তর দিলেন। তাহাতে কামন্দকী আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা তুমি হীন হইলে কিসে?" মকরন্দ সে কথায় উত্তর দিয়া কহিলেন,—"মালতী দত্তপূর্ব্বা বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।" শুনিয়া পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন,—"সে জনশ্রুতি আমি জানি, ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে, রাজা ভূরিবসুর নিকট নন্দনের জন্য মালতী প্রার্থনা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—'নিজ কন্যার প্রতি মহারাজেরই প্রভুত্ব' সেই লোকটি বলিয়া গেল, আজ আবার রাজা নিজেই মালতীকে দান করিয়াছেন, তাই বলিতেছি, বৎস লোক সকলের ব্যবহার-তন্ত্র বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত, পুণ্যাপুণ্যের কারণ সকল বাক্যেই ব্যবস্থিত, সমস্ত বাক্যেরই আয়ত্ত। ভূরিবসুর বাক্যটি অসত্যাত্মক। মালতী কিছু রাজার নিজ কন্যা নহে। কন্যাদানে রাজাদের অধিকার এরূপ ধর্ম্মাচারসিদ্ধান্তও শুনা যায় না। কাজেই ইহাতে বিমর্ষের কারণ নাই। আর আমাকেই বা অনবধানা মনে করিতেছ কেন? দেখ, তোমার বা মালতীর যে পাপাশঙ্কা হইতেছে, তাহা শত্রুরও যেন না হয়। তাই বলিতেছি, আমি প্রাণব্যয় করিয়াও তোমাদের মিলনের জন্য যত্ন করিব।" তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবতীর আদেশ শোভন ও সঙ্গত বটে, নিজ সন্তান মাধব ও মালতীর প্রতি দয়া ও স্নেহবশে আপনার সংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাই আপনার প্রব্রজ্যাচারের বিরোধী যত্নের বিরাম নাই; ইহার পর সমস্তই দৈবায়ত্ত।" সেই সময়ে অমাত্যপত্নীর আদেশে মালতীকে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদের পরিজনেরা কামন্দকীকে আহ্বান

করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সকলে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। মালতী ও মাধব অনুরাগ ভরে পরস্পরের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায় কি কষ্ট! মালতীর সহিত মাধবের লোকযাত্রা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। আহা! বিধাতা প্রথমে সুহৃদের ন্যায় নিরন্তর এরূপ সুখকর আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া অবশেষে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে নিদারুণ হইয়া মনঃপীড়া জন্মাইতে লাগিলেন।" মালতীও চুপে চুপে বলিতেছিলেন,—"মহাভাগ লোচনানন্দকর; এই পর্য্যন্তই তোমার দর্শন।" লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,—"হা ধিক, অমাত্য অবশেষে আমাদের প্রিয়সখীর জীবন সংশয় করিয়া তুলিলেন!" মালতী আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার জীবন তৃষ্ণার ফল ফলিল। পিতার নিষ্করুণ ব্যবহারে তাঁহার কাপালিক ব্রতের আচরণকে সত্য করিয়া তুলিল। দুষ্ট দৈবের নিদারুণ আরম্ভের ন্যায় পরিণামও ঘটিল। হতভাগিনী আমি কাহারই বা দোষ দিব, আর অশরণা হইয়া কাহারই বা শরণ লইব?" লবঙ্গিকা তখন তাহাকে লইয়া কামন্দকীর সহিত প্রস্থান করিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মাধবের প্রতি সহজ-স্নেহকাতরা ভগবতীর ইহা আশ্বাসমাত্র।" তাহার পর উদ্বেগ সহকারে মনে মনেই বলিতে লাগিলেন,—"আমার জন্মসাফল্যে সংশয় ঘটিল, এক্ষণে কি করি।" পরে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মহামাংস বিক্রয় ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" অবশেষে মকরন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বয়স্য মদয়ন্তিকার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা হইতেছে কি?" মকরন্দ উত্তর দিয়া কহিলেন,—"অবশ্যই আমার রক্তাক্তপ্রগাঢ় উত্তরীয়-স্খলন অগ্রাহ্য করিয়া চকিত একবর্ষীয় কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিতে শোভিতা সুন্দরী অমৃতসিক্ত অঙ্গে যে আমায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।" শুনিয়া মাধব বলিলেন,—"বুদ্ধরক্ষিতার প্রিয়সখী দুর্লভা হইলেন বলিয়া মনে হয় না। আবার প্রাণান্তকালে হিংস্রজন্তু-বিনাশী রক্ষিতার আলিঙ্গন লাভ করিয়া তিনি কি আর কোথাও অনুরক্ত হইতে পারেন? তাহার পর সেই কমলনয়নার নয়ন-ব্যাপার তোমার প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তিমিতভাব থাকিয়া রমণীয় হইয়া উঠে। এক্ষণে চল পারা ও সিন্ধুর সঙ্গমে অবগাহন

করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করি।" যাইতে যাইতে তাঁহারা মহানদীদ্বয়ের মিলন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, তাহাদের তীর-ভূমি সদ্যঃস্নাতা সমুত্থিতা বধূগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; আর্দ্রবস্ত্রে শরীরের নিম্নোন্নত স্থান সকল ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, তাঁহারা মনোহর কনক কুম্ভ-নিভ পীনোন্নত বক্ষঃস্থল হস্তস্বস্তিকদ্বারা আবরণ করিতেছেন।

(৫)

সন্ধ্যার শেষ ও রাত্রির আরম্ভ। তমালগুচ্ছের ন্যায় অন্ধকারাবলী আকাশ-সীমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, প্রান্তভাগে পৃথিবীও যেন নূতন জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। প্রারম্ভ সময়ে রজনী বায়ুবেগে চারিদিকে বিস্তারিত বলয়া-কার স্ফীতধূমমণ্ডলীর প্রকাশে বনস্থলীতে নিজনীলিমা প্রগাঢ় করিয়া তুলিতেছে। সেই সময় একটি ভীষণ ও উজ্জ্বলবেশে ভূষিতা রমণী আকাশতলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। মন্ত্রন্যাসে অর্পিত ষড়ঙ্গচক্রে নিহিত হৃদয়পদ্মে প্রকাশিত শিব রূপী নিজ আত্মাকে একাগ্রচিত্তে দেখিতে দেখিতে নাড়ী সকলের বায়ুপূরণে ও জগতের পঞ্চামৃত আকর্ষণে তিনি শূন্যভ্রমণ ক্লেশ দূর ও সম্মুখস্থিত মেঘসকল বিভক্ত করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে আসিতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল ও স্খলিত কপালকণ্ঠমালার সংঘর্ষে তাহাতে স্থাপিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকাগুলি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং সেই জন্য তাঁহাকে রমণীয় ও ভীষণ দেখাইতেছিল। রমণীর ঘনগ্রন্থিবদ্ধ জটাভার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছিল। ধারাবাহী শব্দে পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত বাদ্যঘণ্টা দীর্ঘ ও রমণীয় শব্দ করিতেছিল। শবশির শ্রেণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুঞ্জন ও কিঙ্কিণী-নিকরকে অনবরত ধ্বনিত করিতে করিতে উত্তাল-বেগানিল বাদ্যযন্ত্রে বদ্ধ পতাকা কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। রমণী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতেছিলেন,—'ষোড়শ নাড়ীমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আত্মা-স্বরূপ, তাঁহাকে জ্ঞাত যোগিগণের হৃৎপদ্মস্থিত ধ্যানমূর্ত্তি সিদ্ধিদাতা স্থিরচিত্ত সাধকগণের অন্বেষণীয় শক্তিত্রয়ে পরিপুষ্ট ও অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত শক্তিনাথের জয় হউক"। রমণী ক্রমে পুরাতন নিম্বতৈলাক্ত চিতা-ধূমে ব্যাপ্ত শ্মশানভূমির নিকট করালায়তনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই করালায়তনেই অঘোরঘণ্ট নামে কাপালিক বাস করিতেন। তিনি শ্রীপর্ব্বত হইতে পদ্মাবতীতে উপস্থিত হন। রমণী তাঁহার শিষ্যা, নাম কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলাও

শ্রীশৈল হইতে আসিতেছিলেন। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রজনীতে করালার অর্চ্চনার জন্য গুরু কপালকুণ্ডলাকে পূজাসম্ভার লইয়া আসিতে আদেশ দেন। কাপালিক দেবীর নিকট স্ত্রীরত্ন উপহার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে স্ত্রীরত্ন নগর মধ্যেই ছিল এবং সকলে তাহা জানিত। কপালকুণ্ডলা তাহারই আহরণের ইচ্ছা করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি যুবক কুটিল-কুন্তলভার জটাবদ্ধ করিয়া কৃপাণ হস্তে শ্মশানে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার ইন্দীবরশ্যাম অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছিল। সেই শ্রীমান্ ও মৃগাঙ্ক-নিভানন; তিনি ললিত চরণ বিক্ষেপ করিতেছিলেন। কেবল তাঁহার বাম হস্ত বিগলিত-রক্ত নরমাংস ধারণে সাহস ও অবিনয় প্রকাশ করিতেছিল। এই যুবকই মাধব। কপালকুণ্ডলা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন এবং মাধবকে মহামাংস বিক্রেতা বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। তাহার পর নিশারম্ভের অন্ধকার মধ্যে বিলীন হইয়া তিনি নিজ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্মশানে প্রবেশ করিয়া মাধব বলিতেছিলেন—"মুগ্ধাক্ষীর প্রেমার্দ্র প্রণয়স্পর্শী এবং পরিচয় জাত প্রগাঢ় অনুরাগে পূর্ণ সেই সেই নিসর্গ-মধুর বিলাসাদি আবার কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে! আহা! সন্দেহ করিতে করিতেও যখন তাহাদের কল্পনা করা যায়, তখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিয়া ক্ষণমধ্যে সান্দ্রানন্দময় তন্ময়ভাবে অন্তঃকরণকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। মুক্তাহারহীন আমার রচিত বকুলমালায় অধিবাসিত প্রিয়তমার বক্ষঃস্থল আমার বক্ষে অর্পণ এবং আমার কর্ণমূলে তাঁহার আনন-সন্নিবেশ প্রভৃতি অঙ্গ বিনিময় কখনও কি লাভ করা যাইবে? এ সকল ত বহুদূরে; এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, যাহা দর্শনমাত্রে যাবতীয় সুখ যেন সম্মিলিত হইয়া পরম ভূমাভাব বিস্তার করিতে থাকে, নেত্রোৎসবে অনুরাগ জন্মায়, নব শশিকলারাশির সারে গঠিতের ন্যায় অনঙ্গমঙ্গলগৃহ প্রিয়তমার সেই মুখখানি আবার যেন দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার দর্শনে সত্য সত্যই অত্যল্প মাত্রও পার্থক্য অনুভূত হইবে না। কারণ পূর্ব্বের সুদৃঢ় অনুভব হইতে জাত সংস্কারের উদ্বোধে বিস্তারিত প্রিয়তমা ভিন্ন অন্য জ্ঞানে অবারিত তাঁহার স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তিধারা বুদ্ধিবৃত্তির পুরুষের সহিত অভেদবশে এক্ষণে আমার চৈতন্যকে তন্ময় করিয়া তুলিতেছে। প্রিয়তমা আমার চিত্তে যেন লীলা

প্রতিবিম্বিতা, লিখিতা, উৎকীর্ণা, খচিতা বজ্রলেপযোজিতা অন্তর্নিখাতা মদনের পঞ্চবাণে বিদ্ধা, চিন্তাতন্তুজালে ঘন গ্রথিতা হইয়াই সংলগ্না রহিয়াছেন।" মাধব বিচরণ করিতে করিতে রক্ষঃপিশাচগণে পরিবৃত শ্মশানভূমির ভীষণতা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তথায় তখন চিতাজ্যোতির প্রান্তদেশে তাহার বিস্তার রোধ করিয়া, মেদুরঘনপিণ্ডীভূত বহুদূরব্যাপী ভীষণ অন্ধকার গুণোৎকর্ষের জন্য জ্যোতি-রাশিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। মিলিত হইয়া আকুলভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে কটপূতন প্রভৃতি পিশাচ ও অন্যান্য বিকট জন্তুগণ কিল কিল কোলাহল তুলিয়া হর্ষভরে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল। মাধব মহামাংস বিক্রয়ের জন্যই শ্মশানে আসিয়াছিলেন; পিশাচদিগকে সম্বোধন করিয়া নিজের আনীত মাংস দেখাইয়া, তিনি তখন বলিতে লাগিলেন,—"ওহে শ্মশানবাসী কটপূতন সকল অমন্ত্রপূত অকপট পুরুষমাংস বিক্রীত হইতেছে, তোমরা গ্রহণ কর।"

মাধবের ঘোষণায় পিশাচগণ তুমুল কোলাহল তুলিয়া, এরূপ ভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, যেন তাহাতে সমগ্র শ্মশানদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল। মাধব বিস্ময় সহকারে দেখিতে লাগিলেন যে, কতক লক্ষ্য ও কতক অলক্ষ্য বিশুষ্ক ও দীর্ঘ দেহে ভীষণ উল্কামুখ পিশাচদিগের আকর্ণ বিস্তারিত বিকট ব্যাদানে প্রদীপ্তা-নল উন্মুক্ত দশন কোটি, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বিদ্যুৎপুঞ্জনিভকেশ, নয়ন, ভ্রূ ও শ্মশ্রুজালে মণ্ডিত বদনসকলে নভস্তল আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কোন স্থানে পূতনপ্রেতগণ বৃকদিগকে ঘর্ঘর রবে কাঁদিতে দেখিয়া, গ্রাস হইতে অর্দ্ধমুক্ত উচ্ছিষ্ট নরমাংসে পরিপুষ্ট করিতেছে, তাহাদের খর্জ্জুর বৃক্ষের মত জঙ্ঘা কৃষ্ণ-বর্ণ ত্বকে আচ্ছাদিত স্নায়ুগ্রন্থিতে ঘন অস্থিপঞ্জরমাত্র জীর্ণ কঙ্কাল ভীতি জন্মা-ইতেছে। আর এক প্রকার পিশাচ বিবর্ণ দীর্ঘদেহে মুখব্যাদান করিয়া জিহ্বা সঞ্চালিত করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে চঞ্চল অজগরে বাসিত কোটররন্ধ্র পুরাতন চন্দন তরুর ন্যায় বোধ হইতেছিল। একটি দীন প্রেত প্রথমে শবদেহের চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া স্কন্ধ জঘন, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা প্রভৃতি মাংসল স্থানের পূতিগন্ধ মাংস অনেক পরিমাণে গ্রাস করিল, পরে স্নায়ু অন্ত্র নেত্র প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া ক্রোড়-দেশে কঙ্কাল লইয়া সন্ধিস্থল হইতে মাংসভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার দন্তকবল প্রকাশিত হইয়া ভীষণভাব ধারণ করিল। শবভোজী পিশা-চেরা উত্তাপে ক্ষরিতরক্ত, পাকে গলিতমেদ অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ সকল চিতারাশি

হইতে লইয়া পকশ্লথ মাংসযুক্ত সন্ধিনির্মুক্ত জঙ্ঘাস্থি পৃথক করিয়া প্রবাহিত মজ্জাধারা পান করিতেছে। সেই প্রদোষ সময়ে পিশাচাঙ্গনারা অন্ত্রে মঙ্গলসূত্র বলয়, স্ত্রীহস্তরক্তপদ্মে কর্ণভূষণ, হৃৎপুণ্ডরীকে কণ্ঠমালা, শোণিত-কর্দ্দমে কুঙ্কুম-লেপ করিয়া কান্তগণ সহ মিলিত হইয়া কপাল-পানপাত্রে মজ্জা সুরাপানে প্রীত হইয়া উঠিতেছে। মাধব আবার তাহাদিগকে মহামাংস-বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমেষমধ্যে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! সমগ্র শ্মশানভূমি প্রাণিশূন্য হইয়া উঠিল; তখন মাধব বিচরণ করিতে করিতে শ্মশানপ্রান্তবাহিনী নদীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, কুঞ্জকুটীরস্থ পেচককুলের ঘুৎকারে বর্দ্ধিত শৃগালের প্রচণ্ড-রবে অগ্রভাগপরিপূর্ণ হওয়ায় তীরভূমিকে ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। আবার নদীগর্ভে ভগ্ন কঙ্কালরাশি বেগরোধ করায় স্রোত প্রবল হইয়া তটস্থল ভঙ্গ করিতেছে ও ঘোর ঘর্ঘর রবে নির্গত হইতেছে।

সেই সময়ে কিছুদূরে "হা নির্দ্দয় পিতঃ, দেখ তোমার রাজচিত্ত-আরাধনার উপকরণ বিনষ্ট হইয়া যায়" এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মাধব ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বিকল কুররী-কূজনের মত কার এই চিত্তাকর্ষক স্নিগ্ধতার স্বর শুনা যাইতেছে। স্বরটি যেন পরিচিতের ন্যায় কর্ণের পূর্ব্বোপলব্ধি জন্মাইতেছে। ইহাতে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও অস্থির হইয়া উঠিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিহ্বল হইয়া পড়িল; গাত্রস্তম্ভে গতি স্খলিত হইতে লাগিল। কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে এবং এই ব্যাপারই বা কি? করালায়তন হইতেই এই করুণ ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। উহা এরূপ অনিষ্টকর ব্যাপারের স্থানই বটে! যাহাই হউক ব্যাপার কি দেখিতে হইল।" এই বলিয়া মাধব দ্রুতবেগে করালায়তনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, বধ্যবেশা মালতীকে লইয়া দেবার্চ্চনাব্যস্ত আঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা তথায় রহিয়াছেন। কাপালিক চামুণ্ডাকে উপহার দিবার জন্য কপালকুণ্ডলাকে যে স্ত্রীরত্ন আহরণের আদেশ দিয়াছিলেন। মালতীই সেই স্ত্রীরত্ন! মালতী সৌধশিখরের অলিন্দে নিদ্রিতা ছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া আসেন। মালতী বলিতেছিলেন,—"হা নির্দ্দয় পিতঃ, দেখ এক্ষণে তোমার রাজচিত্ত-আরাধনার উপকরণ বিনষ্ট হইয়া যায়! হা স্নেহময়ী মাতঃ,

দৈবের দুঃখকর লীলায় তুমিও হত হইলে! হা মালতীময়জীবিতে, ভগবতি কামন্দকি, আমার কল্যাণসাধনই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য; আমার প্রতি স্নেহই আপনার দুঃখের কারণ! হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, এখন হইতে আমাকে কেবল স্বপ্ন সময়েই দেখিতে পাইবে!" তখন মাধব বলিয়া উঠিলেন,—"এইত সেই মদিরেক্ষণা! এক্ষণে সন্দেহ দূর হইল। প্রিয়তমা জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সংবৰ্দ্ধনা করা যাক।" অনন্তর তিনি দ্রুতবেগে সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা করালাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছিলেন,—"দেবি চামুণ্ডে! তোমাকে প্রণাম। আর সদর্পপদমৰ্দ্দনে আনমিত ভূগোলের নিপীড়নে অধোগামী কূৰ্ম্মপৃষ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিস্খলিত এবং পাতালপ্রতিম গহন বিবরে সপ্তার্ণব প্রক্ষিপ্ত করিয়া বিভব বিকাশ করিতে করিতে যাহা নীল-কণ্ঠের সত্তাকে আনন্দিত করিয়া তুলে, তোমার সেই ক্রীড়াকেও বন্দনা করি। সঞ্চালিত গজাজিন-প্রান্তে স্থিত নখরাবলির আঘাতে বিদীর্ণ চন্দ্র-রেখা হইতে ক্ষরিত অমৃতধারায় জীবিত তোমার কণ্ঠমালার কপালসমূহের প্রচণ্ড অট্টহাসে ভীত ভূতগণ যাঁহার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহাতে শ্রীস্ত শ্বাসত্যাগী কৃষ্ণভুজঙ্গচয়ের কেয়ূরসন্নিভ নিষ্পীড়নে প্রসারিত ফণাপীট হইতে নিঃসৃত বিষজ্যোতিতে ভয়ঙ্কর বিস্তারিত তোমার বাহুসমূহে ভূধর সকল বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, প্রজ্বলিত অনলে পিঙ্গল ললাট-নেত্রের ছটাভারে ভীষণ মস্তকের ঘূর্ণনে জ্বলন্ত কাষ্ঠচক্র-ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনে দিগন্ত সকল গ্রথিত দেখায়, তুঙ্গ খট্টাঙ্গের অগ্রভাগে বদ্ধ পতাকা সকলে তারাগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, ও প্রমুদিত-পূতন-বেতাল প্রভৃতির তালে বিদলিতশ্রবণা উদ্ভ্রান্তা গৌরীর আলিঙ্গনে হৃষ্টচিত্ত ত্রিলোচনকে আনন্দ প্রদান করে, তোমার সেই তাণ্ডব নৃত্য আমাদিগের অশুভ নাশ ও হর্ষ প্রদান করুক"।

এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া মাধব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায় কি প্রমাদ! অলক্তকরাগে রঞ্জিত এবং রক্তমাল্য ও রক্তবসনে ভূষিত হইয়া বসুতুল্য ভূরিবসুর কন্যা বৃকদ্বয়ের গোচরে পতিতা মৃগীর ন্যায় এই দুই পাষণ্ড চণ্ডালের হস্তে পড়িয়া মৃত্যুমুখে অবস্থান করিতেছেন,। হায় কি কষ্ট, হায় কি অনিষ্ট এবং বিধাতার এ কি নির্দ্দয় কার্য্যারম্ভ!" কপালকুণ্ডলা

মালতীকে বলিতেছিলেন—"যদি তোমার কোন প্রিয়জন থাকে, ত এই সময়ে স্মরণ করিয়া লও। কারণ দারুণ কৃতান্ত তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র আকর্ষণ করিতেছে।" তখন মালতী বলিতে লাগিলেন—"হা দেব মাধব, পরলোকগমন করিলেও এ অভাগিনীকে স্মরণ করিও। প্রিয়জন যাহাকে স্মরণ করে, সে কখনও মৃতা হয় না।" শুনিয়া কপালকুণ্ডলা বলিয়া উঠিলেন,—"হায় এ তপস্বিনী মাধবের অনুরক্তা ?" অবিলম্বে খড়্গ উত্তোলন করিয়া যাহাই হউক ইহাকে বলি-প্রদান করি—বলিয়া অঘোরঘণ্ট দেবীর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি চামুণ্ডে, মন্ত্র সাধনার পূর্ব্বে সংকল্পিত ও আনীত পূজোপহার গ্রহণ কর।"

সহসা মাধব উপস্থিত হইয়া মালতীকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে টানিয়া লইলেন ও বলিতে লাগিলেন—"রে দুরাত্মা কাপালিক চণ্ডাল দূর হ ! তুইই নিহত হইলি।"

মাধবকে দেখিয়া "মহাভাগ, রক্ষা করুন" বলিয়া মালতী তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মাধব বলিলেন—"মহাভাগে, ভীত হইওনা ; মরণ ভয়ে শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অনর্গল প্রলাপে যাহার প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার সেই সখা সম্মুখে উপস্থিত ! তাই বলিতেছি সুতনু ভয়কম্প ত্যাগ কর ; এক্ষণে এই পাপটাই নিজ পাপের বিরুদ্ধ পরিণামফল ভোগ করিবে।" অঘোরঘণ্ট বলিতে লাগিলেন,—"আ ! কে এই পাপটা আমাদের অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইল !" শুনিয়া কপালকুণ্ডলা উত্তর করিলেন,—"ভগবন্ এটি ইহার স্নেহপাত্র কামন্দকীর সুহৃৎপুত্র মহামাংসবিক্রেতা মাধব।

সজলনয়নে মাধব মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাভাগে একি ?" বহুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,—"মহাভাগ আমি ইহার কিছুই জানি না ; এই মাত্র জানি, যে উপরি অলিন্দে নিদ্রিতা ছিলাম, এখানে আসিয়া জাগরিতা হইয়াছি ; কিন্তু তুমি আসিলে কেন ?"

মাধব একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"তোমার পাণিপঙ্কজ গ্রহণে ধন্য হইবার ইচ্ছায় অধীর হইয়া মহামাংসবিক্রয়ের জন্য শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিতেছিলাম। তাহার পর তোমার রোদনধ্বনি শুনিয়া এখানে আসিয়াছি।

শুনিয়া মালতী স্বগত বলিতে লাগিলেন,—"হায় ! ইনি আমারই জন্য আপনার প্রতি উদাসীন হইয়া শ্মশান ভ্রমণ করিতেছেন ?

মাধব তাহাদের উভয়ের আগমন কাকতালীয়ের ন্যায় বোধ করিলেন।

চিত্তে নানাভাবের সঞ্চার হওয়ায় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"রাহুর আনন-প্রবিষ্টা ইন্দুকলার ন্যায় প্রিয়তমাকে দৈবাৎ পাইয়া এই দস্যুর কৃপাণ-পাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমার চিত্ত আতঙ্কে বিহ্বল, করুণায় দ্রবীভূত, বিস্ময়ে বিক্ষোভিত, ক্রোধে প্রজ্বলিত ও আনন্দে বিকসিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।" অঘোরঘণ্ট মাধবকে বলিয়া উঠিলেন,—"অরে ব্রাহ্মণবালক, ব্যাঘ্রের আঘ্রাত মৃগীর প্রতি কৃপাকুল মৃগের ন্যায় তুই পাপ বলিস্থান-বাসী হিংসা রুচি আমার গোচরে পড়িয়াছিস্, অগ্রে খড়্গাঘাতে তোর স্কন্ধ ছিন্ন করিয়া শিরোহীন দেহের রুধির ধারায় ভূত-জননীকে প্রীত করিতেছি।

মাধব উত্তর করিলেন,—দুরাত্মা পাষণ্ড চণ্ডাল, তুই সংসারকে অসার, ত্রিভুবনকে রত্নহীন, লোক সকলকে নিরালোক, বান্ধবজনকে মরণ-শরণে রত, কন্দর্পকে দর্পশূন্য, লোকচক্ষুনির্ম্মাণকে বিফল, এবং জগৎকে জীর্ণারণ্যে পরিণত করার ইচ্ছা করিতেছিস্ কেন? অরে পাপ, প্রিয়সখীগণের লীলাপরিহাসে প্রক্ষিপ্ত সুকুমার শিরীষ পুষ্পের আঘাতে যিনি ম্লান হইয়া উঠেন, তাঁহারই বধের জন্য তুই অস্ত্র উত্তোলন করিতেছিস্? তবে দেখ, তোরই মস্তকে এই আকস্মিক যমদণ্ডের ন্যায় আমার বাহু নিপতিত হউক।"

শুনিয়া অঘোরঘণ্ট বলিলেন,—"দুরাত্মা প্রহার করিয়া দেখ, কেমন তুই থাকিস্।"

উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,—"সাহসিক নাথ প্রসন্ন হও, এ দৃশ্য নিদারুণ—তাই বলিতেছি আমাকে রক্ষা কর, এ অনর্থকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও।"

কপালকুণ্ডলা অঘোরঘণ্টকে বলিলেন,—"ভগবন্ সাবধান হইয়া এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া ফেলুন।"

তখন মাধব ও অঘোরঘণ্ট মালতী ও কপালকুণ্ডলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভীরু, হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর, এ পাপ হত হইল। মৃগের সহিত যুদ্ধে করিকুম্ভ-বিদারী পাণি-বজ্রে ভূষিত সিংহের প্রমাদ, কেহ কখনও কি অনুভব করিয়াছে"?

এদিকে মালতীকে দেখিতে না পাইয়া অমাত্য ভূরিবসু চারিদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কামন্দকীও তাহা জানিতে পারিয়া ভূরিবসুকে আশ্বাস প্রদান

করিয়া সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন করালায়তন অবরোধ করে; কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অঘোরঘণ্ট ভিন্ন এই ভীষণ ও অদ্ভুত কর্ম্ম আর কাহারও নহে, এবং করালায় উপহারের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রস্তাবমু কামন্দকীর এই ঘোষণা শুনিবামাত্র সৈন্যেরা করালায়তন অবরোধ করিল। মাধব প্রভৃতিও সে ঘোষণা শুনিয়াছিলেন। তখন কপালকুণ্ডলা অঘোরঘণ্টকে বলিলেন,—"ভগবন্, আমরা অবরুদ্ধ হইলাম।" অঘোরঘণ্ট উত্তর দিলেন—"এই সময়ে পৌরুষ প্রকাশের অবসর বটে।" মালতী হা পিতঃ হা ভগবতি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাধব বলিলেন—"প্রিয়তমাকে পরিজনদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া পরে তাহাদের সমক্ষেই এ দুরাত্মাকে নিহত করিতেছি" এই বলিয়া মালতীকে সরাইয়া দিয়া কাপালিকের সম্মুখভাগে দাঁড়াইলেন। পরে মাধব ও অঘোরঘণ্ট উভয়ে উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রে পাপ, আমার এই অসি কঠোর অস্থিগ্রন্থির অভিঘাতে মুখরিত হইয়া, প্রখর স্নায়ু চ্ছেদে ক্ষণমাত্র বেগশান্তি করিয়া পঙ্কের ন্যায় মাংসপিণ্ডে নির্ভয়ে নিপতিত হইতে হইতে তোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া এক্ষণে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকুক" এই বলিয়া উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মালতী ও কপালকুণ্ডলা তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

ধব-নিদর্শন।

বিধবার বাণী।

প্রথম যেদিন শুনিলাম, আমার বর আসিবে, বিবাহ হইবে, সেদিন আমি অবোধ বালিকা মাত্র। অর্থের বচসা মিটাইয়া, কুলমর্য্যাদার অভিমান বাঁচাইয়া ও সৌন্দর্য্যের সারতত্ত্ব বুঝিয়া সত্য সত্যই পিতা আমাকে যেদিন সম্প্রদান করিলেন, সে দিন আমি বালিকা মাত্র। পুরুষ স্ত্রীলোক বুঝিতাম, বিবাহের কথায় মাথা হেঁট করিতাম, কেহ বিবাহের কথা লইয়া ঠাট্টা করিলে, ছুটিয়া পলাইতাম। কোন্ বরটি কেমন, কাহার কেমন বিদ্যাবুদ্ধি, কাহার

কেমন মুখশ্রী, কাহার কেমন অঙ্গগঠন, দু'একটা কথায় দু' একবার মনে পড়িত বটে, তবে ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, বুঝিতে চেষ্টাও করিতাম না, বুঝিতে চাহিলেও যেন গোপনীয় কাজ করিতেছি বলিয়া লজ্জিত হইতাম।

সম্প্রদানের সেই শুভরাত্রি। সকলের মুখেই হাসি, আনন্দের উদ্দাম কোলাহল। আমার কাছে বালক না হইলেও স্বামীও বালক—আমিও বালিকা। এই বালক-বালিকা লইয়া একটা বিবাহের নামে কত লোকেই কত খেলা খেলিল। এখন মনে পড়িলে হাসিও পায়, রাগও ধরে। পাড়ার মেয়েছেলেরা বালকবালিকা লইয়া কি অসভ্যতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুধু যে সেই অসভ্যতাই বুঝিতাম না, তাহা নহে; সেই আমোদের নামে কত সর্ব্বনাশের পুঁজি সঙ্গে করিয়া আনিয়া ক্রমে ক্রমে বোঝা বাড়াইয়াছিলাম, এখন তাহা ভাবি, আর এ দেশের বালকবালিকার জন্য চক্ষের জলে ভাসি। যিনি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আমার—আরাধ্য-দেবতা স্বামী—তিনিও আর ইহ জগতে নাই। আজ আমি বিধবা, নিরাভরণা। সে মঙ্গল-দীপ নিভিয়া গিয়াছে, সে হুলাহুলি থামিয়া গিয়াছে, সে শঙ্খ নীরব হইয়াছে, আয়তির সে রামসীতার সম্বর্দ্ধনা-স্থলে এখন কোন স্মৃতিচিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন জীবনই আরাধ্য ধনে বঞ্চিত হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না। স্বামিবিহীনতা চেতন কেন, জড়েরও সম্ভবপর নহে। সকলেরই স্বামী চির অমর। তবু বিধবা কেন, ক্ষুদ্র আমি—এ প্রশ্নের সমাধান কি করিব। যিনি অসাধারণ মানব, তিনি অমর স্বামীর সাহচর্য্যে জীবন যাপন করেন।

'সধবা' ও 'বিধবা' এই দুইটি কথা লইয়াই আমাদের ভাগ্যবিচার। যে পর্য্যন্ত ধবের হস্তে হস্তপ্রদান না করিয়া বালিকার জীবনযাপন, এক নিখিল ধবের পায়, নিষ্কামভাবে নয়, শুধু না বুঝিয়াই আত্মসমর্পণ, তখন যেন সকলেই স্বামি-শূন্য জীবন লইয়া ইতস্ততঃ কেবল স্বামীর অন্বেষণেই ব্যতিব্যস্ত।

কত যুগযুগান্ত আগে নিখিল-ধবের চির আশ্রিত কোন পুণ্যময়ী কুমারী তার আশ্রয় প্রার্থনার আশায় ছুটিয়া গিয়াছিল। যিনি সর্ব্বপ্রথম গিয়াছিলেন, তিনি পবিত্র মানবের আদি জননী। এ আশ্রয় প্রার্থনা ভগবানেরই ইচ্ছা। সহস্র সন্তপ্ত প্রাণের অশান্তি প্রশমনের চেষ্টার মূলেও সহস্র সন্তপ্ত, বদ্ধ ও মুক্তীচ্ছু প্রাণের উদ্ধারকল্পে একটি সাধনালব্ধ পুন্নাম নরকত্রাতা পবিত্র শিশুর

সৃষ্টি কমনাই পিতামাতার সার চিন্তা। স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ দৃঢ় হইল। স্বামীর চির-আশ্রিত নারী কুমারী, অকুমারী, সধবা বিধবা ইত্যাদি কত নামেই ব্যাখ্যাত হইল।

স্বামী চির অমর। কিন্তু অমরত্ব সাধনাসাপেক্ষ। অমরত্বের আশ্রয় প্রার্থনা এবং অভ্যাসও সাধনা-সাপেক্ষ। চিন্তা অভ্যাস ও সাধনা সামান্য বলিয়াই স্বামিত্বের বিশ্বাস এত ক্ষীণ হইয়াছে। সেই অমরত্বের জন্যই যে প্রত্যক্ষ দেবতা, সিদ্ধ যোগী, দীক্ষাগুরু ও রক্ষাকর্ত্তা স্বামীর প্রয়োজন, বিবাহের পবিত্র বন্ধনে প্রতিমন্ত্রে সেই কথাই ব্যক্ত। সমস্ত গুরুজনের সমক্ষে, সভাস্থ সমবেত নরনারীর সম্মুখে, জীবনের চিরন্তন প্রতিশ্রুতি পালনের কঠোর প্রতিজ্ঞা। যাহা করিবার জন্য একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আজ দুইজনে—পুরুষ প্রকৃতি—স্বামী স্ত্রী মিলিয়া তাহা পালন করিব। দেহ-সংশোধক ও চিত্ত-বিকাশক সে পবিত্র মন্ত্রও বুঝি না, কঠোর কর্ত্তব্য পালনের সে প্রতিজ্ঞাও পালন করি না, সম্মিলন-তত্ত্ব বিবাহও বুঝি না, প্রকৃতি পুরুষের যৌগিকত্ব স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধও বুঝি না। বুঝি সংসার—বুঝি নিত্যস্রোতে প্রবাহমাণ অসংখ্য নরনারীর অনিবার্য্য সংসর্গ-স্পৃহা।

যে স্বামীকে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ডাকিতেছি, দয়া করিয়া, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ লইয়া, শরীরী হইয়া প্রত্যক্ষরূপে তিনি দেখা দিয়াছেন। সত্যই বিবাহে অতুল আনন্দ। সতী স্বামীর জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, হিন্দু বালিকাও সংযম করিয়া, স্বামি-প্রার্থনায় ব্রতাচারণ করিয়া থাকে। সতীর স্বামী আরাধনারও যেমন বিরাম নাই, এ অচ্ছেদ্য স্বামি-স্ত্রী বন্ধনও কেহ ছিঁড়িতে পারে না, এ স্বামীর নিধন নাই। এক দেহ দ্বিখণ্ডিত হইলে খণ্ডিত দেহ শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আগেই চায় দেহের সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যের উপভোগই রসতত্ত্বের সাধনা। এই সাধনার জন্যই পুরুষেরা জামাজুতা কাপড় চোপড় পরে, আমরাও সালঙ্কারা হইয়া, লম্বিত কৃষ্ণ…কেশগুচ্ছ বিনাইয়া, মাথায় সিন্দুরবিন্দু দিয়া সৌন্দর্য্য সিন্ধুতে অবগাহন করি। যৌবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট হই না, নিত্য নূতন অভাব লইয়া সৌন্দর্য্যের পুঁজি যেন বাড়াইয়া দেই। আহারে বিহারে, নিদ্রায়

জাগরণে নিত্য নিত্য ভোগের ভেরী বাজাইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি। স্বামীর সহিত যতদিন এই ভোগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে, ততদিন সধবা আর শরীরী স্বামীর সহিত এগুলির প্রত্যক্ষ বিসর্জ্জনেই আমরা বিধবা। প্রত্যেক নরনারী যে নিত্য ধবময়, স্বামীর চরণে নিত্য প্রণত, এ কথা ভুলিয়া গিয়াই কামনাকে লইয়া জাতি গড়ি, ধর্ম্ম গড়ি, নব প্রয়োজন গড়িয়া লই। বাসনা ইহা নিশ্চয় গড়িবে, চিরদিন গড়িতেছে। যাহারা এ গঠনে গায়ের জোরে বাধা দেয়, স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, তাহারা জগতের কিছুমাত্র উপকার সাধন করে না। আর যাঁহারা আপনার মানসিক বলে, সংযমের বলে এই নিত্য প্রবহমাণ স্রোতের অনির্ম্মল জলকে নির্ম্মল করিয়া দেন, জগতে তাঁহারা দেব-দেবী-রূপিণী।

প্রাণে যখন যে প্রশ্নের উদয় হয়, তখনই সে প্রশ্নের কেহ মীমাংসা করিয়া দিলে, এত মানুষ এমন ভাবে অধঃপাতে যাইতে পারে না। সকল সময় প্রশ্নের...মীমাংসকও পাওয়া যায় না, আর সকল মীমাংসা মন মানিয়াও লইতে চায় না। আবার একই মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্য দিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়।

বিবাহের পরে যখন স্বামিসঙ্গ লাভ করি, তখন তিনি অধ্যয়নে নিযুক্ত। এমনই পিতামাতা অভিভাবক, অধ্যয়নের জীবনে, বালকবালিকার জীবনে একত্র এক শয্যায় শয়নের জন্য আমরা কম লাঞ্ছিত হইতাম না। স্বামী যে দিন আমার সঙ্গে একত্র শয়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, সে দিনই তিরস্কার সহ্য করিতেন, আমিও তিরস্কৃত হইতাম। নীরবে সকলই শুনিতাম, মুখ ফুটিয়া, সাহসে ভর করিয়া কোন দিনও কোন কথা বলিতে পারিতাম না।

প্রথম প্রথম আমার ভয় হইত, লজ্জা হইত; কিন্তু দেবতার চরণে আশ্রয় লইতে ভয় অপেক্ষা ভরসাই যে অধিক, দিনে দিনে আমি তাহা বুঝিতে লাগিলাম। শত শত যুবককে যে বয়সে অযথা আমোদ পরায়ণ হইতে দেখিয়াছি, সেই বয়সেই আমি তাঁহার দেবত্বে মুগ্ধ হইয়াছি। হৃদয়ে তাঁর যেন চঞ্চলতা নাই, হাসি তামাসা নাই, অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি। তাঁহাকে সম্মান করিবার ইচ্ছা, ভক্তি করিবার ইচ্ছা, স্বতঃই বড় প্রবল হইত, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তির আরাধনা করিতাম। এমন কিছুদিন গিয়াছে, তিনি

জড়ভাবে দেবমূর্ত্তির মত আমার সম্মুখে বসিতেন, আমি রূপসুধা পান করিতে করিতে অলক্ষিতে রসতত্ত্বে পৌঁছিয়া ধ্যানস্থ হইতাম। কখনও তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার দেহ মন ও সৌন্দর্য্য লইয়া একাকিনী নীরবে আমি বিচার করিতাম। তিনিও আমার জড়মূর্ত্তির বিচার করিতেন। দেহ মন ও সৌন্দর্য্যের রূপ ও রস-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া আপনি বুঝিতেন, আমাকে বুঝাইতেন। আমি তাঁহাকে 'দেবতা' বলিয়া ডাকিতাম, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তিনি কখনও আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেন, কখনও 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদিন আমি স্বামীর নিকট 'তুমি' 'তুই' ও 'আপনি' সম্বোধনের ইতিহাস শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,…"আপনি" 'তুমি' 'তুই' শব্দগুলি বহুদিন হইতে মানবের মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পুষ্টি করিতেছে, এ পুষ্টির স্বভাবগত কোন ইতিহাস নাই। সংস্কারগত ইতিহাস আছে। 'তুমি' বলিয়াই যদি সম্মানসূচক সম্বোধন করিতে মানব জাতি ইচ্ছা করিত, তাহাতে বাস্তবিক কোন দোষই ছিল না। আবার হৃদয় উচ্চ না হইলে 'আপনি' বলিলেও সম্মান করা হয় না, 'তুমি' বা 'তুই' বলিয়াও উচ্চ হৃদয় সম্মানের পাত্রকে সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু চিরপোষিত, মানব জাতির অভ্যস্ত সংস্কার 'আপনি'র ভিতরে যত সম্মান পুঁজি করিয়াছে, 'তুমি'র ভিতরে তত নৈকট্যকে, কখনও ভালবাসায়, কখনও মোহান্ধতায় ভরিয়া… রাখিয়াছে; 'তুই'র ভিতরে তুচ্ছতাকে লইয়া সংস্কার মানব-মনে কার্য্য করিতেছে। আবার কোন কোন অবস্থায় 'তুই' এর ভিতরে যত ভালবাসা আছে, 'তুমি'তে তাহা নাই। 'আপনি'তে তাহা নাই।

ঈশ্বরকে যখন শুধু ডাকিতে হয় বলিয়া মনের সাধারণ অবস্থায় ডাকি, তখন 'আপনি' বলাই মন বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টার পরিচয়। আর যখন ভাবে বিভোর হইয়া মনের বিশেষ অবস্থায় ডাকিবার জন্য উন্মত্ত হই, তখন 'তুমি'র নৈকট্য বিশুদ্ধ মনেরই পরিচয়। ভক্তির প্রথম অবস্থায় ভক্ত ইষ্ট-দেবতাকে সম্মান করিয়া ভালবাসিতে চায়, ভক্তির পরিণত অবস্থায়, ভক্ত ভালবাসিয়াই সম্মান করিতে চায়। এ ভক্তির সম্বোধন 'তুমি' 'তুই' সব হইতে পারে; এ ভক্তির সংস্কারে গণ্ডী নাই, মানবীয় মনের সাধারণ বিচারে এ সম্বোধনের মীমাংসা হয় না। কিন্তু যতক্ষণ অসংস্কৃত মন, ভালবাসিতে

যাইয়া মোহান্ধের মত ভালবাসে, তুমিত্বের নৈকটে যাইয়া সম্মান না করিয়া সম্মানার্হকে ভালবাসিতে চায়, ততক্ষণ 'আপনি'র গণ্ডী বড় ভাল। 'আপনি' অসংস্কৃত মনের অসংযত বাকের বিবেক, একটু বিচারেই সম্মানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।' সম্বন্ধ যত উচ্চ হয়, ভাবও তত উচ্চভাবে পরস্পরের মন বিচার করিবার সুবিধা পায়। এই জন্য স্বামিস্ত্রীর মধ্যে—বাস্তব জীবনের লক্ষ্যে আদর্শ স্থাপনের জন্য দেবদেবী সম্বোধন বড় উচ্চ ভাবময়। যিনি স্বামীকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে শেখেন, তিনি তাঁহার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যময় খেলায় কেবল ভুলিয়া থাকেন না, তিনি তাঁহার মানবতত্ত্বের সন্ধান করেন; যিনি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী দেবী বলিয়া-বিশ্বাস করিতে শেখেন, তিনি তাঁহার লাবণ্যশ্রী দেখিয়া ভোলেন না, জ্যোতিশ্রীর সন্ধানে মনকে নিয়োজিত করেন। সর্ব্বপ্রকার বিবাহের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বিবাহের এই প্রধানতম লক্ষ্য। বিবাহ বলিয়া দেয়,—"তুমি পৃথক হইও না, মিলিত হও। তুমি এই মিলন-তত্ত্বের মধ্যে…মানবত্বের মধ্যে… সৃষ্টির…মধ্যে প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে বিশ্বস্বামীর অনুসন্ধান কর।" যেখানে এত বড় গভীর সম্বন্ধ, সেখানে স্বামিস্ত্রী পরস্পরের সম্মান কত উচ্চাঙ্গের, আমরা অনেকেই তাহা বুঝি না।

স্বামী যাহা বুঝাইতেন, সহজেই যেন আমার মন তাহা বুঝিয়া লইত। তাঁহাকে……বুঝিবার জন্য মন যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। তাঁহাকে ভক্তিতে বুঝিতাম, বিশ্বাসে বুঝিতাম, কল্পনায় বুঝিতাম। সকল সাধ্বী স্ত্রীর নিকটেই স্বামী দেবতাই বটে, কিন্তু স্বতঃ প্রকাশিত দেবমূর্ত্তির সেবা সকল নারীর অদৃষ্টে ঘটে না।

তিনি আপনি যত সাবধান হইয়াছিলেন, তত সাবধানে আমাকে আত্মরক্ষা করিবার গৌরবময় মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন।

স্বামিস্ত্রীর মধ্যে সংযমের কোন আবশ্যকতা নাই; প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা সঙ্গিনীদের নিকট শুনিয়া শুনিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলাম। মন যে দেহের সাহচর্য্যে ভোগ করিয়া—আপনার কামনার পরিতৃপ্তি করিয়া আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মার সেবায় সংযত হইতে চায়, ভোগের ভাবনায় আমরা তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। প্রতিবেশী যুবকযুবতী অনেক সময় একটি

নির্ম্মল জীবনের উপরে যে নৈতিক অবনতির আদর্শ স্থাপন করে, ভাবিলেও তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গঠিত বা উৎকর্ষ-প্রাপ্ত চরিত্র তাহাতে যথেষ্ট সৎশিক্ষা পায় বটে, কিন্তু অগঠিত চরিত্রের চিরদিনের জন্য সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

বাসনার স্রোতাবর্ত্তে যৌবনের মোহে, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে সাধারণ মানব যখন বিকারগ্রস্ত, সেই সময়ই আমি স্বামিপদভেলার আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিলাম। সেবা যে ভগবানের অন্যতম উপাসনা, স্বামীর সাহচর্য্যে দিনে দিনে আমি তাহা বুঝিতে লাগিলাম। আহারে বিহারে, নিদ্রায় জাগরণে সর্ব্বস্থানের একমাত্র শিক্ষা সংযম। মন্ত্রমুগ্ধের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। জীবনে আগে যেন কোমলতা ছিল না, ছিল কমনীয়তা—ছিল স্বামি-প্রবঞ্চনার বিষ তোষামোদ। প্রথম ছিল স্বামীর জন্য অনাবশ্যক ব্যস্ততা, আর এখন হইল সকল লইয়া স্বামীর দিব্য জীবন গঠনের চেষ্টা। আমার মনে স্বামিত্বের যত দিব্য গঠন হইবে, ততই আমি যথার্থ স্ত্রী, যথার্থ সেবিকা, যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইব। আগে ভাবিতাম, স্বামীর সকলই ভাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যে ইন্দ্রিয়ের—স্বামীর নহে, সে কথা আগে বুঝিতে পারিতাম না। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের বাসনায় যে মোহান্ধতা আছে, তার কাছে আমার স্বামীর স্বামিত্ব নাই। স্বামীর স্বামিত্ব ইন্দ্রয়ের মোহান্ধ জ্ঞানে নহে—ইন্দ্রিয় দমনে, ক্রমে ক্রমে তাহা বুঝিতে লাগিলাম। এ কি অভিনব তত্ত্ব—এ কি এক মহতী প্রার্থনা বর্ণে বর্ণে, ছন্দে ছন্দে যেন কোমলতা ও তেজের গম্ভীরমূর্ত্তির পরিচয়। যাহারা এক সময়ে হাস্য পরিহাস করিতে আসিত, তাহারাই সদালাপ করিতে আসে। ছদ্মবেশিনী প্রিয়সঙ্গিনীরা আপনার প্রচ্ছন্ন দোষকে ঢাকিয়া লইয়া তাঁহার সতীমূর্ত্তি, দেবীমূর্ত্তি কখনও মাতৃরূপে, কখনও ভগ্নীরূপে দেখাইয়া যায়। মাতৃস্বরূপিণী দেবীগণ দয়া করিয়া আসিয়া সাদর-সম্ভাষণ করেন। অভ্যন্তরে ছদ্মতা, বাহিরে মুখশ্রী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মলিনতা, আচার ব্যবহারে আত্ম-দোষ-ক্ষালনের মৌখিক অযথা চেষ্টা দেখিতে অতি সুন্দর—আংশিকও বুঝাইয়া দেয়, মানুষের দুর্ব্বলতা কোথায়!

• • • • •

সেই চমৎকার দিন! প্রশ্ন উঠিল স্বামীর নিকট চাহি কি? কেহ বলিলেন, স্বামীর রূপ চাই, কেহ বলিলেন, স্বামীর গুণ চাহি। কেহ বলিলেন, স্বামীর

সম্পদ চাই, কেহ কেহ বলিলেন, স্বামীর সকলই চাই, দেহ চাই, মন চাই, আত্মা চাই ; সকল লইয়াই স্বামী। চমৎকার মীমাংসা।

নিদ্রা হইতে হঠাৎ একদিন জাগিয়াছিলাম, কেন যেন তখন মনে মনে প্রশ্ন হইল, স্বামীর নিকট চাহি কি ? দেহ না মন, না আত্মা! দেহ চাই ? এইত নয়ন ভরিয়া দেখিতেছি—দেহ। দেহ—না সৌন্দর্য্য! তবে কি সৌন্দর্য্য চাই ? সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য হইতে এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত সুগঠিত দেহের নিকট চাই আমি সৌন্দর্য্য! রক্ত, মাংস, বসা যেখানে যত আছে, তাহা আমার নিকট অপবিত্র, জগতে আর যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, এর নিকট সকলই তুচ্ছ, চাই শুধু এই সৌন্দর্য্য! ও সৌন্দর্য্য কিসের ? এই জল, এই বায়ু, এই ক্ষিতি, এই তেজ, এই ব্যোম—ইহারই অংশে এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানব দেহ! এই সুন্দরী প্রকৃতির সমষ্টির সৌন্দর্য্য চাই না, চাই শুধু ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য! সমষ্টিকে ভাবিতে পারি না, আয়ত্ত করিতে পারি না, ব্যষ্টিকে লইয়া রূপরসের আস্বাদন করিতে যাইয়া ব্যষ্টির মধ্যে ডুবিয়া যাই। কিন্তু সত্যই কি চাই শুধু ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য ঐ দেহ ? শুধু জড় দেহ কি আমার তৃপ্ত করিতে পারে ? না—শুধু দেহ চাই না—দেহ চাই, মন চাই, আত্মা চাই! সহসা স্বামী হাসিয়া উঠিলেন। প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন,—"স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মৃত, তুমি কেবল বলিতেছ,—"আমি দেহ চাই, মন চাই, আত্মা চাই।" কতদিন চলিয়া গেল, সাবিত্রীর মত আমার দেহ আগুলিয়া রহিলে। মন ত আগেই গেল, ছিল দেহ, তাহাও পচিয়া গেল, তুমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে, দেহ নাই, মন নাই—কিছুই নাই। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, আমি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়াই বলিলাম, এই ত আমি, তুমি সানন্দে বলিলে, আমি দেহ চাই, মন চাই, আত্মা চাই।

একমুহূর্ত্তে যেন আমার প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ দেহ চাই, মন চাই, আত্মা চাই। যে দিন প্রাণ চলিয়া যাইবে—সে দিনও দেহ চাই, যে দিন দেহও পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, সে দিন শুধু ভোগস্পৃহাহীন অমর আত্মার নিত্যসঙ্গিনী ব্রতচারিণী—ইহ পরকালের সহধর্ম্মিণী হইতে চাই।

আজ এ প্রশ্নের একরূপ মীমাংসা করিয়া আমার মনকে বুঝাইতে পারি। স্বামীর শিক্ষায় বুঝিয়াছি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বামী চিরজীবনের সহায়। আবার মৃত্যুর পরে ইহলোকের স্ত্রী ও পরলোকের স্বামী, বা ইহ লোকের স্বামী ও পরলোকের স্ত্রী উভয়েই শরীরী ও অশরীরী স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ। তপস্যা করিয়া দেবতার দেখা পাইয়াছি, তাঁহার কর্ম্মজীবনের দৃঢ় প্রণালী ইহলোক হইতে তাঁহাকে পরলোকে আহ্বান করিয়াছে, তিনি নব কর্ম্মস্থল গিয়াছেন, কিন্তু ডাকিলেই ত তিনি আসিবেন। প্রয়োজন মত ডাকিলে সকল সময়ই জামাজুতা পরিয়া আসিবেন কেন? খালি গায়েও আসেন, দূরে থাকিলে চিঠিও লেখেন। প্রয়োজন হইলে স্বপ্নেও দেখা দেন। যার বাহিরের প্রকাশিত রূপ সংযত অথচ অন্তরে রসস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের পক্ষে সাকার অন্তরিন্দ্রিয়ের পক্ষে নিরাকার অথবা যার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির আস্বাদনে মনের কল্পনায় তিনি আমার নিকট কল্পনায়, ভাবে ও প্রকাশে সাকার, আমার সেই ঈপ্সিতদেবতা আমার হৃদয়রাজ্যে চির প্রতিষ্ঠিত। বালিকার জীবনে, কিশোরীর জীবনে, যুবতীর জীবনে, প্রৌঢ়ার জীবনে, এবং এই বৃদ্ধ-বয়সে আমি যে মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, সে মূর্ত্তি পূজায় আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে। দেবতা স্বতঃ প্রকাশিত, তার মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি আপনি গড়িয়া দেন, ভক্ত মাত্রই সে মূর্ত্তি পূজায় ভাবোন্মত্ত ও প্রেমতত্ত্বজ্ঞ হয়।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

শান্তি।

কর্ম্ম সারি, ত্যজিয়াছ এ বিশ্বভুবন,
আর না সহিতে হ'বে জ্বালা অনুক্ষণ,
এড়ায়েছ অশান্তির তীব্র প্রতিঘাত,
পৃথিবীর শোক দুঃখ রোগাদির হাত।
ধীরভাবে সহ্য করি' দুঃখরাশি যত,
না জানায়ে অন্তরের মর্ম্মভেদী ক্ষত
হে সহিষ্ণু! মৌনভাবে চ'লে গেছ আজি
আর এক কর্ম্মক্ষেত্রে বীরভাবে সাজি।
পাইও মনের সুখ! যেন মিথ্যা কথা
দিতে নাহি পারে সেথা তোমায়ে হে ব্যথা
যেন কভু স্নেহ সেথা ব্যর্থ নাহি হয়
প্রেম শান্তি মনোমাঝে চিরকাল রয়।
প্রার্থনা আমার বিভু করিও সফল
কি দিয়ে জানাব ভক্তি—লহ অশ্রুজল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দিল্লী।

মুসলমান-রাজত্ব।

(পাঠান শাসনকাল—দাস-বংশ)

হিন্দুস্থানে মুসলমান পতাকা উড্ডীন হইলে, যিনি প্রথমে তাহার ছায়াতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কুতুবুদ্দিন ঐবক্। (১) কুতুব তুর্কীস্থান হইতে ক্রীতদাসরূপে অনেকের নিকট বিক্রীত হইতে হইতে অবশেষে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পতিত হন; মহম্মদ ঘোরীর একমাত্র কন্যা থাকায়, তিনি অনেকগুলি ক্রীতদাসকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন; কুতুবুদ্দিন তাহাদের অন্যতম। কুতুব বাল্যকালে ঐবক্ নামে অভিহিত হইতেন, পরে কুতুবুদ্দিন উপাধি লাভ করেন; অন্যান্য কার্য্যে নিয়োগ করার পর মহম্মদ ঘোরী কুতুবুদ্দিনকে তাঁহার অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন; কুতুবুদ্দিনই দিল্লী অধিকার করিয়া লন। কবিচন্দ্র বলেন যে, পৃথ্বীরাজ কর্তৃক সাহাবুদ্দিনের হত্যার পর সকলে মিলিয়া কুতুবুদ্দিনকে গজনীর সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন। (২) এবং রেণুসিংহের হস্ত হইতে তিনি দিল্লী অধিকার করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মহম্মদ ঘোরী জীবিত থাকিতে থাকিতেই কুতুবুদ্দিনকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করায় তিনি দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। (৩) সে যাহা হউক কুতুবুদ্দিন যে প্রথমে

(১) কুতুবুদ্দিন—বিশ্বাসীর ধ্রুবতারা। কুতুবের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ঐবক্ নামে অভিহিত হইতেন।

(২) সাইত সোধি সহাব। পুত্তি কাজি কুতবানির।
নবল তসত নবরোজ। ছত্র চামর সোংভ্যনির॥

(3) After the return of Mahomed Ghoory, his general, Mullik Kootboodden Eibuk, took the fort of Merut and the city of Dehly from the family of Chawond Ray; and it is owing to this circumstance that foreign nations say, "The empire of Dalhy was founded by a "slave." (Briggs Ferishta).

From thence he went to Mirat, of which he took possession in A. H. 587 (1191. A. D). In the same year he marched from Mirat and captured Delhi.

(Tabakat-i-nasiri Elliot vol II).

দিল্লী অধিকার করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কনোজ আক্রমণ কালে রাজা জয়চন্দ্র কুতুবুদ্দিনের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন, কাশীরাজও তাঁহার কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের পতনের পর রাজপুতেরা একেবারে হীনবীর্য্য হন নাই; তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমানাধিপত্য স্থাপনের বাধা প্রদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিনকে আজমীরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অনেক দিন ব্যাপিয়া সমরক্রীড়া করিতে হইয়াছিল। গুজরাট, মহুবা, কালী-প্সর এবং রাজপুতানার আরও কোন কোন স্থান তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনতায় বক্তিয়ার খিলিজি বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করেন। কুতু-বুদ্দিন, তাজুদ্দিন য়েলদুজ নামে মহম্মদ ঘোরীর অন্য এক ক্রীতদাসের কন্যার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হন। দিল্লীতে মহাসমারোহে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। (৪) ইহার পর লাহোর ও গজনীর অধিকার লইয়া শ্বশুর জামাতায় বিবাদ উপস্থিত হয়; লাহোর অধিকারে শ্বশুর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কিন্তু জামাতাকে গজনীর অধিকার পরিত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরেই কুতুব গজনী অধিকার করিয়াছিলেন।

গজনী অধিকার কালে কুতুবুদ্দিন অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়েন। তাহার পর আবার ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি সংযমসহকারে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'লাক বক্‌সীস' উপাধিতে অভিহিত হইতেন। পুরাতন দিল্লীর অভ্রভেদী কুতুবমিনার কুতুবুদ্দিনেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। কুতুব উহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জামাতা আল্‌তামাসের রাজত্বকালে তাহার গঠন শেষ হয়। পুরাতন দিল্লীর জুমা-মস্‌জিদ বা কুতুব মস্‌জিদ প্রভৃতিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

১২১০ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম দিল্লীর সিংহা-সনে উপবিষ্ট হন। সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ওমরাগণ স্বাধীনতা অবলম্বন

(4) Kootb-ood-Deen, some time after, having obtained permission to return to his Government, espoused the daughter of Taj-ood-Deen Yeldooz, governor of Kirman in Peshawar, and celebrated the marriage-festival with great splendour after his arrival at Dehly. (Briggs Ferishta.)

করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালায় বক্তিয়ার খিলিজি অন্যতম। আরামকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সামসুদ্দিন আলতামস তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়া লন। আলতামসও ক্রীতদাস ছিলেন। কুতুবুদ্দিন তাঁহাকে ক্রয় করিয়া পরে আপনার এক কন্যার সহিত বিবাহ দেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে কুতুবুদ্দিনের শ্বশুর তাজুদ্দিন য়েলদুজ ও অপর জামাতা নাসিরুদ্দিন কুবাচা আলতামাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায়, তিনি তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। এই সময়ে চেঙ্গিজ খাঁ মোগল ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমদিকের রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। কোন কোন মুসলমান রাজা চেঙ্গিজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। আলতামাস কিন্তু তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। বোখারা প্রভৃতি স্থান চেঙ্গিজ খাঁর অধিকৃত হওয়ায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি দিল্লীতে আসিয়া আলতামাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহাদের মধ্যে আমীর রুহাণীর নাম উল্লেখ যোগ্য। (৫) খলিফা আরব হইতে আলতামাসের নিকট রাজ পরিচ্ছদাদি উপহার পাঠাইয়া দেন, আলতামাস মহাসমারোহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষে বক্তিয়ার খিলিজির উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া আলতামাস স্বীয় পুত্র নাসিরুদ্দিন মহম্মদকে সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ তখনও পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হন নাই, তজ্জন্য আলতামাসকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইয়াছিল। আলতামাস রম্ভম্বর, মন্দুর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি অধিকার করেন। উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল মন্দির তাঁহা কর্ত্তৃক ভূমিসাৎ হয়, মহাকালের ও বিক্রমাদিত্যের মূর্ত্তি দিল্লীতে আনিয়া মস্‌জিদ্ দ্বারে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইয়াছিল। (৬) ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বের পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে আলতামাস

(5) At this time Ameer Roohany, the most learned poet and philosopher of his age, fled from Bokhara, after that city was taken by Chungiz Khan, and sought protection at Dehly, where he wrote many excellent poems. (Briggs Ferishta).

(6) After the reduction of Gualiar, the king marched his army towards Malwa, reduced the fort of Bhilsa, and took the city of Oojein, where

ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে যে সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভের নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছিলেন, আলতামাসের সময়ে সে সকল সম্পূর্ণ হয়।

আলতামাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকুনুদ্দিন ফিরোজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠায় তাঁহার মাতা সাতুর্কাণ শাসনকার্য্য পরিচালনায় আরম্ভ করিয়া আলতামাসের অন্তঃপুরস্থ রমণী-গণের ও তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের হত্যার আদেশ দেন। শাতুর্কাণ প্রথমে তুর্কী ক্রীতদাসী ছিলেন, তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া ওমরাগণ আলতা-মাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুলতান রিজিয়া বেগমকে সিংহাসনে উপবেশন করান. রিজিয়া বেগম গুণশালিনী রমণী ছিলেন। আলতামাস তাঁহার জীবিত কালে কোন কোন সময়ে রিজিয়ার হস্তে রাজ্য পরিচালনের ভার প্রদান করিতেন। রিজিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তিতে প্রথমে কয়েকজন ওমরা মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বেগমের কৌশলে তাঁহাদের পরস্পরেরমধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অবশেষে ওমরাগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। রিজিয়া পশ্চাৎ,

he destroyed a magnificent temple dedicated to Mahakaly, formed upon the same place with that of Somnat. This temple is said to have occupied three hundred years in building, and was surrounded by a wall one hundred cubits in height. The image of Vikramaditya, who had been formerly prince of this country, and so renowned, that the Hindoos have taken an œra from his death, as also the image of Mahakaly, both of stone, with many other figures of brass, were found in the temple. These images the King caused to be conveyed to Dehly, and broken at the door of the great mosque. (Briggs Ferishta).

After he had reached the capital he sent, in A. H. 632 (1234 A. D.), the army of Islam towards Málwa and took the fort and city of Bhilsa. There was a temple there which was three hundred years in building. It was about one hundred and five gaz high. He demolished it. From thence he proceeded to Ujjain, where there was a temple of Maha-kal, which he destroyed as well as the image of Bikramajit, who was King of Ujjain, and reigned 1316 years before this time. The Hindu era dates from his reign. Some other images cast in copper were carried with the stone image of Maha-kal to Dehli. (Tabakat-i-Nasiri. Elliot vol II)

সিন্ধু ও বাঙ্গালা প্রভৃতি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। বেগম জামালুদ্দিন ইয়াকুৎ নামে একজন আবিসিনিও ক্রীতদাসকে আমীর ওমরা পদ প্রদান করায় অন্যান্য ওমরারা বিরক্ত হইয়া উঠেন। ইয়াকুতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা অনেকের মনে সন্দেহেরও সৃষ্টি করে। প্রথমে লাহোরের শাসন কর্ত্তা বিদ্রোহী হন, কিন্তু অবশেষে তিনি পুনর্ব্বার বশ্যতা স্বীকার করেন। বিঠুণ্ডার (৭) শাসনকর্ত্তা মল্লিক আলতুনিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রিজিয়া বেগম বন্দী হন। তাঁহার প্রিয়পাত্র ইয়াকুৎ জীবন বিসর্জ্জন দেয়। এদিকে অন্যান্য ওমরারা বেগমের ভ্রাতা বৈরামকে সিংহাসনে আরোহণ করান। রিজিয়া আলতুনীয়ার সহিত বিবাহ পাশে আবদ্ধ হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বেগম আর একবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেবারও তিনি ও তাঁহার নবপতি পরাজিত হন। অবশেষে তাঁহারা জমিদারগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বৈরাম দেখিলেন যে উজীর ও কোন কোন ওমরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দমনের ব্যবস্থা করেন, সেই সময়ে চেঙ্গিজ খাঁর মোগলেরা লাহোর অবরোধ করিলে উজীর তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। প্রত্যাগমন কালে তিনি সৈন্যদিগকে বাধ্য করিয়া দিল্লীতে আগমন ও বৈরামকে সিংহাসনচ্যুত করেন। বৈরাম জীবন বিসর্জ্জন দিতেও বাধ্য হন। ঐজুদ্দিন বলবন্ নামে এক জনৈক ওমরা সহসা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন কিন্তু অন্যান্য ওমরারা তাহাতে বিরক্ত হইয়া রুকুনুদ্দিন ফিরোজের পুত্র আলাউদ্দীন মসুদের মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দেন। এই সময়ে মোগলেরা পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালা ও পশ্চিমে উচা প্রদেশ আক্রমণ করে, তাহাদিগের বাধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মসুদ অত্যন্ত বিলাসী ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠায় ওমরারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার পিতৃব্য

(7) Brigg বিঠুণ্ডাকে বর্ত্তমান বুলন্দ সহর বলেন, Elliotএর উদ্ধৃত তবকতী নাসিরি ও Dowএর History of Hindostan এ বিঠুণ্ডার পরিবর্ত্তে তবরহিন্দ (Tabarhindh) লিখিত আছে।

নাসিরুদ্দিন মামুদকে সিংহাসন প্রদান করেন, বন্দী অবস্থাতেই মসুদের প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়।

নাসিরুদ্দিন মামুদ আলতামাসের পুত্র। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ও গুণ-শালী নৃপতি ছিলেন। মামুদ স্বীয় ভগিনীপতি গিয়াসুদ্দিন বলবন্ বা বেলীনকে উজিরী প্রদান করেন। বলবনের সহিত কিছুকালের জন্য তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। পরিণামে আবার উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়। গোক্ষুর ও মেবাতিরা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করায় তাহাদের দমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হিন্দু রাজাদের মধ্যে কাহার কাহারও সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে মামুদই জয়লাভ করেন। উজীর বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সের খাঁ গজনী হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র পারস্যাধিপতি হল্লাকু নাসিরু-দ্দিনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। নাসিরুদ্দিন একজন জিতেন্দ্রিয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তাঁহার একটী মাত্র বেগম ছিলেন। তিনি উজীর গিয়াসুদ্দিন বলবনের কন্যা। বেগম স্বহস্তে বাদসাহের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন। এক দিন রন্ধনকালে তাঁহার অঙ্গুলী দগ্ধ হওয়ায় বেগম একটী পরিচারিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নাসিরুদ্দিন উত্তর দেন যে, তিনি রাজ্যের ন্যাসিস্বরূপ এরূপ অনাবশ্যক কার্য্যে তিনি রাজকোষের অর্থব্যয় করিতে পারেন না। মামুদের ভোজ-নাগার ফকিরের গৃহতুল্যই ছিল; রাজা বাদসাহের বিলাস ভবনের ন্যায় দৃষ্ট হইত না। নাসিরুদ্দিন কোরানাদির লিখন দ্বারা অনেক সময়ে আপনার আহার্য্যের উপায় করিতেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দিন বলবন বা বেলিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বলবন তুর্কীস্থানের কোন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারের পুত্র ছিলেন। মোগলেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া বিক্রয় করে, অবশেষে তিনি আলতামাসের নিকট আনীত হন, প্রথমে কোন কোন ক্ষুদ্র কার্য্যেনিযুক্ত হওয়ার পর বলবন আপনার ক্ষমতা প্রভাবে ওমরা শ্রেণীভুক্ত ও আলতামাসের কন্যার সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন, বলবন একজন ন্যায়পর ও উদার সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদিগের প্রতি কোন কার্য্যের ভার প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন না। নীচ বংশীয়দিগকে তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্ত

করিতেন না। মোগলদিগের অত্যাচারে যে সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি স্ব স্ব দেশ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, বলবন তাঁহাদিগকে সযত্নে ও সসম্মানে প্রতিপালন করিতেন। দিল্লীর যে যে ভাগে তাঁহাদের আবাস-স্থান ছিল, তাঁহাদের নিজ বাসভূমির নামে তাহারা অভিহিত হইত। বলবন শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোকদিগেরও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। দিল্লীর কবি আমীর খশ্রু ঐ সকল ব্যক্তির নেতা ছিলেন। কলাবিদ্‌গণকেও তিনি উৎসাহ দিতেন, এতদ্ভিন্ন বলবন সাজসজ্জা ও আরম্ভড় ভালবাসিতেন। (৮)

(8) In the history of these times, compiled from the Tubkat Nasiry and other works besides that of Ein-ood-Deen Beejapoory, it is stated, that Gheias ood-Deen Bulbun used to affirm, that one of thc greatest sources of the pride of his reign was, that "upwards of fifteen of the unfortunate sovereigns from Toorkistan, Mawur-ool-Nehr Khoorassan, Irak, Ajum, Azoorbaizam, Iran, and Room, who had been driven from their countries by the arms of Chungiz Khan, were enabled to find an honourable asylum at his court at Dehly." Princely allowances and palaces were assigned to each, and, on public occasions, they ranged themselves before the throne according to their rank; all standing on the right and left, except two princes of the race of Caliphs who were permitted to sit on either of the musnud. The parts of the town in which the royal emigrants resided took their names from the princes who occupied them, and were denominated Mohullas such as,

The Mohulla Abassy.
—Sunjurry,
—Khwarazm Shahy.
—Deylimy.
—Alny.
— Alabuky.
— Ghoory.
—Chungizy.

The Mohulla Roomy.
—Sunkury.
—Yemny.
—Moosury.
—Samar-Kundy.
— Kashghury.
—Kantty.

In the retinue of those princes were some of the most illustrious men of learning whom Asia at that time produced. The court of India, therefore, in the days of Gheias-ood-Deen Bulban, was esteemed the most polite and magnificent in the world. A society of learned men assembled frequently at the house of the prince, commonly knowd by the name of Khan Khan Shaheed, at which the Ameer Khoosrow of Dehly, the poet presided. Another society of musicians, dancers,

বলবনের সময়ে মেবাতীয়া অত্যন্ত উপদ্রব করায় তিনি লক্ষ মেবাতীয় প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে মেবাত প্রদেশের অরণ্য কৃষিভূমিতে পরিণত হয়, পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সেরখাঁর মৃত্যু হওয়ায় মোগলেরা উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করে, বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন, তিনি উক্তপ্রদেশের শাসন কর্ত্তাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাও তুগ্রল খাঁ বিদ্রোহাচরণ করায় বাদসাহ তাহার বিরুদ্ধে গমন করিয়া তুগ্রলকে পরাজিত ও নিহত করেন, বাদসাহের কনিষ্ঠ পুত্র কুরা খাঁ বগেরা বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হন, মোগলেরা পুনর্ব্বার পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে, মহম্মদ তাহাদিগকে দূরীভূত করেন, কিন্তু নিজেও জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। বাদসাহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি মহম্মদের পুত্র কৈখসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বলবনের মৃত্যুর পর কিন্তু ওমরারা কুরা খাঁর পুত্র কৈকবাদকে সিংহাসনে উপবেশন করান।

কৈকবাদের পিতা নাসিরুদ্দিন কুরাখাঁ বগেরা সিংহাসন লাভের অভিপ্রায়ে

actors, and story tellers, frequently met at the house of the King's second son, Karra Khan Bagera, who delighted in such amusements. The omras followed the example of their superiors, so that various societics were formed in every quarter of the city, and the King's taste for splendour in his palaces, equipages, and liveries was imitated by the courtiers.

So imposing were the ceremonies of introduction to the royal presence, that none could approach the throne without a mixture of awe and adminstration. Nor was Gheis ood-Deen Bulbun less splendid in his processions. His state elephants were covered with purple and gold trappings. His horseguards consisting of a thousand Tartarrs, appeared in glittering armour, mounted on the finest steeds of Persia and Arabia, with silver bits, and housings of rich embroidery. Five hundred chosen foot, in rich liveries, with drawn swords, proceeded him, proclaiming his approach, and clearing the way. His nobles followed according to their rank, with their various equipages and attendants. The Nowroze and other festival and the anniversary of his own birth, were held with much pomp. (Briggs Ferishta .

বাঙ্গালা হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পুত্র কৈকবাদও তাঁহার বাধা-প্রদানে যাত্রা করেন। সরযূতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কৈকবাদ যুদ্ধেরই প্রয়াসী ছিলেন। কুরাখাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বহস্তে পত্র লিখিয়া পাঠান। অবশেষে কৈকবাদ তাহাতে সম্মত হন। কুরা খাঁ নবীন বাদসাহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া রাজপরিজন কর্ত্তৃক অধীন ব্যক্তির ন্যায় সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। কৈকবাদ তখন মসনদ হইতে উত্থিত হইয়া পিতার চরণতলে নিপতিত হন। পিতা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন। কৈকবাদই সম্রাট থাকিবেন স্থির হয়। তবে কুরা খাঁ কোন কোন ওমরাকে বিতাড়িত করিবার জন্য কৈকবাদকে উপদেশ দেন। কৈকবাদ দিল্লীতে আসিয়া কিন্তু তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উহারা ক্রমে তাঁহাকে অত্যন্ত বিলাস-পরায়ণ করিয়া তুলে, অবশেষে তাঁহার মোগল ও খিলিজি ওমরাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠে। মোগলেরা কৈকবাদের পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের ইচ্ছা করেন; কিন্তু খিলিজিরা তাহা স্বয়ংই গ্রহণের অভিলাষী হন। পরিণামে খিলিজি সর্দ্দার জালালুদ্দিন ফিরোজ কৈকবাদের হত্যা সম্পাদন করাইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদবধি ১২৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দাসবংশের অবসান হয়।

[ক্রমশঃ]

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটা সুবিধা হইল এই প্রাণান্তকর শীতে চড়াই রাস্তাতে চলিয়া অনেকটা আরাম বোধ হইতে লাগিল। চড়াই উঠিবার পরিশ্রমে শীতের মাত্রা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল; কিন্তু পায়ের ঠাণ্ডা আর কিছুতেই যায় না। যাহা হউক এই-রূপ ভাবে ২ মাইল চলিয়া চোপতা চটী পাওয়া গেল। কোথাও একটু আগুন নাই যে, শরীরটাকে আর একটু গরম করিব। একটা স্থানে জড়সড় ভাবে বসিলাম; এখানে কয়েকটি বাঙ্গালী যাত্রী এবং ৩ জন সাহেব দেখিলাম। সাহেব-

দের থাকিবার জন্য একটি অনতিবৃহৎ বাঙ্গালা আছে। চাপরাশী এবং চটীর অনেক লোক জন লইয়া সাহেব মহাশয়েরা বিরাজ করিতেছেন। চটীর যত দোকানদার সাহেবদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পরিচয়ে জানিতে পারা গেল, একজন পুলীশ সাহেব, একজন ডাক্তার সাহেব, অন্য একজন ভ্রমণকারী। আমরা শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতেছি, আর এই সব দেখিতেছি, একজন সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া তুঙ্গনাথ পর্ব্বতে চলিয়া গেল। তুঙ্গনাথ এখান হইতে ৪ মাইল উপরে। বড় ভয়ঙ্কর চড়াই, এমন কি চড়াইয়ের ভয়েই অধিকাংশ যাত্রী তুঙ্গনাথ দর্শনে বঞ্চিত থাকে। দুই পার্শ্বে ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল, রাস্তায় চড়াই করিতে করিতে ৪ মাইল উপরে পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিতে হয়। এখানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। শ্রীতুঙ্গ নাথ, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। স্থানটি বড়ই রমণীয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। দর্শনাদি করিয়া উৎরাই নামিয়া পুনরায় চোপতা চটীতে আসিতে হয়।

শীতাধিক্য বশতঃ আমরা কেহই তুঙ্গনাথ দর্শন করিতে যাই নাই। এক সাধু ব্যক্তির নিকট হইতে তুঙ্গনাথ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠকবর্গ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা পুনরায় কঠিন চড়াই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিষম চড়াই! খণ্ড খণ্ড পাথরের উপর দিয়া ক্রমাগত উপরে উঠিতেছি। দুই পা উঠি আর একটু দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করি। শরীর ঘর্ম্মময়, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায়; কাণে মুখে তালা লাগিতেছে; মাঝে মাঝে বরফের স্তূপ প্রতি পদক্ষেপে বসিয়া যায়। অনেক কষ্টে সে চড়াইটা শেষ করিলাম। উপরে উঠিতেই পাণ্ডা নামধারী, মলিন কোট প্যাণ্ট পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ সামান্য ছাপ্পর ঘরে বসিয়া যাত্রীদিগকে চরণামৃত লইতে বলিতেছে, দেখিলাম। আমরা নিকটে যাইবা মাত্র বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল—"বস্ আউর চড়াই নেহি হ্যায়, অব্ উৎরাই পড়েগা। মহারাজ! চরণামৃত লে যাও, গরুড় ভগবান জী কো কুছ্ প্রণামী দেনা।" আমরা নগদ দুইটি পাই গরুড় জীকে ভেট্ দিয়া উৎরাই নামিতে লাগিলাম। অল্প দূর গিয়াই সমতল রাস্তা পাওয়া গেল। বৃক্ষ-লতা-সমাকীর্ণ সেই রাস্তায় বেলা ১১ টা অবধি চলিয়া গণেশ চটী নামক একটি ক্ষুদ্র চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নানাহার কার্য্য সামাধান করিতে উদ্যোগী হইলাম। যদিও ইহা চটী নয়, চটীর মুখতলা এবং

জলও অনেক নীচে তথাপি ক্ষুধার আক্রমণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এই চটীতেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। সঙ্গীয় দুর্গাসিং সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলে, কোন রূপে খিচুড়ী নামাইয়া লইলাম এবং পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া একটু শয়ন করিলাম। বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে বাহির হইয়া ৪ মাইল চলিয়া গোপেশ্বর মন্দিরের ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হওয়া গেল। রাস্তার সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্যে মোহিত হইয়াছিলাম। কতদিন যে কতরকম মনোমোহন দৃশ্যে প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই প্রাণ মন বিমোহন অলৌকিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হিমাচলের কঠিন কঙ্করময় পথে অবাধে চলিয়াছি। আর প্রতিবার নব নব সৌন্দর্য্যের অভ্যুদয়ে বিশ্বরচয়িতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া তাঁহার রাতুল চরণে এ অশান্ত হৃদয় ক্ষণিকের জন্যও নত হইয়াছে। আমি ধন্য হইয়াছি। স্বদেশের সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া যেন আশার পরিতৃপ্তি হয় নাই। আরও সুন্দর দেখিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। চির করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় আজ আমি সৌন্দর্য্যের রাজত্বে বাস করিতেছি। প্রতিদিন নব নব ছবি সুন্দর হইতে সুন্দরতম, মহৎ হইতে মহত্তমরূপে নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া আমাকে কি মহান্ আনন্দে আপ্লুত করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব। সংসারের অসার কোলাহল, শোক দুঃখ, চিন্তা, বিমর্ষতা অন্তর্হিত হইয়াছে। হায়! সে স্বর্গীয় শোভা আর এ জীবনে দেখিতে পাইব কিনা, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

গোপেশ্বর মন্দিরের ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। কয়েক জন পাণ্ডা আমাদিগকে একটি ঘর দেখাইয়া দিল। আমরা নির্দ্দিষ্ট ঘরে তল্পী তল্পা রাখিয়া বাজারের দিকে চলিলাম। মন্দির বন্ধ ছিল, সন্ধ্যা আরতির বিলম্ব আছে দেখিয়া আমরা বাজার দেখিতে বহির্গত হইলাম। ৪।৫ খানা দোকান আছে। একটি দোকানে ষ্টেশনারি অনেক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া গেল। দোকানদারও বেশ সজ্জন। অন্যান্য দোকানে সেই "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" অর্থাৎ চাল, দাল, আটা, আলু, ঘৃত। তবে অন্যান্য স্থান হইতে এখানে অপেক্ষাকৃত সস্তা। এমন কি আমাদের দুজনের চারি আনায় বেশ ভাল ভাবে খিচুড়ী ভক্ষণ হইয়াছিল। এত সস্তা পাহাড়ের কোথায়ও পাই নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আসিবার পথে দেখিলাম, মন্দিরাধ্যক্ষ বৃদ্ধ রাওল সাহেব পাকা দাড়ী বুলাইয়া পাশা খেলিতেছেন। মন্দিরের মোহান্তের উপযুক্ত অবসর বটে!!!

চশমার ভিতর দিয়া এ অভাগাদিগের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষপাত করিলেন, আমরা কৃতার্থ বোধ করিলাম। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে, ঘৃত প্রদীপ মৃদু জ্বলিতেছে। আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ গোপেশ্বর দর্শন করিলাম এবং প্রণামী দিয়া বাহিরে আসিলাম। আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া নিদ্রার যোগাড় করা গেল। যদিও ঘরটী ভাল ছিল, কিন্তু অপরিসর বলিয়া সমস্ত রাত্রি পা গুটাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

পরদিন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে ১ মাইল সমতল রাস্তায় চলিয়া উৎরাই পাইলাম। অনেকটা উৎরাই নামিয়া বেলা ৮ টার সময়ে লালসাঙ্গা (চমোলী) নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেক দিনের পর পুনরায় অলকানন্দার দর্শন পাইয়া পরম আনন্দ বোধ হইল। সেই রুদ্রপ্রয়াগে মাকে ছাড়িয়াছি ; আজ কত দিনের পরে কত দূরে (রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ হইয়া লালসাঙ্গা ১১০ মাইল) আসিয়া আবার তাঁহার দর্শন পাইলাম। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্র অলকানন্দার পূতবারি মস্তকে ধারণ করিলাম। ওপারে লালসাঙ্গা সহর, আমরা এপারে, মধ্যে অলকানন্দার উপরে ঝোলা সেতু। রাস্তার উপরে সেতুর নিকটে এক জন ভদ্রলোক গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত এলোপ্যাথিক ঔষধ যাত্রীদিগকে বিতরণ করিতেছেন। আমরাও কয়েকটী কুইনাইন পিল ও কিছু ডাইরিয়া পাউডার লইলাম। অনেকক্ষণ অলকানন্দার তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। প্রবল বলশালিনী উন্মাদিনী মা আমার কল কল তান তুলিয়া সহস্র তরঙ্গভুজে বিশ্ব দেবতার শ্রীচরণে যেন পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিতেছেন। সে আনন্দ তানে প্রাণ মাতিয়া উঠে। হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হয়। আমরা কল্লোলিনীর উন্মত্ত ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে দেখিতে তীরভূমির উপরিস্থ রাস্তা বহিয়া চলিতে লাগিলাম। অল্পদূর গিয়াই একটা ছোট চটী পাওয়া গেল। আমরা সে চটী পশ্চাতে ফেলিয়া একরূপ ভাল রাস্তাতেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আরও কিছুদূর চলিয়া মঠ চটী পাইলাম। চটী মন্দ নয়, ৫।৬ খানি দোকান আছে। একটী দোকানে জিলিপি ভাজা হইতেছে দেখিয়া কিছু ক্রয় করিয়া উদরস্থ করা গেল। বেলা প্রায় ৯ টা হইবে। আরো আগে গিয়া কোন চটীতে আহারাদি করা হইবে সাব্যস্ত করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম।

কখনও সামান্য চড়াই কখনও উৎরাই চলিয়া বেলা ১১টার সময়ে গিয়া চটীতে উপস্থিত হইলাম এবং মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পাদন মানসে একটী দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই চটীটা বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে কয়েকখানি দোকান। সম্মুখে অনেক নীচে মন্দাকিনী প্রবাহিতা। অনেক কষ্টে নামিতে পারা যায়। চটীর নিকটেই দুইটী স্থূলধার ঝরণা আছে। তাহাতেই জলের কাজ চলিয়া যায়। নদীর ওপারে এবং আমাদের চটীর পশ্চাতে বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী মস্তক তুলিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। তখন ঠিক মধ্যাহ্ন কাল। আমি চটীর সম্মুখস্থ অশ্বথ বৃক্ষমূলে বসিয়া হিমালয়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম। মস্তকোপরি সূর্য্যদেব অবিশ্রান্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছেন; সে কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। উচ্চ অসমান পর্ব্বতগুলি আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কত যুগ যুগান্তর হইতে কি গভীর রহস্যে পাষাণবক্ষ পূর্ণ করিয়া এই গিরিশ্রেণী বিরাজিত আছে তাহা কে বলিতে পারে। আমার ন্যায় সংসারক্লিষ্ট উদাসীন কতদিন হয়ত এই স্থানে বসিয়া এই গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া পুলকে আত্মহারা হইয়াছে এবং কত কথা চিন্তা করিয়াছে। মধ্যাহ্নতপনের উজ্জ্বল কিরণ সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিতে হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী সে অপূর্ব্ব দৃশ্যের কণামাত্রও অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণে রঞ্জিত সে সুন্দর সৃষ্টিকৌশল প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তার মহান্ ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

মাঝে একটী ভারি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। এই চটীতে আসিবার রাস্তায় ১ মাইল আগে যখন আমরা প্রায় সমতল রাস্তায় চলিয়া আসিতেছিলাম, কাণ্ডী-ওয়ালা দুর্গাসিং অনেকটা পশ্চাতে ছিল; হঠাৎ তাহার কাণ্ডীসংলগ্ন ঘটীটি নীচে পড়িয়া গেল। আমরা সেখানে বসিলাম, কাণ্ডীওয়ালা সেই পাহাড়ীবালক কাণ্ডী উপরে রাখিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। তাহাকে ব্যস্তভাবে নামিতে দেখিয়া আমরা বলিলাম, "ঘটী যাউক্, তুই উঠিয়া আয়", সে কিছুতেই মানিল না, হন্ হন্ করিয়া নামিতে লাগিল। কিছুদূর নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সে যেরূপ ক্ষিপ্রশক্তিতে নামিতেছিল, তাহাতে আমরা মনে করিলাম হয়ত নীচে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছে। প্রায় ১০ মিনিট তাহার আর দেখা নাই। আমরা তাহাকে খরচ লিখিয়া অন্য

একটী কাণ্ডীওয়ালা করিতে হইবে ইত্যাদি আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ী বালক ঘটী লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছে। কোন কষ্টের চিহ্ন তাহার প্রফুল্লবদনে লক্ষিত হইল না। হাসি মুখে "মিল্ গিয়া মহারাজ" বলিতে বলিতে আমাদের দুর্গাসিং উপরে উঠিয়া আসিল। আমরা তাহার শক্তি ও সাহসের প্রশংসা করিলাম। এইরূপ কার্য্য যে তাহাদের নিকট অতি সামান্য তাহাই সে আমাদিগকে বারংবার বলিতে লাগিল। আমাদের কেহ ঐরূপ নীচে নামিয়া গেলে সমস্ত দিনে তাহার উঠিয়া আসার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। আর একটা সামান্য ঘটীর জন্য ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে কেহই রাজি ছিলেন না। ধন্য পাহাড়ী বালক! যে আজন্ম পাহাড়ে প্রতিপালিত, তাহার পক্ষেই ঐরূপ শক্তির পরিচয় দেওয়া সম্ভব।

কোনরূপে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আমরা সেই অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। কয়েকটী প্রৌঢ়বয়স্কা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবিধবা বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া সম্প্রতি এই চটীতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, আর আমরা যাইতেছি। নারায়ণ দর্শন করিতে প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কতক্ষণে ভগবানকে দর্শন করিতে পাইব অহরহ ভাবিতে লাগিলাম। আজ আমার স্বদেশবাসিনী কয়েকটী স্ত্রীলোক স্বর্গদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে আসিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার পরমানন্দ বোধ হইল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া, শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া পড়িলাম। রাস্তাটা মোটের উপর মন্দ নয়। তেমন চড়াই উৎরাই নাই; সামান্য উঁচু নীচু, সমতল বলিলেও চলে। ১ মাইল চলিয়াই আর একটী চটী পাওয়া গেল। চটী পার হইয়া অল্পদূর অগ্রসর হইতেই অলকানন্দার উপরে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুলের সমীপবর্ত্তী হইলাম। পুলটীর প্রায় ভগ্নদশা। তবে ভালরূপ মেরামত করা হইবে, তাহার সরঞ্জাম কিছু কিছু পড়িয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। কে জানে নবকলেবর ধারণের পূর্ব্বেই পুলটি যাত্রীদিগকে সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিবে কি না। যাহা হউক আমরা পুল পার হইয়া সম্মুখে চড়াই পাইলাম। অনেক ঘুরিতে হইবে বলিয়া সঙ্গিদ্বয় অন্যান্য যাত্রীর সহিত পাক্‌দণ্ডীতে উঠিয়া পড়িলেন। আমিও

অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। পার্বত্য বড় কঠিন। খাড়া উপরে উঠিতে হইতেছে। তাহার উপর পড়ন্ত সূর্য্যের তাপে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। রৌদ্রে পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। সড়ক রাস্তা ছাড়িয়া কি ভুলই করিয়াছি। অতি কষ্টে চলিয়া সড়ক পাওয়া গেল এবং অল্পদূর যাইতে আমরা পিপুল কুটীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। রাস্তা হইতে খানিকটা দূরে ৩টী সুপরিসর গুহা দেখিতে পাইলাম। তাহার পরেই পিপুল কুঠী। এ চটী বেশ বড় রকম এবং দোকান অনেক গুলি; প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই পাওয়া যায়। একটী দোকানে সুন্দর সুন্দর চামর বিক্রয় হইতেছে। এখানে একটী পোষ্ট আফিসও আছে। তখনও কিছু বেলা আছে দেখিয়া আমরা পিপুল কুঠী হইতে বহির্গত হইলাম। এখানকার পর্ব্বতগুলি তৃণ লতা বৃক্ষাদি শূন্য এবং নৈবেদ্যের আকার। অলকানন্দা বহু নিম্নে বহিয়া যাইতেছেন। এই সমস্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গরুড় গঙ্গা চটীতে উপস্থিত হইলাম। কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালায় স্থানাভাব। একটী খালি কুঠরী আছে তাহাও চাবিবন্ধ। কাহার নিকটে চাবী থাকে অনুসন্ধান করাতে জানিতে পারিলাম ধর্ম্মশালার চৌকীদার একজন দোকানদারের জিম্মায় চাবী রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছে। দোকানদারকে ঘর খুলিয়া দিতে বলায় সে বলিল, তাহার দোকানে আটা লইলে সে অনুগ্রহ করিয়া ঘর খুলিয়া দিতে পারে। আমরা স্বীকৃত হইলে, সে ঘর খুলিয়া দিল এবং বলিয়া গেল আর যদি কেহ সে ঘরে প্রবেশ করিতে আসে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে এত্তালা করিলে প্রতিবিধান করা হইবে। ভাবিলাম মহাত্মা কালী কমলী বাবা বুঝি উক্ত দোকানদারকেই ধর্ম্মশালাটি দান করিয়াছেন। যাহা হউক অনেক বাক্ বিতণ্ডার পরে ধর্ম্মশালার একটী ঘর খুলিয়া লওয়া গেল এবং কম্বলাদি ভিতরে রাখিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে বিশ্রামার্থ বসিলাম। একটী বার তের বৎসরের বালক আসিয়া তাহাদের দোকান হইতে দ্রব্যাদি লইতে অনুরোধ করিল ও তাহাদের দোকানে যে "মেটিয়াকা তেল" (কেরোসিন্) পাওয়া যায় তাহাও বলিতে ভুলিল না। আমরা এমন সুবিধা ছাড়িলাম না, অবিলম্বে বালকের সঙ্গে তাহাদের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দোকানদারটী বালকের পিতা, বড়ই সজ্জন। কাঠ গুদামের সন্নিকটে

াহার বাড়ী, প্রায় ১২ বৎসর সে এই স্থানে দোকান করিয়াছে। দোকানদার ামাদিগকে চা করিয়া খাওয়াইল। তাহাকে পুরীর অর্ডার দিয়া আমরা গরুড় ঙ্গাবারি স্পর্শ করিতে অবতরণ করিলাম। খগরাজ গরুড় নারায়ণের বাহন ইবার নিমিত্ত এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহারই নামানুসারে নদী ও ্থানের নাম গরুড়গঙ্গা হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে পক্ষিরাজ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক যুক্তকরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা দর্শনাদি করিয়া দোকানে াাসিলাম এবং খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া উদরজ্বালা নিবারণ করিলাম। গরুড় গঙ্গা নদীর উপরে একটী নাতি ক্ষুদ্র পুল আছে। রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পর দিন ১৯ জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গরুড়জীকে প্রণাম পূর্ব্বক গরুড়গঙ্গা হইতে বিদায় লইলাম। কিছুদূর অল্প চড়াই করিতে হইল এবং ৪ মাইল চলিয়া পাতালগঙ্গা নামক চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীর নীচে দিয়া পাতাল গঙ্গা প্রবাহিতা। ইহার নাম পাতালগঙ্গা কেন হইল তাহা জানিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রামানন্তর তথা হইতে রওনা হইয়া ২ মাইল পরে গোলাপ চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীর নিকটে একটী নারায়ণের মন্দির আছে। ইহার পরে ক্রমেই রাস্তা খারাপ। বিশ্রী চড়াই, একস্থানে এমন খাড়া চড়াই যে, সে স্থান দিয়া চলিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এই স্থানের পর্ব্বত গুলি একেবারে তৃণ গুল্ম-লতাপাদপ শূন্য, উলঙ্গ মূর্ত্তি। এক স্থানে খণ্ড বিখণ্ড প্রস্তরের উপর দিয়া চলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। প্রায় ৮ মাইল চলিয়া বেলা ১০ টার সময়ে কুমারচটী নামক একটী সুন্দর চটীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেকগুলি দোকান, জলেরও বেশ সুবিধা। আজ মাত্র ৮ মাইল চলিয়াই এই চটীতে মধ্যাহ্নক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইল। কারণ আজ পরিশ্রমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। একটী দোকানে আশ্রয় লইয়া আহারাদি সম্পন্ন করা হইল।

এই চটী হইতে পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর যাইতে হয়। হিমালয়ে পঞ্চ কেদার আছেন। স্বয়ং কেদারনাথ প্রথম, দ্বিতীয় মধ্যমেশ্বর তৃতীয় তুঙ্গনাথ, চতুর্থ রুদ্রনাথ, ও পঞ্চম কল্পেশ্বর। পঞ্চ কেদার দর্শন করিতে হইলে প্রথমে কেদার

নাথ, দ্বিতীয় মধ্যমেশ্বর, কালীপীঠ হইয়া যাইতে হয়। তৃতীয় তুঙ্গনাথের বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, চোপতা চটী হইতে ৩।৪ মাইল চড়াই করিলে তুঙ্গনাথ পাওয়া যায়। চতুর্থ রুদ্রনাথ লালসাঙ্গার নিকটবর্ত্তী একটী কাঁচি রাস্তায় ১০।১২ মাইল গেলে পাওয়া যায়। পঞ্চম কল্পেশ্বর কুমার চটী হইতে কাঁচি রাস্তায় অলকানন্দার তীরে যাইতে হয়। তথায় অলকানন্দা পার হইবার নিমিত্ত এক ঝোলা আছে। ঝোলায় পার হইয়া অন্য পর্ব্বতে উঠিলে নিবিড় দেবদারু বনমধ্যে কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির পাওয়া যায়। রাস্তা অতিশয় কঠিন। এই কঠিনতার জন্যই অধিকাংশ যাত্রী তথায় যাইতে রাজী হয় না। আমরাও কল্পেশ্বর দর্শন করিতে পারি নাই।

কুমার চটীতে উপস্থিত হইয়া আমরা একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। ঘরটী নাতিদীর্ঘ কিন্তু বড় মাছির উৎপাত। কোনরূপে মাছি তাড়াইয়া যথাসম্ভব আহারাদি করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানে আলু বেশ সস্তা, পাহাড়ের আর কোথাও এত সস্তা পাই নাই। অপরাহ্নে কুমার চটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রকৃতির অসামান্য রূপ-রাশি দেখিতে দেখিতে মহানন্দে আমরা তিন জনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কি সুন্দর শোভাময় পর্ব্বত শ্রেণী। নিস্তব্ধ গম্ভীর ও সুনিবিড় অরণ্যানী সমন্বিত বিচিত্র শোভা সম্পদশালী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর এই হিমালয় বিশ্বস্রষ্টার কি মহান ভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বার বার গিরিরাজের পাদমূলে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কুমারচটী হইতে বদরিকাশ্রম ২৪ মাইল। আমরা ৬ মাইল চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই সুপ্রসিদ্ধ যোশীমাঠ উপস্থিত হইলাম। শ্রীনগরের পর এরূপ সমৃদ্ধি সম্পন্ন সুন্দর স্থান একটীও আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। প্রথমতঃ আশ্রয় খুঁজিতেই আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। অনেক কষ্টে একটা ঘর ঠিক করিয়া তল্পী তল্পা ফেলিয়া সেই অন্ধকারেই আমি সহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার দুধারে নানাবিধ দোকান। রামচন্দ্র নম্বুরীর কার্য্যালয়ে গিয়া বসিলাম। দোকানে কেদার বদরী এবং অন্যান্য স্থানের ছবি, নানা বিষয়ক হিন্দীপুস্তক ও হিমালয় জাত ঔষধাদি বিক্রীত হয়। দোকানদারটী বেশ শিক্ষিত ও সজ্জন। অনেক ক্ষণ তাঁহার সহিত সদালাপে অতিবাহিত করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে জলযোগ

করিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। পরদিন ২০ জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে সঙ্গিদ্বয় যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া আমি যোশীমঠে একটা দিনও থাকিতে অনুরোধ করিলাম। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত হিমালয়স্থিত এই পরম রমণীয় ধামে একটা দিনও না থাকিয়া স্থানান্তরে যাইতে আমার মন কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গিদ্বয় বুঝাইলেন যে মাত্র ১৮ মাইল দূর বদরিকাশ্রম। নারায়ণ ধাম দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে যোশীমঠে একদিন থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া গেলেই হইবে। আমিও সেই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া বিনা বাক্য-ব্যয়ে সঙ্গিদ্বয়ের অনুবর্ত্তী হইলাম। ত্রিদিববাঞ্ছিত দিব্যধাম নারায়ণপুরী দর্শন করিতে আমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ায় প্রত্যূষেই যোশীমঠ পরিত্যাগ করিয়া অনেক খানি উৎরাই অবরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রয়াগের সমীপবর্ত্তী হইলাম। দূর হইতে কল্লোলিনীর সে ভীষণ কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হৃদয়ে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি বিষ্ণু-গঙ্গার কি উন্মত্ত ভীষণ-তাণ্ডব নৃত্য। সে সলিলোচ্ছ্বাস দূর হইতে দেখিলেও আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলাগঙ্গা নাচিতে নাচিতে আসিয়া অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাস উপরিস্থিত পুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। প্রচণ্ডবলশালিনী উন্মাদিনী বিষ্ণুগঙ্গা উভয় হস্তে প্রস্তর রাশি ছড়াইতে ছড়াইতে ভয়ঙ্কর বেগে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সহস্র হস্তীও বুঝি সে প্রবাহ বেগ রোধ করিতে সমর্থ হয় না। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, প্রতিনিয়ত এই বিশাল জলরাশি গভীর শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্তম্ভিত নেত্রে এই বিরাট দৃশ্য দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে আমি অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম আমার ন্যায় কত উদাসীন নারায়ণ দর্শন মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া পুণ্যসলিলা বিষ্ণুগঙ্গার এই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাব। নিয়ত কোলাহল পূর্ণ যোশীমঠ হইতে একেবারে কল্পনাতীত অনির্ব্বচনীয় ভাবরাজ্যে অবতরণ। সে অবোধ্য মহাগীতি, প্রাণের গভীরতম প্রদেশে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

ওই কি ?

ওই কি উদিল দেব হৃদয়-মন্দিরে
ওই কি ঝরিল প্রেম নয়নের নীরে ?
ওই কি অরুণ জাগে পূরব গগনে
ওই কি মধুর স্পর্শ মৃদুল পবনে ?
ওই কি জ্বলিল চিতা কামনা-অনলে
ওই কি জাগিছে প্রাণ প্রতি পলে পলে ?
ওই কি প্রশান্ত মুক্ত সুনীল অম্বর
ওই কি পাগল মূর্ত্তি অনন্ত সাগর ?
ওই কি বৈরাগী বেশ পশ্চিম প্রান্তরে
ওই কি মাধুরী তাঁর মাধুরী-আকরে ?
সন্ধ্যায় অবশ হিয়া বিগলিত প্রাণে
ওই কি পূরবী সুর উঠে নদী-গানে ?
ওই কি উপরে লক্ষ অনিমেষ আঁখি
নিশীথে আকুল করে পরাণের পাখী ?
যাই—যাই—কোথা আমি—আমি আত্মহারা
মুক্ত আমি—ভেঙ্গে গেছে এ দেহের কারা !

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেস হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগুরবে নমঃ।

২য় খণ্ড। চৈত্র ১৩২১ ১২শ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ, শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল, শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম,
শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জগদম্বার কৃপায় অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম এবং ক্ষতি সহ্য করিয়া শাশ্বতীর দ্বিতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ করিলাম। তৃতীয় বর্ষে যাহাতে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় তজ্জন্য আমরা সাধ্যমতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য যাঁহারা এ পর্য্যন্ত প্রদান না করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, যেন তাঁহারা অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করা যে কত ব্যয়সাধ্য, তাহা অবশ্য তাঁহারা অবগত আছেন। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন! নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ, ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora.) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আইঃ রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রী।

প্রভাতে ঋগ্বেদমাতা বিশ্ববিকাশিনী
দ্বিভুজা প্রসন্নাননা পুস্তকাঙ্ককরা
রক্তোৎপল জিনি প্রভা তারা-কিরীটিনী
কুমারী ব্রহ্মাণী আদ্যা কৃষ্ণাজিনধরা।
হংসারূঢ়া নব-রবিমণ্ডলবর্ত্তিনী
বিশ্বারাধ্যা বিশ্বধ্যেয়া ত্রৈলোক্যবন্দিনী।

মধ্যাহ্নে সুনীলাকাশে নীলোৎপলপ্রভা,
বিষ্ণুশক্তি শ্রীবৈষ্ণবী যজুর্ব্বেদমাতা।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজে শোভা,
যুবতী গরুড়ারূঢ়া বিশ্ব-পালয়িতা।
নব মধুরিমা শোভে সৌরকর-মাঝে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর হস্তে রাজে।

সায়াহ্নে শান্তির ছবি অমল ধবলা
সামবেদমাতা বৃদ্ধা রুদ্রাণীরূপিণী।
বৃষভ-আরূঢ়া ভালে শশি-অর্দ্ধকলা
নিরুপমা ত্রিনয়না ত্রিকালবর্ত্তিনী।
ত্রিশূল-ডমরু-হস্তা সবিতৃমণ্ডলে
অজ্ঞান-তামসহরা স্বরূপে উজ্জলে।

শ্রী—

জপ ও পূজা।

জপ ভিতরকে বাহিরে আনে। পূজা বাহিরকে ভিতরে আনে। জপ চিন্তাকে মূর্ত্তিমতী করে। পূজা মূর্ত্তিকে চিন্ময়ী করে। জপ ভিতর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরে বিশ্রান্তি লাভ করে। পূজা বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতরে বিশ্রান্তি লাভ করে। জপ উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া উভয়ের ঐক্যসাধন করে। পূজা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে আসিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নের একতা সম্পাদন করে।

জপে চিন্তার প্রাধান্য, মূর্ত্তির অপ্রাধান্য। পূজায় মূর্ত্তির প্রাধান্য, চিন্তার অপ্রাধান্য। জপের দ্বারা যে উদ্দেশ্যের সাধন; পূজার দ্বারাও সেই উদ্দেশ্যেরই সাধন ; তথাপি উভয়ের পার্থক্য আছে। জপ কারণকে কার্য্যের মধ্যে আনে, পূজা কার্য্যকে কারণের মধ্যে আনে। কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান করান জপের কার্য্য, কার্য্যের জ্ঞানের পর কারণের জ্ঞান করান পূজার কার্য্য, কারণের অনুমানে কার্য্যের জ্ঞান—ইহাই জপের সাধ্য। কার্য্যের প্রত্যক্ষে কারণের জ্ঞান—ইহা পূজার কার্য্য।

তদ্গতচিত্তে মন্ত্রের উচ্চারণকে জপ বলে, বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া তৎপর মন্ত্রার্থের সহিত সেই মনের একীকরণ জপের দ্বারাই সম্ভব। জপ—শব্দব্রহ্মোপাসনা।

উপাসনার্থ আলম্বনটিকে সম্মুখে রাখিয়া সেই উপাস্যের মূর্ত্তির দর্শন, সেবা ও ভাবনা পূজা দ্বারাই সম্ভব। পূজা—ব্রহ্মরূপোপাসনা।

জপে আন্তরভাবের অত্যন্ত প্রাধান্য। পূজায় বাহ্যভাবের, শেষ আন্তর ভাবের প্রাধান্য। জপে পার্থিব ভাবের অপ্রাধান্য বলিয়া জপ কঠিন। পূজায় বাহ্যভাবের প্রাধান্য হেতু পূজা সহজ। চিন্তাশীল ব্যতীত জপ করিতেই পারে না। চিন্তাশীল না হইয়াও শ্রদ্ধালু পূজা করিতে পারে।

জপ।

অন্য বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করতঃ পরে সেই মনোবৃত্তিকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে মন্ত্রার্থগত করা ও তৎপরে মন্ত্রার্থের সহিতও উপাস্যের একীকরণ করা

অত্যন্ত শক্তিসাপেক্ষ। জপের প্রথম সাধনও খুব সহজ নহে। অন্যবিষয়ে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিলে সেই চিত্তকে মন্ত্রার্থের সহিত একীকরণ করা অসম্ভব। তবে জপের প্রথমাবস্থায়ই যে দৃঢ় একাগ্রতা জন্মিবে, এমত কথা নাই। তাহা বলিয়া একগ্রতা না থাকিলে, চিন্তাশক্তির জোর না থাকিলে জপ করিতে যাওয়া নিষ্ফল। প্রথম সামান্য একাগ্রতায় জপের আরম্ভ। ক্রমে জপ করিতে করিতে চিত্তের প্রত্যয়-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে, চিত্তবৃত্তি মন্ত্রার্থগত হইতে পারে—তাহা হইলেই জপের সার্থকতা। জপ—ধ্যানমূলক। ধ্যান—স্মৃতিসন্ততি মাত্র। ভাবনাপ্রকর্ষে স্মৃতি প্রত্যক্ষ দর্শনাকারা হইয়া থাকে। স্মৃতি (স্মরণপ্রবাহ) যদিও দূরবর্ত্তি-বস্তুবিষয়ক হইয়া থাকে, তথাপি ভাবনাপ্রকর্ষে ঐ স্মরণপ্রবাহ দূরবর্ত্তি-বস্তুকে প্রত্যক্ষে আনিয়া উপস্থিত করে, এই কারণে স্মৃতি প্রত্যক্ষদর্শনসমান আকার লাভ করে। জপ চিন্তাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া সম্মুখে আনে বলিয়া এই চিন্তা প্রত্যক্ষদর্শনের মতই হইয়া উঠে।

পূজা।

পূজার শেষাবস্থায় উপনীত হওয়া অবশ্য অত্যন্ত শক্তিসাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম সাধন অত্যন্ত সহজ ও মনোরম। প্রথমতঃ পূজায় বাহ্য স্থূলমূর্ত্তি আলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করা হয় বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ কিঞ্চিৎ ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই পূজা করিতে অধিকারী ও ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। চিত্তগ্রাহী সুন্দর মূর্ত্তিকে স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন ও বসন-ভূষণ পরিধান করাইতে কোনরূপ শক্তির আবশ্যক করে না। তবে প্রথমেই মূর্ত্তির ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস, ও মূর্ত্তি উপাসনায় অভীষ্টসিদ্ধি—এইরূপ শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সামান্ত ভক্তি থাকিলেই পূজার ফললাভ করিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে জপ যত কঠিন, পূজা তত কঠিন নহে। জপের প্রারম্ভে অনুরাগ তাদৃশ দেখা যায় না, পূজার প্রারম্ভেই অনুরাগ প্রায়শই দৃষ্ট হয়। চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া যখন দশভুজা দুর্গাদেবী আমাদের সম্মুখে বিরাজিতা থাকেন, তখন সুগন্ধি কুসুম সুগন্ধ-চন্দনানুলেপিত করিয়া সেই মূর্ত্তির পাদপদ্মে অর্পণ করিবার

সময়ে সকলেরই অনুরাগ হইয়া থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক। মানবের মন সৌন্দর্য্যমুগ্ধ; কাজেই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া উপাস্যের উপাসনা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই মনোরম ও সহজেই ফলপ্রদ। জপে সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি স্পষ্ট প্রকট নহে—এ কারণে জপে প্রথমে মন বসিতেই চায় না, জোর করিয়া মনকে বসাইবার চেষ্টা করিলেও অনুরাগ তাদৃশ জন্মে না। আমাদের মনে হয়, প্রথমে পূজায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। তৎপরে পূজা করিতে করিতে শ্রদ্ধা-ভক্তির আতিশয্য হইলে চিত্তের অবিচ্ছিন্ন স্মরণ-প্রবাহ সহজেই জন্মিতে পারিবে। তখন পূজার মধ্যেই উপাস্য মূর্ত্তির ধ্যান করিতে চেষ্টা করা উচিত। সেই বহিঃস্থ মূর্ত্তিকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা লোকে যতই কঠিন মনে করে, তত কঠিন নহে। দূরস্থ প্রিয় জনকে ভাবিতে আরম্ভ করিলে সেই প্রিয় জনের আকৃতি সুস্পষ্ট মনে পড়ে, এবং সেই আকৃতি সম্মুখে যেন দেখিতেছি, এইরূপও বোধ হয়। তবে উপাস্য বিষয়েই বা তাহা না হইবে কেন? আমাদের উপাস্য যখন সাকার, তখন সেই আকৃতিই বা কেন আমাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে না? তার পর আমাদের ঐকান্তিকী আকুলতা থাকিলে পরমেশ্বরকৃপালাভ হইবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পূজা করিলে ফল ফলিবে না কেন? কর্ম্ম কর, ফলের জন্য লালায়িত হইলে চলিবে না, ফল দিবার যিনি কর্ত্তা, ফল তিনিই দিবেন। আমরা কার্য্য করিবার অধিকারী, কার্য্যই করিয়া যাইব।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

সম্পাদক কাঁঠালপাড়া সাহিত্যসম্মিলনী।

সুলতানা রিজিয়া।

ইতিহাসের সহিত নাটক-নভেলাদির ঐক্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। আজকাল বঙ্গদেশে বহু ঐতিহাসিক নাটক-নভেলাদি বাহির হইয়াছে। কিন্তু সকলগুলিই ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করা দূরে থাকুক, বরং ইতিহাসকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ইতিহাস প্রকৃত;—নাটক-নভেলাদি অপ্রকৃত; অতিরঞ্জিত। ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নাটক-নভেলাদি লিখিতে হইলে স্বতঃই অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতি ঐতিহাসিকমূলক গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠককে তাঁহার আখ্যায়িকাগুলি পাঠের পূর্ব্বে সেগুলিকে উপন্যাস নির্দ্ধারিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উপন্যাস লিখিতে হইলে অনেক স্থলে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল বঙ্গদেশে এই প্রকার নাটক-নভেলাদির এরূপ প্রবল স্রোত বহিতেছে যে, সাহিত্যের ক্ষীণ আশাকে অতি দ্রুত ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এ দোষ কাহার? দেশের না দশের,—অশিক্ষিতের না শিক্ষিতের,—পাঠকের না লেখকের—? দেশের শিক্ষাবিস্তার বাড়িতেছে বটে, কিন্তু এই প্রকার কার্য্যে আমরা বড়ই উদাসীন। দেশে আজকাল এরূপ কুবাতাস বহিতেছে যে, স্বদেশের ইতিহাসালোচনা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি, আমাদের উর্দ্ধতম পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাসালোচনায় আমরা বিন্দুমাত্র সময় অতিবাহিত করি কি না সন্দেহ। ইহা হইতে আশ্চর্য্যজনক আর কি হইতে পারে—? যাহাই হউক, আমরা এখন উপরিলিখিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠকবর্গের নিকট একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন আমাদের এই আফগান-সাম্রাজ্ঞী রিজিয়াকে, নাট্যশালার কল্পিত পরিচ্ছদধারিণী "রিজিয়াকে" সমান চক্ষে না দেখেন।

২৬ বৎসর রাজত্বকালের পর ১২৩৫ খৃঃ অব্দে পাঠান সম্রাট্ আল্‌তামাসের মৃত্যু হইলে কয়েক দিবসের জন্য দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর-ওমরাহ এবং উজীরদিগের মধ্যে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতে

লাগিল। বিষয়, কে দিল্লীর শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে? সম্রাট্ আল্‌তামাস অপুত্রক ছিলেন না; তবে এ বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল,—।

সম্রাটের মৃত্যুর পর মুসলমান রাজ্যাধিকারের চিরপ্রথা অনুসারে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন-প্রাপ্তির আশায় সকলে আপন আপন ইষ্টলাভের ছিদ্রান্বেষণ খুঁজিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে যুবরাজ রুকুনুদ্দীন অন্যান্য ভ্রাতাগণকে পরাজিত করিয়া ১২৩৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। বিষম লাম্পট্য-দোষ এবং অলসতায় তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে শাসনদণ্ড অচিরে খসিয়া পড়িল। * রুকুনুদ্দীনের রাজ্যচালনায় কি প্রজাগণ কি সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাজে কাজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য গুপ্তভাবে নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। রুকুনুদ্দীনের জননী আল্‌তামাসের প্রধানা বেগম। তিনি ওমরাহগণের অভিপ্রায় অবিলম্বে অবগত হইয়া স্বীয় পুত্রের অমঙ্গল অপনোদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। রিজিয়া তাহার প্রধান অন্তরায় জানিয়া বেগম সা টোরকান্ নানারূপ কৌশলে তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া, পুত্রকে নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যত আশা-ভরসা শৈশবে বিলীন হইয়া গেল। প্রবল বিদ্রোহের ক্রোধানলে পড়িয়া রুকুনুদ্দীন এবং তাঁহার জননী সা টোরকান্ অবিলম্বে বন্দী হইয়া ভীষণ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সেইখানে তাঁহাদের মানবলীলার অবসান হইয়াছিল। অদূরদর্শী, হতভাগ্য রুকুনুদ্দীন ছয় মাস আটাশ দিন মাত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

আলতামাসের পুত্রগণের মধ্যে যুবরাজ বাইরামের সিংহাসনপ্রাপ্তির আশা প্রবল ছিল। কিন্তু তিনি নিজে অলস এবং লাম্পট্য-দোষে দূষিত ছিলেন। যখন ওমরাহগণ কাহাকে সিংহাসনে বসাইবেন, এই আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী, তখন সাহজাদা বাইরামের চক্ষু ফুটিল। তিনি পিতার আত্মীয় এবং

* "Rukun-d-din soon dethroned by a mass body of rebellion headed by Razia on Sunday (1236 A.d.) brought from Kilu-ghari and put to long confinement..........He was very generous and kind but was a prince of lavishness and debauchery"—Tabakat-I-Nasiri—Elliot History. Vol, II. p. 331.

সেনাপতি বেলিনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ যে চুপ করিয়া বসিয়া-ছিলেন, তাহাও নহে। তিনিও সিংহাসনের আশায় বিদ্রোহী হইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। বাইরাম ও বেলিনের যাবতীয় আয়োজন ফাঁসিয়া গেল। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যেরা একমত করিয়া অবিলম্বে সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া, বিস্তৃত পাঠান সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সুতরাং পুত্রগণের রাজ্যের আশা মুকুরে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় হইল।

১২৩৬ খৃঃঅব্দে সুলতানা রিজিয়া হিন্দুস্থানের শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। মুসলমান সাম্রাজ্যে এক রিজিয়া ব্যতীত অন্য কোন সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে আরোহণের কথা ইতিহাসে লেখা নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রিজিয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা কুটিল রাজনীতি অনুধাবন করিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।* বস্তুতঃ তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ নিপুণা ছিলেন, এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে প্রস্তুত। †

ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারার সহিত তাঁহার জীবনের অনেক সাদৃশ্য ছিল। মুসলমান সম্রাটের কন্যাদিগের সচরাচর বিবাহ হইত না। জাহানারা এবং রিজিয়া উভয়েই অবিবাহিতা ছিলেন।

জাহানারা ও রিজিয়া উভয়েই বিদ্যাবতী ও রূপবতী ছিলেন। জাহানারা যেরূপ সদয়া ও সরলপ্রাণা ছিলেন, রিজিয়াও সেইরূপ সদয়া ও সরল-প্রাণা ছিলেন। জাহানারা ও রিজিয়া তাঁহাদিগের পিতার জীবদ্দশায় উভয়েই

* "The King replied, my sons are devoted to the pleasure of youth, and no one of them is qualified to be King. They are unfit to rule the country, and after my death you will find that there is no one more competent to guide the state than my daughter."—Tabakat-I-Nasiri, Elliot History of India, Vol. II. P. 333.

† "She assumed the imperial robes took her seat in the musnud administered the laws strictly and punctually, and suppressed with vigour all attempts to take advantage of the supposed weakness of a female reign." History of British India—by Hugh Murray F. R. S. E. Chap. VII., P. 180.

পিতার পার্শ্বে বসিয়া রাজ্যের শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ব স্ব পিতাকে রাজকার্য্যে উপদেশ দিতেন। সাজাহানের বার্দ্ধক্যের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশেকো যখন মোগল রাজদণ্ড কিছুকালের জন্য চালনা করিয়াছিলেন, জাহানারা তাঁহার দক্ষিণদিকে আসন গ্রহণ করিয়া, ধরিতে গেলে প্রায় একরূপ স্বাধীনভাবেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেইরূপ সুলতানা রিজিয়া যখন যুবতী, সেই সময় সম্রাট্ আলতামাস গোয়ালিয়র আক্রমণাকালে তাঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান থাকিতেও কন্যা রিজিয়াকে বিশেষ বুদ্ধিমতী, রাজনীতিজ্ঞ এবং উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহারই হস্তে কিছুকালের জন্য শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়া সম্রাট্ নিশ্চিন্ত-মনে গোয়ালিয়র যাত্রা করিয়াছিলেন।* ইহা হইতে বুঝা যায়, সম্রাট্ সাজাহানের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে ঔরঙ্গজীব ব্যতীত জাহানারা এবং সম্রাট্ আলতামাসের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে রিজিয়া উভয়েই প্রায় সমগুণে ভূষিতা ছিলেন। কিন্তু যৌবনের বিষম বিলাসস্রোতে কিয়ৎ-কালের জন্য উভয়েই ভাসমান হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আমরা তাঁহাদিগের জীবনী আলোচনা করিয়া অন্য কলঙ্ক খুঁজিয়া পাই না। ছলে, বলে, কৌশলে এবং কুটিল ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ঔরঙ্গজীব যেমন বৃদ্ধ পিতা এবং ভগিনী জাহানারাকে আগরার দুর্গে বন্দী করিয়া নিজে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রিজিয়া যখন স্বাধীনা সাম্রাজ্ঞী, তখন তাঁহার ভ্রাতা বাইরাম মালীক আলটুনীর সাহায্যে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে দিল্লী-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ উভয়েরই ভাগ্যে কারাবাস ঘটিয়াছিল। ভীষণ ঘটনাচক্র উভয়েরই দিল্লী নগরীতে ঘটিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে এই, জাহানারা মোগলকন্যা, রিজিয়া আফগানকন্যা।

আলতামাসের বিশ্বস্ত এবং উচ্চপদস্থ বন্ধুগণের এবং সাম্রাজ্যের সংশ্লিষ্ট ওমরাহগণের ইচ্ছায় রিজিয়ার কৃষ্ণবর্ণ বিলম্বিত বেণীর উপর মণিমুক্তাখচিত

* "In her earliest youth she displayed such talents for administration that Altmush, her father, when departing on his expedition against Gwalior, left her sole regent, regarding her as better fitted than any of his sons to sustain the weight of Government; and Ferose one of the princes, having been afterwards deposed for incapacity, the Chiefs unanimously vested the Empire in this accomplished lady." History of British India by Hugh Murray. Chap. VII p.p. 179-180.

রাজমুকুট এবং ছত্রদণ্ড স্থাপন যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। অশেষ গুণশালিনী রিজিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও যোগ্যতানুসারে রাজ্যচালনা করিয়া ইতিহাসে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃদিগের অদূরদর্শী বিদ্রোহের প্ররোচনায় যে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া রিজিয়া তাঁহার পিতার পদানুসরণে কার্য্য করিতে ভুলিতেন না। ভ্রাতাগণ বিদ্রোহী হইলেও, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেককে মর্য্যাদাশীল কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পিতার পুরাতন সেনাপতি এবং বাইরামের পৃষ্ঠপোষক বেলিনকেও ক্ষমা করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া রিজিয়াকে অশেষ গুণে গুণশালিনী সম্রাজ্ঞী বলিলে বোধ হয় দোষের হইবে না।

কি কারণে জানি না, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের (দ্বিতীয়) উপর তাঁহার ক্রোধাগ্নি পতিত হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞায় মহম্মদ কারারুদ্ধ হন। মহম্মদ কারাগারে স্বীয় সময় চিন্তাজালে জড়িত না করিয়া ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহম্মদ কারাগারে অশেষ কষ্টের মধ্যে যথেষ্ট ধর্ম্মালোচনা করিয়া নিজের পরকালের প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

মুসলমানতনয়া রিজিয়া অন্তঃপুরাবদ্ধা রমণীগণের রীতি পালন করিতেন না। তিনি বিচারালয়ে নিয়মিত বসিয়া বিচার-কার্য্য এবং সামন্তনৃপতিগণের সহিত একত্র বসিয়া রাজ্যের কূট মীমাংসা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি স্ত্রীলোকের বসন-ভূষণে দেহ আবৃত না করিয়া, পুরুষের বস্ত্রাদিতে অঙ্গ আবৃত রাখিতেন। তিনি স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন-প্রথার বশবর্ত্তিনী ছিলেন না। যুদ্ধকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বক্ষে বর্ম্ম এবং যথারীতি অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা হইয়া তিনি অসীম সাহসিকতায় শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। আবশ্যক হইলে রিজিয়া অপরিচিত যুবকের সহিত বাক্যালাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। রিজিয়া আইন কঠোররূপে গঠন করিয়াছিলেন। বিচার-কার্য্যে তিনি কখনও পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিতেন না। ন্যায়ের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ তৎপরা ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ার আধার ছিল, ভারতে বহু যবন সম্রাটের সহিত তুলনা করিলে

সম্রাজ্ঞী রিজিয়া অনেকের অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইবার পাত্রী ছিলেন। এই সকল কারণে কি প্রজাবৃন্দ কি সামন্তনৃপতিগণ স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল হস্তের শাসনাধীনে কখনও কোন অভাব অনুভব করেন নাই।

রিজিয়ার চরিত্র দোষের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এমন এক দিন আসিল, যে দিন রিজিয়ার এই পাপের পরিণাম বড়ই বিষময় হইয়াছিল এবং তাঁহাকে দিল্লীর কারুকার্য্যখচিত শয্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া, অন্ধকারতম ভীষণ কারাগারের ভূমিতল আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ সুখভোগে লালিতা পালিতা হইয়া যৌবনের প্রথম স্তরে স্বীয় রিপুর বল্গা সংযত রাখিতে না পারায় তাঁহার এই অধঃপতন হইয়াছিল। ঐ দোষের ভাগিনী কেবল রিজিয়া নহেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিলাস-ঐশ্বর্য্যও দায়ী। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের পুস্তকের পৃষ্ঠায় অল্প বিস্তর রিজিয়ার চরিত্র লইয়া ভ্রূকুটী করিয়া কালী কলমের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের দেশে অনেক রাজ্যের অধীশ্বরীগণ "প্রৌঢ়াবস্থায়" বিলাস এবং ইন্দ্রিয়-স্রোতে গা ভাসাইয়া কলঙ্কের পরিবর্ত্তে যশের রাশি মাথায় করিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় ভীষণ যৌবনে রিজিয়ার যে পদস্খলন হইয়াছিল, এটা কি অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়,—? যাক্ ও কথা। গোপনীয় সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।

রুকুন্দ্দীনের পর আমীর ওমরাহগণের বিশেষ চেষ্টায় রিজিয়া সিংহাসনে বসিয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন নাই। তখনও বিদ্রোহী দলের নেতারা প্রচ্ছন্নভাবে বলসঞ্চয়ে নিযুক্ত ছিল। আল্‌তামাসের বিশ্বাসী উজীর নিজামুল মুল্‌ক তাঁহার মৃত্যুর পর ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং মালীকজানি, মালীক কোচি, লাহোরের সুবাদার মালীক কবির খাঁ প্রভৃতি রিজিয়ার বিরুদ্ধে সহসা অস্ত্রধারণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিগণকে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। * বীরবালা রিজিয়া ষড়্‌যন্ত্রকারীদের অভিপ্রায় অচিরে

* "The confederates consisting of the vizir Nil-zam-ood-moolk Fooneidy, mullik Alla-ood-Deenkhany Mullick Leif-ood-Deen Koochey,

অবগত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন। অযোধ্যার সুবাদার মালীক নসিরুদ্দীন সম্রাজ্ঞীর সাহায্যে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথী পার হইবার সময় সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বন্দী হইলেন এবং কারাগারেই তাঁহার জীবনের অবসান হইল। যুদ্ধে রিজিয়ার জয় হইল। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল; উজীর নিজামুল-মুল্‌ক প্রাণভয়ে পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। রিজিয়ার রণোন্মত্ত সৈন্যেরা শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে ছুটিল। মালীক সোফিউদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতাকে শত্রুরা নৃশংসভাবে হত্যা করিল মালীক আলাউদ্দীনকে বাবুল নামক স্থানে হত্যা করিয়া তাহার মস্তক সম্রাজ্ঞী-সমীপে দিল্লীতে উপঢৌকন আসিল।*

শত্রুগণকে ইতিপূর্ব্বে শাস্তি দিয়া রিজিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদলের নেতা নিজামুল-মুলক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, তাঁহার স্থানে সহকারী উজীর খাদা মেনী গজনভী অভিষিক্ত হইলেন। সম্রাজ্ঞী মালীক সিয়ফুদ্দীন ইয়াকুবকে কত্‌লগ খাঁ উপাধি দিয়া সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন। বিদ্রোহীদলের সহযোগী কবির খাঁ নিরুপায় হইয়া সম্রাজ্ঞীর পদতলে আশ্রয় লইলেন। দয়াশীলা সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে ক্ষমা পূর্ব্বক পূর্ব্বপদে অর্থাৎ লাহোরের সুবাদারের কার্য্যে বাহাল রাখিলেন। অন্যান্য স্থানের শাসনকর্ত্তাগণকেও সতর্ক করিয়া তাঁহাদের স্বীয় পদেই নিয়োগ রাখিলেন।

Mullick Eiz-ood-Deen Salar and Mullik Kubir Khan, who had united their forces at Lahore, now advanced to Delhi, and encamping without the city,—commenced hostalities. They at the same time sent letters to all the officers of the empire inviting them to join their party. This news reached Mullick Nuser, Jageerdar of Oudh, he raised troops and hastned to the support to the Queen; but on crossing the Ganges, being attacked by the confederates, he was defeated and taken prisoner in which condition he soon after died." P. 218. Vol. I. Briggs History of the rise of the Mohamedan power in India.

* "The troops, availing themselves of this event, pursued them. Mullick Self-ood-Deen Koochij and his brother were taken and put to death. Mallik Alla-ood-Deen Khany was slain near Babool, and his head brought to Delhy. But vizeir Nizam-ool-Moolk Jooneidy contrived to escape to the Surmone hills where he died."—Briggs History of the rise of Mohammedan power in India vol. I. p. 219.

কিন্তু এইখানে তাঁহার কাল হইয়াছিল। জুমালউদ্দীন ইয়াকুফ (অশ্বপালের পরিদর্শক) তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রিজিয়া ইহাকে আমীর-উল-ওমরাহ উপাধিতে ভূষিত করিয়া উচ্চকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীর এইরূপ আকস্মিক-উন্নতি সোপানে আরোহণ দেখিয়া প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা নানা জনে নানারূপ কলঙ্ক উত্থাপন করিতে লাগিলেন। প্রধান ওমরাহগণ এই মাননীয় উপাধি অসৎপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং এইরূপ ভবিষ্যতে হইবে বিবেচনা করিয়া, বিশেষ অবমানিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ নানারূপ আকার ধারণ করিয়া, নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।*

লাহোরের সুবাদার মালীক কবির খাঁ সম্রাজ্ঞীর নিকট অশেষরূপে ঋণী ছিলেন। তাঁহার উদ্ধত চরিত্রের জন্য তিনি সম্রাজ্ঞীর নিকট বহুবার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলে নিমকহারামী করিতে ছাড়িতেন না। ১২৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় বল সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রিজিয়াও প্রচুর সৈন্য লইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এই যুদ্ধে কবির খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া রিজিয়ার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কবির খাঁ ধৃষ্টতা স্বীকার করাতে রিজিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লাহোরের সুবাদারীর সহিত মুলতানের সুবাদারী প্রদান করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন।+

* "Jumal-ood-Deen Yakoot an abyssinian, who was in great favour was raised from the office of master of the horse, to that of Ameer-ool-omra. The nobles highly offended this proceedings were disposed to examine narrowly the cause of so much favour. A very great degree of familiarity was observed to exist between the Abyssinian and the queen; so much so, that when she rode he always lifted her on her horse by raising her up under the arms. This intimacy, the great favour which had suddenly attained, and his rapid elevation to the first rank realm;"—Briggs History of the rise of Mohamedan power in India. vol. I. p. 220.

+ "The first persen who began openly evince their feelings was Mullik Kubeer Khan, Viceroy of Lahore, who in the year 1239 A.D cast of his allegiance and increased his army. The Queen collecting her forces marched against him. p. 220.........He conducted himself with so much

রিজিয়ার চরিত্রের কলঙ্কের কথা ভাতিন্দার সুবাদার মালীক আলটুনীর কর্ণগোচর হইলে তিনি জুমাল-উদ্দীনের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হইলেন। মালীক আলটুনীর বহুকাল হইতে রূপতৃষ্ণা প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কামনা পূরণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। জুমাল-উদ্দীন তাঁহার পাপ-পথের প্রধান অন্তরায় ছিল। তিনি জুমাল-উদ্দীনকে হত্যা করিয়া রিজিয়ার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

আলটুনী বহু সহস্র সৈন্য লইয়া রিজিয়াকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রিজিয়া আলটুনীর গুপ্ত উদ্দেশ্য জানিতেন না। তিনি অবিলম্বে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। বিদ্রোহী দলে এবং রাজকীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। অবশেষে আলটুনীর সম্পূর্ণ জয় হইল। রিজিয়া বন্দিনী অবস্থায় ভাতিন্দায় আলটুনীর নিকট প্রেরিত হইলেন। রিজিয়ার প্রিয় পাত্র জুমালকে আলটুনীর আজ্ঞায় নিষ্ঠুররূপে হত্যা করা হইল। রিজিয়া বন্দিনী ও আলটুনীর নিকট ভাতিন্দায় প্রেরিত হইলেন দেখিয়া, তুর্কী ওমরাহেরা দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া, বাইরামকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন।*

রিজিয়া আলটুনীর অভিপ্রায় অচিরে অবগত হইলেন। দিল্লী-সিংহাসন পুনরায় অধিকার করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি আলটুনীর প্রস্তাবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আলটুনীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে আলটুনী ও রিজিয়া উভয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণ আক্রমণে বাইরামকে বিচলিত করিতে পারিল না। বাইরাম তৎক্ষণাৎ সেনাপতি বলবনকে তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য পাঠাইলেন। সম্রাটের আদেশে বলবন্ অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে বলবনের সম্পূর্ণ জয়

art on this occassion, that the queen, on hor departure, either beleiving him to her interest by gratitude, not only permitted him to retain his office as Governor of Lahore, aeded to it that of mooltan." p. 220.

* "The army now returned to Delhy, where the Toorky officers devoted her brother, the prince Beiram, a son of the late Shums-ood-Deen Altmush, To the throne"—p. 221. Briggs History of the rise of the Mohamedan power in India, vol. I.

হইল। রিজিয়া ও আলটুনী উভয়ে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। রিজিয়া প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হইল দেখিয়া দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এ যুদ্ধেও সেনাপতি বলবনের অদ্ভুত কৌশলে রিজিয়া এবং আলটুনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া বলবন্ সম্রাট্-সমীপে হাজির করিলেন। বাইরাম ভগিনীর উপর ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, কিন্তু পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। হায়! রিজিয়ার কমনীয়-শোণিতে দিল্লীর মৃত্তিকা রঞ্জিত হইয়াছিল।*

রিজিয়া ৩ বৎসর ছয়মাস ছয়দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজামাত্রেই সুখী ছিল। তিনি সিংহাসনে বসিয়া কয়েকবর্ষই কেবল বিদ্রোহ নিবারণে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীলোককে রাজ্য শাসন করিতে দেখিয়া বহু দুর্বৃত্তেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তিনি একাকিনী সকলকেই শাসনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বিশেষ উন্নত ছিল, এ কথা আমরা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতহই না। তাঁহার দয়ায় বহু প্রাণী প্রাণদণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। তিনি শরণাগতকে কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

---

* "Mullik Eiz-ood-Deen Bulban, who was again sent to oppose her, gave the Queen's army a secord defeat at Kithul October 24th 1239 A.D. in the same year. She and her husbands were seized by the zemindars in their flight and were both put to death on the 25th of the same month,—Brriggs History. p. 222,

ললাটেশ্বরী।

(নলহাটি)

লিখিত অদৃষ্ট-লিপি বিশ্বের ললাটে,
তুমি কি লেখিকা তার ললাট-ঈশ্বরী,
নির্ণীত জীবের ভাগ্য তোমারি শ্রীপাটে
ত্রিকালদর্শিনী দুর্গে, শক্তি, মহেশ্বরি !
অখণ্ড কর্ম্মের ফলে প্রচণ্ড নিয়তি,
তুমি কি অলক্ষ্যে দেবি লেখিকা তাহার ;
অনন্ত কালের চক্রে বিঘূর্ণিত গতি,
তুমি কি ঘুরাও তাহে এ সৃষ্টিসংসার !
দেশ, কাল, পাত্রভেদে কালরূপা তুমি,
মহা, সিদ্ধ, উপ, অর্দ্ধ শ্রীপীঠবাসিনী !
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, অধঃ, উর্দ্ধ, ভূমি,
চুম্বিছে রাজীব-পদ কৈবল্যদায়িনী !
দাও জ্ঞান, মহামুক্তি, মহাভক্তি, বল,
দাও ও শ্রীপদে ঠাঁই চরম সম্বল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

প্রবাসে শিক্ষালাভ।

(গল্প)

আমার নাম শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসস্থানের নাম অপ্রকাশিত রাখিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সাহেব ও বাবুদের নিকট আমি মিষ্টার এস, কে, ব্যানার্জ্জি নামেই অভিহিত হইতাম। পিতৃ-প্রদত্ত অত বড় লম্বা নাম লিখিতে বা বলিতে আমার হাতে মুখে কেমন কেমন লাগিত। মিষ্টার শরৎকুমার সংক্ষেপে লেখা হইত বটে, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে লেখা হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে ব্যানার্জ্জি লিখিতে হইত। সেই জন্য সময় সময় বিরক্ত হইয়া ভাবিতাম,— ব্যানার্জ্জি স্থলে সংক্ষেপে ব্যাং লিখিলে ক্ষতি কি? তাহা হইলে ত নামটি খুব সংক্ষেপে অর্থাৎ মিঃ এস, কে, ব্যাং হয়। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতাম সত্য, কিন্তু লিখিতে সাহসী হইতাম না। কারণ, ওরূপ ভাবের লেখা কাহারও দেখি নাই। কিন্তু ওরূপ ভাবে ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমার পিতার নাম হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও মাতৃদেবী এখন পরলোকে। সংসারে আমিই তাঁহাদের একমাত্র আদুরে সন্তান ছিলাম। পিতামহাশয়ের বিষয়াদিও যথেষ্ট ছিল। তবে কলিকাতার মত ইমারতের বাড়ী ছিল না। গৃহে চাকর চাকরাণীও ছিল। চাকরের কাজ গরু বাছুর দেখা, তাহাদিগকে খাওয়ান, এবং মাঠে কৃষাণ মুনিষের কাজকর্ম্ম দেখা। আর দাসীর কাজ গোয়াল, উঠান, গৃহ ও বাসনাদি পরিষ্কার করা। রান্নাদির কার্য্য মাতা ঠাকুরাণীকেই করিতে হইত। তিনি রান্নাঘর ও ঠাকুরবাড়ীটি নিজেই পরিষ্কার করিতেন, এবং সরোবর হইতে পানীয় জল নিজেই আনিতেন। পিতা মহাশয় প্রতি বৎসরই দুর্গোৎসব করিতেন। সে সময় মাতৃদেবী সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীর সেবা করিতেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র পরিশ্রম বা বিরক্তি অনুভব করিতেন না।

পিতামহাশয়ের চেষ্টায় আমি যথাসময়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই সময় হইতেই আমার মাথা বিগড়াইল। সংসারে ও পিতৃবিষয়ে আস্থা না হইয়া আমার প্রবাসে থাকিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আমার বিবাহও হইয়াছিল। সুতরাং মনে মনে স্থির করিলাম, এবার এফ, এ পরীক্ষা দিয়া সপত্নীক কলিকাতায় যাইব। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দুই বৎসর পরে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আমার উত্তীর্ণ সংবাদে জনক জননী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। একদা আহারের পর রাত্রিকালে পিতার নিকট চাকুরীর প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, এবং প্রকারান্তরে বুঝাইয়া বলিলাম যে, কলিকাতায় গেলে মোটা মাহিনার চাকুরী মিলিবে। প্রত্যুত্তরে পিতা বলিলেন,—"এত বিষয়-সম্পত্তি জমি-জায়গা থাকিতে পরের নিকট চাকুরী করিতে যাইবে কেন ? তোমার ত কিছুরই অভাব নাই, বরং ইচ্ছা করিলে তুমিই ২।৫ জন চাকর রাখিতে পার। আর এক কথা,—তুমিই আমাদের একমাত্র সন্তান, তুমি বিদেশে থাকিলে আমরা কি করিয়া থাকিব বল দেখি ?" কিন্তু পিতার এ সকল প্রবোধ বাক্যেও শান্ত না হইয়া আমি চাকুরীর জন্য জেদ ধরিলাম। আমার এইরূপ আব্দারে পিতামহাশয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন।

ইংরাজী শিখিয়াছি, সুতরাং প্রত্যহ ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ না করিলে দিন গুজরান হইত না। পিতামহাশয় অনেক দিন হইতেই 'বঙ্গবাসী' লইতেন, এবং উহা মনোনিবেশ সহকারে পাঠও করিতেন। তিনি সময় সময় আমাকে বঙ্গবাসী পাঠ করিতে বলিলে আমি বলিতাম,—"ওতে ছাই ভস্ম আছে, ইংরাজী শিখিয়া বঙ্গবাসী পড়িব কেন ? আমি 'ইংলিশম্যান' 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' পড়ি।"

একদিন ষ্টেটস্‌ম্যান্ কাগজখানি পড়িতে পড়িতে wanted (বিজ্ঞাপন) স্তম্ভে একটী কর্ম্মখালির সংবাদ দেখিলাম। উহাতে কলিকাতার এক সাহেব সওদাগরী আফিসে ইংরাজীনবিশের কর্ম্মখালি সংবাদ ছিল। বেতন ৫০ টাকা বলা বাহুল্য আমি বিজ্ঞাপন পাঠান্তে নিজের পারদর্শিতা জানাইয়া চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিলাম।

৩।৪ দিবস পরেই দরখাস্ত মঞ্জুরের সংবাদ আসিল। আফিসের ম্যানেজার মহাশয় আমার জন্য সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

আমি পিতাকে এই সংবাদ দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। পিতা-মহাশয় আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না।

পরদিন পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, আমি কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম। যাইবার কালে সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া গেলাম,—শীঘ্রই তোমাকেও লইয়া যাইব। যথাসময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আমি কর্ম্মে নিযুক্ত হই-লাম, এবং পিতামহাশয়কে আগমন সংবাদ দিলাম।

দুই মাস কাজ করিবার পর ম্যানেজার সাহেবের নিকট কয়েক দিবসের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম। উদ্দেশ্য সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া। পিতা মাতাকে বলিলাম,—"আমার ওখানে খাবার সুবিধা হয় না, নিজেই হাত পোড়াইয়া রান্না করিতে হয়" (আমি হোটেলে খাইতাম, কিন্তু হোটেলে খাওয়ার কথা শুনিলে পিতামহাশয় বিরক্ত হইতে পারেন ভাবিয়া ওরূপ কথা বলিলাম)। যাহা হউক, অনেক কথা বলিবার পর তাঁহারা উভয়েই বধূকে আমার সঙ্গে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

একদিন গো-গাড়ী করিয়া আমি সস্ত্রীক নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে পিতৃদেবও ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। যথাসময়ে হাওড়াগামী ট্রেন আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি লইয়া, সস্ত্রীক ট্রেনে চড়িলাম। পিতৃদেব কাঁদ কাঁদ মুখে আমাকে কত উপদেশ দিয়া ষ্টেশন হইতে প্রস্থান করিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বেই ভাড়াটীয়া বাড়ী ঠিক করিয়াছিলাম। আমি আমার স্ত্রীকে আনিয়া সেই বাড়ীতেই রাখিলাম। তাহার জন্য একটী চাকর ও একটী চাকরাণী নিযুক্ত করিতে হইল। আমার স্ত্রী ৪।৫ দিন রান্না করিবার পর একদিন আমাকে বলিল,—'দেখ. কলিকাতায় থাকিয়া ভদ্রলোকের মেয়ের রান্না করা অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জার কাজ। সুতরাং আমাদের একটী রসুইয়ে বামুন ঠিক করিলে ভাল হয়।' ইত্যাদি।

স্ত্রীর মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য আমাকে একটী অজ্ঞাতকুল বিদেশ-আমদানী সূত্রধারী রাঁধুনী ঠিক করিতে হইল। নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের রান্না ত্যাগ করিয়া, আমরা একজন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন লোকের

হাতের রান্না অম্লানবদনে খাইতে লাগিলাম। এইরূপে ২।৩ বৎসর কাটিয়া গেল। আমার একটী পুত্রসন্তানও হইয়াছে। আমি মোটা মাহিনা পাই সত্য, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া বাড়ী ভাড়া, চাকর চাকরাণী ও রাঁধুনীর বেতন এবং নিজেদের খরচ যোগাইতে যে কিরূপ বেগ পাইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা ছাড়া আমার লক্ষ্মীদেবীর আব্দার ত আছেই। সে আব্দার রক্ষা করিতে আমাকে ৫।১০ টাকা কর্জ্জ করিতে হইত। আবার বেতন পাইলে তাহা পরিশোধ করিতাম। খরচ বাদে জমা থাকিত সাড়ে ষোল আনা।

একদিন বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম—'তোমার মাতা অত্যন্ত পীড়িত, শীঘ্র বাড়ী আসিবে।' বাড়ী যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও লোকলজ্জাভয়ে আমাকে স্ত্রীর সহিত বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, মাতৃদেবী বিসূচিকা রোগে জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও সম্পাদিত হইয়াছে। পরন্তু পিতৃদেবও উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা করান হইল, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। সংসার-সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনিও মাতার সহিত মিলিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমাকে নগদ ৩০০০৲ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। উহা দ্বারা পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া, আমার হাতে আরও ১০০০৲ টাকা থাকিল। পিতা-মাতার মৃত্যুতে আমারও বাড়ীর সম্বন্ধ ছুটিয়া গেল। আমি যেন একটা প্রধান দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলাম। ভাবিলাম—এবারে আর আমাকে বাড়ী আসিতে হইবে না। আমার মত সভ্য ব্যক্তির এই অসভ্য গ্রামে আসাও সম্পূর্ণ অনুচিত। কিন্তু মানুষে একরূপ ভাবিলে বিধাতা অন্যরূপ করিয়া থাকেন; বর্ত্তমান প্রমাণ—জর্ম্মনীর যুদ্ধযাত্রা। মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইলে না জানি সংসারে কতই অঘটন ঘটনা ঘটিত।

বাড়ীর অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করিয়া আমার হাতে আরও ৫০০৲ টাকা হইল। জমি-যায়গাগুলি গ্রামের একজন লোকের জিম্মায় দিলাম। সে বৎসর বৎসর উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক মূল্য আমার নিকট পাঠাইতে স্বীকৃত হইল। এই সমুদায় কার্য্য সমাধান্তে আমি একদিন শুভযোগে পত্নী পুত্র লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

এধারে কলিকাতায় ১৮।১৯ বৎসর কাটিল। আমি যাহাকে জমি জায়গা দিয়া আসিয়াছিলাম, সেই লোকটী ৩ বৎসর মাত্র আমার নিকট টাকা পাঠাইয়াছিল। কিন্তু তার পরে আর টাকা পাঠায় নাই। 'জমিদারের খাজনা বাকী আছে,—এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই' ইত্যাদি অছিলা করিয়া টাকা বন্ধ রাখিয়াছিল। বাস্তুভিটা ও জমি জায়গার প্রতি আমারও গ্রাহ্য ছিল না, এবং অর্থাভাবে জমিদারের খাজনাও পাঠাইতে পারি নাই। বাড়ী হইতে যে টাকাগুলি আনিয়াছিলাম, সেগুলি ঋণ পরিশোধ, ছেলেদের পড়ান ও অন্যান্য বিলাস খরচে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পরন্তু ২।৩ শত টাকা কর্জ্জও হইয়াছিল। এখন আমার ৫টী সন্তান, ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা। কন্যা দুইটী সকলের ছোট। জ্যেষ্ঠপুত্র বিধুভূষণ বি, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। মধ্যম পুত্রটীও এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিল। সুতরাং আমি মনে মনে করিতাম—কিছুদিন পরে আমিই ত টাকার গদীতে বসিয়া থাকিব, গ্রামের জমি জায়গায় দরকার কি? জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বিবাহেরও কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এ হেন গুণবান পুত্রের ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পণ না পাইলে বিবাহ দিব না। তদ্ভিন্ন পাত্রীকেও ১০০০৲ হাজার টাকার অলঙ্কার দিতে হইবে।

একদিন বিধুভূষণ কলেজ হইতে বাসায় ফিরিল না। আমি মনে করিলাম, হয় ত কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। পরদিন সকালবেলায় তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কলেজে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, বিধুভূষণ কল্য কলেজে আসে নাই। আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। পুত্রের সন্ধানের জন্য পুলিশে সংবাদ দিলাম এবং সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিলাম।

পুত্রশোকে ৩ মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু পুত্রের সংবাদ পাইলাম না। আমার পত্নী পুত্রশোকে শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহার বাঁচিবার আশাও নাই। একদিন আমি আফিসে কার্য্য করিতেছি, এমন সময় একখান পত্র পাইলাম। পত্রখানি খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম এবং বিস্ময়ে হতভম্ব হইলাম! পত্রখানি আমার পুত্র বিধুভূষণেরই লেখা। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

লণ্ডন—ইংলণ্ড
তারিখ……

"প্রিয় পিতা মহাশয় !"

"আমি আপনার অজ্ঞাতে প্রফুল্লবালা ও তাঁহার পিতার সহিত লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে প্রফুল্লবালার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, আমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া স্বকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার সংবাদ জানাইয়া বলিবেন যেন আমার জন্য অনর্থক চিন্তা না করেন। আমি কতদিনে যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব তাহা বলিতে পারি না। সম্প্রতি কুশলে আছি।"

"আপনাদের বিধুভূষণ"

প্রফুল্লবালা বিধবা ব্রাহ্ম-মহিলা। বয়ঃক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে। ঐ কন্যাটি ব্যতীত তাহার পিতার আর সন্তানাদি নাই। বিষয় সম্পত্তিও মন্দ নহে। প্রফুল্লবালার সহিত তাহার পিতার বিলাত যাওয়ার সংবাদ জানি, কিন্তু আমার পুত্রের চরিত্রদোষের ও বিলাত যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পুত্রের ব্যবহারে আমার বহুকালরোপিত আশালতিকা ছিন্ন হইয়া গেল। আমার পত্নী পুত্রের সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া, সেই রাত্রেই জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। আমি নিমতলা ঘাটে শবদেহ লইয়া গিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম।

অতঃপর কিছুদিন অতীত হইলে ইউরোপে মহাসমরের সূচনা হইল। বাণিজ্যপোতের যাতায়াত বন্ধ হওয়াতে আমাদের সওদাগরী আফিস একরূপ বন্ধ হইল। ম্যানেজার সাহেব আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলেন। আমার একমাসের বেতন প্রাপ্য ছিল। ম্যানেজার সাহেব বলিলেন,—"তোমার বেতনের টাকা যুদ্ধ ফণ্ডে জমা দেওয়া গেল।" আমি জগৎ অন্ধকার দেখিলাম।

আরও চাকুরীর চেষ্টা করিলাম বটে; কিন্তু চাকুরী জুটিল না। সকলেরই অবস্থা একরূপ, অনেকেই আপন আপন কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইতেছেন। তাই ৫০৲ টাকার রত্ন কলিকাতার বাজারে ১৫।২০ টাকাতেও বিকাইল না।

এদিকে উত্তমর্ণগণ আসিয়া টাকার তাগাদা, বাড়ীওয়ালা ভাড়ার তাগাদা

এবং ঝি, চাকর ও রাঁধুনী বেতনের তাগাদা করিতে লাগিল। সে জন্য কতকগুলি মিষ্ট বাণীও শুনিতে হইল। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম, কারণ হাতে এক কপর্দ্দকও নাই। কি করি পত্নীর অলঙ্কার পত্র ও অন্যান্য জিনিষ অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইল। পেট খরচ চালাইবার মতও কিছু রহিল না। আমি বাড়ী যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু বাড়ী যাইব কি করিয়া, ট্রেন ভাড়া কই?

ম্যানেজার সাহেবের নিকট পুনরায় যাইয়া অনেক কাঁদা কাটা করিলে পর তিনি বাড়ী যাইবার জন্য আমাদিগকে ট্রেন ভাড়া দিলেন। আমি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া ছেলেমেয়ে সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমাদের পুরাতন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছি এমন সময়ে জনৈক মুসলমান উক্ত বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমার পরিচয় পাইয়া এবং এই বাড়ীটী আমাদের বলায় সে আমাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। পরে জানিতে পারিলাম বাকী খাজনার দরুণ আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নীলামে বিক্রী হওয়ায় ঐ মুসলমানই খরিদ করিয়াছে এবং সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রবাসে বাস করিবার ফল আমি এতক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলাম। ছেলেমেয়ে গুলিও আমার সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু আমাদের কান্না শুনিবে কে? আমি যে নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছি।

পুত্র দুইটী বড় ছেলে। তাহাদের ক্ষুধা পাইলেও তাহারা বুঝিয়াছে খাবার কোথায় পাইব। কিন্তু মেয়ে দুইটী আর থাকিতে পারিল না। দিনরাত উপবাস দিয়া তাহারা এতক্ষণে খাবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কান্না শুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত উদ্বেলিত হইল। আমি আর দেখিতে না পারিয়া তাহাদের জন্য একটী বাড়ীতে কিছু খাবার ভিক্ষা করিলাম। ঐ বাড়ীর একজন লোক আমাকে বলিল,—'কেন ঠাকুর! কলিকাতার মত সহর জায়গাতেও তোমার খাবার জুটিল না?" উঃ! কি মর্ম্মান্তিক যাতনা!

আমি তখনই সে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। আমার রিক্ত হস্ত দেখিয়া মেয়ে দুইটী আরও কাঁদিতে লাগিল। জনৈক গ্রামস্থ বৃদ্ধ এই ব্যাপার অব-

শোকন করতঃ দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং জল ও আহারীয় দ্রব্যাদি দিয়া আমাদের উদরপূরণ করিলেন। আমাদের ক্লান্তি দূর হইলে বৃদ্ধ আমার পিতার প্রশংসা করিয়া কত গল্প করিতে ও আমার কার্য্যে দোষ দিতে লাগিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া অবনতমস্তকে সমস্ত দোষ স্বীকার করিলাম।

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম। বৃদ্ধ 'কোথায় যাইবে' জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম,—'এখন ত আমাকে একটি চাকুরীর যোগাড় করিয়া উদর পূরণ করা চাই।' বৃদ্ধ আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও তত ভাল নয়। আমার মত লোকের পল্লীগ্রামে চাকুরী পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কোথাও চাকুরী মিলিল না। এদিকে দুর্গাপূজা উপস্থিত। গ্রামে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—সকলেই নব নব সাজে সজ্জিত হইয়াছে। আমি যে গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি, সে গ্রামটি বাদ্যরবে মুখরিত। সে সময়ে মায়ের বোধন বলিয়া পথিমধ্যে জনতাও বেশ হইয়াছিল। এই নিরানন্দ সময়েও ছেলেগুলি আনন্দময়ী মাকে দেখিবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি তাহাদিগকে লইয়া মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। তখন মায়ের বোধন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমি মা'কে দেখিয়া ভক্তিযুক্তমনে প্রণাম করিলাম। ছেলে মেয়েগুলিও প্রণাম করিল। পিতৃভিটা ত্যাগ করিয়া অনেক দিন হইতে মা'কে দর্শন করি নাই। তখন দর্শনাকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে জাগিত না। শৈশব-কালে পিত্রালয়ে মা'কে দর্শন করিলেও আজিকার মত মা'কে দর্শন করি নাই। বোধনের কাতরাহ্বান শ্রবণ করিয়া আমার মত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আমিও ডাকিলাম,—'মা!' আবার মায়ের দিকে চাহিলাম। মা যেন হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"এই যে অবোধ, তোর সম্মুখেই আছি।"

আমি আবার মনে মনে বলিলাম,—"মা, এই হতভাগ্য কি তোর সন্তান নয় মা? হতভাগ্য কি তোর করুণা, স্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত মা?"

মা যেন হাসিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আমার সন্তান সকলেই। তবে

আমি যেমন সন্তানদিগকে দেখি, সন্তানেরা সেরূপ আমাকে দেখে না। আমি সকলকেই তুল্যরূপ স্নেহ করি। তুমিও ত আমার করুণাবলেই এরূপ শিক্ষা-লাভ করিতেছ।"

বোধনক্রিয়া শেষ হইলে পর মায়ের মন্দিরের জনতা কমিল। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছে। আমি ছেলেগুলিকে লইয়া মায়ের সম্মুখেই বসিয়া আছি। আমাকে যাইতে না দেখিয়া একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় দিলাম। তখন তিনি সাদরে আমাদিগকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য ঐ ব্রাহ্মণই বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বপুরুষ হইতেই মায়ের পূজা চলিয়া আসিতেছে। বিষয় বৈভবাদিও যথেষ্ট। গোয়াল ও রান্নাঘর ব্যতীত সমস্ত বাড়ীই ইষ্টকনির্ম্মিত।

বাড়ীতে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভূরিভোজন করাইলেন, এবং বলিলেন,—"আপনি আমাদের নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয়। আপনার পিতৃদেব প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিতেন। আপনাকে আর কোথাও যাইতে বা চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইবে না। নিজের বাড়ী মনে করিয়া এইস্থানেই অবস্থান করুন। যাহা করিতে হয় আমিই করিব। পূজার পরে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা করা হইবে।" আমি আনন্দদায়িনী জননীকে ধন্যবাদ দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পূজার পর ব্রাহ্মণ আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমার পুত্র দুইটীর নামে তুল্যাংশরূপে উইল করিয়া দিলেন। কারণ তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। বয়ঃক্রম যথাক্রমে ১৩ তের ও এগার বৎসর মাত্র। গত বৎসর ব্রাহ্মণের পত্নীও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমার পুত্র দুইটীকে জামাতা করিতে মনস্থ করিয়া, আগামী ফাল্গুনমাসে শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মায়ের কৃপায় তাঁহার আশা পূর্ণ হউক।

এখন আমার কোন কষ্ট নাই। বরং পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত সুখে আছি। আশা আছে, ছেলে মেয়ে গুলিকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, দুই বৈবাহিকেই তীর্থক্ষেত্রে অবস্থান করিব। প্রবাসবাসে যে সমস্ত কালিমা স্পর্শ করিয়াছে, সজ্জন-সঙ্গে তীর্থবাস করিয়া তাহা প্রক্ষালন করিব।

প্রবাসে বাস করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার আজীবন স্মরণ থাকিবে। এক্ষণে বাসনা,—ছেলেমেয়েগুলিকে রাখিয়া সংসার-সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব। আর যদি আমার মত প্রবাসী ব্যক্তির এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন হয়, তাহা হইলে লেখনী ধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

পিতা স্বর্গ।

এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র সব মিথ্যা সব ছায়া,
অদৃষ্টের দাস জীবে তাই স্নেহ তাই মায়া ;
মায়ায় আবৃত হ'য়ে সৎচিতে ভুলে যাই,
অহংএ হারায়ে ফেলি ব্রহ্মজ্ঞান যায় তাই।
পরমাত্মা জীব আত্মা শুধু এক রূপান্তর,
মোহমদে মত্ত হ'য়ে ভেদ করি আত্মপর।
মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশয়ে সেইক্ষণ
পিতামাতা আখ্যা পেয়ে যবে পরিচিত হন ;
পরব্রহ্মে তাই লোকে পিতা মাতা দুই বলে
একশক্তি মহাশক্তি দ্বিবিধ আকারে চলে।
পিতামাতা এক ধন দৃষ্টিভ্রম ঘটে যবে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে বিভিন্নতা দেখি তবে।
বিশ্বসৃষ্টি সাম্যময় মোহ আঁখে ভুল করি,
বাহিরে বিষম ঠেকে সত্য ব'লে ভুল ধরি ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বিভিন্নতা সে যে ভুল মায়াখেলা,
দ্বিস্থান দুয়ের নাই (যথা) রাত্রিশেষ ভোরবেলা।
স্বর্গ হ'তে আসিয়াছে আমার আমিত্ব যাহা,
সেই স্বর্গ পিতা মোর পূজনের ধন তাহা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।

চাঁদ সওদাগর।

হিন্দুগণ পৌত্তলিক, জড়োপাসক, মূর্ত্তিপূজক, নরপূজক বলিয়া অভিহিত। এই বিশেষণে বিশেষিত হইতে আজকাল অনেকে অপমান বোধ করেন, দুঃখিত এবং ক্ষুণ্ণ হন। আমি বলি, ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কথা নাই, বরং গৌরবান্বিত হইবার কথা। কারণ, ইহা হিন্দুর উচ্চতম বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তিরই পরিণাম-ফল। বিশ্বাসী ভক্ত, সকল স্থানে, সকল পদার্থে আপনার উপাস্য দেবতাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

মানিলাম, হিন্দু অবতারবাদ ধর্ম্মের উপাসক, মূর্ত্তি-পূজার পক্ষপাতী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমানগণও সেই মূর্ত্তি-পূজা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও অবতারবাদধর্ম্মের উপাসক। বুদ্ধ, খৃষ্ট, এবং মহম্মদকে তাঁহারা অবতার-স্বরূপেই অর্চ্চনা করেন, এবং উচ্চাসন দান করেন। মানুষ মানুষকে পূজা করে কেন? উত্তরে সকলেই বলিবেন, মানুষের গুণে এবং শক্তিতে বাধ্য হইয়াই মানুষ মানুষকে পূজা করে। সুতরাং ইহা মানুষ-পূজা নহে, গুণ এবং শক্তির পূজা। গুণ এবং গুণী স্বতন্ত্র নহে, শব্দ ব্যতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই, উভয়েই একে সমাবিষ্ট। গুণ দেখিয়া গুণীর পূজা স্বাভাবিক। বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। এই সহজ সাধনাতেই মানুষ দেবত্ব—ব্রহ্মত্ব লাভ করে; উপাস্য দেবতার দর্শন পায়। হিন্দুর এই বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল অন্ধবিশ্বাস বলিতেও এক শ্রেণীর লোক কুণ্ঠা বোধ করেন না। একে যাহা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, অপরে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এই মত-বৈষম্য চিরপ্রসিদ্ধ। ইহা আধুনিক বা পরিকল্পিত নহে।

হিন্দুধর্ম্ম নানা শাখা-প্রশাখাতে বিভক্ত হইলেও শাক্ত ও বৈষ্ণবরূপ দুইটি শাখাই প্রধান। শাক্তগণ শক্তির উপাসক; শঙ্কর ও শঙ্করীর ভক্ত। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উপাসক, কৃষ্ণ-রাধিকার ভক্ত। শাক্তগণ মাতৃ-পিতৃভাবে শঙ্করী ও শঙ্করের সাধনা করিয়া থাকে। অনেক সাধক উপাসনাপ্রভাবে উপাস্য দেবতার দর্শন ও ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। তাহার

ভূরি ভূরি প্রমাণও আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং ভক্ত রামপ্রসাদ যদি মিথ্যা-বাদী না হন, তবে তাঁহারা সন্তানরূপে সাধনা করিয়া উপাস্য দেবতার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। শাক্তই হউক আর বৈষ্ণবই হউক, হিন্দুর প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই তাহার অকাট্য প্রমাণ। হিন্দুর ধ্রুব বিশ্বাস, মানুষ যাহা চায়, তাহা পায়। উপাস্য দেবতার নিকট ঐশ্বর্য্য চাহিলে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য চাহিলে মাধুর্য্য প্রাপ্ত হয়। যে হেতু, তিনি বাঞ্ছা-কল্পতরু, দাতা এবং দয়ালু।

চাঁদ সওদাগর শঙ্কর এবং শঙ্করীর উপাসক; অন্য কোন দেবতার পূজা করিতেন না; একমনে একপ্রাণে শঙ্করী ও শঙ্করের আরাধনা করিতেন। তিনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম চন্দ্রধর বণিক্য। সঙ্গতি-সম্পন্ন বড় মহাজন বলিয়া লোকে চাঁদ সওদাগর বলিত। কেহ কেহ রাজা চন্দ্রধরও বলিত। বাস্তবিক তিনি রাজার মত ঐশ্বর্য্যশালী ও গুণসম্পন্ন ছিলেন।

চম্পাই নগর বা চম্পক নগর তাঁহার নিবাসভূমি ছিল। সেই চম্পক নগর কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণ আপন আপন বাসস্থানের নিকটে চাঁদ সওদাগরের বাড়ী ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সুখানুভব করিতেছেন। পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণমধ্যে কেহ কেহ বলেন, নদীয়া জেলায়, কেহ কেহ বলেন, বর্দ্ধমান জেলায়। কেহ কেহ বা বগুড়া ও দিনাজ-পুর জেলায়ও নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী অধিকাংশ লোকেই ত্রিপুরা জেলায় চম্পক নগরে চাঁদ সওদাগরের বাড়ী ছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। আসামবাসিগণ বলেন, ধুব্‌ড়ি জেলায় চাঁদ সওদাগরের বাড়ী ছিল। ঐ গুরুতর ঐতিহাসিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা বলি, চাঁদ সওদাগর বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গদেশের কোন এক স্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি শিবসেবক একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে বঙ্গীয় কবিগণ মনসা-মঙ্গল, মনসা-ভাসান, পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি নাম দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সকলেই চাঁদ সওদাগরকে একনিষ্ঠ সাধক, শিবভক্ত এবং ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ধীরতা ও স্থিরতা অলোকসামান্য ছিল। তিনি

বিপদে পড়িয়া ধৈর্য্য-হারা হন নাই; সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই; অচল অটল ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। রাজা চন্দ্রধর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহযাত্রার বর্ণনা : এবং বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, তিনি কীদৃশ সম্পত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার বাণিজ্যতরী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সাগরদ্বীপ সমূহে যাতায়াত করিত।

কথিত আছে, লখিন্দরের বিবাহযাত্রায় তিন সহস্র গন্ধবণিক্ বরযাত্র গিয়াছিল। সঙ্গে তিন শত ভাট বিবাহসঙ্গীত গান করিয়াছিল। বহুসংখ্যক মালী, তের শত গাবর, সাত শত ধোপা, সঙ্গে বহুসংখ্যক বাদ্যকর, নাপিত, তাঁতি, যোগী গিয়াছিল। সাত সহস্র অগ্নিক্রীড়ক বাজীকর গিয়াছিল। ৭০ খানি স্বর্ণ-পালঙ্ক, ৭০০ শত স্বর্ণ-রৌপ্যের দোলা ও বহুসংখ্যক মুক্তার ঝালর, ও আস্তরণমণ্ডিত হস্তী, ও নানা জাতীয় বহু অশ্ব, শত শত মশাল্চি গিয়াছিল। ইত্যাদি।

বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কোন কোন কবি সপ্ত ডিঙ্গা, কোন কোন কবি চৌদ্দ ডিঙ্গা লিখিয়াছেন। আমরা এখানে চৌদ্দ ডিঙ্গার বিবরণই দিলাম। যথা—

চণ্ডীকে প্রণাম করি চলে হরষিতে
ডিঙ্গির উপরি সাধু উঠিল ত্বরিতে।
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর
সে ডিঙ্গায় তুলি নিল শঙ্করী শঙ্কর।
আপনি বসেছে সাধু ডিঙ্গার উপর
মহা অদ্ভুত ডিঙ্গা সুমেরু-শিখর।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা বিজয় সাগর
তাহাতে শোভিছে ভাল শত শত ঘর।
এতিলেক সেই ডিঙ্গা দেখিতে সুন্দর
দুই ক্রোশ গ্রাসিয়া যায় এতই ডাঙ্গর।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা আগল পাগল
নামেতে পাগল ডিঙ্গা কাজেও পাগল।
তাহাতে ভরিয়া খাদ্য ফল মূল সকল
বাঘ মেড়া আর ভরিল হাজার ছাগল।

তার পাছে মেলে নৌকা নামে মৈষাসুরা
বাইশ লক্ষ হস্তী তাতে তেইশ লক্ষ ঘোড়া।
এতিলেক সেই ডিঙ্গা চাঁদ অধিকারী
সেই ডিঙ্গা হস্তী ঘোড়া করে লড়ালড়ী।
আর পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়
ভাদ্র মাসে বাইলে ডিঙ্গা গঙ্গার লরে মুড়।
আগে পাছে দুই পাইক নামে আউল ঝাউল
তাহাতে তুলিছে চাঁদে খোরাকের চাউল।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে মৈষাশৃঙ্গ
জল গোড়ার তলে চাঁড়া দেখিতে ত্রিভঙ্গ।
সেই ডিঙ্গার পাইক শত শত মাতোয়াল
বাইট গজ জলের তলে যার পাতোয়ান।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে গামাইর পাট
সে ডিঙ্গার গলইতে বসে বেচা কিনার হাট।
অৰ্দ্ধেক ডিঙ্গার মধ্যে পাইকের ছুটাছুটি
অৰ্দ্ধেক ডিঙ্গায় ভরিয়াছে মিঠাই মুটা মুটি।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে লক্ষ্মীপাশা
সে ডিঙ্গার গলইতে ধরেছে নানা পক্ষী বাসা।
সে ডিঙ্গার মধ্যে মধ্যে কাজলের রেখি
তার মাঝে ভরিয়াছে পাটের ছলা দেখি।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নাম তার টঙ্কা।
তাহাতে ভরিয়া নিছে মণামণি লঙ্কা।
সেই ডিঙ্গার পাছে যায় নামেতে মৈষামরু
আটুয়া গোড়ার তলে বাঘে লড়ায় গরু।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখি
তাহাতে উঠিলে সব ত্রিভুবন দেখি।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে তালবানা
তাহাতে ভরিয়া নিল খৈ আর ছানা।

তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে সুষামুখী
তাহাতে উঠিলে হয় সর্ব্বলোক সুখী।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর
সেই ডিঙ্গায় বসিয়াছে বিপ্র শুভঙ্কর।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যত সে ডিঙ্গায় ভরি
শাস্ত্র পুরাণ পড়ে, বলে হরি হরি।
তাহার পশ্চাতে ডিঙ্গা এড়িল মহত
কারালী গলই যায় দশ দণ্ডের পথ।
সেই ডিঙ্গার নাম বটে রঙ্গিষা বিনন্দ
সমুদ্র বাঁধিয়া যায় যেন সেতুবন্ধ।
চৌদ্দ ডিঙ্গা মিলিলেক সমুদ্রের মাঝে
যেই দেব দেখে চাঁদে সেই দেব পূজে।

মনসামঙ্গল বৈদ্য জগন্নাথ।

চাঁদ সওদাগর শঙ্করের উপাসক। শঙ্করের তিনটি বিবাহ, প্রথমাপত্নী দক্ষ-রাজদুহিতা সতী দুর্গা, দ্বিতীয়া পত্নী হিমরাজকন্যা কালী বা চণ্ডী, তৃতীয়া পত্নী গঙ্গা। সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করেন। শিবমায়া মনসা সতীর মানস কন্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। একদা শিব মায়া বিষহরী মহাদেব-নিকট পৃথিবীতে তাঁহার পূজা-প্রচারের কামনা করিলেন। দেবাদিদেব শঙ্কর বলিয়াছিলেন, আমার ভক্ত চন্দ্রধর বণিক্য যদি তোমার পূজা করে, তবেই তোমার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইবেক, নচেৎ নহে। মনসা মহামুনি কশ্যপের ঔরসে তদীয় পত্নী কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

জরৎকারু মুনির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় কথা হয়, মুনিবর পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন না, বরং যখনই পতির কার্য্যের প্রতিকূলে কথা কহিবে, তখনই পরিত্যাগ করিবেন। একদা অপরাহ্নে জরৎকারু মুনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হয় বলিয়া মনসা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাই স্বামিকর্ত্তৃক ত্যক্তা হন। মনসা আস্তীক মুনির মাতা। নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী, বিষাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও বহু-ক্ষমতাশালিনী।

চাঁদ সওদাগর একনিষ্ঠ ভক্ত শঙ্করসেবক; সন্তানধর্ম্মপরায়ণ। মনসা প্রথমতঃ প্রীতিভাবে চাঁদ সওদাগর হইতে পূজা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কোন কোন কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চাঁদ সওদাগর চণ্ডীর উপাসক, চণ্ডী মনসার বিমাতা। বিমাতার সহিত সপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের যেরূপ অসদ্ভাব হইয়া থাকে, চণ্ডীর সহিত মনসারও সেইরূপ অসদ্ভাব ছিল। গঙ্গা চণ্ডীর সপত্নী, সুতরাং তিনিও মনসার পক্ষাবলম্বিনী। সুতরাং যাঁহারা চণ্ডীর উপাসক, তাঁহারা তাঁহাদের অকৃপার পাত্র। যেরূপেই হউক, চাঁদ সওদাগরের উপর মনসার কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। তাহার অনিষ্টসাধন করিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। মনসা চাঁদ সওদাগরকে প্রীতিতে বশীভূত করিতে না পারিয়া, কৌশলে বশীভূত করিতে যত্নবতী হইলেন। নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও সফলকাম হইতে না পারিয়া পরিশেষে এক পরমা সুন্দরী কামিনীর রূপ ধারণ করিয়া চাঁদ সওদাগরের মন হরণ করিলেন। ছদ্মবেশধারিণী বিষহরির রূপে ও মায়াতে মুগ্ধ হইয়া চাঁদ সওদাগর 'মহাজ্ঞান" হারা হইলেন। এই "মহাজ্ঞানটা যদি আধ্যাত্মিক শক্তি হইয়া থাকে, তবে মনসা দেবী তাহা গ্রহণ করিয়া একটি দীপশিখার ন্যায় আকাশে মিলাইয়া গেলেন বলিয়া কবিগণ কি বুঝাইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। চাঁদ সওদাগর মহাজ্ঞান-হারা হইয়াও বিচলিত হন নাই। শঙ্কর গারুড়ী নামে তাঁহার এক ওঝা বন্ধু ছিল, তাহার সাহায্যে মনসার করাল কবল হইতে নিজে ও সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মনসা প্রথমে সেই ওঝাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। চাঁদ সওদাগরের অকৃত্রিম বন্ধু শঙ্কর ওঝা মনসার কুহকে ভুলিলেন না। অবশেষে আস্তীক জননী এক অপার্থিব কৌশলে শঙ্কর গারুড়ীর জীবন বিনাশ করিলেন। চাঁদ সওদাগর তাহার বন্ধু প্রধান বৈদ্যরাজ শঙ্কর গারুড়ীকে হারাইয়া একমাত্র মনসার প্রতিকূলে রহিলেন। পুরোহিত জনার্দ্দন, ভৃত্য নেড়া ও পত্নী সনকা অনেক প্রবোধ দিল। কিন্তু চন্দ্রধর "যা করেন শঙ্করী শঙ্কর" বলিয়া আরো দৃঢ় হইলেন। মনসা চাঁদ সওদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করিয়াছেন, ওঝাশ্রেষ্ঠ শঙ্কর গারুড়ী আর জীবিত নাই; সুতরাং এখন মনসার পথ পরিষ্কার। মনসা চাঁদ সওদাগরের ছয়টি পুত্রের প্রাণ হরণ করিলেন। তথাপি চাঁদ সওদাগর

কাঁদিলেন না, অশ্রুত্যাগ করিলেন না, মনসার পূজা দিতে আত্মীয়-বন্ধুগণ কত বুঝাইল, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং বলিলেন, এই "কানীর "চেঙ্গ মুড়ি কানীর" পূজা প্রাণ থাকিতে করিব না। বিষহরী যদি দেবতা হয়, তবে পৃথিবীর সকলই দেবতা।

চাঁদ সওদাগর পুত্রশোকে অভিভূত হন নাই; বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বকীয় ব্যবসা চালাইতেছিলেন। বাণিজ্য-তরণী সহ নানা স্থানে যাইয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয়াদি করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল বাড়ী আসেন নাই। এদিকে তদীয় পত্নী সনকা ঘটস্থাপন পূর্ব্বক মনসার পূজা করিতেছেন। চণ্ডীর প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। তিনি চাঁদ সওদাগরকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, 'চাঁদ! তুমি আমার ভক্ত, তোমার পত্নী সনকা মনসার পূজা করে। ইহা আমার সহ্য হয় না।' চাঁদ সওদাগর কহিলেন 'মা, আমি আপনারই সন্তান। কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।' চণ্ডী কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমাকে এই হেন্তাল দিলাম। তুমি দেশেতে যাইয়া এই হেন্তাল দ্বারা মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দাও। তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।' হেন্তাল কি? হিন্তাল শব্দটি দ্বারা ঠিক্ করা যায় না। তবে ইহা যে একটি যষ্টি, তাহা পরিষ্কারই বুঝা যায়। খুব সম্ভব, ইহা হিন্তাল কাঠের লাঠী। চাঁদ সওদাগর বলিলেন, 'মাত! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।' যেই কথা সেই কার্য্য। চাঁদ সওদাগর তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া হেন্তাল দ্বারা মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং মনসাকে মারিতে গেলেন। মনসা পলাইয়া প্রাণে বাঁচিল। মনসার ক্রোধ ও আরও বাড়িয়া উঠিল। চাঁদ সওদাগর কথায় কথায় বলিতেন :—

"হেঁতালের বাড়ীতে কানীর ভাঙ্গিব পাঁজর।"

মনসাও চাঁদ সওদাগরের অনিষ্ট করিতে ব্রতী হইলেন; বিস্তর ক্ষতিও করিলেন। ক্ষতি সহ্য করিয়া চাঁদ সওদাগর একনিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন; অচল, অটলভাবে শঙ্কর-শঙ্করীর সেবা পূজা করিতেন; মনসার নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠিতেন। যথা—

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সওদাগর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর।

দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে,
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাহারে।
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা,
বলে চেঙমুড়ী দেবী কিসের দেবতা।
হেন্তাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে,
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে।
বলে একবার যদি দেখা পাই তার,
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর।
আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি,
পরম সুখেতে হবে রাজ্যেতে বসতি।
এইরূপে কিছু দিন করিয়া যাপন,
বাণিজ্যে চলিল শেষে দক্ষিণ পাটন।
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর,
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর।
বাহ বাহ বলি ডাক্ দিল কর্ণধারে,
সাবধানে লয়ে যাও জলের উপরে।
চাঁদ-আদেশ পাইয়া কাণ্ডারী চলিল,
সাত ডিঙ্গা লইয়া কালীদহে উত্তরিল।
চাঁদ বেণের বিষম বাদ মনসার সনে,
সাধু কালীদহে জানিল দেবী ধেয়ানে।

মনসাভাসান কেতকাদাস।

চাঁদ সওদাগরের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, দুঃখে পাপের ভোগ বিনাশ হয়। দুঃখের অন্তরালে সুখের দিন লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণাধিক ছয়টি পুত্র মনসার কোপে শমনভবনে গমন করিল। স্থিরচিত্তে তিনি তাহা সহ্য করিলেন, তজ্জন্য দুঃখিত বা ব্যথিত হইলেন না; এক বিন্দু অশ্রুজলও ত্যাগ করিলেন না; আবার বাণিজ্যে চলিলেন। যাইবার কালে তদীয় পত্নী সনকা কহিলেন—

আপনি করিছ যাত্রা যাইতে সফর,
জানাইনু ছয় মাস আমার উদর।
ভাল মন্দ যেই হবে দৈবে তারে জানে,
লেখিয়া দেহত পুত্র জানিয়া আপনে।
এতেক শুনিয়া চাঁদে হরষিত মনে,
এক পুত্র লিখি দিল সনকার স্থানে।
পুত্র হলে নাম তার রাখিও লখিন্দর।
শুভক্ষণে যাত্রা ক'রে যায় সওদাগর। মনসামঙ্গল।

এই বাণিজ্যযাত্রাই চাঁদ সওদাগরের কাল হইল। বিপত্তি-লাঞ্ছনার এক-শেষ হইল। তিনি প্রকৃত ভক্ত, খাঁটি মানুষ, বিপদকে বিপদ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা অম্লানবদনে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুতেই ধৈর্য্য-হারা হন নাই। বিপদরাশি যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই; হস্তের হেন্তাল ছাড়েন নাই। তাঁহার মত প্রকৃত বিশ্বাসী এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি জগতে বিরল। তিনিই প্রকৃত বড়লোক, তাঁহার জোড়া মিলে না। শঙ্কর-শঙ্করীর পূজা এবং স্তুতিপাঠই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাহার একটি স্তুতি এই—

নমস্তে হর সুন্দর নমস্তে হরসুন্দরি
নমস্তে শিব শঙ্কর নমস্তে শিব শঙ্করি
নমস্তে সর্ব্বস্বরূপ নমস্তে সর্ব্বমোহিনি
নমো দেব নমো দেবি নৌমি শঙ্কর-শঙ্করি !
নমস্তে সৃষ্টিকারণ নমস্তে সৃষ্টিকারিণি
নমঃ শিব নমঃ শক্তি নৌমি শঙ্কর-শঙ্করি !
নমস্তে কালপুরুষ নমস্তে কালনাশিনি
নমো মৃত্যু নমো মুক্তি নৌমি শঙ্কর-শঙ্করি !
নমস্তে ভীমদর্শন নমস্তে বিশ্বমোহিনি
নমো জ্ঞান নমো গতি নৌমি শঙ্কর-শঙ্করী !
নমস্তে ধর্ম্মপালক নমস্তে কর্ম্মদায়িনি
নমো রাগ নমো রতি নৌমি শঙ্কর-শঙ্করি।

নমস্তে কামনাশক নমস্তে কামকারিণি
নমো যোগী নমো ভোগী নৌমি শঙ্কর-শঙ্করি
নমস্তে প্রেয়কারক নমস্তে শ্রেয়শালিনি
নমো জয় নমো জয়া নৌমি শিবশঙ্করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চন্দ্রধর বণিক্ একজন বড় বাণিজ্যব্যবসায়ী বলিয়াই তাহার নাম চাঁদ সওদাগর। এবার তিনি সুবৃহৎ ৭ খানি অর্ণবযান লইয়া দক্ষিণ পাটনে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। বাণিজ্য-সম্ভারে সাতখানি নৌকা পরিপূর্ণ হইল। কেবল কি তাহাই? তাহার সঙ্গে শঙ্কর-শঙ্করীও আছেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। তাহার উপর সৈন্য সামন্ত আছে। গায়ক-বাদক আছে; সখের অনুচর বিদূষক আছে। দাড়ী মাঝীরত কথাই নাই। প্রবল প্রবাহে আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যে নৌকায় শঙ্কর-শঙ্করী আছেন, সেই নৌকাতে শঙ্খ-ঘণ্টাদির বাদ্যসহ পূজা আরতি হইতেছে। চণ্ডীপাঠ ও সমস্বরে স্তুতিপাঠ হইতেছে। অপর নৌকাগুলির মধ্যে কোন নৌকায় মানুষের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতেছে, কোন নৌকাতে পশ্বাদির খাদ্যের ব্যবস্থা হইতেছে; কোন নৌকাই নীরব নয়, ডাকা হাঁকি গোলমালে সকলেই ব্যস্ত। চাঁদ সওদাগরের অবসরমাত্র নাই। তিনি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। নৌবহরে সমুদ্রমধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব ভাসমাননগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন নৌকায় মাঝি-মাল্লাগণ বসিয়া বসিয়া তামাকে দম দিতেছে ও ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। কোন কোন নৌকার দাড়ি-মাঝিগণ গল্প করিতেছে। কেহ কেহ বা বসিয়া বসিয়া ষোলকটি ও বাঘবন্দী খেলা খেলিতেছে। কোন কোন নৌকার দাড়ী-মাঝিগণ ভাটিয়াল সুরে গাহিতেছে—

ভবের বাজার ভেঙ্গে গেল রে মন আমার।
ও তুই কি কর্‌লি ভবের হাটেতে বেপার।

খোদা যখন সুধাইবে, তুই তখন কি জবাব দিবে।
শাস্তি হলে কি ভেস্তে পাবে ভেস্তী দুনিয়ার।
লারকা লারকী করিলা খসম কেউ ত মন নয়রে আপন
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার।
যদি করতে চাইস ফতে, তবে চল ধরম-পথে
খোদা তাল্লার কুদরতে খএর হবে তোর এবার।

চন্দ্রধর বণিক্যের ঝঞ্ঝাবাত-সহক্ষম সমুদ্রগামী সুদৃঢ় নৌবহর। সঙ্গে বহু লোকজন। ভয়ের কোনও কারণ নাই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত, সঙ্গীয় লোক সমস্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইলেও সকলেই বাধ্য এবং অনুগত-প্রত্যেক বিভাগের প্রধান ব্যক্তির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া সাধু চন্দ্রধর মালাহস্তে ইষ্টনাম জপে নিমগ্ন আছেন। পূজা আরতির সময় শঙ্কর-শঙ্করীর পূজা আরতি দেখেন। আহারের সময় আহার করেন। রাত্রিতে অতি অল্পকাল নিদ্রা যান। আর সকল সময়েই কেবল মালা জপ করিয়া কাটান। নৌবহরের সমস্তই লোকই যেন পূর্ণানন্দে মাতোয়ারা। কাহারো মনে কোন ভয়-ভাবনা নাই। কাহারো প্রাণে চিন্তার রেখামাত্র নাই। যা কিছু চিন্তা কেবল হিসাব-রক্ষকের। তাহার উপরই সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের ভার আছে। একদিকে দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, অপর দিকে ক্রেতাকে মূল্য কম দিয়া লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। হিসাবে ব্যয়ের অঙ্ক লিখিবার বিবেচনা। কারণ, বিশ্ব-স্তার ব্যাঘাত না ঘটিয়া,লাভের অঙ্কটার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চিন্তাতেই ব্যাকুল! সুতরাং তাহার নানা চিন্তা। আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিবার অবসর বা সময় নাই। নির্ভয়ে মনের আনন্দে চাঁদ বণিক্য বাণিজ্যে চলিয়াছে। স্বপ্নেও বিপদের কথা মনে উদয় হয় না।

মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর, মনসার সহিত চাঁদ বণিক্যের বিবাদ। মনসার দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে পরিষ্কার আকাশে একখানি ক্ষুদ্র মেঘের সঞ্চার হইল। অল্প সময়মধ্যে তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিল। আকাশমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণ জলদজালে আবৃত হইল। ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। ঘন ঘন করকাপাত হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল।

মাঝিগণ বিপদ মনে করিয়া নৌকা নিরাপদস্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। নৌকা তীরের নিকট নিয়া নোঙ্গর করিতে পারিল না। যথা—

অবনী আকাশে, প্রখর বাতাসে,
হলো মহা অন্ধকার।
গাঠিয়া গাবর, নায়ের নফর,
নাহিক দেখে নিস্তার।
গজশুণ্ডাকার, পড়ে জলধার
ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পেয়ে ডর, বলে সদাগর,
যাইতে নারিনু রাজ্যে।
হুড়্ হুড়্ হুড়্, পড়িছে চিকুর,
যেন বেগে ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার,
ভাঙ্গিল মাথার খুলি।
দেখিতে অদ্ভুত, হতেছে বিদ্যুৎ,
ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে কাঁদিয়া,
কেন বা বাণিজ্যে আইনু।
তরী সাতখান, চাপি হনুমান,
চক্রাবর্ত্তে দেয় পাক।
ঘন ঘন উড়ে, ছই সব উড়ে,
প্রলয় পবন ডাক্।
হাঙ্গর কুম্ভীর, আইল বিস্তর,
তরীর আশে পাশে ভাসে।
জলে ভিঙ্গা লয়ে, রাখে পাক দিয়ে,
অহি ধরে গিলিবার আশে।

বিপদ বিকলে, কালীদ উথলে,
তরঙ্গে তরণী বুড়ে।
হইয়া বিকল, কান্দিয়া সকল,
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
ঘনের গর্জ্জনে, আর বরিষণে,
কাণ্ডারী জড় হলো শীতে।
অঙ্গ নাহি নড়ে, মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে,
সবে রহে এক ভিতে।
ডিঙ্গার নফর, নাশিল হাঙ্গর,
কাছি গিলিল মাছে:
চাপিয়া তরণী, হনুমান আপনি,
হেলায়ে ছুলায়ে নাচে।
ঘন পড়ে ঝন্ঝনা, ভাসিল বাতনা,
ভেসে গেল কালীদহ জলে।
ডিঙ্গা ডুবুডুবু, সদাগর তবু,
মনসার নাম না বলে।
যা করে শিব-শূল, এবার পাইলে কুল,
মনসায় বধিব পরাণে।
বলিছে বেণিয়া, সে সব শুনিয়া,
জলে বীর হনুমান।
করি হুড় মুড়, ছাড়িল ঝড় ঘোড়,
হনুমান বাড়িল বলে।
মতিগতি মনসা, মারিয়া পদের ঘা,
ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।
কান্দেরে বাঙ্গাল, হইনু কাঙ্গাল,
ভাসে গেল পুস্তেব হুলা।
বিপদে সদাগর, জলের উপর,
ভাসিল নিদান বেলা।

ডুবাইয়া নায় চাঁদ জল খায়,
জাগতির খল খল হাসে।
জয় জয় মনসা, তুমি মা ভরসা,
রচিলেন কেতকা দাস।

চাঁদ সওদাগর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে ভাসিলেন। তরঙ্গাভিঘাতে একবার ডুবিতেছেন আর একবার ভাসিতেছেন। তাঁহার সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য সহ নৌকা কালীদহে নিমজ্জিত হইল। শঙ্কর-শঙ্করীও জলে নিমগ্ন হইল। চাঁদ সওদাগর হাতের হেন্তাল ছাড়েন নাই। পরিধেয় বস্ত্র জলে ভাসিয়া গেল। উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু সন্তরণের সুবিধা হইল। তিনি প্রাণপণ করিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। চাঁদ সওদাগর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া শিব শিব বলিতে লাগিলেন। চাঁদ সওদাগর মরিলে মনসার পূজা প্রচারের পথ রুদ্ধ হয় ভাবিয়া মনসা তাঁহার আসনের পদ্ম ভাসাইয়া দিলেন। চাঁদ সওদাগর দেখিলে, তাঁহার সম্মুখ দিয়া একটি শতদল পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে, তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন না। বরং পদ্ম দেখিয়াই রক্তলোচনে বলিয়া উঠিলেন, এই পদ্মে মনসার জন্ম। ইহা কি আমি স্পর্শ করিতে পারি? ইহা স্পর্শ করিলেই যে অধর্ম্ম হইবে। শেষ একটী ভেলা প্রাপ্ত হইয়া চাঁদ সওদাগর শিব শিব বলিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরিধানে বস্ত্র নাই। জলে উদর পূর্ণ। অবসন্নদেহে অনেক কষ্টে গিয়া তীরের নিকটে উপনীত হইলেন। কাতরহৃদয়, বস্ত্রবিবর্জ্জিত চাঁদ সওদাগর লজ্জায় তীরে উঠিলেন না। লজ্জায় গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিলেন। অবশেষে শ্মশান হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা আনিয়া গায় দিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভিক্ষার্থে নগরে গমন করিলেন। ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট বালকগণ পাগল বলিয়া ঢেলা মারিতে লাগিল। দুঃখে কষ্টে ভিক্ষা করিয়া যে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা একটি বৃক্ষমূলে রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইন্দুরে তাহাও গর্ত্তের ভিতরে লইয়া গেল। স্নান করিয়া আসিয়া চাঁদ সওদাগর চাউলগুলি না পাইয়া একটা কলার ছোবড়া দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। চব্য, চষ্য, লেহ্য, পেয় নানা উপাদেয় দ্রব্যে যাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না, সেই চাঁদ সওদাগরের আজ কলার ছোবায়

ও গণ্ডুষমাত্র জলেই পরিতৃপ্তি হইল। বিপন্ন চাঁদ সওদাগর নানা দুর্গতি লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, তথাপি তাহার দুঃখের অবসান হইল না। তিনি কখন বা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ফল মূল আহার করিতেন। কখন বা উপবাসী হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিতেন। অনাহারে অনিদ্রায় চাঁদ সওদাগরের সুন্দর শরীরখানি মলিন হইয়া গেল। চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া গেল। তাঁহার আর আগেকার সেই লাবণ্য—সেই সুন্দর মুখশ্রী নাই; এক ভয়ানক বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। নিরুপায় হইয়া তাঁহার মিত্র রাজা চন্দ্রকেতুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রকেতু মিত্রের বেশ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। চাঁদ সওদাগর তাহার বাড়ীতে মনসার পাট দেখিয়া যখন তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন, তখন চন্দ্রকেতু তাঁহাকে পাগল বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন; প্রহার করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন না। অতঃপর চাঁদ সওদাগর কাঠুরিয়াগণের সহিত কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাধ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেন। কাঠের আঁটি মস্তকে লইয়া যখন বাজারে চলিলেন, তখনই আবার ঝড় পড়িল। আবার বিপদ ঘটিল। মাথার চন্দন-কাঠের বোঝা ফেলাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে এক ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধান্যক্ষেত্র নিড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। চাঁদ বণিক্য ধানের গাছ খড়ের গাছ চিনেন না। খড়ের বদলে ধানের গাছ উপাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার গালে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন। কপর্দ্দকহীন চাঁদ সওদাগর দুঃখে ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া দেশের দিকে গমন করিলেন। অঙ্গে বস্ত্র নাই, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ। কখন মাঠের মধ্য দিয়া, কখন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ ভূত পিশাচ বলিয়া ভয় পাইতেছে, কেহ পাগল বলিয়া সরিয়া যাইতেছে, কেহ বা ঢেলা মারিতেছে, কেহ বা হাতে তালী দিতেছে। চাঁদ বণিক্যের ভ্রূক্ষেপ নাই। উলঙ্গপ্রায় হইয়া কঙ্কালাবশিষ্টদেহ চাঁদ সওদাগর বহুকষ্টে বহুদিনে চম্পক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। লজ্জায় দিনের বেলায় এক কদলীবনে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

বিপদের উপর বিপদ, এক গণক আসিয়া সহসা চাঁদ সওদাগরের বাড়ীতে

উপস্থিত হইলেন। সনকা দৈবজ্ঞ দেখিয়া ভবিতব্য গণাইতে আরম্ভ করিলেন। গণক বলিল, 'মা! তোমার আজ বড় বিপদ। আজ এক বিকট চোর তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করিবে।' দৈবজ্ঞ চলিয়া গেলেন। সনকা ভয়ে ভয়ে দিবাভাগ কাটাইয়া রাত্রিতে শয়ন করিলেন। চক্ষে নিদ্রা আসিল না, কলাবন হইতে কে যেন ডাকিতেছে। কি যেন নড়িতেছে। শুনিয়া সনকা ঘরের বাহির হইলেন। যথা—

শুনিয়া ধাইল তথা সনকা বেণেনী,
কলাবনে কেটা নড়ে কান পাতি শুনি।
কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর খুসুর নড়ে,
লম্ফ দিয়া নেড়া গিয়া তার ঘাড়ে পড়ে।
চোর চোর বলিয়া মারিল বড় লাথি,
পরিচয় নাহি তাহে অন্ধকার রাতি।
মার খেয়ে সাধু বেণে হইল বড় কাতর,
আর না মারিও নেড়া আমি সদাগর।
এতেক শুনিয়া তারা রাখিল মারণ,
প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ।
পরিচয় পাইয়া হইল মনেতে লজ্জিত,
কেতকার বিরচিল মনসার গীত।

চাঁদ সওদাগর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ স্ত্রীর নিকট কহিলেন। সনকা স্বামীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অশ্রু নিক্ষেপ করিলেন। পরে কহিলেন,মনসাই এই বিপদ ঘটায়েছেন। ''মনসার পূজা কর,বিপদ কাটিয়া যাইবে।' চাঁদ সওদাগর বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে মনসার পূজা করিব না। কাণীকে পুষ্পাঞ্জলি দিব না।' অতঃপর সনকা পুত্র লখিন্দরকে আনিয়া দেখাইলেন। চাঁদ সওদাগর পুত্রমুখদর্শন করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। লখিন্দরকে কোলে করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাঁদ সওদাগর এখন সঞ্চিত ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে লখিন্দরের বয়স বৃদ্ধি হইল। উপযুক্ত শিক্ষাদান করিলেন। দুঃখের দিন দূর হইয়াছে মনে করিয়া চাঁদ সওদাগর একটুকু নিশ্চিন্ত হইলেন।

পুত্রকে লইয়া স্বামী-স্ত্রী পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। চাঁদ সওদাগরের সঞ্চিত ধন কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা কেহ করিতে পারিত না। তিনি পূর্ব্বে যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, বাণিজ্য-তরণী সহিত পণ্য-দ্রব্যাদি-হারা হইয়াও সেইভাবে চলিতে লাগিলেন। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। লোকে বলিত, চাঁদ সওদাগরের অফুরন্ত ধন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হইলেও তিনি পরম সাধু ছিলেন। "বাণিজ্য যে করে, তাহার সত্য কথা নাই" বাক্যে দৃষ্টান্তা-নুসরণ করিতেন না। তাঁহার ব্যবসায় কোনরূপ ছলনা ও চাতুরী ছিল না, সর্ব্বদা সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। সত্যপথে চলিতেন। মনসার কোপে পণ্যদ্রব্যসহ তাঁহার বাণিজ্য-তরী জল-নিমগ্ন হইলেও তিনি একেবারে নির্ধন হইয়া যান নাই। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি-হারা হন নাই। পূর্ব্ববৎ সম্মানে এবং অক্ষুণ্ণ গৌরবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। লখিন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নিছনি নগর-নিবাসী ধনাঢ্য সায় বণিক্যের কন্যা বেহুলার সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইবামাত্র সায় বণিক্য আনন্দে সায় প্রদান করিলেন। সায় বণিক্যের কন্যা বেহুলা পরম রূপবতী ও গুণবতী। তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে চাঁদ সওদাগরের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। এক্ষণ তাহা পূর্ণ হইতে চলিল।

জ্যোতির্ব্বিদ কর্ত্তৃক লখিন্দরের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। জন্ম-পত্রিকাতে লিখিত ছিল, মনসা দেবীর কোপে বিবাহ-রাত্রিতে বাসর-ঘরে সর্পা-ঘাতে লখিন্দরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। সেই দিন রক্ষা পাইলে দীর্ঘায়ু এবং প্রখ্যাতনামা পুরুষ হইবে। তজ্জন্য চাঁদ সওদাগর পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের বাসরঘরের জন্য সাতাইল পর্ব্বতে এক লৌহময় বাসর-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লোহার ছানি, লোহার খুঁটি, লোহার বেড়া দ্বারা সেই ছিদ্রশূন্য পরমরমণীয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্প দূরে থাকুক, পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রবেশের পথ ছিল না। চাঁদ সওদাগর এবং সায় বণিক্য

উভয়েই ধনী। উভয়েই সম্ভ্রান্ত। মহা আড়ম্বরের সহিত শুভ দিনে শুভ লগ্নে শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। চাঁদ সওদাগর পুত্র এবং পুত্রবধূকে লইয়া ঘরে আসিলেন। সনকা ফুল্লান্তঃকরণে পুত্র এবং পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে নিলেন। পুত্রবধূ বেহুলাকে কোলে লইয়া সনকা কহিলেন।

সুলগ্নে বেহুলা করিলে আসিয়া
নূতন গৃহে প্রবেশ।
করি আশীর্ব্বাদ উমার মতন
পালিও স্বামি-আদেশ।
গঙ্গার মতন, বীর তনয়েরে
করিও বক্ষে ধারণ।
জীবন-সংগ্রামে চালাইও রথ
দেবী ভদ্রার মতন।
সম্পদে বিপদে জানকীর মত,
তুমি মা হইও রমা।
চিরদিন ভার বহিও সবার
হইয়া বসুধা সমা।
অরুন্ধতী সম হইও সুব্রতা
মৈত্রেয়ী সমান জ্ঞানে।
দ্রৌপদীর মত হইও পণেতে
রক্ষিতে গৌরব মানে।
সাবিত্রী সমান তেজেতে জ্বলিয়া
ফেলিও পুড়ি মরণে।
আলস্য লালসা বিলাস-বাসনা
দলিও সদা চরণে।
মায়ের মতন পালিও সমাজে
ভগিনী সমান পরে।
কন্যার মতন গুরুজন-পদে
নমিও দুইটি করে।

নারীর সরম পরম রতন
করিও শিরোভূষণ।
স্বামীর সহিত করিও সতত
স্বধর্ম্ম যত্নে পালন।

বেহুলা মৃদু-মধুরস্বরে কহিলেন,—'মা, আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।' অতঃপর পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে বরকন্যা লৌহময় মনোহর বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলেন। চাঁদ সওদাগর সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রহরী সহ সর্প-খাদক ময়ূর রাখিয়া দিলেন, নিজে জাগরিত থাকিয়া সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যথা—

শুভক্ষণে মন্দিরেতে প্রবেশে কুমার
দৃঢ় করি বান্ধিলেক মন্দিরের দ্বার।
লখাই বেহুলা গেল লোহার বাসর
পাইক প্রহরী দিল রাজা চন্দ্রধর।
চারিশত ময়ূর রাখি চারি চালে
সর্প দেখিলে তারা ধরি ধরি গিলে।
হাতে অস্ত্র শূল খাণ্ডা আর চর্ম্ম দড়ী
দশ সহস্র পাইক দিল থাকিতে প্রহরী।
কতুয়াল করি দিল তেরায়ে নফর
বেড়াইবে ফটক সব জানাইবে সত্বর।
ফটক প্রহরী দিয়া রাজা চন্দ্রধর
পাঠাইছেন বার্ত্তা রাজা মহোৎসব কর।
এক গোটা সর্প আজি ধরে যেই জন
এক লক্ষ টাকা তারে দিবে সেইক্ষণ।
লাফে লাফে নাচে চাঁদ পাকা দাড়ী নড়ে
লম্বোদর মহাপেট ঘন লাছা পড়ে।

বৈদ্য জগন্নাথ।

বেহুলা লখিন্দর পর্ব্বতোপরি লৌহময় বাসর-গৃহে স্থবর্ণ-খট্টায় সুখে শয়ন করিলেন। সোহাগবাতি গৃহ আলোকিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এ দিকে

ভুজঙ্গ-জননী মনসা দেবী পৃথিবীর যাবতীয় সর্পকে একত্র করিয়া কহিলেন, সর্পগণ! আমি তোমাদের জননী। চাঁদ সওদাগর আমার পরম শত্রু, সে আমার পূজা করে না, বরং দেখিলেই হেস্তাল লইয়া মারিতে আসে, তাহার পুত্র লখিন্দরের আজ বিবাহ-বাসর। আজ তাহাকে সাতাইল পর্ব্বতোপরি ছিদ্রশূন্য লৌহময় গৃহে রাখিয়াছে, আজ যদি লখিন্দর প্রাণে বাঁচে, তবে সহসা তাহার ধ্বংস নাই। তোমরা যে কেহ যাইয়া তাহাকে দংশন কর।' প্রথম প্রহরে বঙ্কবাজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে বৃহৎ বৃহৎ অন্যান্য সর্প গেল। লখিন্দরকে দংশন করা থাক, কেহই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। শেষ রজনীতে ভয়ঙ্করী কালনাগিনী গিয়া লৌহময় শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক লখিন্দরকে দংশন করিল। যথা—

বাসরে প্রবেশ কৈল এ কালনাগিনী।
বেহুলা লখির রূপ দেখিল আপনি।
বেহুলা লখির কোলে যেন কাল নিধি।
যেমন কন্যা তেমনি বর মিলাইল বিধি।
এ হেন সুন্দর গায় কোন্‌খানে খাইব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব।
বিষম আরতি দেবী কেন দিলা মোরে।
লখিন্দরে খাইতে মোর শক্তি নাই পুরে।
ছকুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী
শোকদুঃখের বার্ত্তা আমি ভাল মতে জানি।
আপনি তিতিল কালী নয়নের জলে।
ঝরিতে বিদরে বুক গেল পদতলে।
হেন কালে পাশমোরা দিতে লখিন্দর।
পদাঘাত বাজে কালী মস্তক উপর।
দুঃখিত হইয়া কালী তখন কহে কথা।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও সকল দেবতা।
মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনা অপরাধে মো'র মুণ্ডে মারে লাথি।

বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়।
দুর্ল্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়।
জাগ জাগ ওগো বেহুলা সায় বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল-নিদ্রা ঘোরে খাইল কি।

বেহুলা স্বামীর মৃত দেহ কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লখিন্দরের মাতা শোকবিহ্বলা লইলেন। চাঁদ সওদাগর, তাঁহার মিত্র রাজা চন্দ্রকেতু এবং বৈবাহিক সায় বণিক্য একত্রে হইয়া বহু পরামর্শ করিলেন। বহু বৈদ্য—বহু ওঝা আনিলেন। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। কিছুতেই কোন ফল হইল না। গ্রাম শুদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে একত্রিত হইল। তখন চাঁদ সওদাগর নিরাশ হইয়া কহিলেন।

চাঁদ বলে কোথা তোরা চাকর নফর।
কালীর উচ্ছিষ্ট বাড়ীর বাহির কর।
ঘর হইতে লখিন্দরে রাখ নিয়া বাহিরে।
ঘর দ্বার লেপি দেহ, গোময় প্রাচীরে।
ভাসাইয়া দেহ নিয়া মরা লখিন্দর।
আপদ খণ্ডিল কালীর আর নাই ডর।

তখন বেহুলা বলিলেন,"আমি যদি সতী হই, আমার যদি দেবতায় ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে, তবে আমি মৃত পতিকে বাঁচাইবই বাঁচাইব। কলাগাছের ভেলা করিয়া নদী বাহিয়া ছয় মাস ঘুরিয়া বেড়াইব। দেশদেশান্তরে যাইব। দেবীকে প্রসন্ন করিয়া মৃত পতিকে জিয়াইব।" শ্বশুর-শাশুড়ী পিতা-মাতা প্রতিবেশী সকলেই নিষেধ করিলেন। সতী বেহুলা কাহারো নিষেধবাক্য শুনিলেন না। তিনি পতিকে লইয়া মান্দাসে উঠিলেন। বেহুলা কাহারো কথা না শুনিয়া নদী-স্রোতে দেশ-দেশান্তরে ভাসিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে এক গোঁদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোঁদা তাঁহার সতীত্ব বিনাশের জন্য অনেক চেষ্টা করিল। বেহুলার মন ফিরাইতে পারিল না। এরূপ অনেক স্থানে অনেক দুষ্ট লোক বেহুলার রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহার সতীত্ব বিনাশ জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। বেহুলা একাকিনী আপনার সতীত্ব-ধর্ম্ম ও পতিকে রক্ষা

করিয়াছেন। কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। হায়! হায়! লখিন্দরের দেহ ক্রমে পচিয়া উঠিল। দুর্গন্ধে মান্দাসে থাকা দায় হইয়া পড়িল। যথা—

মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ।
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।
মরা অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে।
দিবসে দিবসে তাহা কীট কৃমি বাছে।
ঘন ঘন বৈসে ঘন মরা অঙ্গ কাছে।
বেহুলা তাড়ান যত নহে নিবারণ।
পুলকে প্রবেশে তাহে মশক-নন্দন।

এইরূপে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেহুলা ত্রিবেণীর ঘাটে আসিলেন। নেতে ধূপানীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় গিয়া নাচ করিলেন। দেবগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। দেবতাগণ লখিন্দরের প্রাণদান করিলেন। বেহুলা সতীর শিরোমণি। পতির নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিতে ক্রুটী করেন নাই। সর্পদষ্ট স্ফীত গলিত কীটাকুলিত মৃত পতিকে মান্দাসে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে দীর্ঘকাল কাটাইলেন। তাঁহার এই পতি-সেবা ও সতীত্বের তুলনা হয় না। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতী রমণী-গণের একাসনে উপবিষ্টা হইবার উপযুক্তা। বেহুলা পতিব্রতা রমণীদিগের সমুন্নত ধ্বজা। তাই আজ গৃহে গৃহে বেহুলার কীর্ত্তিকাহিনীও গীত হইতেছে।

লখিন্দর দেবতাগণের বরে প্রাণ প্রাপ্ত হইলেন। বেহুলা স্বামীকে লইয়া ঘরে আসিলেন। মনসা বেহুলাকে কৃপা করিলেন। বেহুলার প্রার্থনায় মনসা কহিলেন।

মনসা বলেন আমি দিলাম এই বর।
সাত ডিঙ্গা ধন লয়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর।
তোমার শ্বশুর যদি বিপরীত বুঝে।
এত দুঃখ দিলাম তবু আমাকে না পূজে।
তোর পতি জিয়াইলাম সুন্দর লখাই।
তোমা হতে পূজা পাব চাঁদ বেণের ঠাঁই।

বাহির হইয়া বেহুল্য যাও নিজ ঘরে।
কদাচিৎ মোর পূজা চাঁদবেণে করে।
বেহুলা কহেন মাতা কর অবগতি।
ছয় ভাসুর জিয়াইলে লখিন্দর গতি।
ক্ষমহ যতেক পূর্ব্বে কৈলাম অপরাধ।
সদয় হইয়া মোরে করিলা প্রসাদ।
আমার শ্বশুর অতি বিপরীত বুঝে।
এত বর পাইয়া যদি তোমারে না পূজে।
তবে না করিব রক্ষা আপনার প্রাণ।
নিশ্চয় কহিলাম মাতা না করিব আন।

* * *

চৌদ্দ ডিঙ্গায় চৌদ্দজন বসিল কাণ্ডারী।
এক ডিঙ্গায় লখিন্দর বেহুলা সুন্দরী।
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছয়টি ভাসুর।
সাধু পুত্র সাধু যেন ডিঙ্গায় ঠাকুর।
আগু পাছু চৌদ্দ ডিঙ্গা ধরিল উজান।
ক্ষমানন্দ বলে সাধু বড় ভাগ্যবান।

মনসাভাসান।

বেহুলা ভাসুর ও স্বামীর সহিত চম্পক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। চাঁদ সওদাগর পুলকিত মনে নানা বাদ্যোদ্যমের সহিত পুত্রগণকে এবং পুত্রবধূকে বাড়ীতে উঠাইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু মনসার প্রসাদ বলিয়া যখন জানিলেন, তখনই তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, মনসা এত অনিষ্ট করিয়াও কৃপাদান করিলেন। কি গুণে আমি এই কৃপার অধিকারী হইলাম? রাজা চন্দ্রধর সন্দেহাকুলিতচিত্তে নানা ভাবনা করিতে লাগিলেন। মনসা কি প্রকৃতই দেবী? প্রভূত শক্তিশালিনী? চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া দেবী চণ্ডীকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, "মা, তুমি আমার প্রাণের বেদনা অন্তরের কথা জান। আমি তোমারই দিকে তাকাইয়া রহি-

য়াছি। কত দুঃখ, কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা তুমি জান। স্বয়ং দর্শন করিয়াছ, এখন আমার প্রাণের ভিতর মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। জয় পরাজয় তোমার হাতে। আমি কেবল তোমারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। তুমি ব্যতীত আমার আর পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান নাই। তুমি আমাকে সমস্ত পার্থিব বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি আর তোমার সেই রুদ্রমুখ দেখিতে পারি না। একবার প্রসন্ন মুখ দেখাও। শান্তিতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। তোমার হাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। জননি, আমার কোন বল নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। আমার জীবন পাপে কলঙ্কিত। আমি তোমার দয়ার ভিখারী, তোমার ধনে ধনী হইতে চাই মা, ইত্যাদি বলিয়া চাঁদ সওদাগর গাইলেন—

মাতৃধনে চাহি পূর্ণ অধিকার
দাও দাও জননি আমার।
দাও সরলতা, পরার্থপরতা
সাধন দৃঢ়তা, বিনয় আচার।
দাও একনিষ্ঠা, এক মন প্রাণ।
গাইতে মধুর একত্বের গান
দাও একাগ্রতা, দাও ব্যাকুলতা
দাও মা দীনতা নাশি অহঙ্কার।
দাও প্রীতিভক্তি, প্রেম মহাধন।
বিশ্ববাসী জনে করিতে আপন।
দাও মা প্রবল হৃদয়ের বল।
করি আশীর্ব্বাদ শকতি সঞ্চার।
দাও মা বিশ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাস,
করিতে বিনাশ বাসনা বিলাস।
সুখ দুঃখ জ্ঞান, করিয়া সমান।
আনন্দ অন্তরে করিতে বিহার।
দাও নিত্য শান্তি, বৈরাগ্য নির্ভর।
স্বাধীন সুন্দর বিবেক আদর।

রাখ অবিরত, সেবা-ব্রতে রত।
অচল অটল কার্য্যেতে তোমার।
দাও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা সুশীলতা
করিতে বিনাশ হিংসা দ্বেষানল।
কর মা নির্ব্বাণ, আশা অভিমান।
হ'ক্ অবসান সকল বিকার।
দাও নামে রুচি, সংকীর্ত্তন যাগ।
পুলক উদ্যমে নব অনুরাগ
হইয়া বিহ্বল, করিতে কেবল
নাম সুধাপান সুখে অনিবার।
দাও মা বিধান আত্মযোগধ্যান।
নন্দন উদ্যান পদযুগে স্থান।
দাও মা কল্যাণ, চিত্ত সমাধান।
শুভ মতি গতি রতি সাধনার।

চতুর্থ অধ্যায়।

পৃথিবীতে ভাঙ্গা ও গড়ার ব্যাপার সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই ভাঙ্গা গড়ার প্রবাহে পড়িয়া মানুষ হাসিতেছে কাঁদিতেছে। মানুষের এই জীবনস্রোত বা ভাঙ্গা গড়ার প্রবাহ নদীর ন্যায়। এক শ্রেণীর নদী আছে, তাহাতে স্রোত নাই। তরঙ্গ নাই। পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি বাঁকা আছে। পরেও তেমনি থাকিবে। সেই নদীর কূলে যাহারা বাস করে, তাহাদের ভয় নাই, ভাবনা নাই, কিন্তু শরীর রুগ্ন, মুখে হাসির লেশমাত্রও নাই। গৌরবর্ণ দেহখানি পীড়াতে জীর্ণ-শীর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষক চাষ করিতেছে। সে গরু তাড়াইতেছে, কি গরু তাহাকে টানিতেছে বুঝা যায় না। আর এক প্রকার নদী আছে। তর তর বেগে ছুটিয়াছে। কল কল ধ্বনি করিতেছে। প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে। তীর-প্রদেশ ভাঙ্গিয়া গন্তব্য পথ সোজা করিয়া লইতেছে। এই নদীর তীরে যাহারা বাস করিতেছে,

তাহাদের পদে পদে বিপদ্। যখন নদীতে বাড়ীঘর শস্যক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া লইতেছে, তখন কাঁদিতেছে। যখন চর পড়িতে আরম্ভ করে, ভাঙ্গা বন্ধ হইয়া যায়, তখন হাসির ফুয়ারা ছুটে। সবল সুস্থকায় কৃষক উৎসাহে কৃষিক্ষেত্রে চাষ করিতেছে। তাহাদের প্রাণে কত আমোদ, কত উৎসাহ, তাহা মাপ-কাটি দ্বারা মাপ করা যায় না। তাহাদের প্রাণে যেন হাসি সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। চাঁদ সওদাগরের হৃদয়খানি শেষোক্ত নদীর ন্যায়। তিনি ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ পরম সাধু। শঙ্কর-শঙ্করীর উপাসক। মনসা তাঁহার নিকট পূজা পায় না। তিনি শঙ্কর-শঙ্করী স্থলে মনসাকে বসাইতে পারেন না। এদিকে পুত্রবধূ বেহুলা মনসার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, শ্বশুর দ্বারা মনসার পূজা করাইবেন। নচেৎ নিজে প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্বশুরের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়াছেন। শ্বশুর বধূর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে গুণবতী রূপবতী ধর্ম্ম-প্রাণা পুত্রবধূ, তাহা দ্বারা অপহৃত সম্পত্তি এবং মৃত পুত্রগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর দিকে নিজের ধর্ম্ম। আত্মীয়-স্বজন আসিয়া চাঁদ সওদাগরকে মনসা পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। চাঁদ সওদাগর আপনার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া কহিলেন। যথা—

হেন মনসার সনে করহ বিবাদ।
এবে তারে পূজা কর না রবে বিষাদ।
হারাইলে পায় আর মরিলে বাহুড়ে।
হেন দেবে পূজা কর জন্ম-জন্মান্তরে।
চাঁদ বেণে বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুষ্ক ডাঙ্গায় চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে যদি যায়।
সর্ব্বলোকে বলে সাধু তুমি হে পাগল।
তরণী নাহিক চলে বিহনেতে জল।

বেহুলা শ্বশুরের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া যুক্তকরে মনসার কাছে প্রার্থনা করিলেন। বেহুলার প্রার্থনায় চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দখানি ডিঙ্গা শুষ্ক ডাঙ্গা দিয়া

ঘরে প্রবেশ করিল। চাঁদ সওদাগর অবাক্ হইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে কহিলেন।

বাদ বিসংবাদ ছিল যার সনে কালি
কোন্ লাজে তাহার লইব পদধূলি।
চেঙ্গমুড়ী বলিয়া যাহারে দিলাম গালি
কোন্ লাজে তারে আগে হব পুটাঞ্জলি।
এই বড় অপমান হইল আমার।
কেমনে পূজিব পদ দেবী মনসার।
যেই হাতে পূজি আমি সোনার গন্ধেশ্বরী
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরী।
সাবিত্রী সমান হইল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলাম চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর।

মনসা ভাসান।

তুমি যদি বল তবে পূজিব বামহাতে।
ডাইন হাতে না পূজিব বলিনু তোমাতে।
যেই হাতে আনন্দে পূজিব হরগৌরী
সেই হাতে না পূজিব ধামনাভাতারি।

বৈদ্য জগন্নাথ।

বেহুলা রূপবতী। তাঁহার রূপে চাঁদ সওদাগরের গৃহ আলোকিত হইয়াছিল। তাঁহার গুণে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিল। তিনি শ্বশুর-ভবনে আসিয়া মনসার ঘট স্থাপন করিলেন। প্রভাতে সন্ধ্যায় মঙ্গল ধূপের আরতি করিতেন। মধ্যাহ্নে নানা উপচারে মনসার পূজা দিতেন। প্রদোষে যখন মনসার আরতি-বাদ্য বাজিয়া উঠিত, তখন প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া চাঁদ সওদাগরের গৃহে সমবেত হইত। একদিন সান্ধ্য আরতির সময় অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। সানাইর মধুর তান দিগ্‌দিগন্তরে মধু বর্ষণ করিল। অগুরু-গন্ধে দশ-দিক্ ভরিয়া গেল। জ্যোৎস্না শতগুণে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চাঁদ সওদাগর সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। মনসার মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কখনও সেই দিকে পদার্পণ করেন নাই। মনসার

ঘটও সন্দর্শন করেন নাই। মণ্ডপের নিকটে গিয়া দেখিলেন, বেহুলা মনসার আরতি করিতেছেন। আসনে দেবী অষ্টমঙ্গলা। সহসা চাঁদ সওদাগরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি ভূপতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অষ্টমঙ্গলা চণ্ডীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা! তুমি কত বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। কত আকস্মিক রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছ। বিকৃত রোগী যেমন চিকিৎসককে গাল দেয়, কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করে, তথাপি চিকিৎসক ছাড়ে না, আমিও সেইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় তোমাকে কত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; কত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। তথাপি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই। এতদিনে বুঝিলাম, তুমি প্রকৃতই পূজনীয়া দেবী। স্নেহস্বরূপিণী দয়াময়ী জননী। অধমে করুণা কর মা। আমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী সনকা, প্রাণাধিকা পুত্রবধূ বেহুলা তোমার অসীম ক্ষমতার কথা, বাৎসল্যের কথা সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেছে। আমি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করি নাই। বরং আমি বলিয়াছি, মনসা যদি দেবী অষ্টমঙ্গলা হইলেন, তবে তিনি আমার নিকট হইতে পূজা পাইবার জন্ত এত ব্যস্ত কেন? মা, তোমার প্রসাদে আমার সাত পুত্রকে চৌদ্দখানি ডিঙ্গাসহ হস্তে পাইয়াও আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। এখন বল দেখি মা! তুমি মনসা কি দেবী অষ্টমঙ্গলা? তুমি যদি দেবী অষ্টমঙ্গলা মহামায়া চণ্ডী হও, তবে আমার পুত্রবধূ বেহুলা এবং পত্নী সনকাকে মনসার সেবিকা করিলে কেন? আর যদি অষ্টমঙ্গলা মনসা হও, তবে আমাকে হেস্তাল দিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিতে ও মনসাকে তাড়াইয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলে কেন? যদি তোমারা উভয়ে অভিন্না ও শক্তিরূপিণী হও, তবে আমাকে লইয়া এ খেলা খেলিলে কেন? বল মা বল। আমার ভয়ানক চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, জ্ঞানহারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছি।" চাঁদ সওদাগরের এই আকস্মিক ভাবান্তর দর্শনে পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ সনকাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও কৃতাঞ্জলিপুটে চাঁদ সওদাগরের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই। সকলেই যেন কি এক মহাভাবে বিভোর। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে চাঁদ সওদাগর বলিয়া উঠিল, "মা, বুঝিলাম, 'কর্ম্ম-বন্ধন; যতদিন আনাগোনা,

ততদিন আমার কর্ম্মবন্ধন ; ভববন্ধন ছিন্ন করিতে তোমার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। তাই অযাচিত করুণা দান করিতে আসিয়াছ।” চাঁদ সওদাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভূপতিত হইয়া দেবী অষ্টমঙ্গলাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, “মা, তোমার এ কি লীলা ? তুমি যে আজ মনসার আসনে উপবিষ্টা ?”

তখন দেবী অষ্টমঙ্গলা মহামায়া চণ্ডী কহিলেন, “চাঁদ! আমিই যতিদিগের হংস, বৈষ্ণবদিগের প্রধান পুরুষ, কৌলিকদিগের শক্তিরূপা মহাদেবী। আমিই দেবী, আমি স্বয়ং দেব। আমিই অনন্তরূপা মায়াবিনী। তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিলাম। তুমি আমার পরম ভক্ত। তোমার সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা এবং ধৈর্য্যকে দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে কষ্ট দিয়াছি। এখন বলিতেছি— ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমিই স্বাহা, স্বধা, আমিই প্রণব ওঙ্কার। আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী অষ্টমঙ্গলা চণ্ডী। আমিই সর্ব্বশক্তিশালিনী। আমিই নাগমাতা মনসা। আমারই নাম জরৎকারু, জগৎগৌরী, মনসা, সিদ্ধ-যোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তীক-মাতা, বিষহরী এবং মহা জ্ঞানযুক্তা। সর্ব্বঘটে সকল পদার্থে আমারই সত্তা ও শক্তি উপলব্ধি কর। তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি মনসার পূজা কর। তোমার মঙ্গল হইবে।” চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পুরোহিত জনার্দ্দন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পুরোহিত জনার্দ্দন ও পণ্ডিতগণ আসিয়া কহিলেন। যথা—

পণ্ডিত বলিছে শুন চাঁদ সদাগর।
সুবর্ণের ঘট আনি বসাও সত্বর।
ছাগ মেষ বলি দাও চান্দ সদাগর।
এতেক শুনিয়া চাঁদ তোলে মণ্ডপ ঘর।
সুবর্ণ-প্রতিমা ঘট নাহি তার সীমা।
হরষিত হয়ে তবে স্থাপিলা প্রতিমা।
পদ্মারে পূজিয়া দিল এক শত বলি।
অন্তরে থাকিয়া দেবী চায় মাথা তুলি।
মণ্ডপে না যায় দেবী মনে ভাবি ডর।
হেন্তাল দেখিয়া পদ্মা কাঁপে থর থর॥

এতেক দেখি বলে সায়ের কুমারী
হেন্তাল করহ দূর চাঁদ অধিকারী—
এতেক শুনিয়া চাঁদ মনে মনে হাসে।
এখনও কাণি বেটী মোরে ভয় বাসে॥
হেন্তাল চিরিয়া তায় লাগায় ধূপ বাতি।
তবে সে মণ্ডপে আইল দেবী পদ্মাবতী॥
নানা মতে স্তব করে চাঁদ সওদাগর।
সদয় হও মনসা গো মোরে ক্ষমা কর॥
চাঁদের বচনে তুষ্ট হইল মনসা।
কহিতে লাগিল কিছু পাইয়া ভরসা॥

চাঁদ সওদাগরের ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া গেল। বিষহরীর বিষদৃষ্টিও দূর হইল। চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিলেন। সকল দুঃখের অবসান হইল। মনসার বরে তিনি স্বর্গীয় অমর ফল প্রাপ্ত হইলেন।

চাঁদ সওদাগরের মত স্থিরপ্রজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ধার্ম্মিক এবং বেহুলার মত সতী গুণবতী রমণী জগতে দুর্লভ। ধার্ম্মিক চাঁদ সওদাগর বেহুলার মত গুণবতী রূপবতী পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া সংসারেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বহু লাঞ্ছনার পর দেব-আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। চরমে তাঁহার পরম গতিলাভ হইল।

কোন কোন কবি লিখিয়াছেন, দেবাদিদেব মহাদেবই সন্ন্যাসী সাজিয়া চাঁদ সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া মনসা "শিবমায়া" বলিয়া বুঝাইয়া দেন। তথাপিও চন্দ্রধর শঙ্কর-শঙ্করী ব্যতীত অন্য দেবতা মানিবেন না; পূজা করিবেন না বলিয়া ব্যক্ত করায় মহাদেব স্বয়ং আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক মনসার পূজা করিতে বলেন, তবে চাঁদ সওদাগর মনসা দেবীর পূজা করেন। অতঃপর পরিবারবর্গ সহ চাঁদ দিব্যধামে গমন করেন। তিনি সর্ব্বদাই একনিষ্ঠচিত্তে গাইতেন।

সঙ্গীত।

হয়েছে প্রচার, নাম চমৎকার।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্।

গাও রে হৃদয় পরিহরি ভয়।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্ ॥
গাও ওরে প্রাণ, হারাই জ্ঞান।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্।
গাও তবে মন, ভুলিয়া মরণ।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্ ॥
গাও রে অন্তর; সুখে নিরন্তর।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্।
গাও রে শরীর হইয়া অধীন।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্ ॥
গাও রে বদন গাও রে দশন
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্।
গাও রে শ্রবণ, গাও রে নয়ন।
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্ ॥
গাও রে বাসনা, গাও রে রসনা,
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্।
গাও রে দীপনা, গাও রে মাদনা
জয় শিব শঙ্কর হর হর ব্যোম্ ॥

শ্রীরামকানাই দত্ত।

নন্দিনী।

(সাঁইথিয়া)

তব অধিষ্ঠান-ভূমি চির-সমুজ্জ্বল ;
ভৈরব নন্দিকেশ্বর—দেবতা-নন্দিনী !
দীর্ঘ বটবৃক্ষমূলে মহাপীঠতল,
এ কি এ রহস্য, কালী, কালের কামিনী !
ভক্ত দিতে চাহে হর্ম্ম্য নিবার স্বপনে,
উন্মুক্ত পাদপতলে বাঁধিয়া বসতি,
নিত্য শঙ্খ-ঘণ্টারোলে ধূপ ধূনা সনে
সন্ধ্যায় পূজক নিত্য করে যে আরতি !
কি স্তব্ধতা চারিদিকে, কি ঘোর নির্জ্জন !
বিকীর্ণ বেদিকা'পরে শুধু ভস্মরাশি,
যূপকাষ্ঠে ছাগরক্তে উৎসর্গ ভীষণ !
রক্তরাগে রাঙ্গাপায়ে কেবা করে আসি !
হে জননি ! কি বিচিত্র এই মহাভূমি !
এ ভাবে নিবস কেন শুধু জান তুমি !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রী।

Mohila Press, Calcutta.

বেদ বলেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" কোরাণ বলেন, "লা এ লাহা ওল্লেল্লা ;" ইহার অর্থ এই যে, এক ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই। এই উক্তি দুইটি যখন মহামান্য শাস্ত্রদ্বয়ের শিরোভূষণ, তখন ইহার প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত কিছু নাই, এই কথাই যদি সত্য হইল, তবে এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব দেখিতেছি, ইহা কি? উপরের মহাবাক্যানুসারে হয় এই বিশ্ব নাই, না হয় এই বিশ্বই ঈশ্বর। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্রে বলিয়াছেন, জগৎকে মায়া বলিতে পার, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না; বস্তুতঃ যে জগৎ এরূপ অসংখ্য দৃশ্যে ও সুখাসুখের বিষয়ে পরিপূর্ণ,তাহাকে আমরা মিথ্যা বলিতে পারি না; সুতরাং এ বিশ্বকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা হইলে তন্ত্রোক্ত "এক এব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং" বচনের সত্যতা রক্ষিত হয় এবং সেই সূক্ষ্মভাবকে নিরাকার ও স্থূলভাবকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা সাকার বলিয়া মানিতে হয়। স্থূল বিশ্ব জ্ঞেয় সাকার ভাব; আর সূক্ষ্ম বিশ্ব নিরাকার অজ্ঞেয় ভাব। নিরাকার তাঁহার কোন নাম নহে এবং উহার অর্থেরও উত্তম সঙ্গতি হয় না; কিন্তু আজিকালি ঐ শব্দটা বড়ই প্রচলিত হইয়াগিয়াছে বলিয়া ঈশ্বরের সূক্ষ্ম ভাবের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

পৌত্তলিকের হৃদয় ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবেই আয়ত্ত করিতে চায়। অসীম নিরাকার পদার্থ আমাদিগের আয়ত্ত নহে, আমাদিগের জ্ঞানগম্য নহে, তাই সসীম পদার্থই পৌত্তলিকের সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞজনেরা ব্রহ্মাববোধ যেরূপ সহজ ও অনায়াস-সাধ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, পুরাকালের তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ সেরূপ মনে করিতে কখনই সাহস করেন নাই। আজীবন সাধনার দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। ব্রহ্মাববোধের নিমিত্ত বহুজন্মব্যাপী সাধনার আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জ্ঞানমার্গে যতটুকু অগ্রসর হইয়া কালের কবলগত হওয়া যাউক না কেন, লব্ধজ্ঞানের অপচয় হইবে না বলিয়া তাঁহারা জানিতেন। পৌত্তলিকের ভাবপ্রবণ হৃদয় স্বভাবতঃই জ্ঞানের পথ অবরোধ করিতে চাহে। সসীম সাকার কোন পদার্থবিশেষের উপর লক্ষ্য না রাখিলে ধ্যান-ধারণা সম্ভবপর হয় না বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের নামে তাঁহার প্রাণ ঘোর অন্ধকারে ঘুরিতে থাকে, তাই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার নিকট আদরণীয় নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানের মূল নীতি হইতেছে এই যে, সেই ব্রহ্ম নিরাকার ও অনন্ত। এখন তাঁহাকে নিরাকার অনন্ত বলাও যা, আর নিরপেক্ষ বলাও তাই। বায়বিশেষে, উপলক্ষ্যবিশেষ বা অবসরক্রমে কিয়ৎকালের নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইবে, এরূপ হাস্যজনক অব্যবস্থা ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যগণের মনে কখনই উদিত হয় নাই। এমন অনেকগুলি নিরাকার পদার্থ আছে, যাহা অনন্ত নহে—সান্ত; সুতরাং আপেক্ষিক অর্থাৎ সেই সমস্ত নিরাকার পদার্থ সর্ব্বতোভাবেই সসীম সাকার পদার্থের সংযোগ-সাপেক্ষ; যেমন আমাদিগের মন, প্রাণ, ইচ্ছা, দয়া, স্নেহ, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি; এইগুলি নিরাকার বটে, কিন্তু ইহার কোনটিই অনন্ত নয়; যেহেতু, দেহের সহিত ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সংসারের বিষয়-বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্যজগতের ব্যাপার সকলের চিন্তায় উদাসীন হইয়া, সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকিয়া একান্তভাবে পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে আর্য্যমনস্বিগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা সহজ নয় বলিয়া তাঁহারা অবগত ছিলেন। অসংখ্য কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বহুবিধ দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় উদ্বেজিত হইয়া, নানাবিধ ঘৃণিত লিপ্সায় ভাসমান থাকিয়া অনায়াসে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। ইহা আর্য্যমনস্বিগণ জানিলে, তাঁহাদিগকে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে হইত না এবং পরাগত পুরুষপরম্পরার জন্য জটিল দুর্ব্বোধ ব্রহ্মপ্রাপক বিধিব্যবস্থা নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতে হইত না।

উপাস্য সাকারকে ব্রহ্মবোধে উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কারণ, সাকারই ব্রহ্মের একরূপ ভাবমাত্র। শাস্ত্রাদি মানিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জীবকুলের উদ্ধারার্থ সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন ;—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

১০অঃ, ৪২ শ্লোঃ।

'আমি একাংশের দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।' সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মবোধে অক্ষমতাহেতু আমরা যদি সেই ব্রহ্মেরই অংশবিশেষের

আরাধনা করি, তাহা হইলে আমাদিগের আয়াস যে সফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরি-উক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যে কোন দ্রব্যের পূজা করিলেই তাঁহার পূজা হয়, তবে সেই পূজার যে ত্রিবিধ ভাব আছে, তাহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২০, ২১, ২২শ শ্লোকে বিশদ ভাষায় প্রকটিত আছে, যথা :—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

লোক সকল যখন ত্রিগুণপ্রধান, তখন উপাসনা ত্রিবিধ হওয়া অনিবার্য্য; কোন কোন আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টা রাজসিক ও তামসিক উপাসনাকে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহেন; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, যেমন যে দণ্ড-বিধি প্রত্যেক অপরাধের দণ্ডবিধি নয়, সেইরূপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র জনসাধারণের সকল প্রকার উপাসনা রুচিকে বেষ্টন করিতে না পারে, তাহাও অঙ্গহীন ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধারণের ধর্ম্মশাস্ত্র নয়। সে কেবল শ্রেণীবিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজও সাকারোপাসনার বিরুদ্ধ; ব্রাহ্মেরা সাকারোপাসনাকে নিষ্ফল বালকের খেলা মনে করেন; কিন্তু সাকারোপাসনা দ্বারা যে ধর্ম্মোন্নতি লাভ হয়, তাহা তাঁহারা হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ— যে কোন সমাজে অনুসন্ধান করিলেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন। সাকারোপাসনায় যে, হৃদয়ের কি মস্তিষ্কের বল কিছু অপহরণ করে এবং নিরাকার উপাসনায় তাহার পুষ্টিসাধন করে, ইহা কেহই বলিতে পারেন না; কারণ, সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকারের সমাজেই ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, সংস্কারবশতঃ নিরাকারোপাসনা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠতর হইলেও যেমন দেহের সুন্দর বর্ণকে আমরা উত্তম বলিয়া জানিয়াও সকল মানুষকে সুন্দর

দেখিতে আশা করিতে পারি না, সাধুজীবন একমাত্র পবিত্র জীবন জানিয়াও সমগ্র মানবজাতিকে সাধুশীল দেখিতে আশা করি না, সেইরূপ নিরাকারোপাসনা তোমার নিকট উত্তম হইলেও উহা মানব-জাতির ধর্ম্ম হইবে বলিয়া আশা করিতে পার না।

আধুনিক সভ্যতাভিমানী মহাত্মগণ সাকারোপাসকদিগকে এজন্য বর্ব্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু সাধনাবলে তত্ত্বজ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র রশ্মিও যাঁহার হৃদয়ে পড়িয়াছে, তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় দেখিতে পাইবেন, সাকার উপাসক কেমন বর্ব্বর! গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই দুই প্রকার উপাসনার ভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ দুন্দুভিধ্বনি-তুল্য-স্বরে তাহার একটি অতি পরিষ্কার উত্তর দিয়াছেন ;—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥"

এ মর-জগতে এরূপ কেহ আছে কি, যে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া এ মতের প্রতিবাদ করিতে পারে? যদি এ মত খণ্ডন করিতেই না পারা যায়, তবে সাকারোপাসনার বিরুদ্ধের স্বরটা একটু মৃদু করিলে ভাল হয় না কি? যাহারা মানুষের প্রকৃতি বোঝে না—স্বাভাবিক পবিত্র সমাজকে ভাঙ্গিয়া কৃত্রিম সমাজ স্থাপন করিতে চায়, তাহারা কেমন করিয়া মানবজাতির ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবে? কেমন করিয়া মানুষকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে? এ বিষয়ে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার পিতার বাৎসল্যে, নিরাকার পুত্রের ভক্তিতে, নিরাকার সখার সৌহার্দ্দে যাহার চিত্ত পুলকিত হয় না, নিরাকার মিষ্টরসে যাহার রসনা তৃপ্তি লাভ না করে, নিরাকার সুগন্ধে যাহার নাসিকা প্রীত না হয়, নিরাকার স্পর্শপদার্থে যাহার স্পর্শেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ না করে, নিরাকার বীণাস্বরে যাহার কর্ণ শীতল না হয়, নিরাকার ঈশ্বরে সে কি প্রীতিলাভ করিতে পারে?

জ্ঞান বলিতে, ইচ্ছা বলিতে, প্রেম বলিতে, আমরা মনে মনে যাহা বুঝিয়া থাকি, সেই প্রকার জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির সহিত সসীম সাকার পদার্থের এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধ যে, সেগুলিকে যাঁহারা সাকারজাত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনা হয় না। এই শরীর ও এই জগৎ

যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে সেগুলি কি করিয়া, কিরূপ ভাবে আশ্রয়-বিহীন শূন্যে আশ্রয় পাইত, তাহা আমাদিগের কল্পনার অতীত। বাহ্যজগতের সকল পদার্থ হইতে আপনাকে বাদ দিতে থাকিলে ফল এই হয় যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উত্তেজনা অভাবে ক্রমশঃ ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে ও তদ্দ্বারা জীব ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞানরূপ সুষুপ্তির ভিতর ডুবিয়া পড়ে। সে সময় বাহ্য জগতের সংজ্ঞা থাকে না, স্বপ্নের ঐন্দ্রজালিক কোন প্রকার খেলা থাকে না, আমাদের ইচ্ছা-জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই থাকে না; সকলই সেই অন্ধকার সাগরে লীন হইয়া যায়। শরীর ও বাহ্যসংজ্ঞাভাবের ফল এই।

শরীরবিহীন জ্ঞান, সাকার-সম্পর্ক-বর্জ্জিত জ্ঞান যদি সম্ভবপর হয়, তবে সে জ্ঞান যে কি প্রকার, তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিবার ও বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই সাকার সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকিয়া আমরা সেই নিরপেক্ষ নিরাকার পদার্থ জানিব কি প্রকারে? আজীবন যদি কেহ জলে ডুব দিয়া থাকে, তবে আকাশ যে কেমন, সে কেমন করিয়া জানিবে?

এই সকল কারণে সাকারোপাসনায় আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না;—সভ্য সমাজের বর্ব্বর তিরস্কারে আমরা কাতর নহি, বিশেষতঃ গ্রীসের জুপিটার, প্লুটো প্রভৃতি ও কাবামন্দিরে হোবাল প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি সকলের সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের দেবমূর্ত্তির গুরুতর পার্থক্য আছে; ক্রিয়াবান্ মহাপুরুষদিগের নিকট শুনিয়াছি, চক্রভেদকালে উক্ত মূর্ত্তি সকল সাধকের ধ্যানযোগে নিজের দেহের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং শাস্ত্রের মূর্ত্তিগুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার না। যদি তুমি কোন ক্রমেই সাকার উপাসনার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পার, তবে যেমন অর্দ্ধ-জগৎ নাই বলিলে জগৎ লোপ হয় না, যেমন তেমনি থাকে, সেইরূপ তুমি সাকারোপাসনার ন্যায্যতা বুঝিলে না বলিয়া, সাকার উপাসনা অন্যায় হইবে না; উহা যেমন ন্যায়, সেইরূপই থাকিবে।

পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ। যে শাস্ত্র সাকার নিরাকারের সামঞ্জস্য করিয়া উভয় মতকে সমভাবে বক্ষে ধারণ করিয়াছে, সেই শাস্ত্র মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইবে কি একদেশদর্শী নিরাকারবাদের শাস্ত্র মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে? যে শাস্ত্র উদারতায় গগন পর্য্যন্ত বিস্তারিত এবং প্রকৃতিতে প্রচার ও গোপনের সন্ধিস্থানে অবস্থিত,

তাহাই "মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে, কিম্বা সেই শাস্ত্রের একটি শাখা—সাকার-বাদের দোষারোপবৃত্তি হইতে যাহার উৎপত্তি, প্রচার দ্বারা ভজাইয়া বুঝাইয়া যাহার বিস্তার-লাভের ভরসা, সেই শাস্ত্র মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইবে? সাকারবাদের প্রকৃত তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে কথিত হইল। আমরা দেহী, দেহীর ভাব বুঝিতে আমাদের স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে; যদি নিরাকার অর্থাৎ অশরীরী হইতাম, তাহা হইলে নিরাকার উপাসনা আমাদের সুসাধ্য হইত। যদি যোগবলে এই পরিদৃশ্যমান দেহকে সূক্ষ্মত্বে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলেও নিরা-কারোপাসনায় আমাদিগের অধিকার জন্মিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি ভাব, সাম্যের অর্থ সকল মানুষকে একভাবাপন্ন করা, স্ত্রীপুরুষকে সমস্বাধীনতা দেওয়া—এ নীতি কি জগতে শান্তির পরিপোষক হইতে পারে? যাহা বিশ্বের শান্তির বিরোধী, তাহার নিকৃষ্টতা লইয়াও কি তর্ক-বিতর্ক করিতে হইবে?

শ্রীসুখরঞ্জন সেন গুপ্ত।

ঋষির তপ।

(অনূদিত)

কল্পবৃক্ষ যে কাননে বহু ভোগ্য বস্তু বহে
ঋষিরা তথায় বায়ু পান করি' পরাণ ধরিয়া রহে।
তথাকার জল হেমকমলের পিঙ্গল রেণুময়
শুচির লাগিয়া তাহে করে স্নান বিলাসের লাগি নয়।
মণিময় শিলাগুহা হ'তে করে অপ্সরী আনাগোনা
তাদের নিকটে জয় করে যত রিপুর উত্তেজনা।
তপে যা' কাম্য তা'রা তা হেলায় পায়ে ঠেলি' অনুখন
তথা করে তপ কত উচু সে যে তা'দের কাম্যধন।

শ্রীকালিদাস রায়।

চিত্রসূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রেসের অসাবধানতাবশতঃ পত্রাঙ্ক ২৩৩—২৬৪ স্থলে ২৭৭—৩০৮, ৫৯৩—৯৪স্থলে ৮৯৩—৯৪, এবং৬০৩—১০ স্থলে ৮০৩—৮১০ হইয়াছে।

১৩২১

বর্ষ-সূচী।

———